তাভেরনিয়ে-র ভারত ভ্রমণ

অনুবাদ : সুধা বসু

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ

জানুয়ারী ১৯৩৩

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
মুদ্রক :— আর. সাহা, প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী, ব্লক কে—১, কলিকাতা-৬

ভূমিকা

সুপ্রাচীনকাল থেকেই যুগে যুগে ভারতবর্ষে নানা দেশ ও জাতির পর্যটক, ভ্রমণকারী ও রাষ্ট্রদূতগণের আগমন হয়েছে। প্রাচ্যও প্রতীচ্যের কোন ভেদ ছিল না এ-ব্যাপারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই দেশের মানুষকেই ভারতবর্ষ সমানভাবে করেছে আকর্ষণ। বিভিন্ন বিদেশী ভ্রমণকারীদের এদেশে আগমন ও অবস্থানের কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। উদ্দেশ্যও ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁদের কেউ এসেছেন রাষ্ট্রদূত হয়ে, কেউ এসেছেন ধর্ম প্রেরণায়, কেউ বা নিছক ভ্রমণের নেশায়। আবার কেউ হয়ত এসেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য ও আদর্শে ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে সকলের মধ্যেই দেখা গিয়েছে অদ্ভুত মিল। চিন্তা ভাবনায় তাঁরা ছিলেন প্রায় সমগোত্রীয়। অর্থাৎ তাঁদের প্রায় সকলেই ভারতবর্ষকে ঘুরে দেখেছেন অত্যুগ্র কৌতূহল ও আগ্রহ নিয়ে। খুঁটিয়ে দেখেছেন সব কিছু। পর্যবেক্ষণ করেছেন এখানকার রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণের জীবনধারা ও ভৌগলিক বিশিষ্টতাকে। অবশেষে তাঁরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় তার পূর্ণ বিবরণ করেছেন লিপিবদ্ধ। কিন্তু তাঁদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তসমূহ কেবল সেই যুগ ও কালের এক একটি কৌতূহলকর সাধারণ বর্ণনামাত্র নয়। তা ভারত ইতিহাসের অমূল্য উপাদানও বটে।

প্রাচীন যুগের অবসানে এল মধ্যযুগ। সেই মধ্যযুগের মধ্যাহ্ন লগ্নে, বিশেষতঃ মুঘল আমলে আগত এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ইউরোপীয় পর্যটকের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের এদেশে আগমন ও তৎসংক্রান্ত অবদানের মূল্য অসামান্য। তাঁরাও তৎকালীন ভারতের প্রতিচ্ছবি অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক সাহিত্যের পাতায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—স্যার টমাস রো (ইংরেজ), বার্ণিয়ে ও তাভেরনিয়ে (ফরাসী) এবং মানুচী (ইতালীয়)। এঁদের ভারত বৃত্তান্ত অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক আকরগ্রন্থ। মুঘলযুগের ইতিহাস অনুসন্ধানের পক্ষে অপরিহার্য সহায়িকা।

এঁদের বর্ণিত সমস্ত ঘটনা, সব বিবরণ যে সম্পূর্ণ নিখুঁত তা নয়। সমস্ত তথ্য নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু তাকে আবার সম্পূর্ণ উপেক্ষা

করাও চলে না। দেশ, জাতি ও ধর্মাদর্শের ভিন্নতা ও বৈষম্যবশতঃ হয়ত প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও তাঁরা এ-দেশের অনেক বিষয়ের প্রকৃত মর্ম রহস্য পুরোপুরি উদ্ঘাটন ও উপলব্ধি করতে পারেন নি। তারফলে অনেক ক্ষেত্রে তা অবাস্তব, অমূলক ও অসংলগ্ন প্রতিপন্ন হয়। আবার অনেক বিষয় হয়ত পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেও সম্ভবতঃ কিছু বর্ণিত হয়েছে। অনেক কিছু হয়ত আতিশয্য সহকারে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন। বিস্ময় বিমূঢ়তাও যে তাঁদের আচ্ছন্ন করেনি তা নয়। তাহলেও এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লব্ধ এবং তা উপেক্ষণীয় নয়। পরন্তু ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উপাদান। একই যুগ ও সময়ে আগত বিভিন্ন ভ্রমণকারীর বিবরণসমূহকে তুলনা করলে সঠিক তথ্য ও নিখুঁত বর্ণনা আবিষ্কার করা অনেকখানি সহজ হতে পারে।

এই জাতীয় সুবিস্তৃত একটি ভ্রমণ বৃত্তান্তের রচয়িতা হলেন ফরাসী পর্যটক জীন ব্যাপ্‌টিস্‌ট্ তাভেরনিয়ে। ইনি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন মুঘল যুগে। তিনি এদেশে একবার, দুবার আসেন নি। এসেছেন ছয়বার। মুঘল সম্রাট শাহজাহান ও তদীয় পুত্র ঔরংজেব—দুজনার শাসনকালই তাঁর ভ্রমণ যাত্রার ব্যাপ্তিমধ্যে পড়েছিল। তিনি ছিলেন সুদক্ষ একজন মণিকার। তাঁর ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা। মণিমাণিক্য ও মুক্তারাজি ক্রয় বিক্রয়ই ছিল তাঁর পেশা। ইউরোপ থেকে দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান সব জিনিস সংগ্রহ করে তিনি প্রাচ্যদেশের পথে পাড়ি দিয়েছেন বারবার।

পারস্য সম্রাটের দরবার, মুঘল বাদশাহ এবং এদেশের নবাব সুলতান ও সুবাদারগণ ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ খদ্দের। গোলকুণ্ডা সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভেরও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

তাভেরনিয়ে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তবে ইহার যাথার্থ সন্দেহাতীত নয়। তাঁর পিতা গ্যাব্রিয়েলের পরিবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। শোনা যায় যে তিনি ধর্মীয় উৎপীড়নের ফলে এ্যান্টোয়ার্প ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন তাঁর ভ্রাতাদের সংগে। তাঁদের পরিবার ছিল প্রোটেষ্টান্ট। এম্. জোরেটের মতে এঁরা মূলতঃ ফ্রান্স থেকেই পূর্বকালে বেলজিয়মে গিয়েছিলেন।

তাভেরনিয়ের পিতা গ্যাব্রিয়েল ছিলেন ভূগোল বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। মানচিত্র অঙ্কনে ছিলেন তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শিল্পী জীবনের পরিবর্তে তিনি

গ্রহণ করেছিলেন ব্যবসায়ীর বৃত্তি। তাভেরনিয়ে-র মাতা ছিলেন সুজান তোনেলিয়ে। এঁদের তিনপুত্রের মধ্যে তাভেরনিয়ে ছিলেন দ্বিতীয়।

অতি অল্প বয়সেই তাভেরনিয়ে বিদেশ ভ্রমণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি নিজেই লিখেছেন যে তাঁর বাইশ বছর বয়সে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করার। এরপরে তিনি ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, ইতালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে ইউরোপের প্রধান ভাষাসমূহ আয়ত্ব করেন।

তিনি সম্ভবতঃ প্রাচ্য দেশের দিকে প্রথম যাত্রা শুরু করেন ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় দফায় তিনি প্রাচ্য অভিমুখী হন ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর। তখন তিনি বেশ বাড় বাড়ন্ত ব্যবসায়ী। প্রথমতঃ কিছুদিন অ্যালেপ্পিতে কাটিয়ে আরও কয়েকটি দেশ ঘুরে পরের বছরে তিনি যান ইস্পাহানে। সেখানে তিনি শাহ আব্বাসের পৌত্র শাহ্ সাভাবির সংগে দেখা করেন।

খুব সম্ভবতঃ তিনি প্রথম হিন্দুস্থানে (ভারত) আসেন ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে। জলপথে কি স্থলপথে এসেছিলেন এবং কোন তারিখে এসে পৌঁছোন তা সঠিক জানা যায়নি। কিন্তু এম. জোরেট বলেছেন যে তাভেরনিয়ে প্রথমে ঢাকায় যান ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে। ১৬৪০-৪১ এর শীতকাল তিনি কাটান আগ্রাতে। সেই সময় তিনি শাহজাহানকে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেখে ছিলেন। সেই যাত্রায়ই তিনি গোয়া যান। গোয়া থেকে গিয়েছিলেন গোলকুণ্ডা ও স্বর্ণখনি অঞ্চলে। সেখান থেকে সম্ভবতঃ আমেদাবাদে যান জাহাজ ধরার জন্য। সেবারে তিনি ভারত ত্যাগ করেন ১৬৪২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কি ১৬৪৩ এর গোড়াতে।

প্রাচ্য অভিমুখে তাঁর তৃতীয় যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৬ই তারিখ। তিনি প্রথমে যান আলেকজান্দ্রিয়াতে। তারপর ১৬৪৪ এর ৬ই মার্চ্চ তিনি অ্যালেপ্পি ছেড়ে যাত্রা করেন দুজন কাপুসীন সন্ন্যাসীকে সংগে নিয়ে। নানা জায়গা ঘুরে তিনি সুরাটে এসে পৌঁছোন ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। সে যাত্রায় ভারত ভ্রমণ অন্তে তিনি বাটাভিয়া হয়ে চলে যান হল্যাণ্ডে। ওখান থেকে স্বদেশে ফিরে যান ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে।

তাভেরনিয়ে চতুর্থ যাত্রায় পদক্ষেপ করেন দুবছর পরে অর্থাৎ ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে। সেবারেও তিনি পারস্য হয়ে ভারতে আসেন। বন্দর-আব্বাস থেকে গোলকুণ্ডা সুলতানের মসলীপত্তনগামী একটি জাহাজে করেই তিনি

এদেশে পৌঁছোন। সেই যাত্রায়ই তিনি মীরজুমলার সংগে বিশেষ আলাপ পরিচয় করার সুযোগ পান।

তিনি পঞ্চম যাত্রায় বের হন ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে। উক্ত যাত্রায়ই শায়েস্তাখানের সংগে তাঁর পত্রালাপ চলে ছাড়পত্র ইত্যাদি ব্যাপারে।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তাভেরনিয়ে বিবাহ করেন মাদেলিন গোইসে নাম্নী এক মহিলাকে। তিনিও ছিলেন জনৈক মণিকারের কন্যা।

বিবাহের অল্পদিন পরেই তিনি ষষ্ঠ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে যান তিনি পারস্যাধিপতি দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের দরবারে। সেখানে কিছু মণিরত্ন বিক্রয় করেন। অতঃপর তিনি ইস্পাহান থেকে চলে আসেন ভারতবর্ষে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তিনি সুরাটে পৌঁছোন। তাঁর সেই ভ্রমণ যাত্রা এবং শেষ যাত্রা স্থায়ী হয়েছিল পাঁচ বছর। এই দফায় তিনি সম্রাট ঔরংজেবের কাছেও কিছু মণিরত্ন বিক্রী করার সুযোগ পান। জাফরখানও কিছু ক্রয় করেছিলেন।

এই সূত্রে তিনি জাহানাবাদে ছিলেন দু'মাস। তাঁর বিদায়কাল আসন্ন হতে ঔরংজেব তাঁকে সাম্বৎসরিক বিরাট উৎসব পর্বে যোগদানের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। ফেরার পথে তিনি আবার ইস্পাহানে কয়েকমাস কাটিয়ে যান। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কন্‌স্টান্টিনোপল-এ পৌঁছোন। ঐ বছরেরই শেষভাগে তিনি প্যারিসে ফিরে যান। দেশে ফিরে তিনি ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই-এর সংগে দেখা করেন। সম্রাটের কাছে কিছু হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান মণিরত্ন বিক্রয় করারও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সম্রাট তাঁর ভ্রমণ কৃতিত্ব দেখে ও বিভিন্ন যাত্রার বিবরণাদি শুনে তাঁকে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত করেন এবং তাঁকে সম্মানসূচক বিশিষ্ট একটি উচ্চতর উপাধি মণ্ডিত করে সম্মানিত করেন।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, এরূপ জানা যায়। কিন্তু তারপরে তাঁর সম্বন্ধে কোথাও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু শোনা যায় যে তিনি ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও একদিন পরলোক গমন করেন। তাঁর ভ্রমণ যাত্রাসমূহের এই বিবরণ "*Six Voyages*" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে। ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি তিনি স্বহস্তে লেখেননি। জনৈক ফরাসী প্রোটেস্টান্ট, নাম স্যামুয়েল কাপ্পজীন তাভেরনিয়ে-র মুখে শুনে শুনে তা লিপিবদ্ধ করেন।

ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ে-র সংগেও তাঁর ভারতবর্ষে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল। দু'জনে একত্রেও কোনও কোনও জায়গা ভ্রমণ করেছেন। বার্ণিয়ে অবশ্য তাভেরনিয়ে-র কয়েকটি যাত্রার পরে ভারতে আসেন।

অন্যান্য ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে তাভেরনিয়ে-র বিবরণ কিছু স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টতা মণ্ডিত। আর এর ভালো মন্দ দু'দিকই আছে। তাভেরনিয়ে-র বৃত্তান্তে মধ্যযুগীয় বিশেষতঃ মুঘল যুগের ভারতবর্ষ ও এশিয়া খণ্ডের আরও অনেকস্থানের ভৌগলিক পরিবেশ, দেশদেশান্তরের নামধাম, অবস্থান ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির কথা বিবৃত হয়েছে বিশদভাবে। ভারতবর্ষের সহর গ্রাম, রাস্তাঘাট, নদনদী ও জনজীবনের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপের।

তাঁর বর্ণনায় এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা, শুল্কনীতি, বিনিময় প্রথা, পরিবহণ ব্যবস্থা, সামাজিক আচার পদ্ধতি কিছুই বাদ পড়েনি। মুঘল শাসননীতি, দরবার, সম্রাটের কর্মধারা, নবাব সুলতান ও সুবাদারগণের ক্রিয়াকলাপ, প্রাসাদ-দরবারের বিচিত্ররূপ, এমন কি রাজপরিবারের খুঁটিনাটি বিষয় তিনি বর্ণনা করেছেন বিস্তৃতভাবে।

কিন্তু সাধারণ জনসমাজ এবং ধর্মীয় ব্যাপারে, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম ও মন্দিরাদির বর্ণনা-ব্যাখ্যানে তিনি কিছু অতিরঞ্জন ও অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন তৃতীয় খণ্ডে রামায়ণের কাহিনী শুদ্ধ সত্য নয়, নানাভাবে ত্রুটিপূর্ণ। সম্ভবতঃ বর্ণনাবৃত্তান্ত লিখবার দিন পর্যন্ত সে বিবরণ স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন নি।

পুরীর মন্দিরের অবস্থান নির্ভুল নয়। বারাণসীর মন্দির সম্বন্ধীয় তথ্যাদিও নির্ভরশীল নয়। মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তির নাম সঠিক লিপিবদ্ধ হয়নি। দেবমূর্তির রূপরহস্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তার উক্তিও অনভিজ্ঞতাজনিত এবং উপলব্ধিহীন ও অসার (৩য় ভাগ)।

ভুটানরাজ্য সম্বন্ধীয় বিবরণ পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। সুতরাং সব তথ্য সমকালীন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও সত্য বিবরণ কিনা তা জোর করে বলা যায় না। 'তিপরা' নামে যে রাজ্যটির কথা তিনি বলেছেন তার অবস্থান অস্পষ্ট। বর্তমান তিব্বত কিম্বা ত্রিপুরা (ইং টিপেরা) রাজ্যের সংগেও কোনও মিল— ভৌগলিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দিকে নেই।

মুঘল পরিবার ও প্রাসাদের অভ্যন্তর সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা মনে হয় পরোক্ষভাবে সংগৃহীত। বাস্তব সত্যের সংগে পরিচয়ের অভাব হয়েছে

প্রতিফলিত। তবে প্রাসাদের বহির্ভাগ, দরবার, মণিমুক্তা, ধনসম্পদ, জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও উৎসব পর্ব সম্পর্কে যে বর্ণনা তাকে অবাস্তব মনে করার অবকাশ কম। কারণ তা বিদেশী পর্যটকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আওতা মধ্যেই ছিল।

তাভেরনিয়ে কেবল মুঘল সম্রাট, দরবার ও রাজধানীর প্রতিই আকর্ষণ প্রকাশ করেন নি। সমগ্র ভারতের প্রায় সব অঞ্চল, বিশেষতঃ নবাব-সুলতানদের কর্মক্ষেত্র, বাণিজ্যকেন্দ্র, বন্দর বাজার সর্বত্র করেছেন বিচরণ এবং তা বারংবার; তবে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলই তাঁর ভ্রমণের অনেকখানি অংশ জুড়েছিল। গুজরাট, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, সুরাট, গোয়া, কোচিন, মসলিপত্তন, বুরহানপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করেছেন তিনি সর্বাধিক। উত্তর ভারতে আগ্রা ও জাহানাবাদ তো মুখ্য কেন্দ্র হিসেবে তাঁকে টেনেছে অবিরত। বাংলাদেশেও তাঁর আগমন হয়েছিল। সে-বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগত। ভারত ভ্রমণ প্রসংগে তিনি এশিয়ার অন্যান্য স্থানের, বিশেষতঃ পারস্য দেশের বর্ণনাও দিয়েছেন। আর তাতে অনেক কৌতূহলকর ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

তাঁর এই ভ্রমণ-কাহিনীর মুখ্য বিশিষ্টতা হোল—সরল অকপট বর্ণনা ও প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করার দিকে ঝোঁক। কেবল রাজা মহারাজা, নবাব সুলতান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাই নয়, গ্রামীণ জীবন, রাস্তাঘাট, পশুপাখী, সাধারণ মানুষের জীবনধারা, চিন্তাভাবনা সব কিছুকে স্থান দিয়েছেন সমানভাবে। কোন কোনও ঘটনা ও বিষয়কে হয়ত অবাস্তব ও আতিশয্যময় মনে হবে। কিন্তু আরও এমন সব বর্ণনা আছে যা গল্প উপন্যাসের মতই রমণীয় ও আকর্ষক।

তাভেরনিয়ের ভ্রমণ-কাহিনীর ইংরেজী সংস্করণসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল Dr. V. Ball কৃত সংস্করণটি (Dr. V. Ball : *Tavernier's Travels*)। এই বঙ্গানুবাদ Dr. Ball-এর সংস্করণেরই পূর্ণাঙ্গ অনুদিত রূপ। অধিকন্তু ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজী বঙ্গবাসী সংস্করণকেও আলোচনা তুলনা করে এই অনুবাদ হয়েছে সম্পন্ন। ইহাতে মূলগ্রন্থে বিধৃত কিছু সংখ্যক স্থানের মধ্যে দূরত্ব ব্যতীত আর কোনও অংশ বর্জিত হয়নি। সব বিষয়ই পূর্ণাঙ্গরূপে স্থান পেয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী ইতিহাসবিদ্, মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক, ছাত্র-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে এই বঙ্গানুবাদ সার্থক প্রতিপন্ন হলে ও সমাদর লাভ করলে অনুবাদের দুরূহ কর্তব্য ও শ্রমসাধনা সফল বিবেচিত হবে।

যাঁর নির্দেশে ও উৎসাহে এই অনুবাদের কাজে ব্রতী হয়েছিলাম, আজ পুস্তকখানি প্রকাশনার প্রাক্কালে সেই উৎসাহদাতা পরমশ্রদ্ধেয় আচার্য ও. সি. গাঙ্গুলী মহাশয়কে শ্রদ্ধা-প্রণাম নিবেদন করি।

বর্তমান প্রকাশনা সংকটের দিনে এই সুবৃহৎ অনুবাদটি প্রকাশ করতে যিনি উৎসাহ সহকারে এগিয়ে এসেছেন তিনি অবশ্যই আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন অতএব, নবভারত পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রণজিৎ সাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে বিদ্যোৎসাহী ও শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত প্রতুল কুমার দত্ত মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা স্মরণীয়। তাঁর প্রতিও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা

সুধা বসু

বিষয় সূচী

প্রথম ভাগ

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় এক	৩
ইস্পাহান থেকে আগ্রা যাওয়ার রাস্তা ; আগ্রা থেকে দিল্লী এবং জাহানাবাদ। সেখানে বর্তমানে মহিমান্বিত মুঘলরা বাস কচ্ছেন। অবশেষে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের দরবারে যাত্রা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াতের পথ ও পন্থার বর্ণনা।	
অধ্যায় দুই	৭
ভারতীয়দের শুল্কনীতি, টাকাকড়ি, বিনিময় প্রথা, জিনিষ-পত্রের ওজন, মাপ পরিমাপ।	
অধ্যায় তিন	২৯
ভারতীয়দের যানবাহন ও এদেশে ভ্রমণ-রীতি।	
অধ্যায় চার	৩৬
সুরাট থেকে বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে আগ্রার রাস্তা।	
অধ্যায় পাঁচ	৪৭
আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে সুরাট থেকে আগ্রার রাস্তা।	
অধ্যায় ছয়	৬৩
কান্দাহারের রাস্তা ধরে ইস্পাহান থেকে আগ্রা।	
অধ্যায় সাত	৭২
দিল্লী থেকে আগ্রার সেই রাস্তাটিরই আরও বিবরণ।	
অধ্যায় আট	৭৯
আগ্রা থেকে পাটনা ও বাংলা প্রদেশের ঢাকা যাত্রা। সম্রাটের মাতুল শায়েস্তাখানের সংগে গ্রন্থকারের বিবাদ বিসম্বাদ।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় নয়	১০০
সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা।	
অধ্যায় দশ	১০৫
গোলকুণ্ডা রাজ্য ও বিগত কয়েক বছরে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে ওখানে তার বিবরণ।	
অধ্যায় এগার	১২১
গোলকুণ্ডা থেকে মসলীপত্তনের রাস্তা।	
অধ্যায় বার	১২৩
সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা এবং বিজাপুর হয়ে গোয়া এবং গোলকুণ্ডা।	
অধ্যায় তের	১২৯
গোয়া সহরের অবস্থা পর্যালোচনা।	
অধ্যায় চৌদ্দ	১৩৯
১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষবার গোয়া ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা।	
অধ্যায় পনের	১৫৫
ফাদার ইফ্রেমের কথা এবং আকস্মিকভাবে তিনি কি প্রকারে ধর্ম সম্পর্কিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন।	
অধ্যায় ষোল	১৬২
কোচিনের মধ্য দিয়ে গোয়া থেকে মসলীপত্তনের রাস্তা। ওলন্দাজগণ কর্তৃক কোচিন অধিকারের বিবরণ।	
অধ্যায় সতের	১৬৮
সমুদ্রপথে অর্মাস থেকে মসলীপত্তন।	
অধ্যায় আঠারো	১৭১
মসলীপত্তন থেকে কর্নাটের একটি সহর ও সৈন্যাবাস এবং গান্ধীকোটা পর্যন্ত রাস্তা। মীরজুমলা ও গ্রন্থকারের মধ্যে আদান প্রদান। হাতী সম্বন্ধে আলোচনা।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় উনিশ	১৯১
গান্ধীকোটা থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা।	
অধ্যায় কুড়ি	২০১
সুরাট থেকে অর্মাসে প্রত্যাবর্তন। ভীষণ একটি নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং কোন প্রকারে দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা।	

দ্বিতীয় ভাগ

অধ্যায় এক	২১১
হিন্দুস্থানে সংঘটিত শেষ যুদ্ধের বিবরণ। এই যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ও দরবারের অবস্থা।	
অধ্যায় দুই	২১৪
ভারত সম্রাট শাহজাহানের পীড়া ও অনুমিত মৃত্যু। তাঁর পুত্রগণের বিদ্রোহ।	
অধ্যায় তিন	২২১
শাহজাহানের বন্দী দশা, পিতার প্রতি ঔরংজেবের শাস্তিবিধান।	
অধ্যায় চার	২৩০
দারাশাহের সিন্ধু ও গুজরাটে পলায়ন। তাঁর সংগে ঔরংজেবের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ; তাঁর বন্দীদশা ও মৃত্যু।	
অধ্যায় পাঁচ	২৩৭
ঔরংজেব কি প্রকারে সিংহাসন লাভ করে সম্রাট হন। সুলতান শুজার পলায়ন।	
অধ্যায় ছয়	২৪১
ঔরংজেব তনয় সুলতান মহম্মদ ও দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর বন্দীদশা।	

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় সাত ২৫০

ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম পর্যায়। তাঁর পিতা শাহজাহানের পরলোক গমন।

অধ্যায় আট ২৫৫

মহান মুঘল সম্রাটের ওজন গ্রহণের পুণ্যপর্ব ও তার আয়োজন। রাজসিংহাসন ও দরবারের ঐশ্বর্য মহিমা।

অধ্যায় নয় ২৬২

মহান মুঘল সম্রাটের দরবার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ।

অধ্যায় দশ ২৬৭

মহান মুঘল সম্রাট কর্তৃক গ্রন্থকারকে তাঁর সমস্ত মণিরত্ন প্রদর্শনের হুকুম প্রদান।

অধ্যায় এগার ২৭১

শায়েস্তা খান গ্রন্থকারকে যে নিষ্ক্রমণপত্র দান করেন তার চুক্তি-সমূহ। চিঠিপত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর। চিঠিপত্রে দেশীয় রীতিনীতির প্রতিফলন।

অধ্যায় বার ২৭৮

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে উৎপন্ন জিনিসপত্র। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য।

অধ্যায় তেরো ২৯৪

কারিগরগণ কত প্রকারে প্রতারণা করতে পারেন। শ্রমিক, দালাল অথবা ক্রেতাদের ধূর্ত্ততা ও বঞ্চনারীতি।

অধ্যায় চৌদ্দ ২৯৯

ইষ্ট ইণ্ডিয়াতে নতুন ব্যবসায়ী কোম্পানী গঠনের রীতি পদ্ধতি।

অধ্যায় পনের ৩১৫

হীরকের বিবরণ, হীরক সমন্বিত নদী ও খনি। গ্রন্থকারের রমলকোটার হীরক খনিতে ভ্রমণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ষোল গ্রন্থকারের অন্যান্য খনিতে ভ্রমণ ও হীরক অনুসন্ধানের রীতি পদ্ধতি।	৩২৯
অধ্যায় সতের গ্রন্থকারের হীরক খনি ভ্রমণের ধারা।	৩৩৪
অধ্যায় আঠার খনিতে হীরক ওজন করার পদ্ধতি। প্রচলিত বিভিন্ন রকমের সোনা ও রূপা। ভ্রমণের রাস্তা ঘাট। হীরার মূল্য নির্ধারণের রীতি-নীতি।	৩৩৮
অধ্যায় উনিশ রঙীন পাথর ও তার আকার।	৩৪৩
অধ্যায় কুড়ি মুক্তার কথা এবং তা কোথায় উৎপন্ন হয়।	৩৪৮
অধ্যায় একুশ শুক্তি মধ্যে মুক্তা সৃষ্টির রহস্য। মুক্তা সংগ্রহের সময় ও রীতি-পদ্ধতি।	৩৫৪
অধ্যায় বাইশ বৃহত্তম ও সুন্দরতম হীরা ও রুবি যা গ্রন্থকার এশিয়া ও ইউরোপে দেখেছেন তার বিবরণ। ভারতে শেষ যাত্রা সম্পন্ন করে গ্রন্থকার স্বদেশের রাজাকে যে সকল বৃহৎ রত্ন বিক্রী করেছেন তার আলোচনা। চমৎকার একটি তোপাজ ও পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তার কথা।	৩৫৯
অধ্যায় তেইশ প্রবাল ও হলদে রঙের তৈল স্ফটিক এবং তার প্রাপ্তিস্থল।	৩৬৪
অধ্যায় চব্বিশ কস্তুরী, বেজোয়ার ও অন্যান্য রোগ নিরামক প্রস্তরাদি।	৩৭২

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় পঁচিশ ৩৮০

এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল স্থানে সোনা উৎপন্ন হয়।

অধ্যায় ছাব্বিশ ৩৮৫

গোমরুণ ছেড়ে সুরাট অভিমুখে যাত্রাকালে একটি বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা।

তৃতীয় ভাগ

অধ্যায় এক ৩৯৫

ইস্ট ইণ্ডিজে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস।

অধ্যায় দুই ৩৯৭

ইস্ট ইণ্ডিজের ফকির বা মুসলমান ভিক্ষা জীবীদের প্রসঙ্গ।

অধ্যায় তিন ৪০০

ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা।

অধ্যায় চার ৪০৫

এশিয়ার পৌত্তলিক রাজা মহারাজাদের কথা।

অধ্যায় পাঁচ ৪০৭

দেবদেবী সম্বন্ধে হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

অধ্যায় ছয় ৪১১

ভারতের পেশাদার ফকির-সন্ন্যাসী ও তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা।

অধ্যায় সাত ৪১৬

মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অবস্থা সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ও বিশ্বাস।

অধ্যায় আট ৪১৯

মৃতদেহ সংকার সম্পর্কে হিন্দু সমাজের রীতি পদ্ধতি।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় নয়	৪২১
ভারতবর্ষে মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে নারীরা কি প্রকারে আত্মাহুতি দান করেন।	
অধ্যায় দশ	৪২৭
সতীদাহের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা।	
অধ্যায় এগার	৪৩৩
ভারতবর্ষে হিন্দুদের মুখ্যতম ও প্রসিদ্ধতম মন্দিরাদি।	
অধ্যায় বার	৪৪৪
ভারতীয় হিন্দুদের মুখ্য মন্দিরসমূহের আরও কয়েকটি।	
অধ্যায় তেরো	৪৪৭
হিন্দুমন্দিরে তীর্থযাত্রার রীতি-পদ্ধতি।	
অধ্যায় চৌদ্দ	৪৪৯
ভারতীয় হিন্দুদের বিভিন্ন আচরণ পদ্ধতি।	
অধ্যায় পনের	৪৫৭
ভুটান রাজ্যের কথা। এই দেশ থেকেই কস্তুরী মৃগনাভি, রেউ চিনি ও পশম আমদানী হয়।	
অধ্যায় ষোল	৪৬৮
তিপ্‌রা রাজ্য।	
অধ্যায় সতের	৪৭১
আসাম রাজ্য।	
অধ্যায় আঠার	৪৭৭
শ্যামদেশের কথা।	
অধ্যায় উনিশ	৪৮৪
মাকাসার রাজ্য ও চীনদেশে ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় বিশ	৪৯৩
গ্রন্থকারের প্রাচ্যাঞ্চল ভ্রমণ, ভেনগারলাতে বাটাভিয়ার জন্য জাহাজে আরোহণ, সমুদ্রে বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন এবং সিংহল দ্বীপে গমন।	
অধ্যায় একুশ	৪৯৯
গ্রন্থকারের সিংহল ত্যাগ ও বাটাভিয়াতে গমন।	
অধ্যায় বাইশ	৫০০
গ্রন্থকারের বন্তমের রাজার সংগে সাক্ষাৎকার ও নানা দুঃসাহসিক কার্যের বিবরণী।	
অধ্যায় তেইশ	৫০৬
গ্রন্থকারের বাটাভিয়াতে প্রত্যাবর্তন। বন্তমের রাজার সংগে পুনরায় সাক্ষাৎ। মক্কা প্রত্যাগত কিছু সংখ্যক ফকিরের অসদাচরণের বিবরণ।	
অধ্যায় চব্বিশ	৫১০
যাভার সম্রাটের সংগে ওলন্দাজদের যুদ্ধ-সংগ্রাম।	
অধ্যায় পঁচিশ	৫১৩
বাটাভিয়াতে গ্রন্থকারের ভ্রাতার মৃত্যু ও তাঁকে সমাধিদান। জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলে নতুন গোলযোগ।	
অধ্যায় ছাব্বিশ	৫১৫
ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের জন্য গ্রন্থকারের ওলন্দাজ জাহাজে আরোহণ।	
অধ্যায় সাতাশ	৫২১
ওলন্দাজ নৌবহরের সেন্ট হেলেনাতে আগমন। দ্বীপটির বিবরণ।	
অধ্যায় আঠাশ	৫২৪
ওলন্দাজ জাহাজের সেন্ট হেলেনা পরিত্যাগ এবং সুখ [illegible] প্রত্যাবর্তন।	

প্রথম ভাগ

অধ্যায় এক

ইস্পাহান থেকে আগ্রা যাওয়ার রাস্তা ; আগ্রা থেকে দিল্লী এবং জাহানাবাদ। সেখানে বর্ত্তমানে মহিমান্বিত মুঘলরা বাস কচ্ছেন। অবশেষে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের দরবারে যাত্রা এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে যাতায়াতের পথ ও পন্থার বর্ণনা।

এই ভারত ভ্রমণ প্রসংগে আমি আমার পারস্যদেশ যাত্রার কাহিনী বর্ণনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম, সেই পন্থাই অনুসরণ করবো। রাস্তাঘাটের বিবরণ দিয়েই আমি এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুরু কচ্ছি। এই বর্ণনা পাঠককে ইস্পাহান থেকে দিল্লী ও জাহানাবাদ পর্য্যন্ত স্থানের পরিচয় দেবে। সেখানে বর্ত্তমানে মহিমান্বিত মুঘল বংশ বাস কচ্ছেন।

পারস্যের সীমানা থেকে হিন্দুস্থানের বিস্তার প্রায় বার শ' মাইলের ও কিছু বেশী ; আর তা হচ্ছে সমুদ্র থেকে সেই সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত। এই পর্ব্বত শ্রেণীর বহর চলেছে এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে পূব থেকে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত বিস্তার নিয়ে। এই পর্ব্বত শ্রেণী প্রাচীন ইতিহাসে ককেশাস অথবা তরাস পর্ব্বত নামে পরিচিত। কিন্তু পারস্য থেকে ভারতে যাতায়াতের তেমন কিছু সুগম পথ উন্মুক্ত নেই, যেমনটি তুর্কীস্থান হতে পারস্যে যাওয়ার জন্য আছে। এর কারণ, পারস্যদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে কেবল অনন্ত বালুরাশি ও মরুময় অঞ্চল। সেখানে জলের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং যাত্রীকে ইস্পাহান থেকে আগ্রা যেতে দু'টি মাত্র রাস্তা ঠিক করে নিতে হবে। একটি যাত্রায় খানিকটা স্থল ও কিছুটা জলপথ অতিক্রম করতে হবে। আর জাহাজ ধরতে হবে অর্মাস্ (আধুনিক হরমুজ) নামক স্থানে। দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ স্থলপথ এবং তা কান্দাহারের মধ্যে দিয়ে। এই দুটি রাস্তার প্রথমটি এবং অর্মাস পর্য্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে আমার পারস্য ভ্রমণের প্রথম পুস্তকে। কাজেই আমি এখন কেবল অর্মাস হতে সুরাট যাত্রার ধরণটিই এখানে বিবৃত করবো।

ইউরোপের সাগর সমুদ্রে যেমন সর্ব্বদাই জাহাজ চলতে পারে, ভারত সাগরে তা সম্ভবপর নয়। তারজন্য উপযুক্ত মরসুম লক্ষ্য করতে হয়। সেই সুসময়টি যদি একবার পেরিয়ে যায় তাহলে সে ঝুঁকি আর নেয়া যায় না। অর্মাস থেকে সুরাটে যেতে হলে নভেম্বর থেকে মার্চ্চ, এই কয়টি মাস একমাত্র উপযুক্ত সময়। ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে কিন্তু সুরাট ছেড়ে কোন যাত্রা চলে না।

কিন্তু অর্মাস থেকে মার্চ্চ মাসের শেষে কি ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জাহাজে করে যাত্রা শুরু করা যায়। কারণ যে পশ্চিমে হাওয়া ভারতবর্ষে বৃষ্টির ধারা নিয়ে যায় তা বইতে আরম্ভ করে ঐ সময় থেকে। বছরের প্রথম চার মাস ধরে একটা উত্তর পূবালী হাওয়া চলে। তার ফলে পনের কি কুড়ি দিনের মধ্যে অর্মাস থেকে সুরাটে পৌঁছোনো যায়। এরপরে বাতাসের গতি একটু উত্তর মুখো হলে যারা সুরাটে যাতায়াত করতে চান তাদের পক্ষে তখন অবস্থা অনুকূল হয়। সাধারণতঃ এই সময়েই ব্যবসায়ীরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ দিনের জন্য যাত্রার আয়োজন করেন। তবে তাঁরা যদি অর্মাস ছেড়ে চৌদ্দ পনের দিনে সুরাটে পৌঁছোতে চান, তাহলে তাঁদের সমুদ্র যাত্রা অবশ্যই মার্চ্চ মাসে, না হয়তো এপ্রিলের গোড়াতে আরম্ভ করতে হবে। কারণ তারপরে পশ্চিমী বায়ু প্রবাহ প্রবলবেগে বইতে থাকবে।

অর্মাস থেকে যে জাহাজগুলি যাত্রা করবে সেগুলি আরব উপকূল ধরে মাস্কাটের সীমানা মধ্য দিয়েই এগোবে এবং তা মাঝ দরিয়া দিয়ে। এর কারণ জাহাজ পারস্য উপকূলের বেশী কাছে গিয়ে না পড়ে। সুরাট থেকে আগত জাহাজও উপসাগরে প্রবেশ করার জন্য ঐ পন্থাই অবলম্বন করবে। কোন জাহাজই মাস্কাট বন্দরে ভিড়বে না। এর উদ্দেশ্য, যাতে আরব দেশের শাসককে কর দিতে না হয়। তিনি এই স্থানটি পর্তুগালের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন।

মাস্কাট সহরটি ঠিক সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সমুদ্রের উপরেই তিনটি পাহাড়। তার ফলে বন্দর পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করা খুব কঠিন কাজ। একটি পাহাড়ের গোড়াতে পর্তুগীজদের তিন চারটি কেল্লা রয়েছে। পূর্বদিকে মাস্কাট, অর্মাস ও বসোরা নামে তিনটি জায়গা। ওখানকার গরম হাওয়া অসহনীয়। আগে একমাত্র ডাচ ও ইংরেজরাই এই সমুদ্রে জাহাজ চালনার রীতি পদ্ধতি জানতেন। কিন্তু কয়েক বছর পরে আর্মেনিয়রা, মুসলমানগণ, ভারতীয় বেনিয়ানরাও ঐ পথে জাহাজ চালাতে রপ্ত হলেন। তবে এঁদের পক্ষে ঐ অঞ্চলে জাহাজ চালনা নিরাপদ নয়। কারণ তাঁরা সমুদ্রের রহস্য খুব ভাল জানেন না, আবার নিজেরাও উত্তম জাহাজ চালক নন।

সুরাটের দিকে যে জাহাজগুলি আসে তা দিউ এবং সেন্ট জন অন্তরীপের দৃষ্টি সীমার মধ্যে দিয়েই আসে। এই সুরাটই বিখ্যাত মুঘল বংশের সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ। সুরাট গামী জাহাজগুলি পরে নোঙর করতে আসে

সুওয়ালিতে। এ জায়গাটি সুরাট থেকে বার মাইলের বেশী দূরে নয় এবং উত্তর দিকে নদীর মোহনা থেকে দু'মাইলের মত দূরে। ব্যবসায়ীরা তাঁদের মাল পত্র কখনও শকটে করে, কখনও বা নৌকোতে করে এখানে ওখানে নিয়ে যান। বড় বড় জাহাজের মাল সব খালাস না করে সুরাটের নদীতে নিয়ে যাওয়া যায় না। এর কারণ বালুরাশিদ্বারা নদীর মোহনা আবদ্ধ হয়ে থাকে। ডাচরা সুওয়ালিতে মালপত্র নামিয়ে দিয়ে ফিরে চলে যান। ইংরেজরাও তাই করেন। তাঁদের নদীতে ঢুকবার অনুমতি নেই। তবে কয়েক বছর বাদে সম্রাট ইংরেজদেরই একটু স্থান দিয়েছিলেন বর্ষাকালটি সেখানে কাটানোর জন্য।

সুরাট হচ্ছে সাধারণ স্তরের একটি বড় সহর। বিশ্রী ধরণের একটি কেল্লা দ্বারা সহরটি সুরক্ষিত। জলেস্থলে যে পথ ধরেই যাওয়া যাক না কেন সেই কেল্লাটিকে অতিক্রম করতেই হবে। কেল্লার চার কোনে চারটি সুউচ্চ বুরুজ। দেয়ালের উপরে কোন সমতল স্থান নেই। কাঠের ভারা বেঁধে তার উপরে বন্দুক কামান বসানো হয়। কেল্লার গভর্ণর কেবল সেখানকার সৈন্যদেরই নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করেন। সহরের উপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই। সহর শাসনের জন্য আর একজন বিশেষ শাসক বা গভর্ণর আছেন। তিনিই তাঁর প্রদেশের সীমানা মধ্যে সব রকম রাজস্ব, রাজকীয় শুল্ক ও কর আদায় করেন।

সহরটিকে ঘিরে যে প্রাচীর রয়েছে তা মাটি দিয়ে তৈরী। অধিকাংশ বাড়ীঘর খামার বাড়ীর মত নল খাগড়া দিয়ে তৈরী। তার উপরে গোবরের পলস্তারা দিয়ে ফাঁকা জায়গাগুলি আবৃত। এরকমটি করার কারণ যাতে ফাঁকা জায়গা দিয়ে বাইরে থেকে ঘরের ভেতরের কিছু দেখা না যায়। সারাটা সুরাট সহরে নয় কি দশখানা মাত্র উৎকৃষ্ট বাড়ী আছে। তারমধ্যে দু'তিন খানি 'শাহ-বন্দর' বা ব্যবসায়ী কুলের প্রধান পুরুষের। বাকী বাড়ী গুলির মালিক হলেন মুসলমান ব্যবসায়ীরা। ডাচ্ ও ইংরেজরা যে বাড়ী গুলিতে থাকেন সেগুলির সৌন্দর্য্যও কিছু কম নয়। ব্যবসায়ী সমিতির প্রত্যেক সভাপতি ও প্রতিটি অধিনায়ক ঘরবাড়ী মেরামত সম্পর্কে বিশেষ তৎপর এবং সেই মেরামতের খরচপত্র তাঁরা কোম্পানীর খরচের খাতেই সন্নিবিষ্ট করেন। এঁরা বাড়ীগুলি ভাড়া করে নিতেন। সম্রাট নিজের জন্য এমন একখানি বাড়ীও করেননি যার জন্য এক ফ্রাঙ্কও লোকসান হয়। এই-

ভয়ে তিনি একটি কেল্লা তৈরী করিয়েছিলেন। কাপুসিন সন্ন্যাসীরা বেশ একটি সুবিধাজনক মঠ তৈরী করিয়ে নিয়েছিলেন। সেটি তৈরী হয়েছিল আমাদের দেশের (ইউরোপীয়) বাড়ী ঘরের নমুনায়। তাঁরা সুন্দর একটি গীর্জাও তৈরী করিয়েছিলেন। এই গীর্জাটি নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার একটি বিশেষ অংশ আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু ওটি কেনা বা তৈরী করানো হয়েছিল অ্যালেপ্পির জনৈক সিরীয় খৃষ্টান ব্যবসায়ীর নামে। তাঁর নাম চেলেবি। এঁর কথা আমি পারস্য প্রসংগে বলেছি।

অধ্যায় দুই

ভারতীয়দের শুল্কনীতি, টাকাকড়ি, বিনিময় প্রথা, জিনিসপত্রের ওজন, মাপ পরিমাপ।

সুদীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বসলে পুনরুক্তি পরিহার করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আমার ভ্রমণ কাহিনীর পাঠকদের একটি বিষয় দ্বারা আমি সেই কথাটি উপলব্ধি করার অবকাশ এনে দিতে পারবো। বিষয়টি হচ্ছে ভারতীয়-দের শুল্ক-ভবন, টাকাকড়ি, বিনিময় পদ্ধতি ও ওজন পরিমাপের রীতি।

কারোর কোন পণ্য দ্রব্য যখন সুরাটে নামানো হয় তখন অবশ্যই তাঁকে সেই জিনিস পত্রের বহর নিয়ে কেল্লা সংলগ্ন শুল্ক-ভবনে যেতে হবে। শুল্ক-শালার কর্ম্মীরা বড়ই কঠোর প্রকৃতির এবং আগত ব্যক্তিদের ও মালপত্রের তল্লাসী ব্যাপারে তাঁরা বিশেষ যত্নশীল ও তৎপর। কোন কোন বিশেষ ধরণের সওদাগরদের সবরকম পণ্যের জন্যই শুল্ক-ভবনে কর হিসেবে শতকরা চার থেকে পাঁচ অংশ দিতে হয়। ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানীকে দিতে হয় কম। তবে আমার মনে হয় যে তাঁরা প্রতি বছর রাজদরবারে প্রতিনিধি প্রেরণ ও উপঢৌকন দানের জন্য যা ব্যয় করেন তা সেই বিশেষ পর্য্যায়ের সওদাগরদের দেয় শুল্কের তুলনায় কিছু কম নয়।

সোনারূপার ব্যাপারে শতকরা দুইভাগ শুল্ক দিতে হয়। যখন এই দু'টি ধাতু শুল্ক-ভবনে আনীত হয় তখন টাঁকশালের কর্তা সেখানে আসেন এবং উহা গালিয়ে এই দেশের মুদ্রায় পরিণত করেন। ব্যবসায়ী ও টাঁকশালের অধ্যক্ষের মধ্যে আলোচনার পরে একটি দিন স্থির হয় যেদিন টাঁকশালের কর্ত্তাব্যক্তি সেই নতুন মুদ্রা ফেরত দেবেন তারপর ব্যবসায়ীরা যতদিন সেই মুদ্রা নিজেদের কাছে রাখবেন বা তা কাজে লাগাবেন তত দিনের সুদ দিতে হবে এবং তা দেবেন রূপার আনুপাতিক ওজন হিসেবে। টাকাকড়ি ও তার আদান প্রদান ব্যাপারে ভারতীয়রা অত্যন্ত সুনিপুণ ও সুচতুর। রূপার তালকে মুদ্রায় পরিণত করার তিন চার বছর বাদে উহার অর্দ্ধ শতাংশ ক্ষয়ে যায়। কিন্তু সেই রূপার মূল্য ধরা হয় মূল ওজনের হিসেব মত। তাঁরা বলেন যে সেই ক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। নানাহাত ঘুরে ঘুরে ওটুকু ক্ষয়ক্ষতি হবেই। প্রখ্যাত মুঘল বংশের সাম্রাজ্য মধ্যে সব রকম রূপা সংগে নিয়ে চলা যায়। কারণ সীমান্তস্থিত সমস্ত সহরেই টাঁকশাল আছে। সেখানে নতুন আমদানীকৃত রূপাকে ভারতীয় সোনারূপার মত চূড়ান্ত নিখাদ

ও খাঁটি করে তোলা হয়। তারপরে মুদ্রায় পরিণত করা হয় সম্রাটের আদেশ অনুসারেই। তাল রূপা অথবা রূপার পাত যদি কেনা যায় তাহলে কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না এবং তাতে লোকসানও কম। আর মুদ্রায় পরিণত রূপার ক্ষেত্রে ক্ষয় ক্ষতিকে এড়ানো সম্ভবই হয় না। তাঁদের এই লাভ জনক ব্যবসাতে চুক্তি থাকে মুদ্রার আকারে রূপার ঋণ পরিশোধ করতে হবে, আর তা সেই চলতি বছরের মধ্যেই। আর কেউ যদি পুরোনো রৌপ্য দ্বারা দেয় অর্থ প্রদান করেন তাহলে প্রথম যখন উহা মুদ্রায় পরিণত হয়েছিল সেই দিনের হিসেবমত তাঁকে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। সহর থেকে দূর দূরান্তে যেখানে অশিক্ষিত লোকদের রূপা সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই এবং যেখানে ধাতুকে মুদ্রায় রূপান্তর করার মত লোকও নেই, সেখানে শিক্ষাদীক্ষাহীন গ্রামবাসীরা অন্ততঃ এক টুকরো রূপাকেও আগুনে ফেলে দেখবেন সেটা ভাল কি মন্দ। এই প্রথা সমস্ত নদীপথে ও খেয়াঘাটে প্রচলিত আছে। এদেশের নৌকো বেতগাছের মত কিছু দিয়ে তৈরী হয়। ছাউনি থাকে বৃষ চর্মের। ফলে নৌকোগুলি খুব হাল্কা হয়। নৌকোগুলি তৈরী করে বনজঙ্গলের মধ্যে রেখে দেয়া হয়। তারপর খরচপত্র ও মজুরীর টাকা পেলে তবে ও গুলিকে বের করে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়।

স্বর্ণ ধাতুকে গোপনে রাখার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের নানা রকম চাতুরী পূর্ণ কৌশল আছে। তার ফলে কচ্চিৎ কখনই তা শুল্ক আদায় কারীদের গোচরে যায়। শুল্ক ফাঁকি দেবার জন্য সব রকম চেষ্টা চলে। ইউরোপের শুল্কভবনে যে রকম কঠোর বিধিনিষেধ আছে এখানে তা ততটা নেই। ভারতীয় শুল্ক নীতিতে যদি কেউ প্রতারণার দায়ে পড়েন, তিনি দ্বিগুণ শুল্ক দিয়েই রেহাই পেতে পারেন। যেমন ধরুন, শতকরা পাঁচ এর জায়গায় দশ টাকা দিতে হয়। সম্রাট সওদাগরদের এই ঝুঁকি নেবার ব্যাপারটা অনেকটা জুয়াখেলার মত মনে করেন। সেইজন্যই তিনি দ্বিগুণ শুল্কের ব্যবস্থা করেছেন। ইংরেজ কাপ্তেনদের একটি সুযোগ সুবিধা তিনি দিয়েছিলেন যে তাঁরা যখন তীরে জাহাজ ভেড়াবেন তখন যেন তাঁদের তল্লাসী করা না হয়। কিন্তু একবার একটু অন্য রকম হোল। একসময় এক ইংরেজ কাপ্তেন তট্টা নামক এক সহরে যাচ্ছিলেন। এই তট্টা হোল ভারতের শ্রেষ্ঠ সহরগুলির একটি এবং সিন্ধুনদীর মোহনার সামান্য কিছু উপরে অবস্থিত। সেই কাপ্তেন যখন

ওখানে নদী পার হয়ে চলেছিলেন তখন শুল্কবিভাগের কর্ম্মীরা তাঁকে বাধা দেন। আর তাঁর জিনিসপত্র তল্লাসী করে যখন তাঁর বিবরণের বিপরীত পাওয়া গেল তখন সব লুটেপুটে নিয়েছিলেন। তাঁরা কাপ্তেনের কাছে কিছু সোনাও দেখেছিলেন। সোনা তিনি এইভাবে অনেকবার নিয়ে এসেছেন এবং তা প্রচুর পরিমাণে। সোনা সংগে নিয়ে তিনি জাহাজ ছেড়ে সহরেও গিয়েছেন। শুল্ক বিভাগ কিন্তু তিনি প্রচলিত নিয়মমত শুল্ক দিতেই তাঁকে রেহাই দিয়েছিল। তাহলেও ইংরেজটি সেই তল্লাসী মূলক অপমানকর ব্যাপারে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে এর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তবে সে কাজটি করেছিলেন বিশেষ এক মজাদার পদ্ধতিতে। তিনি একটি দুগ্ধ পোষ্য শূকর শাবকের রোষ্ট তৈরী করালেন। তারপরে সেটিকে মাংসের ঝলসানো রস ও চাট্নি মাখিয়ে একখানি চীনে মাটির ছোট থালাতে রেখে একখণ্ড লিনেন কাপড় দিয়ে ঢাকলেন। অবশেষে জনৈক ভৃত্যকে বললেন থালাটি হাতে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু সহরের মধ্যে এগিয়ে আসতে। ঘটনাটি কি ঘটবে তাও তিনি কল্পনা করে নিলেন। যখন তাঁর পেছনে পাত্র হাতে ভৃত্যটি শুল্ক-ভবনের সামনে এসে পড়লো তখন সেখানকার কর্ত্তাব্যক্তিরা অর্থাৎ 'শাহ-বন্দর' এবং টাঁকশালের অধ্যক্ষরা সকলে গদীওয়ালা আসনে বসে আরাম কচ্ছিলেন। তারা ভৃত্যটিকে নিজেদের কাছে ডেকেও থামাতে পারলেন না। থালা হাতে করে সে এগিয়ে চলে গেল। তাঁরা কাপ্তেনকে বললেন যে ওকে শুল্ক-ভবনে আসতেই হবে। কারণ তাঁরা দেখতে চান লোকটি কি নিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজ কাপ্তেন যতই চীৎকার করে বলছেন যে ভৃত্য যা নিয়ে যাচ্ছে তাতে শুল্ক দেবার মত কিছু নেই, তাঁরা ততই তাঁকে অবিশ্বাস কচ্ছেন। এইভাবে অনেক তর্ক বিতর্ক চললো। তারপরে কাপ্তেন নিজেই ভৃত্যের হাত থেকে প্লেটখানি নিয়ে ওটিকে শুল্কশালার কর্ত্তাদের দিভানের কাছে রাখলেন। তখন গভর্ণর ও শাহ-বন্দর খুব গম্ভীর ভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে তিনি কেন আইন ভঙ্গ করে চলেন। এই শুনে ইংরেজ ভদ্রলোক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন যে তাঁর সংগে এমন কিছু নেই যার জন্য শুল্ক দিতে হবে। আর সংগে সংগে উত্তেজনাপূর্ণভাবে সেই রোষ্ট করা শূকর ছানাটিকে এমন ভাবে ছুঁড়ে মারলেন যে তার রস চাট্নি সব তাঁদের জামা পোষাকে ছড়িয়ে পড়লো। শূকরের মাংস মুসলমানদের পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু। তাঁদের মতে ঐ মাংসের সংগে যা' কিছুর ছোঁয়া লাগে তাই-ই

অপবিত্র হয়ে যায়। ফলে তাঁদের জামা পোষাক ত্যাগ করতে হোল। দিভানের গদী ও আবরণ সব খুলে ফেললেন। শেষ পর্য্যন্ত ওটাকে টেনে নামিয়ে দিয়ে আর একটি আসন তৈরীর ব্যবস্থা হোল। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ইংরেজ সন্তানকে তাঁরা আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না। শাহ্-বন্দর ও টাঁকশাল রক্ষকরা কোম্পানীর বড়ই অনুগত ছিলেন। কারণ কোম্পানীর সহায়তায় তাঁরা প্রচুর অর্থ লাভ করার সুযোগ পেতেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ, দুই কোম্পানীরই অধ্যক্ষ এবং তাঁদের সহকর্মীদের প্রতি ভারতীয় শুল্কবিভাগের কর্মীদের বিশেষ রকমের একটা শ্রদ্ধাপ্রীতি দেখা যেত। এইজন্য তাঁরা জাহাজ নিয়ে তীরে এলে তা কখনও তল্লাসী করা হত না। এই দুই জাতীয় ব্যবসায়ীরা কখনও সোনা সংগে থাকলে তা গোপন করেন না এবং নিজেদের কাছেই তা রাখেন। তট্টায় আগে ব্যবসা বাণিজ্য খুব বেশী হোত। এখন তা অবনতির মুখে চলেছে। এর কারণ নদীর মোহনা বিশেষ বিপদজনক হয়ে উঠেছে। চড়া পড়ে প্রতিদিন জাহাজ চালনার পক্ষে স্থানটি দুরূহ, দুর্গম হয়ে পড়েছে। এছাড়া বালির পাহাড় তৈরী হয়েও তার গতিপথ প্রায় রুদ্ধ হতে চলেছে।

অবশেষে ইংরেজরা দেখলেন যে ভারতীয় শুল্ক বিভাগ তাঁদের জামা পোষাকের মধ্যে লুকানো জিনিসও খুঁজে বের করার পদ্ধতি জেনে নিয়েছেন। তখন তাঁরা আরও সুকৌশল উদ্ভাবন করার চেষ্টায় হলেন ব্যাপৃত। এই কৌশল গোপনে সোনা ও স্বর্ণ মুদ্রা আনার জন্যই সৃষ্টি হোল। সংগে সংগে ইউরোপ থেকে আমদানী হোল কেশযুক্ত কৃত্রিম টুপি। জাহাজ ভিড়বার সময় হলে তাঁরা সেই টুপির জালের মধ্যেই লুকিয়ে রাখতেন জ্যাকবুস্ (প্রথম জেমসের সময়কার স্বর্ণমুদ্রা), রোজ নোব্‌ল ও ডুকাট মুদ্রা।

একবার একজন বণিকের সংকল্প হোল প্রবাল ভর্ত্তি করে কিছু বাক্স সুরাটে নিয়ে আসবেন। আর তা করবেন শুল্কবিভাগের অগোচরে। জাহাজটি বন্দরে খালাস হওয়ার আগে তিনি প্রবালের বাক্সগুলিকে দিলেন জলে ভাসিয়ে। ভেবেছিলেন শুল্ক আদায়কারীরা যখন অন্য মালপত্র দেখবেন সেই সময় ওগুলিকে নিরাপদে অন্যত্র তুলে নেয়া যাবে। শুল্ক বিভাগের নজরে পড়বে না। কিন্তু পরে ব্যবসায়ীটিকে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল। সুরাট নদীর জল সর্ব্বদাই থাকে ঘোলাটে ও কাদাটে। বাক্সবন্দী সমস্ত জিনিস নষ্ট ও অকেজো হয়ে গেল। নদীর জলের কাদামাটি প্রবালের গায়ে বসে গিয়েছিল দীর্ঘদিন

জলমগ্ন থাকার ফলে। প্রবালগুলির গায়ে এঁটেল মাটির সাদামত একটা আবরণ এমনভাবে বসে গিয়েছিল যে তা তুলে ফেলা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অনেক কষ্টে যখন মাটির আস্তরণ তুলে ফেলা হোল তখন দেখা গেল তার বার শতাংশ ক্ষয় হয় গিয়েছে।

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে যে টাকা কড়ির প্রচলন আছে আমি এখন সেই সম্পর্কে কিছু বলবো। আরও বিবরণ দেবো সেই সব সোনারূপার যা ধাতুপিণ্ডের আকারে আনা হয় লাভের আশায়।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে কিছু তৈরী করা হয়েছে বা করা যায় এমন সোনারূপা ক্রয় করাই লাভজনক। আর উহাকে গালিয়ে তালকরা এবং সর্ব্বোচ্চ মাত্রায় বিশুদ্ধ করে তোলা হবে এমন উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করাই সমীচীন। কারণ তার সংগে যে ধাতু মিশ্রিত রয়েছে তার জন্যে কোন আলাদা মূল্য দিতে হয় না। তা ছাড়া খণ্ড খণ্ড সোনা রূপা সংগে থাকলে রাজা স্বয়ং বা টাঁকশাল যদি উহাকে মুদ্রায় পরিণত করতে চান তাহলে কোন মাশুল দিতে হয় না। কেউ কোন স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে উত্তম হিসেবে রয়েছে জ্যাকবুস (প্রথম জেমসের মুদ্রা), রোজনোব্‌ল্ (তৃতীয় এডওয়ার্ডের), অলবার্টুস (ডাচ ডলার) এবং পর্ত্তুগাল ও আরও অন্যান্য সব দেশের প্রাচীন মুদ্রা। তাছাড়া আরও থাকে এমন সব সোনা যা বিগতকালে মুদ্রার আকারে ছিল। এইসব পুরোনো মুদ্রা দ্বারা বণিক সম্প্রদায় অবশ্যই লাভবান হন।

এদেশে আনবার পক্ষে কি জাতীয় সোনা উত্তম ও উপযুক্ত তা মোটামুটি বোঝা যায়। তা'হচ্ছে—জার্মানীর সবরকম ডুকাট যা বিভিন্ন রাজাদের সময় অথবা রাজধানী জাতীয় সহরে তৈরী হয়েছে। এছাড়া পোলাণ্ড, হাঙ্গারী, সুইডেন ও ডেনমার্কের ডুকাটও চলতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে সবরকম ডুকাটকেই এক ধরণের উৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়। সেকালের ভিনিসীয় স্বর্ণ ডুকাটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে খ্যাতি লাভ করেছিল এবং তার মূল্য ছিল আমাদের দেশের সাউ মুদ্রার চার পাঁচ গুণ বেশী এবং অন্যান্য মুদ্রার চেয়েও অধিক। কিন্তু বছর বার আগে মনে হয় তার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর অন্যান্য মুদ্রার চেয়ে বেশী মূল্য পাওয়া যায় না। আরও অন্য ধরণের ডুকাট আছে। তা'হচ্ছে কায়রোর গ্রাণ্ড সিগ্‌নিয়রের মুদ্রা এবং স্যালি (আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম উপকূলে) ও মরক্কোর মুদ্রা। তবে এই তিন

প্রকার মুদ্রা অন্যান্য ডুকাটের চেয়ে উচ্চ পর্য্যায়ের নয়। আবার ততটা মূল্য-বানও নয়। কারণ আমাদের সাউ (সোল) মুদ্রা (একটি ফ্রাঙ্কের ১/২ ভাগ) থেকে ওগুলি মাত্র চারগুণ বেশী।

বিরাট মুঘল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র যে রীতিতে যাবতীয় সোনারূপা ওজন করা হয় তার নাম তোলা। এই তোলা আমাদের নয় দিনার এবং আট গ্রেণের সমতুল্য। ভারতীয়রা যখনই কোন সোনারূপা ক্রয়-বিক্রয় করেন তখনই তাঁরা হলদে রংএর রাজকীয় চিহ্ন সম্বলিত পিতলের বাটখারা ব্যবহার করেন যাতে ওজনে কোন গলতি না থাকে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা মুহূর্ত্ত মধ্যে সোনারূপা ওজন করে ফেলেন। তবে একশ' তোলার বেশী না হলেই তা সম্ভবপর। কিন্তু বিদেশী বিনিময়কারীদের জন্য আর অন্য কোন ওজন রীতির চলনও নেই। কাজেই এক থেকে একশ তোলা পর্য্যন্ত ওজন গ্রহণের প্রথা চলছে এদেশে। একশ' তোলা হোল আটত্রিশ আউন্স, একুশ দিনার ও আট গ্রেণের সমান। সোনারূপা মুদ্রার আকারে না হয়ে যদি সাধারণ তাল হয় এবং পরিমাণেও খুব বেশী দেখা যায় তাহলে উহার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার প্রথা আছে। আর তাকে নিলামে তুলে দিয়ে এমন চড়া দাম হাঁকতে থাকে যাতে একে অপরকে পরাস্ত করে কিনে নিতে পারে।

এই বিনিময় ব্যাপারে এমন কতক বণিক আছেন যাঁদের হাতে একই সময়ে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার ডুকাটও থাকে। ভারতীয়রা তখন একশ' ডুকাটের সঠিক ওজন ধরে সমস্ত ধাতুর ওজন করেন। এই ওজন তৌলের যে বাটখারা তাতেও রাজ প্রতীক চিহ্নিত। যদি দেখা যায় যে সেই 'পড়েন'টি একশ' ডুকাটের সমান ওজনের নয় তাহলে মাপ সমান সমান করার জন্য কতকগুলি পাথরের টুকরো জুড়ে দিয়ে মাপ ঠিক করে নেয়া হয়। বিনিময়-কারীকে পরে সেই পাথর কুচোর জন্য যে পার্থক্য হয় তার ক্ষতিপূরণ করে দিতে হয়। ডুকাটই হোক্, আর অন্য স্বর্ণমুদ্রাই হোক্, তা ওজন করার আগে তাঁরা সবখানি জিনিসকে কাঠকয়লার আগুনে ফেলে পুড়িয়ে লাল করে ফেলেন। তারপরে জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে মুদ্রারাশিকে বের করে আনেন। এই প্রথার প্রবর্ত্তন হয়েছে জালমুদ্রা আবিষ্কারের জন্য। আর ধূর্ত্তনীতিতে মুদ্রার ওজনবৃদ্ধি করার জন্য অনেক সময় উহাদের গায়ে যে মোম বা গদের ফুটকি দেয়া হয় তা গলিয়ে ফেলার জন্য। কতক মুদ্রা দেখা যায় যার গায়ে সুচতুর ভাবে গর্ত্ত করে অন্য কোন জিনিস পুরে আবার এমন ভাবে

বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে কিছু বোঝার সাধ্য নেই। ঐ জাতীয় মুদ্রাকে আগুনে পোড়ানো হলেও বিনিময়কারী উহাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দেখে নেন খাঁটি না ভেজাল। তারপরেও যদি সন্দেহ থেকে যায় তাহলে উহাকে কেটে টুকরো করে দেখা হয়। এইভাবে যাচাই করার পরেও যেগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে সেগুলিকে আবার নির্ভেজাল করার ব্যবস্থা আছে। তারপরে খাঁটি মুদ্রা ও উত্তম ডুকাটের মতই উহার মূল্যমান নির্নীত হয়।

এই রকম সব সোনাকে যখন মুদ্রায় রূপ দেয়া হয় তখন ভারতীয়রা তাকে নাম দিয়ে থাকেন সোনার টাকা। যে মুদ্রা অর্থাৎ ডুকাটগুলির এক পিঠেই কেবল ছাপ দেয়া থাকে, সেগুলিকে ঐ নামে অভিহিত করা হয় না। সেগুলি এঁরা বিক্রয় করেন তার্তারী এবং অন্যান্য উত্তর অঞ্চল অর্থাৎ ভুটানরাজ্য, আসাম এবং অপরাপর দূরবর্ত্তী স্থান থেকে আগত বণিকদের কাছে। এইসব দেশের নারীরা এই জাতীয় ডুকাট মুদ্রা দ্বারা মুখ্যতঃ দেহালঙ্কার তৈরী করান। বিশেষ করে শিরোভূষণ নির্ম্মিত হয়। কপাল জুড়ে মুদ্রার মালা ঝুলিয়ে মুখমণ্ডলকে সজ্জিত করেন তাঁরা। যে সকল ডুকাটে কোন চিহ্ন বা মূর্ত্তি খোদিত নেই তার খোঁজ উত্তর অঞ্চলীয় ব্যবসায়ীরা বড় একটা করেন না।

আরও অন্য প্রকার যত স্বর্ণখণ্ড বা মুদ্রা আছে তার বেশীর ভাগ বিক্রী হয় জাত স্বর্ণকার এবং সাধারণ ভাবে সোনার জিনিস যারা তৈরী করেন তাদের কাছে। একবার যে ধাতুকে মুদ্রায় পরিণত করা হয়নি তাকে ভবিষ্যতে আর করা যাবে না। তবে রাজা বাদশার অভিষেকের সময় করা চলে এবং তা সেই শুভলগ্নে জনসাধারণের মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা-রূপে ছড়িয়ে দেবার জন্য, অথবা প্রদেশপাল ও দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয়ের জন্য। তাঁরা এই মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করেন নতুন রাজার সিংহাসনে আরোহণ কালে তাঁকে উপঢৌকন দানের উদ্দেশ্যে। এর কারণ এঁরা সকলে ঐ বিশেষ দিনে বা অন্য কোন পরব উপলক্ষ্যে রাজাকে মূল্যবান মণিরত্ন উপহার দেবার মত বিত্তশালী নন। আর একটি বিশেষ উৎসব পর্ব্বের কথা—অর্থাৎ প্রতিবছর যখন রাজাকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করানো হয় সে বিষয়ে আমি যথাস্থানে বর্ণনা দেব। এই উৎসবে তাঁরা স্বর্ণমুদ্রা সম্পর্কেই বেশী আগ্রহশীল হন এবং তখন রাজদরবারে প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও কিছু উপহার দেবার প্রথা আছে।

তাহলে ভবিষ্যতে আরও সুখ সুবিধা, মর্য্যাদা ও বিচক্ষণ শাসননীতির আশা করা যাবে।

এদেশে ভ্রমণকালে একবার স্বর্ণমুদ্রার গুণাগুণ ও মূল্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ঔরংজেবের পিতা শাহজাহান তখন রাজত্ব কচ্ছেন। তিনি তাঁর দরবারের একজন মর্য্যাদা সম্পন্ন পুরুষকে তট্টা প্রদেশের শাসনভার দিলেন। সিন্ধু ছিল রাজধানী। প্রতিবছরই এই প্রদেশ পালের বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে ও তীব্র রকমের সব অভিযোগ আসতে লাগলো জনসাধারণের উপরে নিপীড়ন অত্যাচার ও জোর জুলুম করে টাকাকড়ি আদায়ের জন্য। সম্রাট তাঁকে চার বছর ঐ পদে বহাল রাখার কষ্ট স্বীকার করে অবশেষে তাঁকে ফিরে আসবার জন্য হুকুম পাঠালেন। তট্টার সমগ্র জনসমাজ তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা আরও মনে করলেন যে সম্রাট তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দানের উদ্দেশ্যেই ডেকে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল সম্পূর্ণ অন্য রকম। সম্রাট উল্টে তাঁকে খাতির যত্ন করে এলাহাবাদের শাসনভার অর্পণ করলেন। তট্টা রাজ্য থেকে এলাহাবাদ প্রদেশ ঢের বড়। সম্রাটের কাছে ঐ রকম সদ্ব্যবহার তিনি কেন পেলেন? তার কারণ হোল তিনি আগ্রা পৌঁছোবার আগেই সম্রাটকে উপহার পাঠিয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার, আর বেগম সাহেবাকে বিশহাজার সুবর্ণ মুদ্রা। বেগমের হাতে তখন ছিল যথেষ্ট ক্ষমতা। সেই সুবাদার দরবারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও হারেমের মহিলাদেরও যথেষ্ট উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য। রাজসভাসদগণ সকলেই অতিরিক্ত মাত্রায় স্বর্ণধাতুর লাভের জন্য লালায়িত হতেন। সোনা সব জমা থাকে ছোট একটি কুঠ্রীতে। দরবারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সোনার প্রতি এত আকর্ষণের কারণ এই যে তাঁরা মৃত্যুকালে নিজেদের স্ত্রী পুত্রের জন্য প্রচুর পরিমাণে নগদ অর্থ সম্পদ রেখে যাওয়াকে বিশেষ সম্মান ও মর্য্যাদার বিষয় মনে করতেন। আর তা সম্রাটের অগোচরেই করা হোত। অন্যত্র আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করবো যাতে দেখা যাবে যে জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর মৃত্যুর পরে সম্রাট কিভাবে তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পদের মালিকানা কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী কেবলমাত্র অলঙ্কার পত্র ও কিছু মণিরত্নেরই অধিকার লাভ করেছিলেন।

আমাদের দেশের স্বর্ণমুদ্রার কথা আলোচনা করতে হলে একটি বিষয়

অবশ্যই লক্ষ্যনীয় যে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে উহার তত প্রচলন নেই। কারণ তার একটির মূল্যমান চৌদ্দ টাকার উপরে নয়। চৌদ্দ টাকা আমাদের প্রাচীন মুদ্রার (লিভর) বিশটির সমতুল্য। সাউ হিসেবে আরও কিছু বেশী হয়। তবে এই জাতীয় স্বর্ণ মুদ্রা খুব বিরল। বড় বড় ধনী লোকদের কাছে কিছু কিছু থাকে। তাঁদের যখন কোন ধারদেনা শোধ করতে হয় তখন তাঁরা সেই মুদ্রা রৌপ্য মুদ্রার সংগে বিনিময় করেন, অথবা তার যা মূল্য তার চারগুণ রূপার টাকা আশা করেন। তাতে অবশ্য ব্যবসায়ীদের কোন লাভ হয় না।

মুঘলসম্রাট ঔরংজেবের মাতুল সায়েস্তা খানের কাছে এক বাণ্ডিল জিনিস বিক্রয় করেছিলাম। তার মূল্য ছিল ৯৬,০০০ টাকা। খানসাহেব যখন আমাকে সেই টাকা দিতে এলেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, সোনা না রূপা, কি জাতীয় মুদ্রা পেলে আমি সন্তুষ্ট হই। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি আবার বলে উঠলেন যে এ বিষয়ে আমি যদি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করি তাহলে তিনি আমাকে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করতে বলবেন। তবে তিনি বিশেষ ভাবে কোন নির্দেশ উপদেশ দান করেন নি। তিনি কেবল জানতেন তাঁর নিজের সুবিধে হবে কিসে। আমি বললাম তাঁর নির্দেশমতই কাজ করবো। তখন তিনি জনৈক ভৃত্যকে বললেন, আমার যা সঠিক পাওনা সেই পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা আমাকে বের করে দিতে। কিন্তু তিনি আমাকে একটি সুবর্ণ মুদ্রার মূল্য সাড়ে চৌদ্দটি রৌপ্য মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। সাধারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে তার মূল্যমান চৌদ্দ টাকার বেশী নয়। আমি এবিষয়ে অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ ছিলাম না। তবে আমি তখনকার মত রাজপ্রতিনিধির খেয়াল মাফিকই টাকা নেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। কারণ আমি আশা করেছিলাম যে তিনি অন্যসময়ে আমার আজকের ক্ষতিটুকু পুরোপুরি না হোক অন্ততঃ আংশিকও পূরণ করে দেবেন। এরপরে দু'দিন আর তাঁর সংগে দেখা সাক্ষাৎ করিনি। দুদিন পরে আবার দেখা করে বললাম, যে মূল্য ধরে আমি তাঁর কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছি তাতে ছিয়ানব্বই হাজার টাকায় আমি তিন হাজার চারশ' আঠাশ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হই। অর্থাৎ তিনি সাড়ে চৌদ্দ ধরে আমার উপরে যা চাপিয়ে দিয়েছেন তার ষোল ভাগের একভাগ ক্ষতি হয়। তিনি সাড়ে চৌদ্দ ধরে দিলেও বাজারে চৌদ্দর বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। তা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন আর আমাকে বললেন যে তিনি দেখবেন বিনিময়কারী ও ওলন্দাজ দালালদের সম্বন্ধে কত কঠোর:

ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কারণ তাঁদের জন্যই এরকমটা হচ্ছে। তিনি এবারে বুঝিয়ে দেবেন ভারতীয় মুদ্রার মূল্য কি। তাছাড়া আমাকে প্রদত্ত মুদ্রাগুলি পুরোনো। সুতরাং আধুনিক রৌপ্য মুদ্রা থেকে তার মূল্য বেশী অর্থাৎ চৌদ্দর স্থলে ষোল হবে। এই প্রসংগে এশিয়ার রাজা বাদশাহ ও রাজপ্রতিনিধিদের মেজাজ ও খেয়াল আমার জানা ছিল। তাঁদের সংগে কোন বিরোধ চলে না। কাজেই তাঁকে যা খুসী বলবার সুযোগ দিলাম। কিন্তু খানিক পরে তিনি আত্মস্থ হলেন, মুখের ভাব প্রশান্ত হোল। আমি তখন আমার ইচ্ছে ব্যক্ত করে বললাম যে তিনি যেন পরের দিন আমাকে টাকাটা ফেরত দেবার অবকাশ দান করেন। না হয়তো আমার পাওনা টাকায় যা ঘাট্‌তি পড়ছে তা যেন পূরণ করে দেন। আমি সেই মুদ্রার চৌদ্দ টাকা মূল্য পেলে মোটামুটি ষোল শতাংশ হারাই। অথচ তিনি ভরসা দিয়েছিলেন সাড়ে চৌদ্দ টাকা মূল্যমান পাওয়া যাবে। একথা শুনে রাজ-প্রতিনিধিটি আমার দিকে একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। একটি কথাও বললেন না। অবশেষে প্রশ্ন করলেন আমার কাছে সেই মুক্তাটি আছে কিনা যেটি তিনি কিনবেন বলেছিলেন। সেটি আছে বলে তৎক্ষণাৎ আমি আমার বুক পকেট থেকে ওটিকে বের করে তাঁর হাতে দিলাম। মুক্তাটি ছিল বেশ বড় এবং খুব দীপ্তিময়। তবে গড়নটা ভাল ছিল না। এই কারণেই তিনি আগে ওটি কিনতে রাজী হননি। এবারে হাতে দিতেই বলে উঠলেন, "চমৎকার। যা হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে আর কথা নয়। এই মুক্তাটির জন্য কত চাও তা এক কথায় বল।" আমি সাত হাজার টাকা দাম দাবী করলাম। আর বাস্তবিকই এই একটি মুক্তা ফ্রান্সে না নিয়ে আমি বরং তিনটি নিয়ে যাবো। তখন তিনি বললেন, "এই মুক্তাটির জন্য আমি যদি সাত হাজার টাকা মূল্য তোমাকে প্রদান করি, তাহলে আশাকরি তোমার প্রথম বিক্রয়-চুক্তিতে যে লোকসানের অভিযোগ রয়েছে তার ক্ষতি পূরণ হবে। ব্যাপারটা তাতে ভালই হবে। তাছাড়া তুমি আমার কাছ থেকে একটি 'খেলাত' (সম্মান পরিচ্ছদ) ও একটি ঘোড়া উপহার পাবে।

আমি তাঁকে অভিবাদন করে জানালাম যে ঘোড়াটি যেন আমাকে বয়সে নবীন দেখে দেয়া হয় যাতে আমার প্রয়োজন মিটতে পারে। কারণ আমাকে তখনও অনেক ভ্রমণ করতে হবে। পরের দিন তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন একটি পোষাক, একটি কোমরবন্ধ ও একটি টুপি। এই ধরণের পোষাক

পরিচ্ছদ রাজা মহারাজারা যাঁকে সম্মানিত করতে চান তাঁকেই কেবল প্রদান করেন। পোষাকটি সাটিনের, সোনালী জরির কাজ করা। কটিবন্ধের গায়েতেও ছিল সোনালী রূপালী জরির টানা কারুকার্য্য। টুপিটি কালিকট অঞ্চলের। অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল রঙ্ তার। তাতেও সোনালী জরির কাজ। ঘোড়াটির কোন জীন ছিল না। সবুজ মখমল দিয়ে ওটির দেহ পা পর্য্যন্ত আবৃত। সেই আবরণীর কিনারায় রয়েছে রূপালী ঝালর। ঘোড়ার লাগামটা একেবারে সোজা গড়নের। তার নানা জায়গায় রূপার কারুকর্য্য। আমার মনে হোল এই ঘোড়াটিতে কেউ কখনও চড়েননি। আমি যে ওলন্দাজ কুঠিতে বাস করতাম, সেখানে ওটিকে আনতেই এক যুবক ওর পিঠে চড়ে বসলেন। যেইমাত্র উঠে বসা, ঘোড়া উঠলো লাফিয়ে এবং এমন বেগে লাফাতে শুরু করলো যে বাড়ীর উঠোনে যে চালাঘরটি ছিল তাকে একেবারে ভূমিসাৎ করে দিল। মনে হোল সেই ডাচ যুবকেরও প্রাণহানি ঘটবে। এই জাতীয় অস্থির অশ্ব আমার উপযোগী নয় মনে করে আমি ওটিকে শায়েস্তা-খানের কাছে ফেরত পাঠিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করে দিলাম। আমি সাক্ষাতে গিয়েই বললাম যে আমার বিশ্বাস হয় না যে আমি তাঁর জন্য যেসব দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা আনার জন্যই যে আমার স্বদেশে যাওয়া দরকার তা তিনি উপলব্ধি কচ্ছেন। আমি যতই একথা বলছি, তিনি ততই হাসলেন। তারপরে আর একটি ঘোড়া আনতে পাঠালেন। এই অশ্ব পৃষ্ঠে তাঁর পিতা জীবদ্দশায় আরোহণ করতেন। এটি লম্বা গড়নের পারসীক ঘোড়া। পূর্ব্বে এর মূল্য ছিল পাঁচহাজার ক্রাউন। বয়স তখন আঠাশ বছর। জীন ও লাগাম পরানো হোল। রাজপ্রতিনিধি তাঁর সামনেই ওটির পিঠে আমাকে উঠে বসতে বললেন। ঘোড়াটির চলনভঙ্গী এত মর্য্যাদাপূর্ণ যে আমি এর আগে এরকমটি আর কখনও দেখিনি। তারপরে আমি ঘোড়া থেকে নামতেই তিনি বলে উঠলেন, "আচ্ছা, এবারে তুমি সন্তুষ্ট আমার বিশ্বাস, এই ঘোড়াটি তোমাকে কখনও ভূপতিত করিবে না।"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে তখুনি বিদায় নিলাম। পরের দিন আমার যাত্রার কিছু আগে তিনি আমাকে এক ঝুড়ি অ্যাপেল পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাকে ছয় ঝুড়ি অ্যাপেল পাঠিয়েছিলেন। তারই একটি এল আমার জন্য। এই ফলগুলি কাশ্মীর থেকে এসেছিল। আমাকে প্রেরিত ঝুড়িটির মধ্যে একটি পারসীক ফুটিও ছিল। আমি ঝুড়িশুদ্ধ ফলগুলি ওলন্দাজ

কমাণ্ডারের স্ত্রীকে দিলাম উপহার। এখন সেই ঘোড়াটির কথাই বলি। ওটির পিঠে চড়েই আমি গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে পাঁচশত টাকা মূল্যে আমি ওকে বিক্রী করে দিলাম। দেখতে শুনতে ওটি বলিষ্ঠ হলেও বয়স হয়েছিল খুব বেশী।

টাকা কড়ির প্রসংগে ফিরে আমি আরও বলতে চাই যে কেহ যেন অবশ্যই লুই নামক ফরাসী সুবর্ণ মুদ্রা, অথবা স্পেনদেশীয় ও ইতালীয় পিস্তল এবং অন্য কোন প্রকার মুদ্রা, কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে নিয়ে না আসেন। তাহলে ভয়ানক ক্ষতি ও লোকসান হবে। ভারতীয়রা সব মুদ্রাকেই বিশুদ্ধ করে নেন এবং বিশুদ্ধ ধাতুর ওজনেই তার হিসেব ও মূল্য নির্ণীত হয়। আর প্রত্যেকটি লোকই সোনার জন্য আমদানী শুল্ক ফাঁকি দিতে আগ্রহী। যখন সওদাগরগণ সোনা গোপন রাখতে ব্যগ্র থাকেন তখন এক একটি ডুকাটে আমাদের দেশের (ফ্রান্সের) পাঁচ কি ছয় সোলে (সাউ) পর্য্যন্ত লাভ করেন।

নানা প্রকার রৌপ্যমুদ্রা সম্বন্ধেই এখন আলোচনা করা যাক। তাতে এই দেশের টাকার সংগে বিদেশী মুদ্রার পার্থক্য অবশ্যই নির্ণয় করা যাবে এবং মুখ্যতঃ বিদেশী মুদ্রা সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান লাভ করাও যাবে।

হিন্দুস্থানে যে সকল বিদেশী রৌপ্যমুদ্রা আসে তা'হচ্ছে জার্মানীর রিক্স ডলার, আর স্পেনের রিয়েল। প্রথমটি কিনে আনা হয় পোলাণ্ড, ক্ষুদ্রতর তার্তারী ও মস্কোভিয়ার সীমান্ত থেকে। দ্বিতীয়টি আনীত হয় এমন লোকদের দ্বারা যারা আসেন কন্স্টান্টিনোপল, স্মার্না ও আলেপ্পো থেকে। আর বেশীর ভাগ নিয়ে আসেন আর্মেনিয়রা। এঁরা ইউরোপে রেশমী কাপড় বিক্রী করেন। এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা রূপার বহর পারস্য দেশের মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসেন যাতে কারোর নজরে না পড়ে। যদি শুল্ক সংগ্রাহকদের গোচরে যায় তাহলে বণিকদের রৌপ্যরাজিসহ টাঁকশালের অধ্যক্ষের কাছে যেতে বাধ্য করা হয় এবং তিনি সেসব আব্বাসীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করে তবে ছাড়বেন। আব্বাসীয় মুদ্রা রাজকীয় মুদ্রা। এই আব্বাসী মুদ্রা ভারতে পৌঁছোলে তাকে আবার টাকায় পরিবর্ত্তিত করা হয়। তার ফলে ব্যবসায়ীকে সোয়া দশ শতাংশ ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। এই লোকসানের কারণ প্রথমতঃ মুদ্রায় রূপান্তর, দ্বিতীয়তঃ পারস্যাধিপতিকে শুল্কদান।

অল্পকথায় যদি বুঝতে হয় যে কি করে বণিকরা পারস্য থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত শতকরা সোয়া দশ অংশ, আবার কখনও আরও বেশী লোকসানে

পড়েন এবং তা রিয়েলের ধরণ অনুযায়ী, তাহলে যে জাতীয় রিয়েল সাধারণত তাঁরা পারস্যে নিয়ে আসেন সেই সম্বন্ধেই বলতে হয়। পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম খণ্ডে আমি সেখানকার টাকাকড়ি ও বিনিময় প্রথা সম্বন্ধে যা বর্ণনা করেছি তা স্মরণযোগ্য।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম পারস্যে একটি রিয়েলের মূল্য ১৩ শাহীর মত। তেইশ শাহীতে হয় সোয়া তিনটি আব্বাসী। তারপরে যখন রূপা খুব দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে তখন একটি আব্বাসীর জন্য দেড় শাহী মূল্য দেবে। কাজেই একটি আব্বাসী মুদ্রার মূল্য চারশাহী, আর তোমান হচ্ছে পঞ্চাশ আব্বাসী অথবা দুশত শাহীর সমতুল্য। কেউ যদি সাড়ে ছয়টি তোমান মুদ্রা ভারতে নিয়ে আসেন তাহলে তার প্রতিটির জন্য তিনি পাবেন সাড়ে উনত্রিশ টাকা। অর্থাৎ সাড়ে ছয়টি তোমানের জন্য পাওনা হবে একশ' একানব্বুই টাকা, চার আনা। এদেশে যদি সেভিলের রিয়েল আনা যায় তাহলে একশ' রিয়েলের জন্য পাওয়া যায় ২১৩ থেকে ২১৫ টাকা। মেক্সিকোর একশ' রিয়েলের জন্য কিন্তু ২১২ টাকার বেশী পাওয়া যায় না। সুতরাং একশ' রিয়েলের জন্য যদি ২১২ টাকা পাওয়া যায় তাহলে লাভ হয় একশ' প্রতি সোয়া দশ রিয়েল। কিন্তু সেভিলীয় রিয়েলের ক্ষেত্রে লাভ হয় শতকরা এগার ভাগ।

স্পেনে রিয়েল আছে তিন চার প্রকার। উৎকর্ষ অনুসারে ১০০ রিয়েলের মূল্য ২১০ থেকে ২১৪-২১৫ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সেভিলের রিয়েলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উহা যখন ঠিক ওজনমত থাকে, তখন একশ'র জন্য ২১৩ টাকা পাওয়া যায়। কখনও আবার ২১৫ পর্য্যন্তও ওঠে। তবে তা হয় প্রচুর রূপা আমদানী হলে বা খুব অভাব হলে।

স্পেনের রিয়েলের ওজন হওয়া উচিত তিন ড্রাম সাড়ে সাত গ্রেণ অর্থাৎ দু'টাকার চেয়েও কিছু বেশী। কিন্তু ভারতের টাকার রূপা ঢের উৎকৃষ্ট। সেভিলের রিয়েল আমাদের সাদা ক্রাউনের মত ঠিক এগার দিনার ওজনের। মেক্সিকোর রিয়েল থাকে দশ দিনার একুশ গ্রেণ। স্পেনের একটি রিয়েলের ওজন ৭৩ 'ভাল্'; আর মূল্য সাড়ে চার মামুদী মুদ্রা। এক মামুদী কুড়ি পয়সার সমান। তবে তা খুব উত্তম হওয়া চাই। পূর্ব্বেই ৭৩ ভালের কথা উল্লেখ করেছি। একাশী ভালে এক আউন্স হয়। আর এক ভাল্‌কে ধরা হয় সাত দিনারের সমান।

জার্মানীর রিক্স ডলার রিয়েল থেকে ওজনে ভারী। একশত রিক্স ডলারে

একশ' কেন, আরও ষোল টাকা বেশী পাওয়া যায়। যখন দেখা যাবে একশ' রিয়েল বা একশ' রিক্স ডলারের বিনিময়ে দু'শ' পনের কি ষোল টাকা পাওয়া গেল, তখন মনে হয় একটি টাকা যেন ত্রিশটি সাউএর থেকেও মূল্যহীন। কিন্তু ব্যবসায়ী যদি রূপার বহনমূল্য ও আমদানী শুল্ক হিসেব করেন তাহলে দেখবেন প্রতিটি টাকায় তাঁকে বেশী মূল্য দিতে হচ্ছে। তবে তাঁকে যদি লাভবান হতে হয় তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন যে মেক্সিকোর সবরকম রিয়েল এবং সেভিলেরও এক একটি ওজনে একশ' দিনার ও আট গ্রেণ; অর্থাৎ পাঁচ শ' বার গ্রেণ। আর যেগুলি আমাদের সাদা ক্রাউনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় তার এক একটি একুশ দিনার ও তিন গ্রেণ; যা দাঁড়ায় পাঁচশ নয় গ্রেণে।

সবরকম ডলার ও রিয়েল একশ' সংখ্যক ধরে ওজন করা হয়। যখন বাটখারা বা পৈড়েনে কুলোয় না তখন কুঁচো পাথর যোগ করা হয়। সোনা যে ভাবে ওজন করা হয় তার কথা আমি ক্রমে ক্রমে বলবো।

এখন ভারতীয় টাকা কড়ির কথা আলোচনা করা যাক। ভারতের টাকা হচ্ছে রৌপ্য মুদ্রা। তার অর্দ্ধাংশ, সিকি, অষ্টাংশ, ষোড়শাংশ ইত্যাদি ক্ষুদ্র মুদ্রারও প্রচলন আছে। এখানকার টাকার ওজন নয় দিনার ও এক গ্রেণ। রূপার মূল্য এগার দিনার ও চৌদ্দ গ্রেণ। এদেশে মামুদী নামে আর একপ্রকার রৌপ্য মুদ্রার চলন আছে। তা সুরাট ও গুজরাট ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

এদেশে একরকম অতিক্ষুদ্র তামার মুদ্রা আছে, নাম তার পয়সা। তার মূল্য প্রায় আমাদের দেশের দুই লিয়ার্ডের মত। লিয়ার্ড হোল সাউএর এক চতুর্থাংশ। আধপয়সা, ডবল পয়সা ও চার পয়সারও আলাদা মুদ্রা আছে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এদেশের সর্ব্বত্রই ভ্রমণকালে রূপার টাকার বদলে এই পয়সা পাওয়া যায়। আমার পূর্ব্বেকার এক ভ্রমণে একটি টাকায় আমি উনপঞ্চাশ পয়সা পেয়েছিলাম। আবার এমন সময় ছিল যে এক টাকায় পঞ্চাশ পয়সা পাওয়া যেত। কখনও হয়ত ৪৬ পয়সাও দেয়া হোত। আগ্রা ও জাহানাবাদে কিন্তু টাকার মূল্য ছিল পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন পয়সা। এর কারণ বোধহয় তামার খনির কাছাকাছি স্থানে এক টাকায় বেশী পয়সা দেয়া হয়। মামুদী মুদ্রার বিনিময়ে হয় চল্লিশ পয়সা।

মহিমান্বিত মুঘল বংশের রাজ্য মধ্যে আরও দুই প্রকার ক্ষুদ্র মুদ্রার প্রচলন আছে। এক—ছোট ছোট তেঁতো বাদাম ফল, দ্বিতীয় হচ্ছে অতি ছোট শঙ্খ

বা কড়ি। এই ক্ষুদ্র তেঁতো বাদাম আমদানী হয় পারস্য থেকে। মুদ্রারূপে তার ব্যবহার একমাত্র গুজরাট প্রদেশেই। আমার প্রথম যাত্রায়ই তা লক্ষ্য করেছিলাম। পার্ব্বত্য অঞ্চলে শুষ্ক ও অনুর্ব্বর স্থানে এসব জন্মায়। গাছগুলি ঠিক আমাদের কৃত্রিম ঝাঁটার মত দেখতে। ভারতীয়রা তাকে বলে বাদাম। তেঁতো অ্যাপেল-এর চেয়েও তা বেশী তেঁতো। এক পয়সার বদলে তা পাওয়া যায় ত্রিশ, কখনও আবার চল্লিশ।

অন্য যে ছোট মুদ্রা আছে তার বিনিময় মাধ্যম হোল-কড়ি। এই জিনিসটির কিনারাগুলি গোলাল হয়ে ভেতরে বসানো। মালয়দ্বীপ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও এসব দেখা যায় না। সেই দ্বীপের রাজার রাজস্বের অধিকাংশ হোল এই জিনিস। বিরাট মুঘল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এর প্রচলন আছে। এছাড়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যে এবং আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জেও টাকার পরিবর্ত্তে এগুলি চলে। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে এক পয়সার বদলে তা আশীটি পাওয়া যায়। সমূদ্র থেকে যত দূরে হবে, সংখ্যাও তত কমে যাবে। যেমন, আগ্রাতে এক পয়সার বিনিময়ে ৫০ কি ৫৫ পাওয়া যায়। তার বেশী নয়। ভারতীয়দের টাকাকড়ির হিসেব এই প্রকার ঃ

১০০,০০০ টাকায় একলক্ষ। ১০০,০০০ লক্ষে এক ক্রোড়।

১০০,০০০ ক্রোড়ে এক পদন। ১০০,০০০ পদনে এক নীল।

ভারতবর্ষের গ্রামগুলি বড় ছোট। সেখানে কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী নেই। শেরিফ (স্রফ) নামে একজন সেখানে থাকেন; তাঁর কাজ হোল টাকা ও বিল সব বিনিময়ের জন্য পাঠানো। এই ব্যাপারে শেরিফ প্রদেশ পালের সংগে পত্র বিনিময় করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ইচ্ছেমত টাকা পয়সার মূল্যমান বৃদ্ধি করেন। এক টাকায় কত পয়সা, এক পয়সায়-কত কড়ি হবে সব তাঁরা ধার্য্য করেন। মহান সিগ্‌নিয়রের সাম্রাজ্যে যে সব ইহুদীরা টাকা-কড়ির লেনদেন ও বিনিময় করেন, তাঁরাও খুব সূক্ষ্মবুদ্ধির ধূর্ত্ত প্রকৃতির লোক। কিন্তু তাঁরাও ভারতের এই শেরিফদের কাছে শিক্ষানবীশ হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন কচ্চিৎ কখনই। ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের টাকা লেনদেন ব্যাপারে একটি বড় কুপ্রথা আছে। স্বর্ণমুদ্রা প্রসংগেই আমি এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি।

যখন তাঁরা ঐজাতীয় টাকায় কোন দেয় অর্থ প্রদান করেন তখন বলবেন, যে রৌপ্য মুদ্রা অনেক আগে তৈরী হয়েছে তার মূল্য হাল আমলে তৈরী মুদ্রা

থেকে কম হবে। কারণ মানুষের হাতে হাতে ঘুরে তা ক্ষয় পেয়ে হালকা হয়ে গিয়েছে। সুতরাং কোন লাভের সওদা ও ব্যবসা করতে হলে সর্ব্বদাই শাহজাহানী মুদ্রা অর্থাৎ নতুন আনকোরা টাকা পেলেই তা করা উচিত। নতুবা তাঁরা পনের কুড়ি বছর কি তারও আগেকার মুদ্রা চালিয়ে দেবেন। ফলে একশ টাকায় চার টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। দু'বছর আগে যে মুদ্রা নির্মিত হয়েছে তার জন্য হয়ত তাঁরা এক চতুর্থাংশ অথবা অন্ততঃ এক অষ্টাংশ ক্ষতি স্বীকার করবেন। আর দুঃস্থ অজ্ঞ লোকেরা টাকার ছাপ পড়তে পারেন না। মুদ্রাগুলি কবেকার তাও বুঝতে পারেন না। ফলে প্রতারিত হন। তাঁদের টাকা প্রতি এক পয়সা, আধ পয়সা অথবা তিন কি চার কড়ি ঘাট্‌তি স্বীকার করতে হয়।

জালমুদ্রা বড় একটা দেখা যায় না। যদি কারোর ব্যাগে একটিও জাল টাকা পাওয়া যায় তাহলে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলা হয়। সুতরাং কিছু না বলে টাকাটি হারানোই শ্রেয়ঃ। একথা যদি জানাজানি হয় তাহলে ভয়ানক বিপদের আশংকা। বাদশাহের নির্দ্দেশ রয়েছে যে সেই জালমুদ্রা যে ব্যাগে ছিল সেটি যেখান থেকে আনা হয়েছে সেখানে ফেরত দিতে হবে। যতক্ষণ সেই জাল টাকাটি এবং জালিয়াতকে ধরা না যায় ততক্ষণ ঐ টাকা যে সকল হাত ঘুরেছে সেখানে ফেরত দেবারও চেষ্টা চলে। জালিয়াতকে ধরতে পারলে তার শাস্তি একখানি হাতকে কেটে ফেলা। যদি তাকে খুঁজে পাওয়া না যায় এবং যদি মনে হয় যে টাকাটা যিনি দিয়েছেন তিনিই অপরাধী তাহলে সামান্য জরিমানা নিয়ে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। এর ফলে বিনিময়কারীরা প্রচুর লাভ করেন। যখন কোন টাকা পয়সার আদান প্রদান হয় বণিকরা তখন টাকা নতুন কি পুরোনো তা অন্য লোককে বুঝতে দিতে চান না। এইভাবে কষ্ট স্বীকার করে তাঁরা একশ' টাকায় এক টাকার ষোল শতাংশ লাভ পেয়ে থাকেন।

বাদশাহের সরকার বা রাজস্ববিভাগ থেকে যে টাকা দেয়া হয় তার মধ্যে কখনও কোন জাল মুদ্রা থাকে না। সেখানে যত টাকা জমা পড়ে তা বাদশার খাজাঞ্চীরা বিশেষভাবে পরখ করে দেখেন। শাহানশা বাদশাদেরও বিশেষ রকমের টাকাকড়ির রক্ষক বা খাজাঞ্চী আছেন। তাঁরা যখন খাজাঞ্চীখানায় টাকা জমা করেন তার আগে তা কয়লার আগুনে ফেলে পুড়িয়ে নেন। আগুনে তা লাল হয়ে উঠলে পরে জল ঢেলে নিভিয়ে ফেলা হয়। তারপর

মুদ্রাগুলিকে তুলে যদি কোনটিকে সাদা মনে হয় অথবা কোন খাদের চিহ্ন পাওয়া যায় তাহলে তখুনি তাকে কেটে টুকরো করতে হবে। যতবার টাকা খাজাঞ্চীখানায় জমা পড়ে ততবারই পাঞ্চ করে তার গায়ে ছিদ্র করার প্রথা। তবে পুরোপুরি ভেদ করে করা হয় না। কোন কোন মুদ্রায় ঐ রকম চিহ্ন সাত আটটিও থাকে। তাতে বোঝা যায় উহা কতবার খাজাঞ্চীখানায় যাতায়াত করেছে। মুদ্রারাশিকে এক হাজার হিসাবে এক একটি ব্যাগে ভর্ত্তি করে প্রধান খাজাঞ্চীর সীলমোহর এঁটে মুদ্রার নির্ম্মাণ কাল, দিন বছর ইত্যাদির ছাপ দেয়া হয়। এই বিষয় থেকেই ধরা যায় যে সেই মুদ্রা দ্বারা কত লাভ হতে পারে। খাজাঞ্চীদের লাভ কত হবে তাও বোঝা যায়। লাভের ব্যবসা প্রসংগে নবনির্ম্মিত মুদ্রার জন্যই সকলে চুক্তিবদ্ধ হতে চান। কিন্তু পাওনাদারকে দেবার সময় খাজাঞ্চীরা পুরোনো মুদ্রাদ্বারা তা পরিশোধ করেন। তাতে পাওনাদারের ষষ্ঠ শতাংশ ক্ষতি হয়। তবে রূপা নতুন হলে সওদাগররা অবশ্যই খাজাঞ্চীর সংগে আপোষ মীমাংসা করবেন।

আমার পঞ্চম সমুদ্র যাত্রায় আমি আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে শায়েস্তাখানের সংগে দেখা করতে যাই। উদ্দেশ্য ছিল নতুন সব জিনিস পত্র তাঁকে দেখাব। কাজেই সুরাটে নেমেই তাঁকে সংবাদ পাঠালাম। হুকুম এল দাক্ষিণাত্যের চৌপাটি নামে একটি সহরে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে হবে। তিনি সেখানে একটি অবরোধ চালাতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে অতি অল্প সময়ে, স্বল্প কথায় ইউরোপ থেকে যা সংগ্রহ করে এনেছিলাম তার বেশীর ভাগ বিক্রী করে দিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে তিনি প্রতিদিনই আশা কচ্ছেন সুরাট থেকে সৈন্যবাহিনীর বেতন বাবদ টাকা আসবে। তখন তিনি আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবেন। আমি কল্পনাই করতে পারিনি যে অত বড় একজন রাজপ্রতিনিধি ও বিরাট সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক তাঁর কোন অর্থভাণ্ডার নেই। আমি বরং আরও অনুমান করলাম যে আমার পাওনা টাকা থেকে কিছু বাদ দিয়ে গ্রহণ করি—এই তাঁর ইচ্ছে। তিনি আগের বারে আমাকে সন্তুষ্ট করে দিয়েছিলেন বলেই তাঁর এই আশা। আমি যা ভেবেছিলাম তেমনিই ঘটলো। কিন্তু তিনি আমার নিজের জন্য এবং সংগী সহচর ও ঘোড়াগুলির জন্য এমন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা করে দিলেন যে আমরা দিনরাত বিশেষ প্রাচুর্য্যের মধ্যেই কাটিয়েছিলাম। তিনি বেশীর ভাগ দিনই আমাকে তাঁর ভোজনপর্ব্বে নিমন্ত্রণ করতেন। এই ভাবে দশ বার

দিন কেটে গেল, কিন্তু আমার টাকাকড়ি সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বললেন না। আমি তখন ঐ স্থান ত্যাগের সংকল্প করে তাঁর তাঁবুতে চলে গেলাম। মনে হোল, তিনি যেন একটু বিস্মিত হয়েছেন এবং আমার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে বললেন, "আপনার পাওনা টাকা শোধ করার আগে আপনি কোথায় যাবেন? টাকা পাওয়ার আগে অন্যত্র চলে গেলে কি করে পাবেন?" তদুত্তরে তাঁর মতই দৃঢ়স্বরে আমি বলে উঠলাম, "আমার দেশের রাজা দেখবেন কি করে আমি টাকা পাই। তিনি এত মহৎ যে তাঁর সমস্ত প্রজাদেরই পাওনা টাকা তিনি আদায় করে দিতে যত্নশীল। বিশেষ করে বিদেশে জিনিসপত্র বিক্রী করে যদি মূল্য পাওয়া না যায় তাহলে সে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।"

খুব ক্রোধান্বিত হয়ে খানসাহেব উত্তর দিলেন, "আপনার দেশের রাজা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?" আমি জানালাম যে আমাদের রাজা দু'তিনখানি শক্তিশালী জাহাজ পাঠাবেন। আর তা পাঠাবেন সুরাট বন্দরে, না হয়তো উপকূলের দিকে মক্কা থেকে যে জাহাজ আসবে তার জন্য কোথাও অপেক্ষা করবে। আমার এই কথা শুনে তিনি একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু তা বেশী প্রকাশ না করে তাঁর খাজাঞ্চীকে তখুনি হুকুম দিলেন আমাকে ঔরঙ্গাবাদে পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য একখানি চিঠি পাঠাতে। আমি তাতে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। একতো গোলকুণ্ডা যাবার পথে আমাকে ঐ স্থানটি অতিক্রম করতেই হবে। তাছাড়া তাতে আমার জিনিসপত্র বহনের মূল্য দিতে ও অন্যান্য ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না। পরদিন আমি বিনিময় পত্র পেয়ে রাজপ্রতিনিধির কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই; তা'হলেও বললেন যে আমি যদি আবার কখনও ভারতে আসি তবে তাঁর সংগে দেখা করতে যেন ভুলে না যাই। আমি আমার ষষ্ঠ ভ্রমণ যাত্রায় ভারতে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে ভুলিনি। সেবারে আমি সুরাটে পৌঁছে দেখি তিনি বাংলাদেশে রয়েছেন। সেখানে গিয়ে আমার বাকী সমস্ত জিনিস তাঁর কাছেই বিক্রী করে দিয়েছিলাম। সেই জিনিসগুলি আমি পারস্য সম্রাট বা মুঘল বাদশাহ কারোর কাছেই বিক্রী করতে পারিনি।

এখন আমার এবারের পাওনা টাকা সম্বন্ধে কিছু বলি। ঔরংগাবাদে পৌঁছেই আমি মুখ্য খাজাঞ্চীর সংগে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ি। দেখা হতেই তিনি বললেন যে আমার সব কথা ও পরিচয় তাঁর জানা আছে। তিনি তিন দিন আগে নির্দেশ পত্র পেয়েছেন। খাজাঞ্চীখানা থেকে আমার জন্য

টাকাও বের করে রেখেছেন। টাকার থলেগুলি আমার সামনে নিয়ে এলে আমি তাঁকে খুলে দেখতে অনুরোধ জানালাম। তিনি থলেগুলি খুলতে দেখা গেল যে সমস্ত মুদ্রাই এমন রূপার যা গ্রহণ করলে আমাকে প্রতি একশ' টাকায় দু'টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। আমি খাজাঞ্চীকে ধন্যবাদ জানালাম বটে, তবে বললাম যে এই রকম লেনদেনের অর্থ কি, তা বুঝতে পাচ্ছিনা। আমি তাঁর সম্বন্ধে শায়েস্তাখানের কাছে অভিযোগ পাঠাব। আরও বলবো যে তিনি আমাকে নতুন রৌপ্য মুদ্রা দানের হুকুম দিন, নতুবা আমি যে জিনিসপত্র সম্প্রতি তাঁকে দিয়েছি তা ফেরত নেবার সুযোগ দিতে হবে। এ কথার কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না। আমার কি করা উচিত তাও ঠিক বুঝতে পারিনি। তারপরে আবার বললাম যে আমি নিজেই গিয়ে জিনিসপত্র ফিরিয়ে আনবো। তখন আমার মনে হোল তিনি এবিষয়ে কিছু নির্দেশ পেয়েছেন। ব্যাপারটা সঠিক বুঝবার জন্যেই আমি নিজে যাবার সংকল্প করেছিলাম। এই সময় তিনি বললেন যে আমার যাওয়া তিনি সমর্থন করেন না। তাছাড়া এই নিয়ে কোন ঝঞ্ঝাট হয় তাও তিনি চান না। তার চেয়ে বরং আমাদের নিজেদের মধ্যেই একটা মীমাংসা করে নেয়া ভাল। নানা তর্ক বিতর্কের পরে স্থির হোল যে শতকরা যে দু'টাকার ক্ষতি হবে তার একটাকা আমি স্বীকার করবো, বাকী একটাকা তিনি পূরণ করে দেবেন। আমি যদি তখন এমন একজন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর সন্ধান না পেতাম যাঁর রূপার দরকার হয়েছিল এবং যিনি বিনিময় প্রথায় গোলকুণ্ডাতে আমাকে পাওনা মিটিয়ে দিতে পারবেন, তাহলে আমার পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা কঠিন হোত। এই ব্যবসায়ীটি আমার রৌপ্যমুদ্রা কাজে লাগাতে উৎসাহী হলেন এবং আমাকে একটি হুণ্ডি দিলেন যাতে আমি পনের দিনের মধ্যে গোলকুণ্ডাতে আমার প্রাপ্য টাকা পেতে পারি।

বিনিময়কারীরা রূপা পরখ করার সময় তের রকম ছোট ছোট খণ্ড জিনিস ব্যবহার করেন। তার আধাআধি তামা, বাকী রূপা। এ সবই এঁদের কষ্টিপাথর। এই তেরটি পরখ-বস্তুর প্রতিটি উৎকর্ষের দিকে স্বতন্ত্র।

তবে তাঁরা এই জিনিস খুব বেশী ব্যবহার করেন না। যদি স্বল্প ওজনেরও কোন তৈরী জিনিসের ধাতু সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দেয় তাহলেই তা ব্যবহার করেন। বেশী পরিমাণ রূপার প্রশ্ন যেখানে, সেখানে তো সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ করে নেবার প্রথা। সমস্ত রূপাই তোলা হিসেবে ওজন করা হয়। এক তোলার

ওজন নয় দিনার ও আট গ্রেণ। অর্থাৎ বত্রিশ ভালের সমান। একাশী ভালে হয় এক আউন্স। কাজেই একশ' তোলায় হয় ৩৮ আউন্স, ২১ দিনার ও ৮ গ্রেণ।

এখানে যদি একটু ইঙ্গিত প্রদান করি যে কেবল শেরিফ বা বিনিময়-কারীরাই নয়, সমস্ত ভারতীয়রাই সাধারণ ভাবে এই সব ব্যাপারে ধূর্তবুদ্ধি-সম্পন্ন, তাহলে বোধহয় খুব অন্যায় হবে না। একটি উদাহরণই এবিষয়ে যথেষ্ট। ঘটনাটি অতি অদ্ভুত এবং আমাদের ইউরোপীয়দের কাছে উহা ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে—যে কষ্টি পাথরে সোনা যাচাই করা হয় এবং যে বিষয়টাকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনা, তাঁরা সেই পাথরে এক অণুপরমাণু সোনাও নষ্ট হতে দেবেন না। তার শেষ বিন্দুকেও তাঁরা তুলে নেবেন। তোলার পদ্ধতিটি হচ্ছে কাল পীচ ও তার সংগে কিছুটা, প্রায় আধাআধি নরম মোম মিশিয়ে একটি বলের মত করে তাকে সেই কষ্টি পাথরের উপর বুলিয়ে স্বর্ণরেণুকে তুলে নেয়া হয়। কিছুদিন পরে সেই বলের গায়ে সোনার বিন্দুগুলি ঝিকমিক করে ওঠে। তখন ওগুলিকে তুলে ফেলা হয়। পীচের বলটি ঠিক আমাদের টেনিস বলের মত। পাথরটি আমাদের দেশের স্বর্ণকাররা যে পাথর ব্যবহার করেন তারই মত।

এই-ই হোল ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত টাকাকড়ি ও শুল্ক-ভবন। এখন তাঁদের বিনিময় প্রথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা বাকি রইল।

মহান মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্যে এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যমধ্যে যে সকল জিনিসপত্র তৈরী হয় তা সব সুরাটে এনে জমা করা হয় এশিয়ার বিভিন্ন অংশে ও ইউরোপে রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে। ব্যবসায়ীরা সুরাট থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য ভারতের বিভিন্ন সহরে চলে যান। যেমন, লাহোর, আগ্রা, আমেদাবাদ, সিরোঞ্জ, বুরহানপুর, ঢাকা, পাটনা, বারাণসী এবং দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও দৌলতাবাদে। সুরাট থেকে টাকা নিয়ে নানা জায়গায় লেনদেন হয়। কখনও এক জিনিসের বিনিময়ে অন্য জিনিসের আদান প্রদান চলে। এমন যদি কখনও হয় যে সেখানে ব্যবসায়ীর হাতে টাকা কম পড়েছে এবং কেনাকাটা সম্পূর্ণ হয়নি তাহলে তিনি অবশ্যই দু'মাসের মধ্যে সুরাটে ফিরে এসে মাসে মাসে টাকা পরিশোধ করবেন একটা বিনিময় মূল্য ধরে।

লাহোর থেকে সুরাটে বিনিময় মাশুল হোল শতকরা সোয়া ছয় টাকা।

আমেদাবাদ থেকে এক বা দেড় টাকা।

সিরোঞ্জ থেকে তিন, বুরহানপুর থেকে আড়াই কি তিন, ঢাকা থেকে দশ বারাণসী থেকে ছয় টাকা।

শেষোক্ত তিনটি স্থানের বিনিময় হুণ্ডীর কাজ কারবার তাঁরা কেবল আগ্রা সহর পর্য্যন্তই করেন। তারপরে আগ্রা থেকে নতুন করে শুরু হয় সুরাট পর্য্যন্ত। তবে মূল্যমান পূর্ব্বে উল্লিখিত পুরো হিসেব ধরেই হয়ে থাকে।

কয়েক বছর ধরে বিনিময়ের মান শতকরা এক থেকে দুই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ, কয়েকজন রাজা বা ক্ষুদ্র সামন্ত প্রধানগণ ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটু বিঘ্নিত কচ্ছেন। এঁরা প্রত্যেকেই দাবী করেন যে পণ্যদ্রব্য সব তাঁর রাজ্যমধ্যে দিয়ে চলাচল করবে, আর তাঁকে কর দিতে হবে। আগ্রা ও আমেদাবাদের মধ্যে এই রকম বিশেষ দুটি রাজ্য আছে। একটি অন্তিবার, আর দ্বিতীয়টি বেরগাম্। এখানকার শাসকরা সওদাগরদের উপরে বেশ উৎপীড়ন চালাতে অভ্যস্ত। তবে এই জাতীয় রাজার রাজ্য এড়িয়ে অন্য রাস্তা ধরেও অর্থাৎ সিরোঞ্জ ও বুরহানপুরের মধ্য দিয়েও আগ্রা থেকে সুরাট যাওয়া যায়। কিন্তু এই দুটি অঞ্চল উর্ব্বরা ও বিভিন্ন নদী দ্বারা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। অথচ কোন সেতু বা নৌকোর ব্যবস্থা নেই। কাজেই বর্ষাকালের পরে দুমাস সেই রাস্তা ধরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আর ব্যবসায়ীদের তো কয়েকটি কারণেই নির্দিষ্ট সময়ে সুরাটে পৌঁছোতেই হয়। সময়টি হোল যখন আবহাওয়ার গুণে তাঁরা সমুদ্র যাত্রা করতে পারবেন। এই কারণে সেই উৎপীড়ক দুই রাজার রাজ্যমধ্য দিয়েই তাঁরা যেতে বাধ্য হন। এই দুটি দেশের মধ্যে দিয়ে বারমাসই যাতায়াত চলে। এমনকি বর্ষাকালেও। বর্ষার ফলে সেখানকার মাটি বরং আটকে আরও শক্ত হয়ে যায়।

যখন কেউ জাহাজে ওঠার জন্য সুরাটে আসেন তখন তাঁর সংগে পর্য্যাপ্ত টাকাকড়ি থাকে। সুরাট হচ্ছে ভারতের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের কাজ কারবারের কেন্দ্র। এখান থেকেই টাকা কড়ির ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে বিদেশের সংগে তাঁরা ব্যবসা চালান। সুরাট থেকে অর্মাস, বসোরা ও মক্কা, এমনকি আরও দূর দূরান্ত যেমন, বনতম্, অচিন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্তও যাতায়াত হয়। মক্কা ও বসোরার জন্য বিনিময় হার শতকরা বাইশ থেকে চব্বিশ পর্য্যন্ত ওঠে। অর্মাসে ষোল থেকে বিশ। আমি আর যেসব জায়গার নাম উল্লেখ করলাম তাদের সম্পর্কে বিনিময়ের হার ধার্য্য হয় দূরত্ব অনুসারে। কিন্তু মালপত্র যদি ঝড়ের মুখে পড়ে বিধ্বস্ত হয় অথবা মালাবারী জলদস্যুদের হাতে

পড়ে তাহলে যাঁরা টাকাকড়ি ধার দিয়েছেন তাঁদেরই ক্ষতি স্বীকার করতে হবে ।

এঁদের মাপ, ওজন সম্বন্ধে আর সামান্য একটু মাত্র বক্তব্য আছে। এদের ওজনে যাকে 'মণ' বলে তা'হচ্ছে ৬৯ পাউণ্ড। ১৬ আউন্সে এক পাউণ্ড.। কিন্তু যখন এই ওজনে তাঁরা নীল পরিমাপ করেন তখন মাত্র ৫৩ পাউণ্ড হয়। সুরাটে এঁরা 'সের' নামে একটা ওজনের কথা বলেন। তা হোলা এক পাউণ্ডের ১$\frac{৩}{৪}$ অংশ। ষোল আউন্সে তো হয় এক পাউণ্ড।

অধ্যায় তিন

ভারতীয়দের যানবাহন ও এদেশে ভ্রমণ রীতি।

ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে এদেশের যান-বাহন ও ভ্রমণ পদ্ধতির কথা কিছু উল্লেখ করা বোধহয় অসমীচীন হবে না। আমার মনে হয় ফ্রান্স ও ইতালীতে ভ্রমণ ব্যাপারে আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে ব্যবস্থা আছে এখানে তার থেকেও বেশী সুখ সুবিধে রয়েছে। পারস্যদেশে তো একেবারে বিপরীত। সেখানে তাঁরা গাধা, ঘোড়া বা খচ্চর কিছুই ব্যবহার করেন না। তাঁরা ভারতে জিনিসপত্র পাঠান বলদের পিঠে চাপিয়ে অথবা শকটে করে। পারস্য ও ভারতবর্ষ দুটি দেশ অত্যন্ত কাছাকাছি। কোন ব্যবসায়ীকে যদি দেখা যায় যে তিনি পারস্য থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে আসছেন তাহলে বুঝতে হবে যে তা কেবল লোক দেখানো ব্যাপার বা ওটির লাগাম ধরে বেড়ানোই উদ্দেশ্য, না হয়তো ভারতের কোন রাজা মহারাজার কাছে বিক্রী করার মতলব।

একটি বলদের পিঠে তারা ৩০০ কি ৩৫০ পাউণ্ড ওজন চাপিয়ে দিয়ে থাকেন। একটি চমৎকার দৃশ্য দেখা যায় যখন দশ বার হাজার বলদের সারি একই সময়ে চাল ডাল, নুন ইত্যাদি বহন করে মালপত্র বিনিময়ের স্থান অভিমুখে এগিয়ে যায়। যেখানে চাল নেই, সেখানে চাল, আর গম যবের অভাব যেখানে সেখানে গম যব নিয়ে যাওয়া হয়। নুন যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে তাও নিয়ে যেতে হয়। এই কাজে কখনও আবার উটের ব্যবহারও হয়। তবে খুব কদাচিৎ। উট দেখা যায় বেশীর ভাগ বড় লোকদের মালপত্র বহন করার জন্য। যে সময়ে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হয়, সুরাটে খুব দ্রুত তালে মালপত্র জাহাজে চড়িয়ে দিতে হবে, তখন গাড়ী বা শকটের পরিবর্তে বলদের পিঠে চাপিয়ে নেয়া হয়। এই প্রসংগে একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে মুঘল সাম্রাজ্যের জমিগুলিতে খুব ভালভাবে সার দেবার ব্যবস্থা আছে। জমি বেশ করে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। প্রতিটি জমির পাশে, ক্ষেতের ধারে একটি করে পুকুর আছে জল জমিয়ে রাখার জন্য। এই জিনিসগুলি ভ্রমণকারীদের পক্ষে বড়ই অসুবিধাজনক। সারি সারি শকট ও বলদের দল যখন অগুনতি সংখ্যায় সোজা রাস্তা ধরে চলতে থাকে তখন যদি পর্য্যটকদের সামনে ঐ সব পরিখা পুকুর পড়ে যায় তবে দু'তিন দিনও তাঁদের

অপেক্ষা করতে হয়। যতক্ষণ না ঐ সকল গাড়ী ও বলদের সারি ঐ স্থান অতিক্রম করে এগিয়ে না যাবে ততক্ষণ তাঁরা এগোতে পারবেন না। বলদ-গুলির চালকদের উহাই একমাত্র পেশা ও জীবিকা। তারা অন্য কোন কাজ করেন না। বাড়ীতেও তারা থাকেন না। তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার সংগে সংগেই থাকেন। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাদের নিজস্ব বৃষের সংখ্যা একশত। কারোর হয়ত কিছু কম, আবার কারোর হয়ত সংখ্যায় অধিক। এদের মধ্যে একজন থাকেন প্রধান বা মুখ্য ব্যক্তি। তার মর্য্যাদা যেন কোন রাজার ন্যায়। তার গলায় মুক্তার মালা। যখন দানা শস্যবাহী ও লবণবাহী পৃথক পৃথক শকটের দেখা হয়ে যায় তখন একে অপরকে রাস্তা ছেড়ে না দিয়ে অনবরত ঝগড়া করে। এমনকি শেষ পর্য্যন্ত খুনোখুনি ব্যাপার করে তোলে। এই জাতীয় সংঘর্ষ বিরোধ দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে যে অত্যন্ত ক্ষতিকর তা উপলব্ধি করে একদিন মহান মুঘল বাদশাহ শকট বিভাগের দুই প্রধান ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা হাজির হতে তিনি উভয়কে দেশের কল্যাণ ও নিজেদের মঙ্গলের জন্য ঝগড়া-ঝাটি করতে বারণ করে নানা সদুপদেশ দিলেন। তারপরে তাঁদের দু'জনাকেই একলক্ষ করে টাকা ও একটি করে মুক্তার মালা উপহার দিলেন।

পাঠকরা যদি সুষ্ঠুভাবে হিন্দুস্থানের ভ্রমণ রীতি বুঝতে চান তাহলে জেনে নিতে হবে যে হিন্দুদের মধ্যে উপজাতি আছে চারটি। তাদের বলা হয় মনৃরী। এদের এক এক গোষ্ঠীতে প্রায় এক লক্ষ করে লোক আছে। এরা সর্ব্বদাই তাঁবুতে বাস করে। দেশ বিদেশে পণ্য রপ্তানী করাই এদের জীবিকার উপায়। যারা এদের মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ের তারা কেবল দানা শস্য (যব, গম), দ্বিতীয়রা চাল, তৃতীয়রা ডাল এবং চতুর্থ দল নুনের ব্যবসা করেন। এরা জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনেন সুরাট ও সুদূর কন্যা কুমারিকা অন্তরীপ থেকে। নিম্নোক্ত লক্ষণ চিহ্ন দেখে এই উপজাতিদের চিনতে পারা যায়। এদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কথা আমি অন্যত্র আলোচনা করবো। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা লাল রং-এর আটালো একটা জিনিস দিয়ে ললাটে চিহ্ন এঁকে রাখেন প্রায় একটি মুকুটের অর্দ্ধেক পরিমাণ জায়গা জুড়ে। সমস্ত নাসিকা জুড়ে লম্বা লম্বা রেখা টানেন। তার উপরে দশ কি বারটা গমের দানা বসিয়ে দেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লোকেরাও ঐ প্রথায়ই কপালে ও নাকে হলদে রং-এ চিত্রাঙ্কন করেন। তার উপরে বসিয়ে দেন চাল। তৃতীয়রা ধূসর আটালো রং

দিয়ে কাঁধ পর্য্যন্ত রঞ্জিত করেন, আর জোয়ার শস্য বসিয়ে রাখেন। চতুর্থ উপজাতি অনেকখানি লবণ পূর্ণ একটি থলে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন। লবণ ওজনে থাকে আট থেকে দশ পাউণ্ড (লবণ ওজনে যত বেশী বহন করা যায় ততই কৃতিত্ব)। প্রতি প্রাতঃকালে প্রার্থনার আগে তারা সেই লবণের থলে দিয়ে নিজেদের পেটের উপরে সজোরে ঠোকা দেয় অনুশোচনার চিহ্ন স্বরূপ। এদের প্রায় সকলের গলাতেই একটি উত্তরীয় মত জড়ানো থাকে। উত্তরীয়ের মাথায় একটি ছোট রূপার বাক্স যা ঠিক কোন মৃত মহাপুরুষের অস্থিপূর্ণ কৌটোর মত ঝোলানো থাকে। তার মধ্যে তাদের পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রদত্ত কিছু অন্ধবিশ্বাস-মূলক লেখা থাকে আটকানো। ঐরকম কৌটো তারা তাদের বলদ বা গরু বাছুরের গলায়ও বেঁধে রাখে। যে সকল গরু বাছুর নিজেদের গোয়ালে জন্মায়, তাদের প্রতি একটা বিশেষ স্নেহদরদ থাকে। তারা ওদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির মতই ভালবাসে। বিশেষতঃ যারা সন্তানহীন তারাই ওগুলির গলায় সেই জিনিস বেঁধে দেয়।

এদের সমাজের স্ত্রীলোকেরা কেবল ছাপানো বা সাদা একটি সূতিবস্ত্র পরিধান করেন। কোমার থেকে নীচের দিকে উহা পাঁচ ছয় গুণ বেশী করে জড়ানো হয়। কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশে চামড়া ফুঁড়ে ফুঁড়ে নানা পুষ্প পত্রের নক্সা (উল্কি) অংকিত হয়। তা করা হয় শরীর থেকে রক্ত টেনে বের করার কাপিং ·াস দিয়ে। নক্সাগুলি অংকন করা হয় আংগুরের রসমিশ্রিত নানা রঙ্ দিয়ে। তাতে মনে হয় তাদের শরীরের চামড়া ফুল দিয়ে তৈরী।

প্রতিদিন সকালে পুরুষরা যখন পশু পৃ‍ে মালপত্র তোলেন, নারীরা তখন তাঁবু গোটানোতে থাকেন ব্যস্ত। যে সকল পুরোহিত এদের সংগী হন তারা সমতল ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপযুক্ত স্থানে আবাস ঠিক করে একটি সর্পাকৃতি মূর্ত্তি মাল্যভূষিত করে প্রতিষ্ঠা করেন-ছয় সাত ফুট উঁচু দণ্ডবৎ একটি পীঠের উপরে। তারপরে দলে দলে উপজাতিরা সেখানে সমবেত হন পূজা করার উদ্দেশ্যে। স্ত্রীলোকেরা তিনবার করে সেটাকে প্রদক্ষিণ করেন। অনুষ্ঠান অবসানে পুরোহিতই সেই মূর্ত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি বিশেষ বৃষ পৃষ্ঠে তাকে তুলে নিয়ে যান।

শকটবাহী পশুর সংখ্যা কদাচিত একশ' দুশ'র উপরে ওঠে। প্রতিটি শকট চালাতে দশ বারটি করে বৃষের প্রয়োজন হয়। চারজন করে সৈন্য থাকে প্রতিটি

গাড়ীর সংগে। তাদের পারিশ্রমিক দান করেন পণ্য দ্রব্যের মালিক। তারা দুজন করে গাড়ীর দুপাশে থাকেন। গাড়ীর উপর দিয়ে একটি রশি টানা দেয়া থাকে। রশির দুই মাথা দুজন সৈন্য ধরে থাকেন। যদি কখনও গাড়ী খারাপ রাস্তায় গিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে বা উল্টে যাবার আশংকা দেখা দেয় তখন দড়ির মাথা যাদের হাতে থাকে তারাই গাড়ীকে সজোরে টেনে ধরে বাঁচিয়ে দেন।

আগ্রা বা সাম্রাজ্যের অন্য যে কোন জায়গা থেকেই হোক যে সমস্ত শকট সুরাটে আসে এবং আগ্রা ও জাহানাবাদ হয়ে ফিরে যায় তাদের বারোচ থেকে যে চূণ আসে তা বহন করে নিতে হয়। তারপর চুনকে জমাট করলে তা শ্বেত পাথরের মত শক্ত কঠিন হয়ে যায়।

এখন ভারতবর্ষের ভ্রমণ পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া যাক্। এই কাজে এদেশীয়রা অশ্বের পরিবর্তে বলীবর্দের ব্যবহার করেন। এমন কতক অশ্ব আছে যাদের গতি আমাদের গাড়ীর মতই মন্থর। এই উদ্দেশ্যে বলীবর্দ কেনা হলে বা ভাড়া করার প্রয়োজন হলে দেখতে হবে যে উহার শিং যেন লম্বায় এক ফুটের বেশী না হয়। বেশী লম্বা হলে মাছি মশার উৎপাতে পশুটি শিং ঘোরালে তা চালকের পেটে বসে যেতে পারে। এ ঘটনা হামেশাই ঘটে। বলীবর্দগুলিকে আমাদের ঘোড়ার মত মুক্ত রাখা চলে। কোন লাগাম, বল্গা ও খলিনের দরকার হয় না। তার বদলে উহাদের মুখ বা নাসারন্ধ্রের মাংসল অংশের মধ্য দিয়ে একটি দড়ি চালিয়ে দেয়া হয়। তাই লাগামের কাজ করে। শক্ত মাটিতে, যেখানে পাথর নেই, সেখানে বৃষের পায়ে নাল পরানো হয় না। কিন্তু এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো জায়গা যা কেবল প্রস্তরময়ই নয়, খুব উত্তপ্ত হয়, সেখানে বৃষের খুড় বাঁচানোর জন্য নাল পরানো হয়। ইউরোপে বৃষের শিংএ দড়ি বাঁধা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয়রা বৃষের গলায় মোটা ধরণের ও চার আঙ্গুল চওড়া একটি চামড়ার গলাবন্ধ মত জড়িয়ে রাখেন। শকটের সংগে জুড়বার সময়ই ওটি পরানো হয়।

এদেশে ভ্রমণ যাত্রায় এক প্রকার ছোট গাড়ীর ব্যবহার হয়। সেগুলি অত্যন্ত হাল্‌কা। মাত্র দুটি লোকের ব্যবহার যোগ্য। সাধারণতঃ একজন লোকই যাতায়াত করেন আরামে চলার জন্য। সংগে থাকে মাত্র অতি প্রয়োজনীয় জামা পোষাক, একটি ছোট সুরাপাত্র ও সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য। এই জিনিসপত্র রাখার জন্য গাড়ীর নিচের দিকে একটু জায়গা নির্দিষ্ট থাকে।

দু'টি বলদ গাড়ী টানে। এই গাড়ীতে বসার আসন ও পর্দা ঠিক আমাদের দেশেরই অনুরূপ। তবে পর্দাটি বড় একটা খাটানো হয় না। আমার শেষ ভ্রমণে আমি একটি গাড়ীতে আমার স্বদেশের প্রথায় সব ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। যে দু'টি বৃষ দ্বারা আমার সেই গাড়ী চালানো হয়েছিল তাদের জন্য আমার খরচ পড়েছিল প্রায় ছয়শত টাকা। এই ব্যয়াধিক্যের কথা শুনে পাঠকরা বিস্মিত হবেন না। কতকগুলি বৃষ খুব তেজস্বী ও দ্রুতগামী। তাঁরা একদিনে বার থেকে পনের লীগ পর্য্যন্ত চলতে পারে। আর তা একটানা ষাট দিন। যাত্রাকালের আধাআধি সময় অতিবাহিত হলে দুটি কি তিনটি যাই হোক, বৃষগুলিকে আমাদের দেশের দুই পেনি মূল্যের গমের রুটি, মাখন ও গুড় খেতে দেয়া হয়। একটি গাড়ীর ভাড়া দৈনিক এক টাকার মত। কখনও কম বেশীও হয়। সুরাট থেকে আগ্রা পোঁছোতে সময় লাগতো চল্লিশ দিন। সুতরাং সম্পূর্ণ যাত্রার জন্য ব্যয় হয় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা। সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার দূরত্বও প্রায় ঐরকমই। গাড়ীর ভাড়াও একই প্রকার। এই রকম একটা আনুপাতিক হিসেব ধরেই সারা ভারত ভ্রমণ করা চলে।

নিজেদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশী ব্যয় করার শক্তি যাঁদের আছে তাঁরা পাল্‌কী ব্যবহার করেন। পাল্‌কীতে ভ্রমণ বিশেষ আরামদায়ক। পাল্‌কী প্রায় ছোট গাড়ীর মত। লম্বায় ছয় কি সাত ফুট; আর তিন ফুট চওড়া। চারদিকে আড় বাঁধা থাকে। বাঁশ নামে বেতের চেয়ে অন্যরকম আর একটি জিনিস আছে যাকে খিলানের মত বাঁকানো যায়। তা' দিয়ে ফ্রেম করে পাল্‌কীর আচ্ছাদন তৈরী হয়। ফ্রেমটিকে মুড়ে দেয়া হয় সাটিন বা টিসু কাপড় দিয়ে। চলার পথে যে দিকে যখন রৌদ্রের তাপ লাগে পাল্‌কীর পাশে পাশে ভ্রমণরত ভৃত্য অনুচরগণ সেদিকের পর্দা টেনে নামিয়ে দেয়। একটি ভৃত্যের হাতে থাকে দেশীয় প্রথায় রেশমী কাপড়ে তৈরী বড় একটি ছাতার মত জিনিস। পাল্‌কীর পাশে পাশে ওটি নিয়ে আরোহীকে রৌদ্রতাপ থেকে বাঁচানো হয়। পাল্‌কীর দুপাশে দুটি লম্বা বাঁশ আর দুটি ছোট দণ্ড দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এ যেন ঠিক সেন্ট এণ্ড্রুজের ক্রশ। এক একটি বাঁশ লম্বায় পাঁচ ছয় ফুট। উহার এক একটির মূল্য প্রায় দু'শত ক্রাউন। আমাকেও একবার এক শ' কুড়ি ক্রাউন দিতে হয়েছিল। এই বাঁশ ধরে পাল্‌কী বহন করার জন্য এক এক পাশে তিনজন লোক থাকে। পাল্‌কী বাহকরা আমাদের দেশের শিবিকাবাহীদের

চেয়ে দ্রুতগামী। এদের পদক্ষেপ আরও ঢের বেশী সহজ, স্বচ্ছন্দ। তরুণ বয়স থেকেই এরা এই কাজের শিক্ষা লাভ করে। এদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক সর্ব্বসাকুল্যে মাসে চার টাকা। তবে যাত্রা যদি দীর্ঘ হয় এবং ষাট দিনেরও বেশী সময় কাজ করতে হয় তাহলে আর কিছু বেশী দেবার প্রশ্ন ওঠে।

গাড়ী বা পাল্‌কীতে করে ভারতবর্ষে সম্মানজনক ভাবে ভ্রমণ করতে হলে সংগে অবশ্যই বিশ তিরিশ জন তীর ধনুকসহ সশস্ত্র প্রহরী রাখতে হবে। কয়েকজন বন্দুকধারী লোক থাকলে তো উত্তম। এদেরও পারিশ্রমিক পাল্‌কী বাহকদেরই অনুরূপ। পাল্‌কীর সংগে পতাকা থাকে। ইংরেজ ও ওলন্দাজগণও এই প্রথা অবলম্বন করেন তাঁদের কোম্পানীর সম্মান রক্ষার জন্য। পাল্‌কীর সংগে সৈন্য রাখা লোক দেখানো ব্যাপার নয়। এরা সর্ব্বদা প্রহরায় থেকে আরোহীর নিরাপত্তা রক্ষা করে। প্রয়োজনমত এক একজন পালাক্রমে বিশ্রাম করে নেয়। আরোহীকে আরাম ও শান্তি প্রদান ব্যাপারে এরা বিশেষ সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, যে সহর থেকে পাল্‌কীর জন্য এই সকল লোক সংগ্রহ করা হয়, সেখানে তাদের একজন কর্ত্তাব্যক্তি বা দলপতি থাকেন। এই লোক-লস্করদের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তাঁর। এই দায়িত্বের জন্য তিনি জন প্রতি দুটাকা পেয়ে থাকেন।

যে সব বড় বড় গ্রামে মুসলমান বাসিন্দার সংখ্যা বেশী সেখানে কেবল মেষের মাংস, মুরগীর ছানা ও পায়রা পাওয়া যায়। কিন্তু যে অঞ্চলে বেনিয়ান (ব্যবসায়ী) ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায় বাস করেন না, সেখানে পাওয়া যায় আটা ময়দা, চাল, শাক সব্‌জী ও দুগ্ধজাত মিষ্টদ্রব্য।

ভারতবর্ষের খরতাপ ও গরম আবহাওয়ার সংগে যাঁদের পরিচয় নেই, যাঁরা তাতে অভ্যস্ত নন, তাঁরা ভ্রমণ চালান রাত্রিকালে; দিনমানে বিশ্রাম করেন। যাত্রী যদি কখনও কোন সুরক্ষিত সহরে এসে পৌঁছে যান, তাহলে রাত্রিকালের পরবর্ত্তী যাত্রার জন্য তাঁকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই নগর প্রান্ত অতিক্রম করতে হবে। কারণ রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই পুরদ্বার বন্ধ হয়ে যায়। নগরীর মধ্যে সবরকম চুরি ডাকাতির জন্য নগররক্ষক দায়ী হন বলে তিনি রাত্রিতে কাউকে সহরের বাইরে যাবার অনুমতি প্রদান করেন না। এটা রাজার হুকুম ও নিষেধাজ্ঞা, তা মানতেই হবে। আমি যখন এই ধরণের কোন সহরে গিয়েছি তখন আমি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে সময়মত ফটকের বাইরে

গিয়ে কোন গাছের তলায় মাঠের মধ্যে মুক্ত বায়ুতে বিশ্রাম করে পুনরায় যাত্রার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছি।

হিন্দুস্থানে দূরত্ব পরিমাপ হয় ক্রোশ দ্বারা। এক ক্রোশ এক লীগের সমান। এখন সুরাট থেকে আগ্রা ও জাহানাবাদ যাত্রার সময় হয়েছে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে সেই রাস্তায় সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ও অসাধারণ কি আছে।

অধ্যায় চার

সুরাট থেকে বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে আগ্রার রাস্তা।

তুরস্ক ও পারস্যের তুলনায় আমি এখন ভারতবর্ষের প্রধান সহরগুলির মুখ্য সড়ক সমূহের সংগে অধিক পরিমাণে পরিচিত। এর কারণ, আমি যে ছয় বার পারস্য থেকে ইস্পাহান গিয়েছি, তারমধ্যে দুবার গিয়েছি ইস্পাহান থেকে আগ্রা এবং বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের আরও অন্যান্য স্থানে। কিন্তু একই রাস্তার বারংবার বর্ণনা পাঠকদের কাছে একঘেঁয়ে মনে হবে। সুতরাং প্রত্যেকটি ভ্রমণের রাস্তা ও কি কি দুর্ঘটনা তখন ঘটেছে তার খুঁটিনাটি বিবরণ না দিয়ে, ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট সময় কাল উল্লেখ না করে রাস্তাঘাটের একটা নিখুঁত সাধারণ বর্ণনা দেয়াই সমীচীন।

সুরাট থেকে আগ্রা যাবার রাস্তা আছে দুটি। একটি বুরহানপুর ও সিরোঞ্জ হয়ে, দ্বিতীয়টি আমেদাবাদের মধ্যে দিয়ে। এই অধ্যায়ে প্রথমটির কথাই স্থান পাবে।

সুরাট থেকে বার্দৌলি ১৪ ক্রোশ। বার্দৌলি একটি স্বায়ত্বশাসিত সহর। ওখানে বড় একটি নদী পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যায়। প্রথম দিনের যাত্রায় এমন একটি অদ্ভুত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যার কতকাংশ বনজঙ্গল। বাকী সব গম ও ধানের ক্ষেতে পূর্ণ।

বাহরও একটি বড় গ্রাম। একটি হ্রদের পাশে অবস্থিত। আয়তনে প্রায় এক লীগ। গ্রামের এক প্রান্তে বেশ মজবুত একটি গড় বা দুর্গ আছে। তার ব্যবহার বড় একটা হয় না। গ্রামটির পাশে এক লীগের তিন-চতুর্থাংশ স্থান জুড়ে একটি ছোট নদী পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হয়। এইভাবে নদী পার হওয়া সহজ নয়। তার মধ্যে এমন সব ছোট ছোট পাহাড় মত ও প্রস্তর স্তূপ আছে যে গাড়ী উল্টে যেতে পারে। দ্বিতীয় দিনের যাত্রা পথের প্রায় সবটাই বনভূমি।

বাহর থেকে কির্কা বা বেগমের ক্যারাভান সরাই পাঁচ ক্রোশ দূরে। এই সরাইখানাটি খুব বড় এবং আরামদায়ক। এটি নির্মিত হয়েছে শাহজাহান তনয়া বেগম সাহেবার দানে। কারণ আগে বাহর থেকে নওপুরা পর্য্যন্ত যাত্রা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ। আর এই স্থানটি এমন সব রাজাদের রাজ্যের সীমান্ত-বর্ত্তী ছিল যাঁরা মুঘল বাদশার সামন্ত হয়েও তাঁকে মান্য করতেন না। এমন

গাড়ী বা পশু চালক পাওয়া যাবে না যারা এখানে তিরস্কৃত হয়নি। অঞ্চলটি বনময়। সরাইখানা ও নওপুরার মধ্যেও একটি নদী পদব্রজে অতিক্রম করতে হয়। নওপুরার কাছেই আরও একটি নদী আছে।

নওপুরা সহরটি বেশ বড়। তন্তুবায় সম্প্রদায়ের অধিবাসীতে পূর্ণ। ধান চাল হোল প্রধান পণ্য। সহরের মধ্যে দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত হওয়ায় স্থানটি খুব উর্ব্বর। ধানের ফসল ভাল করতে যে আর্দ্রতা প্রয়োজন তা এই নদীর প্রভাবেই পাওয়া যায়। এখানকার চালের একটা বিশেষ গুণ আছে। সকলেই এই চাল পছন্দ করেন। অন্যান্য সাধারণ চালের চেয়ে তা আকারে প্রায় অর্দ্ধেক। সিদ্ধ হলে বরফের চেয়েও সাদা ভাত হয়। ভাতের গন্ধ ঠিক কস্তুরী মৃগনাভীর মত। ভারতের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই চাল ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। এঁরা যখন পারস্যের কোন বন্ধুকে কিছু উপহার পাঠান তখন তার সংগে এই চালও এক থলি পাঠানো হয়। কির্কা ও অন্যান্য স্থানের যে সকল নদীর কথা বলেছি তা সব সুরাটের নদীতে হয়েছে মিলিত।

তাল্লেনারে একটি নদী পার হতে হয়। সেটি বারোচ পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। সেখানে খুব স্ফীত হয়ে কাম্বে উপসাগরে গিয়ে মিশেছে।

মালবাহী শকটকে বাদলপুরায় বুরহানপুরের শুল্ক দিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য-বহনকারী গাড়ীর জন্য কোন কর নেই।

বুরহানপুর একটা বড় সহর। তবে এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। বেশীর ভাগ বাড়ী ঘর এখন খড়ের। সহরের মাঝখানে একটি দুর্গ আছে। শাসনকর্ত্তা ওখানেই থাকেন। এই প্রদেশের শাসক বিশেষ অধিকার সম্পন্ন। প্রদেশের শাসনভার কেবল সম্রাটের পুত্র বা খুল্লতাতদের উপরেই ন্যস্ত হয়। বর্ত্তমান সম্রাট ঔরংজেব তাঁর পিতার আমলে দীর্ঘকাল এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে বাংলা প্রদেশই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করলো। সেই থেকে এটাকে রাজ্য নামে অভিহিত করা হয়। আজ পর্য্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের বাংলা দেশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবা। বুরহানপুর সহরটির মত ঐ প্রদেশের সর্ব্বত্রই খুব ব্যবসা বাণিজ্য চলে। এখানে প্রচুর পরিমাণে ও অতিমাত্রায় সাদা ও স্বচ্ছ সূতি বস্ত্র নির্মিত হয়। এই কাপড় রপ্তানী হয়ে যায় পারস্য, তুর্কী এবং মস্কোভিয়া পর্য্যন্ত। তারপরে আরও চলে যায় পোলাণ্ড ও আরবদেশ থেকে শুরু করে সুবৃহৎ কায়রো এবং আরও অন্যান্য স্থানে। কতক কাপড় নানা বিচিত্র বর্ণে, রকমারী পুষ্প পত্রালির নক্সা প্যাটার্নে রঞ্জিত ও মুদ্রিত হয়। ওগুলি

দিয়ে মেয়েদের গাত্রাবরণ ও অবগুণ্ঠন তৈরী হয়। এই জাতীয় সূতিবস্ত্র দিয়ে শয্যাবরণ এবং রুমালও তৈরী হয়ে থাকে। আর এক প্রকার কাপড় আছে যা কখনও রঙ্‌ করা হয় না। কখনও ওগুলির গায়ে ডোরা কাটা থাকে, না হয় তো দুটি চারটি সোনালি রূপালি জরির টানা থাকে সারাটা জায়গা জুড়ে। এই কাপড়ের প্রতিটি কিনারায় এক ইঞ্চি থেকে বার-পনের ইঞ্চি পর্য্যন্ত বা একটু কম বেশী চওড়া জায়গা জুড়ে সোনালি, রূপালি জরি ও রেশমী সূতার ফুলকারী কাজ থাকে। তাতে কোন উল্টা সোজা বয়ন থাকে না। দু পিঠেই সমানকাজ ; তা সমান সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। পোলাণ্ডে এই জাতীয় কাপড়ের খুব চাহিদা ও সুখ্যাতি। তবে ওদেশে রপ্তানীর কাপড়ে যদি অন্ততঃ তিন চার ইঞ্চি সোনারূপার কারুকার্য্য না থাকে এবং জলপথে সুরাট থেকে অর্মাস, তাব্রিজ থেকে মঙ্গোলিয়া অথবা কৃষ্ণ সাগরের অন্যান্য অঞ্চল হয়ে যাবার ফলে যদি নক্সাগুলি নিষ্প্রভ ও মলিন হয়ে যায় তাহলে ব্যবসায়ীদের খুব মুস্কিলে পড়তে হয় এবং অতিমাত্রায় ক্ষতি স্বীকার করে বিক্রী করা ছাড়া উপায় থাকে না। সুতরাং জিনিস প্যাক করার সময় খুব সাবধানতা নেয়া দরকার যাতে কোন ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া তাতে প্রবেশ করতে না পারে। এইজন্যই দূর সমুদ্র পথে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন। এই জাতীয় বস্ত্রের কতক তৈরী হয় বিশেষ এক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কোমর বন্ধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। ছোট সাইজের কাপড়কে বলা হয় উড়্‌নি। তা লম্বায় ১৫ থেকে কুড়ি 'এল্‌' পর্য্যন্ত (১ এল=৪৫")। এক একটির দাম কমপক্ষে ১৫০ টাকা থেকে শুরু হয়। তবে দশ বার এলের কম মাপ হলে চলবে না। যে কাপড়গুলি লম্বায় একটু ছোট তা উচ্চপর্য্যায়ের মহিলাদের অবগুণ্ঠন ও গাত্রাবরণ (চাদর) রূপে ব্যবহৃত হয়। তা প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হয় পারস্য ও তুর্কীস্থানে। বুরহানপুরে আরও অন্য প্রকার সূতিবস্ত্র নির্মিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে এত বস্ত্র উৎপন্ন হয় না।

বুরহানপুর ত্যাগ করার সময় একটি নদী অবশ্যই পার হতে হবে। অন্যান্য নদীর কথা আমি আগেই বলেছি। এই নদীতে কোন সেতু নেই। কাজেই জল শুকিয়ে নীচে নেমে গেলে তবে পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। বর্ষকালে অবশ্য নৌকোর ব্যবস্থা থাকে।

সুরাট থেকে বুরহানপুরের দূরত্ব ১৩২ ক্রোশ। ক্রোশের দৈর্ঘ্য ভারতে বড়ই কম। গাড়ী করে এক ক্রোশ পথ এক ঘন্টার কম সময়ে যাওয়া যায়।

বুরহানপুরের অদ্ভুত একটা গোলমালের কথা আমার স্মরণে আছে। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে আমি যখন আগ্রা থেকে সুরাটে ফিরে আসি তখন এই ঘটনাটি ঘটে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই ঃ তখন প্রদেশপাল ছিলেন সম্রাটের মাতার দিক থেকে ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর বালক-ভৃত্যদের মধ্যে একটি ছিল যেমন তরুণ তেমনি দেখতে সুন্দর। সে ছিল খুব ভাল পরিবারের ছেলে। ঐ সহরেই তার এক ভাই দরবেশ রূপে বাস করতেন। সহরবাসীরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। একদিন গভর্ণর ঘরে একা। ভৃত্যটি ঘরে এলে তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতার বলে ও নানা উপহার দিয়ে, স্নেহপ্রীতি দেখিয়ে তরুণ ভৃত্যের উপরে ঘৃণ্য আচরণ করেন। ভৃত্যটি মনিবের সেই জঘন্য আচরণে বিরক্ত হয়ে ছুটে চলে গেল তার ভ্রাতা সেই দরবেশের কাছে। সব কথা তাঁকে জানালে দরবেশ ভ্রাতাকে এমন একটি ছুরিকা দিলেন যেটিকে সহজেই জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখা চলে। আর বলে দিলেন যে গভর্ণর যদি পুনরায় তার সংগে ঐ প্রকার হীন আচরণ করেন তাহলে তাঁর ইচ্ছানুসারে চলার ভান করে শেষ মুহূর্ত্তে ছুরিকাটি যেন ব্যবহার করা হয়। এদিকে ভৃত্য যে দরবেশকে সব জানিয়েছেন তা প্রদেশপাল কিছুই জানতেন না। আর প্রতিদিনই সেই কুকার্য্যের জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। একদা তাঁর ভোজসভা ভবনের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি ভৃত্যটিকে বললেন দেশীয় প্রথায় হাতপাখা চালিয়ে মশামাছি তাড়াতে। বাড়ীটি ছিল উদ্যানের এক কিনারায়। বেলা তখন দ্বিপ্রহর ; সকলেই দিবানিদ্রায় মগ্ন। এই সময়ে প্রদেশপাল আবার ভৃত্যকে সেইভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করলেন। প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল ভৃত্যটির বুঝি কোন আপত্তি নেই ; ব্যাপারটাকে সহজভাবেই নিচ্ছে। কিন্তু মনিবকে আবার কুকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখে ভৃত্য তাঁর পেটের মধ্যে তিন তিনবার সেই ছুরিকা চালিয়ে দিল। তাঁকে মুখ খুলে চীৎকার করা বা কারোর সাহায্য প্রার্থনারও কোন সুযোগ দিল না। হত্যাকাণ্ড সমাধা করে ভৃত্য অম্লান বদনে ধীর স্থির ভাবে প্রাসাদের বাইরে গেল চলে। প্রহরীরা মনে করেছিল শাসনকর্ত্তা হয়ত তাকে কোন কাজে বাইরে পাঠিয়েছেন।

দরবেশের কাছে ভৃত্যটি যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন ভাই কি করে এসেছে। জনসাধারণের ক্রোধের কবল থেকে ভাইকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং প্রদেশপালের কুকীর্ত্তি প্রচারের জন্য তিনি সমস্ত দরবেশগণকে জমায়েত করলেন। আর মসজিদের চারদিকে যত পতাকা টাঙানো ছিল তার এক

একটি সকলকে হাতে নিতে বললেন। সংগে সংগে চীৎকার করে সকলকে উৎসাহিত করে ভিড় আরও জমিয়ে তুললেন। অবশেষে দরবেশ সম্প্রদায়কে পুরোভাগে রেখে মিছিল করে চললেন প্রাসাদ অভিমুখে। আর সকলে মিলে সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, "মহম্মদের নামে আমরা মৃত্যু বরণ করবো। সেই জঘন্য লোকটিকে আমাদের হাতে সমর্পণ করা হোক। তার মৃত্যুর পরে দেহাবশেষ যেন কুকুরের খাদ্য হয়। মুসলমানের কবরখানায় তাকে সমাধিস্থ করা চলবে না।"

প্রাসাদরক্ষীদের পক্ষে অত লোকের ভিড়কে প্রতিরোধ করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ক্রুদ্ধ জনতার কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হোল। সহরে কোন দারোগা ছিল না। পাঁচ ছয় জন রাজকর্ম্মচারী কোনরকমে জনতার সংগে কথা বলার সুযোগ পেলেন। অনেক বলে কয়ে বোঝালেন যে সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাদের কিছু শ্রদ্ধা প্রীতি থাকা উচিত। এই করে তাঁরা ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করে ফিরিয়ে দিলেন। সেই রাত্রেই স্ত্রী পুত্রসহ প্রদেশপালের মৃতদেহ আগ্রায় প্রেরিত হোল। সম্রাট শাহজানের গোচরেও ঘটনাটা গিয়েছিল। তবে তিনি বেশী কিছু বিব্রত বোধ করেন নি। কারণ তাঁর প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যা কিছু ভালমন্দ, তিনি তার অংশীদার। তিনি সেই বালক ভৃত্যকে পরে ব্াংলাদেশে একটি ছোট খাট সরকারী কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

বুরহানপুর থেকে যাই পিয়োম্বী সরাই। আরও বর্ণনা দেবার আগে একটি বিষয় বলে নিতে চাই যে যেখানেই 'সরাই' শব্দটি দেখা যাবে সেখানেই বুঝতে হবে যে মস্ত বড় একটা দেয়ালঘেরা ও ঝোপ ঝাড়ের বেড়া দেয়া একটি জায়গা, যার মধ্যে রয়েছে পঞ্চাশ ষাটটি চালা ঘর। ওখানকার একদল বাসিন্দা ময়দা, চাল, মাখন ও শাকসব্‌জীর কারবার করেন। তাদের আর একটি ব্যবসা হোল পুঁতির মালা তৈরী করা ও ভাত রান্না করা। ওখানে যদি কোন মুসলমান থাকেন তাঁকে সহরে যেতে হবে একটুখানি মেষ মাংস অথবা একটি মুরগী কেনার জন্য। যাঁরা ভ্রমণকারীদের কাছে খাদ্যদ্রব্য বিক্রী করেন তাঁরা সর্ব্বদা নিজেদের কুঁড়ে ঘরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। ঘরের মধ্যে প্রধানতঃ একটি ছোট খাট বা চারপাই থাকে যার উপরে পর্য্যটকরা নিজেদের বিছানাপত্র বিছিয়ে নিতে পারেন।

পিয়োম্বী সরাই থেকে এগিয়ে আরও অনেক জায়গা ও বহু ক্রোশ পথ

অতিক্রম করে পৌঁছোতে হয় আন্দি নামক স্থানে। ওখানে একটি নদী পার হতে হবে। এই নদীর প্রবাহ বারাণসী ও পাটনার মধ্যে দিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। এরপরে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছোনো যায় সিরোঞ্জে (টংক রাজ্যের অন্তর্গত)।

সিরোঞ্জ একটি বড় সহর। অধিবাসীদের অধিকাংশ হচ্ছে বেনিয়া জাতের ব্যবসায়ী ও কারুশিল্পের কারবারী লোক। এঁরা পুরুষানুক্রমে এই কাজ করেন। এই কারণে এখানে অনেক ইঁটপাথরের পাকা বাড়ীঘর দেখা যায়। এই সহরে খুব ছাপানো সূতী কাপড়ের ব্যবসা চলে। তার নাম ছিট্ কাপড়। এই জাতীয় কাপড় দিয়ে পারস্য ও তুর্কীস্তানের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের পিরাণ পোষাক তৈরী হয়। অন্যান্য দেশে তা নিয়ে শয্যাবরণ, টেবিলের রুমাল তোয়ালে ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। সিরোঞ্জের মত সূতী কাপড় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও পাওয়া যায়, কিন্তু তার রং এর বাহার অত উজ্জ্বল নয়। তাছাড়া সেগুলি বারবার জলে ধোয়া হলে রং খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সিরোঞ্জের কাপড়কে যত ধোয়া যায় তা আরও উজ্জ্বলতর হয়। এই সহরের প্রান্ত ধরে একটি নদী বয়ে গেছে। এই নদীর জলের এই গুণ যে তা দ্বারা রঙ্ তৈরী করলে তার ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় ও স্থায়ী হয়। সুতরাং বর্ষাকালে নদী জলে ভরপূর থাকতে বিদেশী বণিকদের অর্ডার অনুযায়ী কারিগররা সূতী কাপড় ছাপার কাজ সম্পন্ন করেন। এরপরে বর্ষা অন্তে জল আরও ঘন হলে সূতীবস্ত্র রঞ্জিত ও মুদ্রিত করলে রঙ্ আরও পাকা ও উজ্জ্বল হয়।

সিরোঞ্জে আর এক প্রকার সূতী বস্ত্র উৎপন্ন হয়, আর তা এত মিহি ও সূক্ষ্ম যে কেউ পরলে তার গায়ের চামড়া দেখা যায়, মনে হবে তিনি নগ্ন। এই বস্ত্র রপ্তানী করার অনুমতি বণিকদের নেই। প্রদেশপাল ঐজাতীয় সমস্ত কাপড় মুঘল বাদশার অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেন। বাকী কিছু পাঠান হয় দরবারের প্রধান পুরুষদের জন্য। এই কাপড় দিয়ে বেগম সাহেবাগণ, সুলতানারা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্ত্রীরা তাঁদের গ্রীষ্মকালীন পোষাক তৈরী করান। এই কাপড়ের পোষাক পরিহিতা নারীদের দেখে স্বয়ং সম্রাট ও দরবারের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। তাঁদের সম্মুখে নর্ত্তকীরা এই পোষাকে সজ্জিতা হয়েই নৃত্য পরিবেশন করেন।

বুরহানপুর থেকে সিরোঞ্জ একশ' এক ক্রোশ। সুরাট থেকে বুরহানপুরের

যে দূরত্ব তা তার চেয়েও বেশী। গাড়ীতে পুরো এক ঘন্টা, কখনও সোয়া ঘন্টা সময় লাগে এক এক ক্রোশ রাস্তা চলতে। এদেশের এক শ' লীগ রাস্তা অতিক্রম করতে পুরো একদিন চলতে হয়। আর তা গম ও ধানের অত্যন্ত উর্ব্বরা জমির মধ্যে দিয়ে। জায়গাগুলি চমৎকার সমতল। বনজঙ্গল খুব একটা চোখে পড়ে না। সিরোঞ্জ ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ প্রায় এই রকমেরই। গ্রামগুলি খুব কাছাকাছি ও পাশাপাশি হওয়াতে ভ্রমণ যাত্রা অত্যন্ত আরাম দায়ক। যখন খুসী বিশ্রাম করা যায়।

সিরোঞ্জ থেকে কয়েকটি সরাই পেরিয়ে কালাবাগে পৌঁছোনো গেল। কালাবাগ (দাক্ষিণাত্যে এবং গোয়ালিয়রের ১০০ মাইল দক্ষিণে) বড় সহর। পূর্ব্বে কোন রাজার বাসস্থান ছিল এখানে। তিনি প্রখ্যাত মুঘলদের কর ও রাজস্ব দিতেন। ঔরংজেব সিংহাসনে বসে কেবল এই রাজারই নয় আরও অনেক প্রজারও শিরচ্ছেদ করেন। সহরের কাছেই বড় সড়কের উপর দুটি সুউচ্চ গম্বুজ আছে। গম্বুজ দুটির গায়ে চারদিক ঘিরে অনেকগুলি গর্ত্ত আছে জানালার মত। একটি থেকে আর একটি ফাঁকা অংশের দূরত্ব দু'ফুট আন্দাজ। সেখানে একটি করে মানুষের মাথা লটকানো। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে আমার শেষ যাত্রায় দেখেছি যে তার অল্প আগেই সেই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছে। কারণ তখনও মনুষ্য মুণ্ডগুলি আস্ত ও অক্ষত ছিল এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ সৃষ্টি করেছিল।

এরপরে কলারস একটি ছোট সহর। ওখানকার সমস্ত বাসিন্দাই পৌত্তলিক হিন্দু। আমার শেষ ভারত ভ্রমণকালে আমি যখন এই স্থানটির মধ্য দিয়ে যাই তখন ওখানে আটটি কামান ছিল। তার একটিতে গোলা ছিল একটি ৪৮ পাউণ্ড ওজনের। বাকীগুলির গোলা ওজনে ছিল ৩৬ পাউণ্ড করে। এক একটি কামান বহন করতে দরকার হয়েছিল বলদের ২৪ টি জোয়াল। খুব শক্তিশালী একটি হাতী কামানের পেছনে অনুসরণ করে চলতো। যখন কামনবাহী বলদগুলি কোন খারাপ রাস্তায় গিয়ে পড়তো ব' থমকে দাঁড়াত তখন হাতীটিকে এগিয়ে দিলে সে শুঁড় দিয়ে তাদের তুলে দিত। সহরের বাইরে রাজপথের দু'ধারে প্রচুর বড় বড় গাছ। ভারতীয়রা বলে আম গাছ। অনেক জায়গায় গাছগুলির কাছে কাছে ছোট মন্দির দেখা যায়। প্রতিটি মন্দিরের দ্বারে একটি করে মূর্ত্তি আছে। এই রকম একটি মন্দিরের সামনেই আমি অবস্থান কচ্ছিলাম। এই মন্দিরটির দ্বারদেশে তিনটি মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। হাতীটি ওখানে এসেই একটি মূর্ত্তিকে শুঁড় দিয়ে তুলে

দুই খণ্ডে ভেঙ্গে ফেললো। দ্বিতীয়টিকে এত উচ্চে নিক্ষেপ করেছিল যে সেটি গেল চার খণ্ড হয়ে। অবশেষে তৃতীয়টির মস্তক ভেঙ্গে নিয়ে চলে গেল। অনেকের মনে হয়েছিল যে হাতীর মাহুত ওকে এই কাজ করার সংকেত দিয়েছিল। আমার নজরে অবশ্য তা পড়ে নি। বেনিয়া সমাজ ইহাতে ক্ষুব্ধ হলেও কিছু বলতে বা প্রতিবাদ করতে সাহস পান নি। কেননা দু'হাজারেরও বেশী সংখ্যক লোক ছিল সেই কামানবাহী দলে ও তদ্বিরকারক রূপে। তারা সকলেই ছিলেন সম্রাটের সৈন্য এবং জাতিতে মুসলমান। এছাড়া কামান চালক রূপে সেই দলে ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজও কিছু ছিলেন। সম্রাট এই সৈন্যদলকে দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছিলেন শিবাজীর সংগে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। শিবাজী এক বছর (১৬৬৪) আগে সুরাট লুঠ করেন। এঁর কথা আমি যথাসময়ে বর্ণনা করবো।

এরপরে খানিকটা এগিয়ে গেত্ নামে একটি সোজাধরণের পার্ব্বত্য পথ (গিরিসংকট)। লম্বায় এক লীগের ¾ অংশ। এই রাস্তার নিম্নগতি সুরাট থেকে আগ্রা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। তার প্রবেশ মুখে দু'টি কি তিনটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রাস্তাটি এত সরু যে দু'টি মালবাহী গাড়ী পাশাপাশি চলতে পারে না। যাঁরা দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ সুরাট, গোয়া, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, মসলীপত্তন এবং আরও অন্যান্য স্থান থেকে আগ্রা যেতে চান তাঁদের পক্ষে এই গিরিপথ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ আর তো কোন রাস্তা নেই। বিশেষতঃ আমেদাবাদের রাস্তা ধরে যেতে গেলে আর দ্বিতীয় কোন পন্থা নেই। পূর্ব্বে এই গিরিপথের প্রতি শেষ প্রান্তে একটি করে ফটক বা দ্বারপথ ছিল এবং যে প্রান্তটি আগ্রার নিকটে, তার কাছে পাঁচ ছয়টি বেনিয়াদের দোকান ছিল। সেখানে ময়দা, ঘি, চা, ডাল ও শাকসব্জী বিক্রী হোত। আমার পূর্ব্বেকার এক ভ্রমণে আমি একটি দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলাম শকট ও মাল গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে। সমস্ত যাত্রীরাই এই গিরিপথের মুখে অবতরণ করতেন। অনতিদূরে চাল ও গমের বস্তায় পূর্ণ বেশ বড় একটি গুদাম রয়েছে। প্রতিটি বস্তার পেছনে শুয়ে আছে তের চৌদ্দ ফুট লম্বা এক একটা সাপ। একটি থেকে আর একটি বেশ বড়। বস্তাগুলির একটি থেকে জনৈক মহিলা কিছু দানা শস্য বের করতে গিয়ে সাপের কামড় খেলেন। তিনি যখন বুঝলেন যে সর্পাঘাত হয়েছে তখুনি গুদাম থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে উঠলেন "রাম, রাম!" অর্থাৎ হে ভগবান! হে

ভগবান! এই দেখে বেনিয়া সমাজের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা ছুটে এলেন তাকে আরাম দেবার জন্য এবং যেখানে সর্পাঘাতের চিহ্ন সেখানে এমন শক্ত করে কিছু বেঁধে দিলেন যাতে বিষ শরীরের উপরের অংশে উঠতে ও ছড়াতে না পারে। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হোল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তার মুখ ফুলে কালির বর্ণ ধারণ করলো এবং ঘন্টা খানেকের মধ্যে তার মৃত্যু হোল।

ভারতীয়দের মধ্যে রাজপুতরা হলেন যুদ্ধ বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতম। এঁরা সকলেই পৌত্তলিক হিন্দু। মহিলাটির যখন মৃত্যু হোল, ঠিক সেই সময়েই সৈন্যরা এসে ওখানে পৌঁছোল। তাদের চারজন চাবুক ও লাঠি নিয়ে গুদামঘরে ঢুকে সাপটিকে মেরে ফেললো। গ্রামবাসীরা মৃত সাপটিকে সহরের বাইরে ফেলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ একদল শিকারী পাখী (শকুন) তার উপরে পড়ে এক ঘন্টার মধ্যে খেয়ে শেষ করে দিয়েছিল। মহিলাটির পিতামাতা মৃতদেহটি নদীর ঘাটে নিয়ে স্নান করিয়ে দাহকার্য্য সম্পন্ন করালেন। আমি ওখানে দুদিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ ওখানে একটি নদী পার হতে হয়। কিন্তু নদীটির জল নীচে না নেমে তখন যেন আরও স্ফীত হয়েছিল তিনচার দিন বারিপাতের ফলে। সুতরাং নদীটি পার হওয়ার আগে আমি আধ লীগ রাস্তাও নীচের দিকে এগোতে পারিনি।

এঁরা সকলেই এই নদীটি পায়ে হেঁটে পার হতে চান। নইলে সমস্ত মালপত্র গাড়ী থেকে আবার নৌকোতে তুলতে হবে। অথবা আধ লীগ আন্দাজ রাস্তা মালপত্র হাতে নিয়ে চলতে হবে। এর চেয়ে কষ্টকর আর কি হতে পারে। এখানকার বাসিন্দারা যাত্রীদের কাজ করেই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। যাত্রীদের উপরে চাপ দিয়ে যতটা সম্ভব বেশী অর্থ আদায় করা এদের স্বভাব। এদের সাহায্য ব্যতীত যাত্রীদেরও চলেনা। কারণ আর কারোর এ অঞ্চলের পথঘাট সম্বন্ধে এত জ্ঞান নেই-এর চেয়ে কিন্তু একটি সেতু নির্ম্মাণ অনেক সহজ। এ অঞ্চলে কাঠ বা পাথর কিছুরই অভাব নেই। সড়কটি পুরোপুরি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে। তা চলে গিয়েছে পাহাড় ও নদীর অন্তর্বর্ত্তী স্থান ধরে। নদীর জল স্ফীত হলে সমস্ত রাস্তাটি এমন জলমগ্ন হয়ে যায় যে খুব জানা লোক ব্যতীত আর কারোর পক্ষেই সেখানে চলা সম্ভব নয়।

এখন নারওয়ার পর্ব্বতের ঢালুতে একটি বড় সহর। পর্বতের উপরিভাগে একটি দুর্গের মত বাড়ী আছে। সমস্ত পাহাড়টিই দেয়ালে বেষ্টিত। বেশীর

ভাগ ঘরবাড়ী ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় চালাঘর এবং একতলা। তবে ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীগুলি দোতলা এবং ছাদ বিশিষ্ট। সহরটির চারদিকে অনেকগুলি পুষ্করিণী দেখা যায়। পূর্ব্বে জলাশয়গুলি খণ্ড খণ্ড পাথরে বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। এখন আর কোন যত্ন নেই। তবে তার চারদিকে অতি সুন্দর সব কীর্ত্তিসৌধ রয়েছে। একদিন আগে আমরা নদীটি পার হয়েছি। নারওয়ারের দিকে আরও চার কি পাঁচ ক্রোশ অতিক্রম করতে হবে। নদীটি সহর ও পাহাড়কে তিনদিকে এমন ভাবে বেষ্টন করে আছে যে মনে হয় যেন একটি উপদ্বীপ। নদীটি এঁকেবেঁকে দীর্ঘপথ চলে অবশেষে গিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। নারওয়ারে প্রচুর পরিমাণে লেপ তোষকের খোলস তৈরী হয়। কতক সাদা, কিছু সোনালী জরির ফুলকারী কাজকরা এবং রেশম বা সাটিনের তৈরী।

নারওয়ার থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে গোয়ালিয়র। সহরটি বড় হলেও উত্তমরূপে গঠিত নয়। অন্যান্য স্থানের মত ভারতীয় রীতিতেই পরিকল্পিত। সহরের পশ্চিম প্রান্ত ব্যাপী যে পর্ব্বতমালা রয়েছে তার কিনারা ধরেই এই সহরটি হয়েছে নির্মিত। পাহাড়টির মাথায় দেয়াল ঘিরে গম্বুজ বুরুজ ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। এই দেয়াল ঘেরা জায়গার মধ্যে বৃষ্টির জল জমিয়ে কয়েকটি হ্রদের মত জলাশয় তৈরী হয়েছে। এখানে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য জন্মায় তা দুর্গরক্ষী সৈন্য পোষণ করার পক্ষে যথেষ্ট। এইজন্য ভারতবর্ষের মধ্যে এই জায়গাটিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়। পাহাড়ের ঢালু গায়ে উত্তর পূব মুখো অংশে সম্রাট শাহজাহান একটি প্রমোদ ভবন নির্মাণ করিয়েছিলেন। ঐ ভবনটি থেকে সমগ্র সহরটির দৃশ্য দেখা যায়। তা বস্তুতঃ পক্ষে একটি সৈন্য শিবিরের কাজ করে। প্রমোদ আগারটির নীচেই পাথর কেটে গড়া কয়েকটি মূর্ত্তি আছে। এদের গড়ন ঠিক হিন্দু দেবতার মত। তাদের একটি উচ্চতায় অসাধারণ।

যেদিন থেকে এই দেশের শাসনভার মুসলমান সুলতান বাদশাহদের হাতে গিয়েছে সেদিন হতেই গোয়ালির দুর্গ হয়ে উঠেছে রাজকুমার ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের বন্দীদশায় অবস্থানের ক্ষেত্র। শাহজাহান যখন নানা অন্যায় কাজ করে সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন তখন যে সকল রাজকুমার ও মন্ত্রীদের উপর তাঁর অবিশ্বাস ও সন্দেহ জন্মেছিল তাঁদের সকলকে এক এক করে গ্রেপ্তার করে তিনি গোয়ালিয়র দুর্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তাঁদের প্রাণহানি ঘটাননি। বিষয় সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করেননি। কিন্তু ঔরংজেবের আমলে

ব্যবস্থা হোল একেবারে ভিন্ন। তিনি কোন উচ্চ পর্য্যায়ের মন্ত্রী বা রাজ-কর্ম্মচারীকে ওখানে পাঠিয়ে নয় দশদিন পরেই হুকুম দিতেন তাঁদের বিষ প্রয়োগ করতে। এই পন্থা গ্রহণের কারণ যাতে প্রকাশ্যে তিনি জঘন্য রকমের হত্যাকারী রূপে ধরা না পড়েন। যে মুহূর্ত্তে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ বক্সকে হাতের মুঠোয় পেলেন তৎক্ষণাৎ তাঁকেও পাঠালেন এই দুর্গে। ওখানেই মুরাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মুরাদকেই ঔরংজেব পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে প্ররোচিত করেন, আর এই মুরাদই গুর্জরাটের শাসনকর্ত্তার পদে থেকে নিজেকে ভারতের সম্রাট উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সহরের একটি মসজিদের অভ্যন্তরে মুরাদের জন্য অতি চমৎকার একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। এটির পরিকল্পনা বিশেষ একটি উদ্দেশ্য মূলক। তার সংগে তৈরী হয়েছিল বিরাট চতুষ্কোণ একটি চত্বর। চত্বরটির চারিদিক ঘিরে খিলানযুক্ত বারান্দাতে সব কুঠরীর সারি। সেখানে সব দোকান পসার চলতো। এই রীতি নিছক ভারতীয়। এদেশে জনসাধারণের জন্য কোন গৃহাবাস নির্মিত হলে তার সামনে চতুষ্কোণ উদ্যান সমন্বিত খিলানযুক্ত ঘরের বহর থাকে। সেখানে দোকান বাজার বসে, না হয় তো দরিদ্রদের জন্য কোন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে ওখানে প্রতিদিন ভিক্ষা দান করা হয়। যিনি এই জাতীয় আবাসের প্রতিষ্ঠাতা, এ যেন তাঁরই জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আর কি!

গোয়ালিয়য়ের পাঁচ ক্রোশ পরে একটি নদীপার হতে হয়, নাম সংক। এরপরে কয়েক ক্রোশ দূরে পতের কি সরাইতে চারটি প্রশস্ত খিলানযুক্ত একটি সেতু আছে। যে নদীর উপর এই সেতু তার নাম কুয়ারী। কুয়ারিকী সরাই থেকে ঢোলপুর বেশী দূরে নয়। ওখানে চম্বল নামে একটি সুবৃহৎ নদী রয়েছে। খেয়া পারাপারের জন্য নৌকো পাওয়া যায়। এই নদীটি আগ্রা ও এলাহাবাদের মধ্যে যমুনায় পতিত হয়েছে।

ঢোলপুর থেকে মিনাক্ষী সরাইর দূরত্ব সামান্য। মিনাক্ষী সরাইতেও একটি নদী আছে; নাম জাজু। তার উপরের প্রস্তর গঠিত সুদীর্ঘ এক সেতু। তাকে জাজুই কা পুল বলা হয়। মিনাক্ষী সরাই থেকে সেতুটি আট ক্রোশ দূরে। এই সেতুর কাছেই আগ্রায় আগত ব্যবসায়ীদের মালপত্র পরখ করা হয়। বণিকরা যাতে শুল্ক ফাঁকি দিতে না পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা। বিশেষভাবে দেখা হয় যে ভিনিগার মিশ্রিত ফলের আচার চাটনির পিপাতে ও কাচের পাত্রে মদের বোতল না থাকে।

অধ্যায় পাঁচ

আমেদাবাদের মধ্য দিয়ে সুরাট থেকে আগ্রার রাস্তা।

সুরাট থেকে বারোচের দূরত্ব ২২ ক্রোশ। এই দুটি সহরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত জায়গা গম, চাল, বাজ্‌রাও আখের চারায় পরিপূর্ণ। বারোচে প্রবেশ করার আগে একটি নদীতে খেয়া পার হতে হয়। নদীটি কাম্বের দিকে প্রবাহিত হয়ে ঐ নামেরই উপসাগরে মিলিত হয়েছে।

বারোচ একটা প্রকাণ্ড সহর। ওখানে একটি দুর্গ আছে; উপস্থিত অব্যবহার্য্য। নদীটির জন্য সহরের বরাবরই খুব খ্যাতি। নদীর জলের বিশেষ গুণ হোল সূতোকে শ্বেত শুভ্র করা যায়। এইজন্য বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের সমস্ত অঞ্চল থেকে সূতো এনে ওখানে জমা করা হয়। তাছাড়া ওখানে বাফ্‌তা নামে লম্বা ও বেশ বড় সাইজের সূতীবস্ত্র তৈরী হয়ে থাকে। এই কাপড় খুব সুন্দর ও সাদা এবং অতি মাত্রায় ঠাস বুননের। এক এক খণ্ড কাপড়ের দাম চার থেকে একশ' টাকা পর্য্যন্ত। বারোচে যে জিনিসপত্র আনা নেয়া হয় তার জন্য শুল্ক প্রদান বাধ্যতামূলক। ইংরেজদের এই সহরে ভারি সুন্দর একটি বাড়ী আছে।

একদিনের একটি ঘটনা স্মরণে আছে। সুরাট থেকে আগ্রায় ফিরে আসার সময় আমি একবার ইংরেজ কোম্পানীর অধিকর্ত্তার সংগে বারোচে যাই। কিছু সময়ের মধ্যে কয়েকজন ভোজবাজীকর তাঁকে জিজ্ঞেস করলো যে তিনি কিছু কৌশল দেখতে চান কিনা। তারপরে তাঁরা কিছুটা আগুন তৈরী করলো। কয়েকটি লোহার শিকলকে আগুনে পুড়িয়ে তপ্ত ও লাল করে তুললো। তারপরে সেগুলিকে নিজেদের গায়ে জড়িয়ে এমনভাব দেখালো যেন তীব্র বেদনা বোধ কচ্ছে। আসলে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। আবার মাটিতে একটি লাঠি পুঁতে কোম্পানীর লোকদের প্রশ্ন করলো তাঁরা কি ফল পেতে চান। একজন বলে উঠলেন, 'আম চাই'। তখন জনৈক বাজীকর একখণ্ড কাপড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে মাটিতে পাঁচ ছয়বার নুয়ে পড়লো। আমি কৌতূহলী হয়ে উপর তলায় চলে গেলাম এবং জানালা দিয়ে বাজীকর কি কচ্ছে তা দেখার চেষ্টা করা গেল। মনে হোল যে সে নিজের বগলের নীচে খানিকটা জায়গা ক্ষুর দিয়ে কেটে সেই রক্ত লাঠিটির গায়ে মাখিয়ে দিল। প্রথম দু'বার সে যখন নিজেকে উপরে তুললো, মনে হয়েছিল লাঠিটা বেড়ে

উঠছে। তৃতীয়দফায় ছোট কুঁড়ি সহ ডালপালা জন্মাল। চতুর্থ বারে গাছটি পত্রালি পূর্ণ হোল। পঞ্চম পর্য্যায়ে পুষ্পিত হয়ে উঠলো।

ঐ সময় ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ আমেদাবাদ থেকে ধর্ম্মযাজককে এনেছিলেন ওলন্দাজ সেনাপতির শিশু সন্তানের নাম করণের জন্য। তিনি শিশুটির ধর্ম্মপিতা হতেও রাজী হয়েছিলেন। সেই যাজকটি আপত্তি তুলে বললেন যে কোন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর এই জাতীয় প্রতারণামূলক ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করা তিনি অনুমোদন করেন না। তিনি যখন দেখলেন যে বাজীকরের একটি নীরস কাষ্ঠখণ্ড আধ ঘণ্টারও কম সময়ে চার পাঁচ ফুট দীর্ঘ একটি গাছে পরিণত হয়ে পত্রে পুষ্পে সমৃদ্ধ হোল ঠিক বসন্ত ঋতুর মত, তৎক্ষণাৎ গাছটাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য গেলেন এগিয়ে এবং প্রতিবাদ করে বললেন যে যাঁরা আর একটু সময়ও ঐ ঘটনা দেখবেন, তিনি তাঁদের কাউকেই খৃষ্ট ধর্ম্মীয় ভোজসভায় যোগদানের অনুমতি অবশ্যই দান করবেন না। কাজেই অধ্যক্ষ তখন বাজীকরদের সরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। এরা স্ত্রীপুত্র সংগে নিয়ে সারা দেশময় বিচরণ করে বেদুইনদের মত। এদের দশ কি বার ক্রাউন দিলেই এরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

যাঁরা কাম্বে ভ্রমণে আগ্রহশীল তাঁরা কখনই নিজেদের রাস্তা ছেড়ে পাঁচ ছয় ক্রোশ এর বেশী এগিয়ে যাবেন না। কেউ যদি বরোদা না গিয়ে বারোচে যান, তাহলে সোজাসুজি কাম্বেতে যেতে পারেন। তারপর সেখান থেকে আমেদাবাদে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই হোক্, আর কৌতূহল বশতঃই হোক্ শেষের রাস্তাটি ধরে যাওয়া কখনই সংগত নয়; আর তা কেবল উপসাগরের মোহনা অতিক্রম করায় বিপদ আছে বলেই নয়।

কাম্বের সহরটি বিরাট। যে উপসাগরের মুখে শহরের অবস্থান তার নাম অনুসারেই এর নামকরণ হয়েছে। এখানে ভারতবর্ষ থেকে আনীত সেই মূল্যবান পাথর কেটে কেটে পাত্রাদি, ছুরির হাতল; মালা এবং আরও নানারকম কারুশিল্প সৃষ্টি হয়। সহরের উপকণ্ঠে সরখেজের মতই নীল উৎপন্ন হয়। পর্ত্তুগীজরা যখন ভারতে খুব যাতায়াত করতেন তখন এই জায়গাটি যানবাহন ও চলাচলের সুবিধার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। এখন সমুদ্রতীরে অতি সুন্দর সব বাড়ীঘর দেখা যায়। এগুলিও পর্ত্তুগীজদেরই তৈরী। বাড়ীগুলিতে পর্ত্তুগালের রীতি-সম্পন্ন উচুঁদরের সব আসবাব পত্রও কিছু রয়েছে। এখন সব জনমানবশূন্য। সবই ধ্বংসের পথে। কাম্বেতে

তখন একটা সুনিয়ম চালু ছিল। তা হোল দিনমান গত হওয়ার দু'ঘন্টা পরে প্রতিটি রাস্তার দু'মাথায় দু'টি ফটক তালাবন্ধ করে আটকে দেয়া হোত। আজও সে ফটক দেখা যায়। এখন কেবল সহরের দিকে ধাবিত মুখ্য রাস্তা-গুলিতেই ঐ রকম তালাবন্ধ করার ব্যবস্থা। সহরটি যে আজ ব্যবসা বাণিজ্যের ঐতিহ্য হারিয়েছে তার অন্যতম মুখ্য কারণ হোল আগে সমুদ্রের জল কাম্বে সহর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসতো। ফলে সমস্ত ছোট জাহাজ নৌকো সব এসে সহরের গায়ে নোঙর করতে পারতো। কিন্তু ক্রমশঃ সাগর প্রতিদিন সহর ছেড়ে দূরে চলে যেতে আরম্ভ করলো। জাহাজ আর সহরের উপকূলে পাঁচ ছয় লীগের মধ্যে এসে ভিড়বার সুযোগ পেলনা।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বারোচ, কাম্বে ও বরোদা অঞ্চলে প্রচুর ময়ূর দেখা যায়। শিশু ময়ূরের মাংস সাদা এবং স্বাদ ঠিক আমাদের দেশের ছোট ময়ূরেরই মত। সমস্ত দিন মাঠে মাঠে অগুণতি ময়ূর বিচরণ করে। রাত্রিতে ওরা গাছের ডালে বিশ্রাম নেয়। দিনের বেলায় ওদের কাছে যাওয়া দুরূহ ব্যাপার। যেইমাত্র দেখবে যে কেউ ওদের শিকার করতে উদ্যত তখুনি তিত্তির পাখীর মত দ্রুতগতিতে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে যাবে। সুতরাং কারো পক্ষেই জামাকাপড় আস্ত-রেখে ওদের পেছনে ছোটা সম্ভব নয়। কাজেই রাত্রি ছাড়া ওদের ধরার উপায় নেই। শিকারীরা এজন্যে একটি উপায় উদ্ভাবন করেছে। তা হচ্ছে তারা যখন গাছের কাছে এগোবে তখন এমন একটি পতাকা নিয়ে যাবে যার দু'পিঠেই জীবন্ত ময়ূরের চিত্র থাকে অংকিত। পতাকা মণ্ডিত দণ্ডের মাথায় দু'টি বাতি জ্বলবে। তার উজ্জ্বল আলোতে ময়ূরগুলি বিমুগ্ধ হয়ে ওদিকে গলা বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে। পতাকাদণ্ডের মাথায় ঢিলে ফাঁস দেয়া দড়ি বাঁধা থাকে। যেমনি ময়ূর গলা বাড়িয়ে আসবে শিকারী তখন ফাঁদটি টেনে ওকে আটকে দেবে।

যে অঞ্চলে প্রতিমাপূজক হিন্দু রাজা রাজত্ব করেন সেখানে পশু পাখী শিকার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু মুসলমান শাসকের রাজ্যে কোন বাধা নিষেধ নেই। একবার পারস্য দেশীয় জনৈক ধনী ব্যবসায়ী দন্তিবারের রাজার রাজ্য দিয়ে যাবার সময় রাস্তার ধারে একটি ময়ূরকে মেরে ফেলেন ; কাজটা হয়ত অজ্ঞতা বশতঃই করেছিলেন, কিম্বা হয়তো হঠকারিতাও হতে পারে। বেনিয়া সমাজের লোকেরা এই খবর অবিলম্বে পেয়ে গেলেন। এই প্রাণী হত্যাকে তাঁরা হীনধরনের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করতেন। তাঁরা

বণিককে আটক করে তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পদ যা প্রায় তিন লাখ টাকার মত ছিল সব কেড়ে নিলেন। উপরন্তু তাঁকে একটা গাছের সংগে বেঁধে তিনদিন একাদিক্রমে এমন ভয়ংকর ভাবে প্রহার করেছিলেন যে তাতেই লোকটির মৃত্যু ঘটে।

কাম্বে থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ছোট একটি গ্রামে একটি মন্দির আছে সেখানে ভারতের সমস্ত পতিতা নারীরা আসেন পূজা অর্ঘ্য দান করতে। মন্দিরটি প্রচুর নগ্ন মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। বাকি মূর্ত্তি প্রতিমার মধ্যে একখানি বিরাট মূর্ত্তি আছে যেটি দেখতে ঠিক অ্যাপোলোর মত। এ মূর্ত্তির নিম্নাংগ অনাবৃত। বয়োবৃদ্ধা পতিতাগণ যৌবনে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করে কিছু দাসী পরিচারিকা ক্রয় করেন। ওদের আবার নৃত্যবিদ্যা ও অরুচিকর সব সংগীত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া তাদের ঘৃণ্য জীবিকার উপযোগী সমস্ত রহস্যময় কলাকৌশল সম্বন্ধেও নির্দ্দেশ উপদেশ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রীত-দাসীদের বয়স এগার বার বছর হলেই কর্ত্রীরা ওদের এই মন্দিরে পাঠিয়ে দেন এই বিশ্বাসে যে ওখানকার দেবমূর্ত্তির কাছে ওরা উৎসর্গীকৃত হলে ওদের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

এই মন্দির ও সৈয়দাবাদের মধ্যে ব্যবধান ছয় ক্রোশ। মুঘল সম্রাটের গৃহাবাস মধ্যে এটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এর চারদিক ঘিরে রয়েছে প্রশস্ত প্রাচীর শ্রেণী। অভ্যন্তরে বিরাট উদ্যান, সুবৃহৎ সরোবর এবং আরও সব আনন্দ দায়ক ও কৌতূহলকর জিনিস রয়েছে যা ভারতীয়দের শক্তি প্রতিভায় সৃষ্টি করা সম্ভব।

সৈয়দাবাদ থেকে আমেদাবাদ পাঁচ ক্রোশ দূরে। সুতরাং আমি বারোচে ফিরলাম সাধারণ রাস্তা ধরে। বারোচ থেকে বরোদা ও নাদিয়াদ হয়ে গেলাম আমেদাবাদে। বরোদা উর্ব্বরা ভূমির উপরে একটি বড় সহর। ওখানে সূতি বস্ত্রের ব্যবসা খুব বিরাট।

আমেদাবাদ ভারতবর্ষের বৃহত্তম সহর গুলির একটি। ওখানে রেশমী কাপড়, সোনারূপার কারুকার্য্য মণ্ডিত পর্দা, ঝালর এবং অন্যান্য মিশ্রিত ধরনের রেশমের ব্যবসা খুব চলে। এছাড়া শোরা (যব ক্ষার), চিনি, আদা (কাঁচা ও শুকনো) তেঁতুল, হরিতকী এবং মিহি নীলের ব্যবসাও বিশেষভাবে চলছে।

আমেদাবাদের অনতিদূরে সরখেজ নামে একটি বড় সহরে এই নীল তৈরী

হয়। এখানে একটি মন্দির ছিল। মুসলমানরা সেটিকে ধূলিসাৎ করে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছে। মসজিদে প্রবেশের আগে তিনটি বিরাট বিরাট অঙ্গন অতিক্রম করতে হয়। চত্বরগুলি শ্বেত পাথরে বাঁধানো; চত্বরের চারদিক ঘিরে রয়েছে সুদীর্ঘ দালানের বহর। তৃতীয় প্রাঙ্গনে পৌঁছোবার মুখে পায়ের জুতো খুলে রাখতে হয়। মসজিদের অভ্যন্তর নানারকম মোজাইকের অলঙ্করণে সুশোভিত নানা মূল্যবান প্রস্তর খণ্ডেও তা অলংকৃত। প্রস্তররাজি সংগৃহীত হয়েছে কাম্বের পর্ব্বতমালা থেকে। ওখানে যেতে দুদিন সময় দরকার হয়।

এখানে প্রাচীন হিন্দুরাজাদেরও কয়েকটি সমাধি আছে। দেখতে ঠিক ছোট গীর্জা বা মন্দিরের মত। এই সমাধি সৌধগুলিতেও মোজাইকের কাজ ও খিলান যুক্ত ছাদ রয়েছে। আমেদাবাদের উত্তর পশ্চিম দিক ধরে একটি নদী প্রবহমান। বর্ষার তিন চার মাস নদীটি অত্যন্ত স্ফীত ও খরস্রোতা হয়ে প্রতি বছর নানা দুর্ঘটনা ঘটায়। ভারতের অন্যান্য নদীর মতই এর অবস্থা। বৃষ্টিপাতের পরে আমেদাবাদের নদী পদব্রজে পার হতে হলে দেড় কি দু'মাস অপেক্ষা করতে হবে। কেননা নদীগুলিতে কোন সেতু নেই। দু'তিন খানি করে নৌকো থাকে বটে, কিন্তু তা দিয়ে কোন কাজ হয়না। নদীতে যখন প্রবল স্রোত থাকে তখন জল নীচে নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতেই হবে। তবে এদেশের লোকেরা ততদিন অপেক্ষা করেন না। তারা একটির পর আর একটি নদী পার হন কেবলমাত্র একটি ছাগ চর্মের উপর নির্ভর করে। চামড়ার থলিতে হাওয়া পুরে ফুলিয়ে নিজেদের পেটের সংগে সেটাকে বেঁধে নেন। এই ভাবেই দরিদ্র স্ত্রী পুরুষেরা নদী পারাপার করে। ছোট শিশু সন্তান সংগে থাকলে তাকে একটি গোলাকার মৃৎপাত্রের মধ্যে বসিয়ে নিজেদের সামনে জলে ভাসিয়ে দেয়। সংগে সংগে পাত্রটি ভেসে চলতে থাকে শিশুটিকে নিয়ে। হাঁড়িগুলির মুখ বিশেষ বড় হয় না। ১৬৪২ সালে আমি যখন আমেদাবাদে গিয়েছিলাম, তখন এমন একটি ঘটনা নজরে পড়েছিল যা ভুলবার নয়।

আমি যে বর্ণনা দিলাম ঠিক সেইভাবে এক গ্রাম্য পুরুষ সস্ত্রীক নদী পার হয়েছিল। সংগে ছিল তাদের দু'বছর বয়সের শিশু সন্তান। তারা শিশুটিকে ঐরকম একটি হাঁড়ির মধ্যে বসিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। শিশুটির কেবল মাথাটিই দেখা যেত। মাঝ নদীতে গিয়ে তারা একটি বালির চড়ায় গিয়ে পড়লো। সেই চড়ায় পড়েছিল বড় একটি গাছ। গাছটি জলস্রোতে ভেসে

এসেই চড়ায় ঠেকেছিল। শিশুটির পিতা পাত্রটিকে সেদিকে ঠেলে দিলেন নিজে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে। লোকটি গাছের কাছে এগিয়ে যেতেই, গাছের গুঁড়িটা অবশ্য জলের কিছু উপরেই ছিল, গাছের শিকরের মধ্যে থেকে একটি সাপ বেরিয়ে শিশুবাহী সেই পাত্রের মধ্যে গিয়ে পড়লো। এই ব্যাপার দেখে শিশুর পিতামাতা ভয় পেয়ে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লো। তারপরে তারা পাত্রটিকে আবার ঠেলে ভাসিয়ে দিল স্রোতের টানে যেখানে হোক গিয়ে পৌঁছোবে। নিজেরা মৃতবৎ সেই গাছের নীচে রইলো পড়ে।

তার প্রায় দুই লীগ দূরে একজন বেনিয়া ও তাঁর স্ত্রী একটি শিশুসহ নদীতে স্নান কচ্ছিলেন। তাঁরা দূরে সেই শিশুবাহী হাঁড়িটিকে দেখতে পেলেন; আরও দেখলেন শিশুর উন্মুক্ত মাথাটিকে। বেনিয়া ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ জলে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললেন শিশুটিকে উদ্ধার করার জন্যে। অবশেষে হাঁড়িটিকে ধরে তীরের দিকে ঠেলে দিলেন; আর তাঁর স্ত্রী নিজের ছেলেকে সংগে নিয়ে হাঁড়িতে আবদ্ধ শিশুকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ সাপটি হাঁড়িস্থিত শিশুর কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু এবারে নাড়া পেয়ে সাপটি দ্রুত বেরিয়ে এসে সেই মহিলার কোমর বেষ্টন করে তাঁর কোলের শিশুকে কামড়ে বিষ ঢেলে দিল। আর তখুনি ছেলেটির মৃত্যু ঘটলো।

দুর্ঘটনাটি যতই মর্ম্মান্তিক ও অস্বাভাবিক হোক না কেন এই জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিরা তাতে ব্যতিব্যস্ত হন না। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের দেবতার গোপন বিধানেই এসব ঘটে। দেবতা তাঁদের একটি সন্তান নিয়েছেন, তার পরিবর্ত্তে আর একটি দান করবেন। এই ধারণা পোষন করে তাঁরা আপাততঃ শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেন।

কিছুকাল পরে এই দুর্ঘটনার সংবাদ হাঁড়িতে ভাসমান শিশুর পিতার কানে পৌঁছোয়। সে তখন বেনিয়া ভদ্রলোকটির কাছে গিয়ে মূলতঃ কি ঘটেছিল তা বর্ণনা করে নিজের সন্তানটিকে দাবী করেন। বেনিয়া তদুত্তরে বলেছিলেন যে হাঁড়িতে প্রাপ্ত শিশুটি তাঁরই। কারণ ভগবান তাঁর নিজেরটিকে কেড়ে নিয়ে তার পরিবর্ত্তে এটিকে পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা শেষে এত জটিল হয়ে উঠলো যে উভয়কে রাজার কাছে হাজির হতে হোল মীমাংসার জন্য। তিনি হুকুম দিলেন শিশুর প্রকৃত পিতার কাছে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হোক।

ঐ সময়েই আমেদাবাদ সহরে আর একটি খুব মজাদার ঘটনা, দুর্ঘটনাও বলা চলে, ঘটেছিল। শান্তিদাস নামে জনৈক ধনী বেনিয়ার স্ত্রীর কোন সন্তান

জন্ম গ্রহণ করেনি। তাঁর সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ দেখে এক গৃহভৃত্য একদিন নিভৃতে তাঁকে বললো যে সে এমন একটি জিনিস তাঁকে খেতে দেবে যার ফলে সন্তান লাভ হতে পারে। মহিলাটি জানতে চাইলেন কি বস্তু খেতে হবে। ভৃত্য জানালো ছোট মাছ খেতে হবে এবং সংখ্যায় তিনচারটি। বেনিয়া সমাজের ধর্ম্ম অনুসারে কোন জীবন্ত প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কাজেই মহিলাটি সে প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হতে পারেননি। ভৃত্য আবার বললো যে সে এমন ব্যবস্থা করবে যাতে তিনি অনুভব করতেই পারবেন না কি খেলেন। তখন মহিলাটি ভৃত্যের প্রস্তাব গ্রহণ করে সন্তান লাভের চেষ্টা করলেন। কিছুকাল পরে তিনি দেহে কিছু পরিবর্ত্তন অনুভব করলেন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর স্বামী বিয়োগ হয়। আর জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা সম্পত্তি লাভের চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন। বিধবা স্ত্রীলোকটি আপত্তি তুলে বললেন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয় সম্পত্তির কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। জ্ঞাতিবর্গ এই কথা শুনে বিস্মিত হলেন। কারণ ঘটনাটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাঁদের মনে হোল তা মিথ্যা চাতুরী বা বিদ্রূপ। মহিলাটির বিবাহিত জীবন পনের ষোল বছর কেটেছে, কখনও সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। তাই জ্ঞাতিদের চেষ্টা অব্যাহতই রইল। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে প্রদেশপালের শরণ নিলেন। তিনি হুকুম দিলেন স্ত্রীলোকটির সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞাতিদের অপেক্ষা করতে হবে। কিছুদিন পরেই তাঁর একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো কিন্তু মৃত বণিকের জ্ঞাতিরা এত অর্থ লোলুপ ছিলেন যে তাঁরা নবজাত শিশুর বৈধতা অস্বীকার করলেন। প্রদেশপাল জ্ঞাতি শত্রুদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে চিকিৎসক ডাকলেন এবং তাঁকে বললেন শিশুটিকে স্নানাগারে নিয়ে পরীক্ষা করতে। শিশুর মা সেই ঔষধ খাওয়ার ফলেই যদি ওর-জন্ম হয়ে থাকে তাহলে শরীর থেকে মাছের গন্ধ পাওয়া যাবে। চিকিৎসক মাছের গন্ধ পেলেন। তখন প্রদেশপাল রায় দিলেন বণিকের বিষয় সম্পদের প্রকৃত মালিক এই শিশু। কিন্তু জ্ঞাতিরা নিরস্ত হলেন না। বিঘ্ন সৃষ্টি করেই চললেন। কেননা এত বড় একটা সম্পত্তি হাত ছাড়া করা যায় না। তখন মহিলা সম্রাটের কাছে আবেদন করলেন। হুকুম এলো শিশু সন্তানসহ স্ত্রী লোকটিকে সম্রাটের কাছে হাজির হতে হবে। তাঁর সামনে পুনরায় শিশুকে পরীক্ষা করাতে চান। এবারেও মহিলার অনুকূলেই পরীক্ষক রায় দিলেন। সম্পত্তি হস্তান্তরিত হোল না।

আমি আরও একটি রমণীয় কাহিনী বর্ণনা করতে পারি। এটিও শুনেছিলাম আমেদাবাদে। ওখানে আমি দশবারো বার গিয়েছি। এমন একজন ব্যবসায়ীর সংগে কাজকারবার চালাতাম যিনি ছিলেন ওখানকার শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা-খানের অত্যন্ত পিয় পাত্র। শায়েস্তা খান ছিলেন মুঘল সম্রাটের মাতুল। ব্যবসায়ীটির খ্যাতি ছিল যে তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। শায়েস্তা খানের শাসনকাল তিন বছর হলে মুঘল আইন অনুসারে তাঁকে এই পদ ত্যাগ করে রাজধানীতে ফিরে যেতে হয়। ওখানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন সম্রাট তনয় ঔরংজেব। একদা রাজধানীতে সম্রাট ও শায়েস্তা খানের মধ্যে আলাপ আলোচনা কালে খান সাহেব বললেন তাঁর (সম্রাটের) অনুগ্রহে আমেদা-বাদের শাসন ভার লাভ করে তিনি অনেক আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত জিনিস দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর হোল জনৈক ব্যবসায়ী সত্তরাধিক বয়সের জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নি। এ কথা শুনে সম্রাট অত্যধিক বিস্মিত হয়েসেই লোকটিকে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আরও বললেন তাঁকে আগ্রায় আনার জন্য লোক পাঠানো হোক। সম্রাটের হুকুম তামিল করলেন খান সাহেব। সেই বৃদ্ধ বণিক বড়ই বিপদে পড়ে গেলেন। একেতো পঁচিশ ত্রিশ দিনের পথ যাত্রা দ্বিতীয়তঃ সম্রাটের জন্য উপঢৌকন নেয়া প্রয়োজন। অতএব অল্পের মধ্যে একটি পানের কৌটো সংগ্রহ করলেন চল্লিশহাজার টাকাতে। তার গায়ে খচিত ছিল হীরা, পদ্মরাগ ও মরকত মণি। তিনি সম্রাটের দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে উপহারটি প্রদান করতে সম্রাট তাঁর নাম জানতে চাইলেন। উত্তরে বণিক বললেন যে তিনি এমন একজন লোককে আমন্ত্রণ করেছেন যিনি জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন নি। সম্রাট আবার তাঁর পিতার নাম জিজ্ঞেস করলেন। এবারে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, আমি বলতে পারিনা। মহামান্য সম্রাট তাতেই খুশী হয়ে নিরস্ত হলেন। বৃদ্ধকে আর বিব্রত না করে তাঁকে একটি হাতী উপহার দানের ব্যবস্থা করে দিলেন। হাতী উপহার লাভ একটি চূড়ান্ত সম্মানের বিষয়। তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যয় বাবদ সম্রাট তাঁকে আরও দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন।

বেনিয়া সমাজের বাঁদরের প্রতি অগাধ ভক্তি। তাঁদের মঠে মন্দিরে অনেক সময় বাঁদর লালিত পালিত হয়। আমেদাবাদে পশু হাসপাতালের জন্য তিন চারিটি বাড়ী আছে। সেখানে গাভী, বৃষ, বাঁদর এবং আরও

অন্যান্য সব জীব জন্তুর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলে। যেখানে যত পীড়িত ও অঙ্গহীন ও পঙ্গু পশু প্রাণী দেখা যায় তাদের বহন করে এখানে এনে চিকিৎসা ও সেবা করা হয়। আর একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে আমেদাবাদের আশে পাশে সব জায়গা থেকে গ্রীষ্মকালে সমস্ত বাঁদর চলে আসে সহরে। বাড়ী ঘরের ছাদে ওরা শুয়ে থাকে। তখন গেরস্থরা তাঁদের বাড়ীর ছাদে, খোলা বারান্দায় চাল, বাজরা, ইক্ষু প্রভৃতি ছড়িয়ে রাখে ওদের খাদ্য হিসেবে। এই ভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা না করলে কপিকুল মিলিত হয়ে গেরস্থের বাড়ীর টালির চালা ভেঙ্গে চুড়ে একাকার করে দেবে। আরও কত যে উৎপাত করবে তা বলার নয়। আর ও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। বাঁদররা কখনও কোন জিনিসের গন্ধ না শুঁকে এবং যার গন্ধ ভাল লাগবে না এমন কিছু খাদ্য হিসেবে মুখে তুলে দেবে না। আর ভবিষ্যতের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য সঞ্চয় রেখে তবে উপস্থিত খাদ্য চিবিয়ে খাবে।

আমি একটু আগেই বাঁদরের প্রতি বেনিয়া সমাজের অগাধ ভক্তির কথা বলেছি। এই বিষয়ে আমার জানা অনেক ঘটনার মধ্যে এখানে একটি বর্ণনা কচ্ছি। একবার আমেদাবাদে গিয়ে আমি ওলন্দাজ কুঠীতে ছিলাম। সেই সময় হল্যাণ্ড থেকে একটি যুবক সদ্য এসেছেন ওলন্দাজ কুঠীতে কর্ম্মরত হয়ে। একদিন তিনি কুঠী বাড়ীর উঠোনের পাশে একটি গাছে দেখলেন বিশালাকার এক হনুমান বসে আছে। ওটিকে দেখেই যুবকের তারুণ্যের উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেল। আর অবিলম্বে বন্দুক চালিয়ে হনুমানের ইহলীলা সম্বরণ করালেন। আমি সে সময়ে ওলন্দাজ সেনাপতির টেবিলে বসে ছিলাম। বন্দুকের শব্দ আমাদের কানে পৌঁছোবার সংগে সংগেই বেনিয়া সমাজের লোকদের উচ্চ চীৎকার শুনতে পেলাম। তারা এসেছেন সেই বাঁদর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ডাচ কোম্পানীর কাছে অভিযোগ পেশ করতে। সেনাপতিকে সেদিন অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হোল। নানা ভাবে বেনিয়া সমাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তাদের শান্ত করে তবে ওখানে অবস্থানের অনুমতি পেলেন।

আমেদাবাদের কাছাকাছি অন্যান্য স্থানের প্রচুর বাঁদর দেখা যায়। একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে যেখানে বাঁদরের সংখ্যা বেশী সেখানে কাক দেখা যায় না। কারণ কাক পক্ষীরা গাছে বাসা বেঁধে ডিম পাড়লেই বাঁদর এসে ডিম মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একবার আগ্রা থেকে ফিরে আমেদাবাদ হয়ে চলেছি সুরাটের দিকে। আমার সংগে ছিলেন ইংরেজ কুঠীর অধিকর্ত্তা

তিনি আমেদাবাদে এসেছিলেন ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু কাজে। আমেদাবাদ থেকে চার পাঁচ লীগ দূরে সুরাটের রাস্তায় আমাদের একটি আমের বাগান অতিক্রম করতে হয়। সেখানে অনেক অতিকায় স্ত্রী ও পুরুষ বাঁদরের ভিড় দেখা গেল। স্ত্রী বাঁদরগুলির বাহুতে ছিল আবার ছোট শিশু বাঁদর। আমাদের দু'জনার গাড়ী ছিল আলাদা। ইংরেজ কুঠীর কর্ত্তাব্যক্তি গাড়ী থামিয়ে আমাকে বললেন যে তার সংগে চমৎকার ও বেশ পরিচ্ছন্ন একটি হাত বন্দুক আছে। ওটি তাকে উপহার দিয়েছেন দামনের শাসনকর্ত্তা। অধ্যক্ষ সাহেবের জানা ছিল যে গুলী ছুঁড়তে আমি খুব ওস্তাদ। তাই তাঁর ইচ্ছে হোল .আমি বাঁদরগুলিকে লক্ষ্য করে বন্দুকটি একটু চালাই। আমার ভৃত্যদের মধ্যে একটি ছিল ভারতীয়। সে আমাকে এই কাজে নিরস্ত-হতে অনুরোধ করেছিল। আমিও অধ্যক্ষ কে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তা সম্ভব হোলনা। সুতরাং বন্দুকটি চালিয়ে আমি একটি স্ত্রী বাঁদরকে হত্যা করলাম। বাঁদরের দেহ গাছের ডালে পড়লো এলিয়ে। কোলের বাচ্চাটি গেল মাটিতে পড়ে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত কপির দল সংখ্যায় প্রায় ষাট, গাছ থেকে নেমে এল অত্যন্ত ক্ষিপ্ত অবস্থায়। আর অধ্যক্ষের গাড়ীর উপরে সব ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। ওরা হয়ত তাঁকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলতো, যদি না আমরা দ্রুত গাড়ীর জানালাগুলি বন্ধ করতে না পারতাম। তাছাড়া আমাদের সংগে অনেক ভৃত্য অনুচর থাকায়ও সুবিধে হয়েছিল। তা নাহলে ওদের তাড়ানো খুব কঠিন হোত। বাঁদরগুলি আমার গাড়ীর কাছে না এলেও আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় এক লীগ আন্দাজ রাস্তা ওরা অধ্যক্ষের গাড়ীকে অনুসরণ করেছিল। বাঁদরগুলি ছিল অত্যন্ত সবল ও বলিষ্ঠ।

এবারে সুরাট থেকে আগ্রার দিকে চলেছি। কয়েক ক্রোশ পরে চিৎপুর নামে ভাল একটি সহর। সহরটির এই নামের কারণ হচ্ছে ওখানে ছিট্ কাপড় নামে এক প্রকার ছাপানো সূতী কাপড়ের ব্যবসা চলে খুব বেশী। এই সহরের কাছে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ ক্ষেপ (এক ক্ষেপ ২½ ফুট আন্দাজ) দক্ষিণে একটি নদী আছে। আমার এক ভ্রমণ যাত্রায় চিৎপুরে পৌঁছে সহরের কাছেই একটি বিস্তৃত ও উন্মুক্ত স্থানের কিনারায় দু'তিনটি গাছের নীচে আমার তাঁবু খাটিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি চার পাঁচটি সিংহের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে। পশুরাজ ক'টিকে ওখানে আনা হয়েছিল পোষ মানানোর

জন্য। রক্ষকরা বললেন এগুলিকে পোষ মানাতে পাঁচ ছয় মাস সময় লাগে। পশুগুলিকে রাখার ও চালনার বিশেষ রীতি পদ্ধতি আছে। একটি সিংহ থেকে আর একটিকে বার পদক্ষেপ মত দূরে রাখা হয়। ওদের পেছনের পায়ে দড়ি বাঁধা থাকে। দড়িটিকে বাঁধা হয় মাটিতে বড় একটি কাঠের খুঁটি পুঁতে তার সংগে। তাছাড়া ওদের গলায়ও দড়ি বেঁধে রক্ষক নিজের হাতে ধরে থাকেন। সমস্ত খুঁটি গুলিকে এক সারিতে পোতা হয়। ওগুলির মাঝামাঝি খালি জায়গাতেও রশি টানা দেয়া থাকে। সিংহগুলি তার মধ্যেই শরীর নাড়াচাড়া করতে পারে পশুর পেছনের পায়ে দড়ি বাঁধার কারণ হোল ওরা ইচ্ছে মত সেই দড়ির দৈর্ঘ্য অনুসারে লাফ ঝাঁপ দিতে পারে। এই রকম দীর্ঘ রশি ব্যবহার করার আরও একটি কারণ আছে। অনেকে সিংহগুলিকে ঢিল ছুঁড়ে ও অন্য নানা প্রকারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করে তোলে। তারা দড়ির দৈর্ঘ্যের জন্য বেশী এগিয়ে যেতে পারে না। জনসাধারণ সিংহগুলিকে দেখার জন্য অনবরতই ভিড় জমায়। তারা পশুগুলিকে উত্যক্ত করলে ওরা লাফ ঝাঁপ দিতে থাকে। সেই সময় রক্ষকরা সিংহের গলায় বাঁধা দড়িটি ধরে পেছনে টেনে রাখে। এই করে ক্রমান্বয়ে সিংহকে পোষ মানানো হয়। আমি চিৎপুরে গিয়ে গাড়ীর মধ্যে বসেই সেই কৌতূহলকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি।

পরের দিন আমার দেখা হয়েছিল একদল ফকির বা মুসলমান দরবেশের সংগে। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সাতান্ন। এঁদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান বুলাকীকে শাহাজাহানের আদেশে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হোল, তখন ইনি রাজদরবার ত্যাগ করেন। আরও চারজন দরবেশ এই মুখ্য ব্যক্তির পরে স্থান পেতেন। ইনি দরবার ত্যাগ করলে তাঁরা দলের নেতা হন। এঁরা শাহজাহানের দরবারে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পাঁচ জন দরবেশ যা কাপড় চোপর ব্যবহার করতেন তার মাপ হোল মাত্র চার এল্। তা কমলা রংএর সূতী কাপড়। তার দ্বারা কোন রকমে লজ্জা নিবারণ হোত। এঁরা প্রত্যেকেই চিবুকের নিচে দিয়ে কাঁধের সংগে একখণ্ড ব্যাঘ্র চর্ম বেঁধে রাখেন। এঁদের সামনে আটটি সুন্দর ঘোড়া থাকে জীনশুদ্ধ। তিনটি ঘোড়ার বল্গা স্বর্ণময়। জীনগুলিও সোনার পাতে মোড়া। বাকি পাঁচটির জীন, বল্গা সব রূপার। প্রত্যেকটির পিঠের উপরে একটি করে চিতা বাঘের চামড়া ছড়ানো। অন্যান্য ফকিরদের কোমরে একটি দড়ি বাঁধা।

তার সংগে একখণ্ড কাপড় ঝুলিয়ে তাঁরা পরিধেয়র কাজ চালান। তাঁদের কেশ দাম পাগড়ীর মত করে মাথায় জড়ানো। সকলেই সশস্ত্র। অধিকাংশের হাতেই তীর ধনুক। কতকের হাতে বন্দুক জাতীয় কিছু; কারোর হাতে ছোট আকারের বল্লম ও অন্য প্রকার অস্ত্র যা ইউরোপে দেখা যায় না। এ জিনিস হচ্ছে একখণ্ড খুব ধারালো লোহার পাত। দেখতে ঠিক বারকোষের কানার মত। এই লম্বা লোহার পাতকে তাঁরা গলায় জড়িয়ে রাখতেন। যখনই ব্যবহার করার দরকার হোত, টেনে বের করে ফেলতেন। জোরে ছুঁড়ে মারলে তীরের মত ছুটে গিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন মানুষকে দুই খণ্ড করে দিতে পারতো। এঁদের সকলের হাতেই একটি করে শিঙ্গা থাকে। কোন নতুন জায়গায় পৌঁছে বা স্থান ত্যাগের সময় তাঁরা ঐ শিঙ্গাতে অদ্ভুত ধ্বনি সৃষ্টি করেন। আর একটি জিনিস তাঁদের সংগে থাকে। তা' হচ্ছে উকোজাতীয় একটি লৌহ যন্ত্র যার গড়ন কর্ণিকের মত। ভারতীয়রা এই রকম কর্ণিক যাত্রা পথে সংগে রাখেন বিশ্রাম স্থল পরিষ্কার করার জন্য। বিশ্রাম স্থলের ঘাস ধূলা বালি তুলে স্তূপীকৃত করে বালিশ তোষকের পরিবর্ত্তে তাই রাত্রিতে শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। দলের কতক লোক লম্বা 'টাক্' দ্বারা সজ্জিত ছিলেন।

সেগুলি ইংরেজ বা পর্তুগীজদের কাছ থেকে সংগৃহীত। দরবেশগণের সংগে চারটি সিন্দুক ছিল পারসীক ও আরবী পুস্তকে পূর্ণ। কয়েকটি বাক্সে ছিল রান্নাবান্নার জিনিসপত্র। দলভুক্ত পীড়িত ব্যক্তিদের বহনকরার জন্য দশ বারটি বৃষ থাকে এঁদের সংগে। দরবেশগণ আমার গাড়ীর কাছে এসে পৌঁছে আমার সংগে যত লোকজন, তাদের মধ্যে কিছু আবার ভারতীয় দেখে জানতে চাইলেন আমরা কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছি। আমি যে স্থানটিতে ছিলাম, তাঁরা চাইলেন, আমি তা তাঁদের ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাই। কারণ দরবেশদল ও তাঁদের প্রধান পুরুষের পক্ষে ঐ জায়গাটি বিশেষ উপযুক্ত ও সুবিধাজনক ছিল। তারা দলপতি ও বাকী চারজন শ্রেষ্ঠ দরবেশের গুণমাহাত্ম্য বর্ণনা করে আমাকে শিষ্টাচার সৌজন্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করলেন। আমি জায়গাটি ছেড়ে দিলাম।

তাঁরা স্থানটিতে উত্তমরূপে জল ঢেলে ধূলাবালি সব বসিয়ে নিলেন। তারপরে দুটি অগ্নিকুণ্ড জ্বালালেন। মনে হোল প্রধান পাঁচজন যেন বরফ ও তুষারে আচ্ছন্ন কোন দেশে রয়েছেন। তাঁরা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে দেহের সম্মুখভাগ ও পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত ও মার্জনা করলেন। সেই সন্ধ্যায়ই

তাঁদের সান্ধ্যভোজন শেষ হতে সহরের শাসনকর্ত্তা ওখানে এলেন প্রধান দরবেশকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। তারপরে এঁরা যতদিন সেখানে ছিলেন ততদিনই নগরপাল তাঁদের প্রয়োজনীয় চাল ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু পাঠিয়ে দিতেন। এঁরা নানাস্থানে গিয়ে দলপতির নির্দ্দেশে সহরে ও গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষা করে বেড়ান। ভিক্ষায় যা পাওয়া যায় তাই-ই সকলে সমভাবে বণ্টন করে গ্রহণ করেন। প্রত্যেককেই নিজের জন্য আলাদা ভাত রান্না করে নিতে হয়। যদি কোন দিন খাদ্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তা দিবাবসানে দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করে দেবার নিয়ম। পরের দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় রাখা নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ।

চিৎপুর থেকে পালনপুর ও দন্তওয়ারা হয়ে বারগানৃত্। শেষোক্ত স্থানটি জনৈক রাজার রাজ্যাধীন। আমাকে একবার আগ্রা যাত্রাকালে বারগানৃতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। রাজার সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তবে তাঁর প্রতিনিধি অর্থাৎ সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের সংগে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার সংগে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছেন। তিনি আমাকে চাল, ঘি ও সেই সময়কার ফল সব উপহার পাঠিয়েছিলেন। আমি প্রতিদানে তাঁকে দিয়েছিলাম সোনারূপার কাজকরা তিনটি সরু কোমরবন্ধ, চারখানি ‍ঃপাদার লিনেন কাপড়ের রুমাল, এক বোতল বলকারী পানীয় এবং আর এক বোতল স্পেনদেশীয় সুরা। আমার যাত্রাকালে তিনি কুড়িটি অশ্বের এক বাহিনী পাঠিয়ে ছিলেন চার পাঁচ লীগ রাস্তা এগিয়ে দেবার জন্য।

একদিন সন্ধ্যাসমাগমে আমি বারগানৃতের রাজার রাজ্য-সীমান্তে তাঁবু খাটাতে যাচ্ছি তখন আমার সংগীরা আমাকে বললেন যে আমরা যদি এই রাজ্য মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলি তাহলে খুনে-ডাকাতদের মধ্যে গিয়ে পড়বো। কারণ ওখানকার রাজা ডাকাতির উপর নির্ভর করেই প্রায় চলেন। সুতরাং আমি যদি শতাধিক এদেশীয় লোকলস্কর সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে ডাকাত ও লুটেরাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রথমে আমি তাদের সংগে তর্কবিতর্ক করেছি, তাদের ভীতির জন্য তিরস্কার করেছি। অবশেষে আমারও মনে আশংকা জন্মাল এবং আমার একগুঁয়েমির জন্য মাশুল দিতে না হয় এইভাবে আরও পঞ্চাশজন লোক সংগ্রহ করে তিন-দিনের জন্য নিযুক্ত করতে নির্দ্দেশ দিলাম, যাতে নির্বিঘ্নে ঐ রাজ্যটি পেরিয়ে

যেতে পারি। এই সময় তারা জনপিছু তিনদিনে চার টাকা করে দাবী করলো। অথচ অন্য সময়ে তারা এক মাসে চার টাকা মজুরী পায়। পরদিন যাত্রা শুরু হবে এমন সময় আমার রক্ষীরা এসে বললো যে তারা আমার কাজ আর করবে না। এই কাজে তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। তারা আমাকে আরও অনুরোধ জানালে যে আমি যেন আগ্রায় তাদের নেতাকে এ কথা না জানাই যে ওরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কাজ ছেড়ে চলে গেল। আমার কাছে সেই নেতারই জবাবদিহি করার কথা। ওদের দেখে আমার তিন ভৃত্যও ঠিক একই প্রস্তাব পেশ করলো। সুতরাং আমার সংগে আর বিশেষ কেউ রইলো না। একটি ঘোড়ার সহিস, গাড়ীর চালক ও তিনটি ভৃত্য মাত্র রইল। এখন একমাত্র ভগবান ভরসা। এইভাবে একলীগ আন্দাজ রাস্তা চলার পরে আমি অনুভব করলাম আমার সংগীদের কয়েকজন যেন আমার পেছনে এগিয়ে আসছে। সুতরাং আমি গাড়ী থামিয়ে একটু অপেক্ষা করলাম।

অবশেষে তারা আমার কাছে এগিয়ে এল। বললাম, যদি আমার সংগে যেতে ইচ্ছে থাকে তবে এগিয়ে চলুক। কিন্তু তাদের ভয় কাটেনি, যাবার তেমন ইচ্ছে আগ্রহও ছিল না। আমি তখন তাদের নিজ নিজ কাজে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললাম এই জাতীয় ভীরু লোকের প্রয়োজন আমার নেই। ওখান থেকে আরও প্রায় এক লীগ রাস্তা চলার পরে দেখা গেল যে একটা খাড়া পাহাড়ের কিনারায় পঞ্চাশ ষাটটি ঘোড়া। চারটি অশ্বারোহী আবার আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। তাদের স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আমি গাড়ী থেকে নামলাম। আমার সংগে তেরটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তার থেকে কয়েকটি ছোট বন্দুক নিয়ে সংগীদের সকলকে দিলাম। ইতিমধ্যে অশ্বারোহীরাও আমার কাছে এসে পৌঁছোলেন। আমি আমার গাড়ীটিকে তাঁদের ও আমার মাঝখানে রেখে বন্দুক এমনভাবে প্রস্তুত রাখলাম যে আক্রমণ হলেই পাল্টা জবাব দিতে পারবো।

কিন্তু তাঁরা ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। রাজা শিকারে বেরিয়েছেন। তিনি কেবল জানতে চান যে তাঁর রাজ্যমধ্য দিয়ে বিদেশী কে যাচ্ছেন। আমি জানালাম যে সেই ফিরিঙ্গি যাচ্ছেন যিনি পাঁচ কি ছয় সপ্তাহ আগে এখান থেকে গিয়েছিলেন। যে সেনানায়ককে আমি বলকারী পানীয় ও স্পেনীয় সুরা উপহার দিয়েছিলাম, সৌভাগ্যবশতঃ

তিনি এই চার অশ্বারোহীর পশ্চাতে ছিলেন। আবার এইভাবে আমার সংগে দেখা হওয়াতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমার সংগে আর মদ্য আছে কিনা। আমি মদ্য সংগে না নিয়ে ভ্রমণ করি না—এ কথা জানিয়ে দিলাম। তাছাড়া ইংরেজ ও ওলন্দাজ বন্ধুরা আমাকে আগ্রাতে যে অনেক বোতল সুরা উপহার দিয়েছিলেন, তাও আমার সংগে ছিল। সেনাধ্যক্ষ রাজার কাছে ফিরে যেতেই তিনিও আমার কাছে এলেন। আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। আমি যে জায়গাটিতে ছিলাম তার থেকে প্রায় দেড় লীগ দূরে একটি ছায়াশীতল স্থানে তিনি আমাকে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন।

সন্ধ্যাবেলায় রাজাসাহেব আবার এলেন। আমরা দু'জনে দু'দিন একত্রে থেকে খুব আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। রাজার সংগে ছিল কয়েকটি সুর-জাতীয় নর্ত্তক-নর্ত্তকী। এদের ছাড়া ভারতীয় ও পারসীকরা আনন্দ উৎসব করে তৃপ্তিলাভ করেন না। আমার যাত্রা আবার শুরু হওয়ার মুখে রাজা আমাকে দু'শ' অশ্ব দিলেন তাঁর রাজ্যসীমার শেষপ্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্য। তাতে তিনদিন সময় দরকার হয়। এইজন্য আমি অশ্বচালকদের মাত্র তিন কি চার পাউণ্ড তামাক উপহার দিয়েছিলুম। এই করে আমি আমেদাবাদে পৌঁছোলে সেখানে সকলে এ কথা শুনে বিশ্বাস করতেই চান নি যে সেই রাজা আমাকে অতটা খাতির যত্ন করেছেন। কারণ তাঁর রাজ্যমধ্য দিয়ে যাত্রীরা কখনও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই যাত্রীদের উপরে অত্যাচার চালান—এই ঘটনা সুবিদিত।

বারগানৃত্ থেকে বিমল ও মোদ্রা পেরিয়ে ঝালোর। ঝালোর পাহাড়ের উপরে একটি প্রাচীন সহর। জায়গাটি চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় ওখানে যাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। ওখানে পাহাড়ের মাথায় একটি হ্রদ আছে। নীচের দিকেও রয়েছে আর একটি [illegible]। এই দুই হ্রদের মাঝখানে পাহাড়ের পাদদেশে রাস্তা আছে সহর পর্য্যন্ত। ঝালোর থেকে আরও কয়েকটি স্থান অতিক্রম করে মের্ত্তায় পৌঁছোনো গেল।

দন্তওয়ারা থেকে মের্ত্তা তিনদিনের রাস্তা। এটি (দন্তওয়ারা) পার্ব্বত্য অঞ্চল। কয়েকজন রাজা বা রাজপুত্রের অধিকারভুক্ত। তাঁরা মহান মুঘল সম্রাটকে কর দান করেন। বিনিময়ে এঁরা মুঘল সম্রাটের সৈন্য বিভাগে কর্তৃত্ব করার সুযোগ পান। তাঁরা কর দিয়ে যা ব্যয় করেন তার চেয়ে বেশী লাভবান হন।

মের্তাও বড় সহর। তবে সুগঠিত নয়। আমার অন্য একবারের ভারত-ভ্রমণে যখন এই স্থানটিতে যাই তখন সমস্ত সরাইখানা লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ছিল। কারণ সেই সময়ে শায়েস্তা খানের বেগম অর্থাৎ শাহজাহানের মাতুলানী ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর কন্যাকে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুজার সংগে বিবাহ দেবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমি একটি উঁচু জায়গাতে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেই উঁচু জায়গাটির আশেপাশে কিছু গাছপালাও ছিল। ঘন্টা দুই পরে একটি ব্যাপার দেখে তো আমি অবাক! দেখা গেল পনের বিশটি হাতী সেই গাছগুলির ডালপালা যতদূর শুঁড় দিয়ে ধরা যায় সব ভেঙ্গে চুরে নীচে নামাতে লাগলো। ব্যাপারটা যেন সাধারণ জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার মত। সেই ভাঙ্গাচোরার কাজ চলেছিল বেগম-সাহেবার হুকুমে। হুকুমটি জারী হয়েছিল কেন তা খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওখানকার অধিবাসীরা তাঁকে প্রকাশ্যে অপমান করেছিল অর্থাৎ তাঁরা সাক্ষাতে বেগমের সংগে দেখা করেনি, উপযুক্ত উপহার উপঢৌকনও প্রদান করেনি।

মের্তা ছেড়ে আরও অনেক জায়গা অতিক্রম করে যেতে হয় বয়ানা (ভরতপুর) নামে একটি সহরে। এর আগে ছিন্দাওনও একটি সহর। সমস্ত দেশব্যাপী যেমন হয় এখানেও সেই রকম নীলের পাত তৈরী হয় এবং তা গোলাকার। এখানকার নীল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাই দামও দ্বিগুণ।

বয়ানার পরে বেত্তাপুরও একটি পুরোনো সহর। এখানে পশমী গালিচা, পর্দা ঝালর ইত্যাদি তৈরী হয়। বেত্তাপুর থেকে আগ্রা বার ক্রোশ। সুতরাং সুরাট থেকে আগ্রা সবশুদ্ধ ৪১৫ ক্রোশ।

এই ভ্রমণ-যাত্রাকে যদি দু'টি সমভাগে তের ক্রোশ করে বিভক্ত করা যায় তাহলে তেত্রিশ দিনে সুরাটে পৌছানো যেতে পারে। তবে বিশ্রাম নিয়ে, স্থানে স্থানে যাত্রাভঙ্গ করে চললে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ দিনের যাত্রা পথ আর কি!

অধ্যায় ছয়

কান্দাহারের রাস্তা ধরে ইস্পাহান থেকে আগ্রা।

আমি এতক্ষণ যে রাস্তা ঘাটের বর্ণনা দিয়েছি, তা প্রায় নিখুঁত। এই করে পাঠকদের আমি কান্দাহার পর্য্যন্ত নিয়ে এলাম। এখন বাকী রয়েছে কান্দাহার থেকে পুনরায় আগ্রা যাবার বিবরণ। এই যাতায়াতের দু'টি পন্থা আছে। একটি কাবুলের মধ্যে দিয়ে, দ্বিতীয়টি মুলতান হয়ে। শেষেরটি সংক্ষিপ্ত এবং দশদিনের কম রাস্তা। তবে ওপথে কোন শকট বা পশুযান যায় না। কারণ কান্দাহার থেকে মুলতান যেতে হলে সমস্তটা রাস্তাই মরুময়। এমনও হয় যে তিনচার দিনের যাত্রা পথে একটুও জলের সন্ধান মিলবে না। কাজেই সবচেয়ে সাধারণ, সহজ ও সমতল রাস্তা হচ্ছে কাবুলের মধ্য দিয়ে। এখন কান্দাহার থেকে কাবুল চব্বিশ দিনের রাস্তা, কাবুল থেকে লাহোর বাইশ দিন, লাহোর থেকে দিল্লী বা জাহানাবাদ আঠার দিন, আর দিল্লী থেকে আগ্রা ছয় দিনের যাত্রা পথ। এর পরে আর ষাট দিন আবশ্যক হয় ইস্পাহান থেকে ফরাত হয়ে কান্দাহার পৌঁছোতে। তাহলে ইস্পাহান থেকে আগ্রা পৌঁছাতে সর্ব্বসাকুল্যে প্রয়োজন হয় একশ' পঞ্চাশ দিন। যে সকল ব্যবসায়ীদের দ্রুত পৌঁছানো দরকার তাঁরা একসংগে তিন চারটি ঘোড়ার ব্যবস্থা রাখেন এবং সবটা রাস্তা অতিক্রম করেন খুব বেশী হ'লেও পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে।

মুলতান এমন একটি সহর যেখানে প্রচুর লিনেন সুতার কাপড় তৈরী হয়। নদীর মুখ বালির চড়া পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত তা সমস্ত তট্টায় রপ্তানী হয়ে যেত। নদী পথ বন্ধ হতে কাপড় সব নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রাতে। তারপর আগ্রা থেকে সুরাটে। লাহোরের যত পণ্য-দ্রব্য তার অধিকাংশই এইভাবে আগ্রা হয়ে সুরাটে যায়। পণ্যবাহী গাড়ী ঘোড়া দুর্ম্মূল্য হওয়াতে মুলতান অথবা লাহোর উভয় স্থানেই খুব স্বল্পসংখ্যক মাল আমদানী-রপ্তানীকারক ব্যবসায়ী আছেন। এই কারণে অনেক কারিগর শিল্পীরাও এ স্থানসমূহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন অন্যত্র। তাতে ঐ অঞ্চলে রাজার প্রাপ্য রাজস্বের হারও অতি মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। আর সমগ্র বেনিয়া সমাজ এসে মুলতানে জড় হয়েছে। এঁরা পারস্যের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্য চালান। ইহুদীরা যে ধরনের ব্যবসা করেন. এঁরাও সেখানে তাই করেন।

সুদে টাকা খাটানোর ব্যাপারে এঁরা তাঁদেরও হার মানিয়েছে। এঁদের মধ্যে বেশ একটি নিয়ম আছে। বছরের কয়েকটি বিশেষ দিনে তাঁরা মুরগীর মাংস খেতে পারেন। দুই তিন ভাই-এর স্ত্রী থাকেন একজন। সন্তানসন্ততির পিতারূপে গণ্য হবেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এই শহরে স্ত্রী পুরুষ দুই শ্রেণীরই প্রচুর নর্ত্তক-নর্ত্তকী আছে। এরা পারস্য দেশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

এখন আমি কান্দাহার থেকে আগ্রার রাস্তা এবং তা কাবুল ও লাহোরের মধ্যে দিয়ে—তারই বর্ণনা দিচ্ছি।

কান্দাহারের অনেক পরে সিগানু হোল ভারতের সীমান্তবর্ত্তী একটি সহর। বিভিন্ন রাজকুমারদের শাসনাধীন থাকে এই স্থানটি। তাঁরা পারস্য সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন। সিগানুর হতে কাবুলের দূরত্ব ৪০ ক্রোশ।

এই চল্লিশ ক্রোশ রাস্তাব্যাপী রয়েছে তিনটি মাত্র শোচনীয় অবস্থা সম্পন্ন গ্রাম। সেখানে কখনও সখনও ঘোড়ার জন্য রুটি বা যব পাওয়া যায়। এইজন্য সবচেয়ে নিরাপদ হোল নিজের সংগে ঘোড়ার খাদ্য বহন করা। জুলাই আগষ্ট মাসে ঐ অঞ্চলে একটা গরম হাওয়া চলে। তাতে মানুষের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে। ঠিক এই প্রকার হাওয়া বাতাসের কথা আমি পারস্য ভ্রমণ প্রসংগে বলেছি। সেখানকার ব্যবিলন এবং মাউসুলের কাছাকাছি জায়গায় এই রকম হাওয়ার প্রকোপ দেখা যায়।

কাবুল একটি বিরাট এবং সুরক্ষিত সহর। উজবেক জাতির লোকেরা প্রতি বছর এখানে অশ্ব বিক্রীর উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন। তাঁদের হিসেবে জানা যায় যে প্রতি বছর ষাট হাজারেরও বেশী ঘোড়া এখানে ক্রয় বিক্রয় হয়। এঁরা পারস্য থেকে প্রচুর মেষ ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু প্রাণী এখানে নিয়ে আসেন। এ স্থানটি পারসীক, তাতার ও ভারতীয় বস্তুসামগ্রী ও মানব-গোষ্ঠীর মিলনকেন্দ্র। এখানে মদ্যও পাওয়া যায়। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যও বেশ ন্যায্য মূল্যে বিক্রী হয়।

অন্য প্রসংগে যাবার আগে আমাকে অবশ্যই একটি বিষয় বিশেষভাবে বর্ণনা করতে হবে। তা হচ্ছে কাবুল থেকে কান্দাহার পর্য্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী আফগানদের কথা। এই মানবগোষ্ঠীর বাস বালুচ পর্ব্বত পর্য্যন্ত স্থানসমূহে। এরা খুব বলিষ্ঠ ও সাহসী। রাত্রিকালে এরা দস্যুবৃত্তি করে বেড়ায়। ভারতীয়দের মধ্যে একটি প্রথা আছে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাঁরা একটি বাঁকা গাছের শিকড় দিয়ে জিহ্বা ঘসা মাজা করে পরিষ্কার করেন।

এতে তাঁদের সর্দ্দি শ্লেষ্মা অনেক বের হয়ে যায় এবং একটা বমির ভাব হয়। সে যুগে পারস্য ও ভারতের সীমান্তবাসীরাও এর চর্চা করতেন। তবে তাঁরা প্রাতঃকালে বিশেষ বমি করতেন না। কিন্তু খাদ্য গ্রহণ করতে বসে দুই এক টুকরো খাদ্য খেতেই তাঁদের হৃৎপিণ্ড ফুলে উঠতে থাকে। আর খাওয়া চলে না, বমি করতে বাধ্য হতেন। তারপর অবশ্য আবার ক্ষুধার্ত্ত হয়েই সেই খাদ্য গ্রহণ করেন। তারা যদি ঐভাবে খাওয়ার আগে বমি না করেন, তাহলে তাঁদের পরমায়ু ত্রিশ বছরের অধিক হয় না। তাছাড়া দেহে শোথ রোগেরও আক্রমণ হয়। কাবুল থেকে খাইবার পেশোয়ার, নউসেরা প্রভৃতি স্থানের পরে আটক।

আটক দু'টি বৃহৎ নদীর মিলনস্থলে একটি শৈলান্তরীপে অবস্থিত। মহান মুঘলদের সুদৃঢ় কেল্লাগুলির মধ্যে একটি এখানে। সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত কেউ বা কোন বিদেশী ওখানে প্রবেশ করতে পারেন না। শ্রদ্ধাস্পদ জেসুইট ধর্মযাজক রুক্স্ ও তাঁর সংগীরা ঐ পথে ইস্পাহান যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্রাটের অনুমতি পত্র না থাকায় তাঁদের ওখান থেকে লাহোরে ফিরতে হয়েছিল। তারপরে জলপথে সিন্ধুদেশে যান। সেখান থেকে যান পারস্যে।

আটক ছেড়ে আরও বহু জায়গা অতিক্রম করলে তবে লাহোর। এটি একটি রাজ্যের রাজধানী। হরটি পঞ্চনদের একটি তীরে অবস্থিত। এই নদীটি উত্তর প্রান্তের পর্ব্বতশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়ে সিন্ধুনদকে স্ফীত করে তুলেছে। যে অঞ্চল এই নদীর দ্বারা বিধৌত তার নাম পাঞ্জাব। সে সময়ে নদীর গতিপথ সহর থেকে এক লীগের মধ্যেও ছিল না। তাহলে বারবার নদীটি গতি পরিবর্ত্তন করে বন্যার সৃষ্টি করে ক্ষেত খামারের অশেষ ক্ষতি সাধন করেছে। সহরটি বেশ বড় এবং দৈর্ঘ্যে এক লীগেরও অধিক বিস্তৃত। কিন্তু দিল্লী ও আগ্রার তুলনায় উঁচু সব ঘর বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তার কারণ অত্যধিক বারিপাত। অতি বৃষ্টির ফলে বাড়ীঘর সব জলমগ্ন হয়ে যেত। রাজপ্রাসাদটিকে মোটামুটি উৎকৃষ্ট বলা চলে। আগে যেমন ওটি নদীর তীরে ছিল এখন আর তেমনটি নেই। নদী এখন প্রায় এক-চতুর্থাংশ লীগ মত দূরে চলে গিয়েছে। লাহোরেও মদ্য পাওয়া যায়।

লাহোর এবং তার উত্তরে অবস্থিত কাশ্মীর রাজ্য অতিক্রমকালে একটি বিষয় অবশ্যই নজরে পড়বে যে সেখানকার নারীজাতির দেহের কোন অংশে লোম নেই। পুরুষদেরও চিবুকে সামান্যই দাড়ি গজায়। লাহোর থেকে

দিল্লীর দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। অনেক সহর, সরাই পেরিয়ে তবে দিল্লী। বেশ খানিকটা রাস্তা চলার পরে লাহোর ও দিল্লীর মধ্যে আবার দিল্লী থেকে আগ্রা পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারে সুন্দর সব বৃক্ষরাজি দেখা যাবে। দৃশ্যটি অতি মনোরম। অনেক জায়গায় গাছ পুরোনো হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে; কিন্তু নতুন গাছ আর পোঁতা হয়নি।

যমুনা নদীর সন্নিকটে দিল্লীও বিরাট সহর। যমুনা উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে অবশেষে পশ্চিম দিক হয়ে প্রবাহিত হয়েছে পূবমুখো। তারপরে আগ্রার পাশ ধরে গঙ্গায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। শাহজাহান আবার নিজের নামানুসারে জাহানাবাদ নামে একটি সহর নির্ম্মাণ করান। আগ্রার পরিবর্ত্তে তিনি এই নতুন সহরেই রাজদরবার চালানোর পরিকল্পনা করেন। এই জায়গাটির আবহাওয়া ছিল মাঝারি ধরণের। দিল্লী এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে হয়েছে পরিণত। চারদিকে কেবল ভাঙ্গাচোরা ইঁট পাথরের স্তূপ। আর গরীব লোকেদের ঘরবাড়ী দেখা যায় চারদিকে। রাস্তাগুলি অত্যন্ত সরু ও সংকীর্ণ। বাড়ীগুলি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই খড় বাঁশের। সম্রাটের দরবারের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিই মাত্র দিল্লীতে বাস করেন। প্রকাণ্ড বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় তাঁরা নিজেদের গৃহাবাস ও শিবির নির্ম্মাণ করেছিলেন। বাদশার দরবারে যে মাননীয় জেসুইটগণ এসেছিলেন তাঁরাও ঠিক ঐ পদ্ধতিতেই নিজেদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

জাহানাবাদ ও দিল্লী একই প্রকারের বড় সহর। দু'টি জায়গার মধ্যে একটি প্রাচীর মাত্র ব্যবধান। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সকলের বাড়ীই সুবৃহৎ প্রাচীরে বেষ্টিত। অধিকাংশ আমির ওমরাহরা সহরের বাইরে বাস করেন জলের সুবিধার জন্য। দিল্লী ছেড়ে জাহানাবাদে প্রবেশ করলেই লম্বা চওড়া সব রাজ পথ দেখা যাবে সুনিশ্চিতরূপে। রাস্তার পাশে পাশে আবার খিলান যুক্ত সব ঘর বারান্দার বহর। সেখানে ব্যবসায়ীদের দোকান পাট। তার উপরের ছাদ সমতল। এই রাস্তা বাদশাহের প্রাসাদ সম্মুখে একটি চতুষ্কোণ উদ্যানে গিয়ে মিলেছে। প্রাসাদের আর একটি ফটকের মুখে আরও একটি সুবৃহৎ ও মনোরম রাস্তা এগিয়ে গিয়েছে। ওখানেও বড় বড় সওদাগর বণিকেরা বাস করেন। তবে দোকান পাটের বালাই নেই।

সম্রাটের প্রাসাদ আধ বীঘেরও বেশী জায়গা জুড়ে পরিব্যাপ্ত। প্রাচীর শ্রেণী চমৎকার খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে গঠিত। মাঝে মাঝে বন্দুক চালনার নিমিত্ত

ফোকর আছে। পরিখাগুলি জলে পূর্ণ। সেগুলিও খণ্ড পাথর দিয়ে বাঁধানো। প্রাসাদের মুখ্য ফটকে কোন জাঁকজমক আড়ম্বর নেই। প্রধান অঙ্গনের চেয়ে বেশী কিছু দ্রষ্টব্য ওখানে নেই। এই ফটক দিয়েই বড় বড আমির ওমরাহরা হাতীর পিঠে করে দরবারে প্রবেশ করেন।

প্রথম দরবার ক্ষেত্র পার হয়ে গেলে আর একটি সুদীর্ঘ রাস্তা দেখা যায়। তার দুই পাশে রয়েছে স্তম্ভ ও খিলান বিশিষ্ট বারান্দার সারি। তাতে ছোট ছোট কুঠরী আছে। সেখানে কিছু সংখ্যক অশ্বরক্ষী শয়ন করে। বাবান্দাগুলি জমি থেকে প্রায় দু' ফুট আন্দাজ উঁচু ভিতের উপরে নির্ম্মিত। বাইরে যে ঘোড়াগুলি থাকে তাদের এই বারান্দার সিঁড়ির উপরে খাবার দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় বড তোরণযুক্ত ফটক আছে যা অনেকগুলি সারিবদ্ধ ঘরের দিকে গিয়েছে এগিয়ে। তা আরও চলে গিয়েছে অন্তঃপুর বা হারেমের অভিমুখে এবং বিচারালয়ের দিকে। রাস্তার মাঝখানে একটি জলধার মত আছে। তাবপবে সমান সমান ব্যবধান ছোট ছোট ফোয়ারার সমাবেশ দেখা যায়।

সেই বড় রাস্তাটি একেবারে দ্বিতীয় বৃহৎ প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত পৌছে গিয়েছে। ওখানে ওমরাহগণ অর্থাৎ রাজ্যেব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা নিজেরাই সতর্ক প্রহরায় থাকেন। এঁরা হলেন ঠিক তুর্কী ও পারস্যের খানদের মত। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করে এদের জন্য নিৰ্দ্দিষ্ট ঘর আছে। তাঁদের অশ্বসমূহ দ্বারদেশে বাঁধা থাকে।

দ্বিতীয় চত্বর থেকে তৃতীয়টিতে পৌছোনো যায় সুবৃহৎ একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করে। তার এক পাশে জমি থেকে দু' তিন ধাপ উঁচু ভিতরে উপরে একটি ছোট হলঘর। ওটি তোষাখানা অর্থাৎ বাদশার পোষাক পবিচ্ছদ আসবাব রাখাব ঘর। ওখানেই রাজকীয় পোষাক মজুত থাকে। সম্রাট যখন কোন প্রজা ও নবাব ব্যক্তিকে 'খেলাত' অর্থাৎ সম্মানসূচক উপঢৌকন দান করেন তখন এই তোষাখানা থেকেই তা নির্ব্বাচিত হয়। আব একটু দূরে তোরণ দ্বারের নীচেই একটি জায়গায় মজুত থাকে জয়ঢাক, তুরী, শিঙ্গা, সানাই প্রভৃতি। বাদশাহ বিচারাসনে আসীন হলে ঐ বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে ওমরাহদের জানিয়ে দেওয়া হয় তিনি এসেছেন। সম্রাটের দরবার ত্যাগের মুখেও ঐরকম সংকেত ধ্বনির প্রথা আছে।

তৃতীয় চত্বরে দেখা যাবে দিভানের মত একটি আসন। সেখানে বসে সম্রাট প্রজাদের অভাব অভিযোগ শোনেন। এটিও একটি বিরাট কক্ষ এবং

চত্বরের উপরে প্রায় চার ফুট উঁচু। তার তিন দিক উন্মুক্ত, কোন দেয়াল নেই। তেত্রিশটি স্তম্ভের উপরে খিলান সাজান। স্তম্ভগুলি চার ফুট আন্দাজ মাপের চৌকো গড়নের। স্তম্ভের আলাদা ভিত আছে, দেহ অলংকৃত। সম্রাট শাহজাহান এই সুবৃহৎ কক্ষটিকে বিশেষ জাকাঁলো করেই নির্ম্মাণ করাতে চেয়েছিলেন। এমন সব বর্ণাঢ্য প্রস্তর খচিত করেছিলেন যাতে মনে হয় তা স্বাভাবিক ভাবেই সুচিত্রিত। এই সজ্জা অলংকরণ ঠিক যেন মহান ডিউকের তাস্‌কানীর গীর্জ্জার মত। দু' তিনটি স্তম্ভে ঐ প্রকার কারুকার্য্য করে দেখা গেল যে সমস্ত স্তম্ভ গাত্রে অলঙ্ককরণ যোজনা করতে যে পরিমাণ রঙীন প্রস্তর প্রয়োজন তা সারা বিশ্বেও মিলবে না। তাছাড়া অর্থও ব্যয় হবে অপরিমেয়। কাজেই তাঁর পূর্বে পরিকল্পনা বাতিল করে ঠিক করলেন সামান্য কিছু ফুলের নক্সা করে দেওয়া হবে।

কক্ষটির মাঝখানে চত্বরের দিকে মুখ করে উঁচু ভিতের উপরে একখানি সিংহাসন স্থাপিত। সেখানে বসেই সম্রাট প্রজাদের বক্তব্য শোনেন ও বিচারের রায় দান করেন। সিংহাসনটিতে বসার জন্য একটি আসন পীঠ, চারদিকে চারিটি থাম। তার আয়তন অনেকটা আমাদের ভ্রমণকালীন ছোট শয্যাসনের মত। উপরে চন্দ্রাতপ গোছের ছাউনি, পশ্চাৎ ভাগও প্রস্তরময়। উপাধান ও আশেপাশের সব কিছু হীরকে খচিত। বাদশাহ যখন ওখানে বসেন তখন আসনটির উপরে স্বর্ণ মণ্ডিত বস্ত্র বা কোন অতিরিক্ত অলঙ্করণ যুক্ত রেশমী কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপরে তিনি দুই ফুট চওড়া তিনটি ছোট সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে ওখানে উঠে বসেন। আসনটির এক পাশে একটি দণ্ডের মাথায় একটি ছত্র। দণ্ডটি দৈর্ঘ্যে কোন বর্শা বা বল্লমের অর্দ্ধেক মত। সিংহাসনের একটি থামে ঝোলানো থাকে সম্রাটের একটি অস্ত্র। অন্য এক একটিতে থাকে ঢাল, ভোজালি, ধনুক ও তীর পরিপূর্ণ তূণ এবং আরও সব অস্ত্র শস্ত্র।

সিংহাসনের নীচে প্রায় বিশ ফুট মাপের চৌকো একটি জায়গা আছে। সেখানটি স্তম্ভসারি দ্বারা বেষ্টিত। সেই থামগুলিকে কখনও সোনার, কখনও বা রূপার পাতে মুড়ে দেওয়া হয়। স্তম্ভ বেষ্টিত স্থানটিতে বসেন সাম্রাজ্যের শাসন বিভাগের চারজন প্রধান কর্ম্মচারী। তাঁরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই বিষয়েই ওকালতী করেন। আরও অনেক আমির ওমরাহ থামগুলিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকেন। যতক্ষণ সম্রাট দেওয়ানে উপস্থিত থাকেন ততক্ষণ

কিছু সংখ্যক বাদক ওখানে হাজির থাকেন। তাদের বাদ্য ধ্বনি এত কোমল ও মধুর যে তাতে রাজকার্য্যে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না। সম্রাট সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকাকালে কিছু সংখ্যক আমির ওমরাহকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কোন কোন সময় তাঁর কোনও পুত্রও থাকেন দাঁড়িয়ে। বেলা ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে 'নহাব' অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যিনি হলেন তুর্কী দেশের মহান উজিরের মত, তিনি বাদশার কাছে একটি বিবরণী পেশ করে জানান যে তাঁর নেতৃত্বে সেদিন কি কি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই বিবরণ দান শেষ হলে সম্রাট আসন ত্যাগ করেন। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে সম্রাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠানকালে কেউ কোন কারণেই প্রাসাদ ত্যাগ করতে পারবে না। তবে আমি বলতে পারি যে সাধারণের ক্ষেত্রে যে আইন প্রযোজ্য তা আমাদের ক্ষেত্রে অনেকখানি মুকুব করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই :

একদিন সম্রাট যখন দেওয়ানীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন আমি প্রাসাদের বাইরে যাবার চেষ্টা করেছিলাম এমন একটি জরুরী কাজের তাগিদে যার জন্য একটুও বিলম্ব করা সম্ভব ছিল না। দ্বাররক্ষীদের নেতা বা কাপ্তেন আমার হাত ধরে বললেন আমার বাইরে যাওয়া চলবে না। কিছু সময় আমি তর্ক বিতর্ক করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে কি কারণে বাইরে যেতে চাই। কিন্তু তার আচরণ অত্যন্ত উদ্ধত দেখে আমি আমার বেতখানি তুলেছিলাম। কাছাকাছি যদি দু' চারজন রক্ষী না থাকতো তাহলে হয়ত ওকে আঘাত করেই বসতুম। তারা সব ব্যাপারটা দেখে আমার হাত ধরে ফেললো। আমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় নবাব (নহাব), যিনি ছিলেন সম্রাটের খুল্লতাত, তিনি ওখানে এসে পড়েন। ঝগড়া বিতর্কের কারণ শুনে তিনি দ্বাররক্ষীকুলের অধিকর্ত্তাকে হুকুম দিলেন আমাকে প্রাসাদ ত্যাগের অনুমতি দানের জন্য। তারপর তিনিই বা[illegible]কে ব্যাপারটা জানান। সন্ধ্যার দিকে নবাব তাঁর এক ভৃত্যকে পাঠিয়ে আমাকে সংবাদ দিলেন যে সম্রাটের ইচ্ছা ও অনুমতি অনুসারে আমি দেওয়ানে সম্রাট সমাসীন থাকতেই আমার ইচ্ছে মাফিক প্রাসাদের বাইরে যাতায়াত করতে পারবো। এইজন্য পরের দিন আমি নবারের কাছে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম।

এই চত্বরটির মধ্যস্থলের মুখে পাঁচ ছয় ইঞ্চি চওড়া একটি খাঁজকাটা জায়গা আছে। বাদশাহ বিচারাসনে সমাসীন হলে দরবারে যাঁদের কাজকর্ম থাকে তাঁরা ঐ পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে অপেক্ষা করেন। তাঁদের ডাক পড়ার

আগে আর একটুও অগ্রসর হওয়া বিধি-সংগত নয়। বিদেশী রাজদূতগণও এই নিয়মের বহির্ভূত নন। কোন রাষ্ট্রদূত ঐ খাঁজকাটা জায়গা পর্য্যন্ত এগিয়ে এলে নিয়মবিধির কর্ত্তা-ব্যক্তি সম্রাটের দিকে লক্ষ্য করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন যে জনৈক বিদেশী রাজদূত সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী। তখন মুখ্য মন্ত্রীদের একজন সে কথা সম্রাটকে নিবেদন করেন। সম্রাট খানিকক্ষণ এমন ভাব প্রকাশ করেন যেন কিছুই শুনতে পান নি। অবশেষে চোখ দু'টি একটু উপরে তুলে বিদেশী দূতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মন্ত্রীকে ইঙ্গিত প্রদান করবেন যে তিনি (দূত) তাঁর কাছে আসতে পারেন।

দেওয়ানী কক্ষের বাঁ দিকে এগিয়ে গেলে উঁচু একটি সমতল জায়গায় বেড়ানো যায়। ওখান থেকে নদী দেখা যায়। এই উঁচু জায়গাটি অতিক্রম করে বাদশাহ ছোট একটি কক্ষে প্রবেশ করেন। তার পরে হারামে যান। এই ক্ষুদ্র কক্ষেই আমি বাদশার সংগে প্রথম সাক্ষাৎ করি। সে প্রসংগ আমি যথাস্থানে বর্ণনা করবো।

প্রাঙ্গণটির বাঁ দিকে যেখানে দেওয়ানী বা দরবার কক্ষ নির্ম্মিত হয়েছে সেখানে অতি চমৎকার পরিচ্ছন্নরূপের ছোট একটি মসজিদ আছে। মসজিদের গম্বুজটি নিখুঁতভাবে গিল্টী করা সীসা বা দস্তার পাতে মোড়া। সম্রাট প্রতিদিন ওখানে ভজন ও প্রার্থনাদি শুনতে যান। তবে শুক্রবারে ওখানে না গিয়ে বড় মসজিদে যান। বড় মসজিদটি অতি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও সুউচ্চ একটি ভিত্তির উপরে স্থাপিত। মসজিদটি এত উঁচু যে সহরের অনেক বাড়ী থেকে উচ্চতায় অধিক। ওটিতে চমৎকার সিঁড়ি সোপানের বহর আছে। বাদশাহ যেদিন ওখানে যান সেদিন বিরাট একটি কাঠের রেলিং সিঁড়ির দুদিকে বসানো হয়। তার কারণ হাতীগুলিকে দূরে রাখা এবং তা মসজিদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই।

চত্বরটির ডানদিকে বারান্দার বহর। তাতে সুদীর্ঘ দালান ও প্রকোষ্ঠ। নির্ম্মিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তা প্রায় আধ ফুট উঁচুতে। এগুলি বাদশাহের আস্তাবল। ওখানে অনেক প্রবেশ পথ আছে। সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি ও দালান মর্য্যাদাশালী অশ্ব দ্বারা পরিপূর্ণ। নিম্নস্তরের ঘোড়ার জন্য বাদশাহ তিন হাজার ক্রাউন মূল্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন উত্তম ঘোড়া আছে যার জন্য তিনি দশ হাজার পর্য্যন্ত দিয়েছেন। আস্তাবলের প্রতিটি দরজায় বাঁশের শলা দিয়ে তৈরী মাদুর (চিক্) টাঙ্গানো। সেসব ঠিক আমাদের দেশের

চুব্‌ড়ি তৈরী করার বেতের মত। আমাদের দেশে যা দিয়ে চুব্‌ড়ি তৈরী হয় তা দিয়েই এগুলি বাঁধা বোনা হয়। কিন্তু এখানে বাঁশের কাঠিগুলিকে বোনা ও বাঁধা হয় পাকানো রেশম দিয়ে। এই কাজ বড় সূক্ষ্ম, তবে অত্যন্ত একঘেঁয়ে। এই মাদুর বা চিক্ টাঙানো হয় ঘোড়ার উপর মশামাছির উৎপাত রোধ করার জন্য। এক একটি অশ্বের জন্য দুজন করে সহিস বা পরিচর্য্যাকারী থাকে। একজন থাকেন পশুটিকে পাখা চালিয়ে হাওয়া করার জন্য। দালানে ও আস্তাবলের দরজায়ও এই রকম চিক্ ঝোলানো থাকে। প্রয়োজনমত তা সরিয়েও দেওয়া যায়। প্রকোষ্ঠগুলির মেঝে চমৎকার কার্পেটে আবৃত। সন্ধ্যাবেলা কার্পেটগুলি তুলে দেওয়া হয়। তারপর সেখানে অশ্বের জন্য খড়ের শয্যা বিছিয়ে দেবার কথা। কিন্তু এখানে শয্যা খড়ের নয়। অশ্বের মল রৌদ্রে শুকিয়ে পাত করে মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়। পারস্য, আরব ও উজবেকিস্তান থেকে যে ঘোড়াগুলি ভারতে আসে এখানে তাদের খাদ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে। ভারতবর্ষে কখনও ঘোড়াকে শুকনো ঘাস বা জই (এক প্রকার ঘাস) খেতে দেওয়া হয় না। প্রতিটি অশ্বকে সকাল বেলায় প্রয়োজন অনুসারে তিনটি আটার রুটি ও মাখন খেতে দেয়ার প্রথা। রুটি এক একটির ওজন আমাদের দেশের ছয় পেনি মূল্যের রুটির মত। এই খাদ্য খাওয়ানো প্রথমে খুব কঠিন কাজ। এই খাদ্যে ওদের অভ্যস্ত করতে প্রায় তিন চার মাস সময় চলে যায়। সহিস এক হাতে ওদের মুখ টেনে খুলবে, আর এক হাতে খাবার পুরে দেবে। আখের চারা ও জোয়ারের যখন কাল তখন সেসব ঘোড়াকে খেতে দেওয়া হয় মধ্যাহ্নকালে। সন্ধ্যা সমাগমের দু ঘণ্টা আগে বাগানের ক্ষুদ্র ঘাসের চটা তুলে তা শিলনোড়ায় পিষে জলে গুলে খাওয়ানো হয় যব বা অন্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যের পরিবর্ত্তে। বাদশার অন্য আস্তাবলেও উৎকৃষ্ট সব ঘোড়া আছে। কিন্তু আস্তাবলগুলি এত কদর্য্য ও বিশ্রী রকমের যে উল্লেখ করার মত নয়।

যমুনা নদীটি ভারি চমৎকার। বড় বড় নৌকা চলেছে নদীতে। আগ্রার ওধারে গিয়ে নদীর নাম গিয়েছে বদলে। এলাহাবাদে গিয়ে নদীটি গঙ্গায় পড়েছে। জাহানাবাদে এই নদীবক্ষে সম্রাটের কয়েকটি দুই মাস্তুলবিশিষ্ট ছোট ছোট জাহাজের মত নৌকো আছে। তিনি নৌকোয় করে প্রমোদ বিহার করেন। এই জলযানগুলি এদেশের রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী অতি চমৎকার-রূপে সজ্জিত।

অধ্যায় সাত

দিল্লী থেকে আগ্রার সেই রাস্তাটিরই আরও বিবরণ।

দিল্লীর পরে বল্লভগড় ও পাল্‌ওয়াল। এর কয়েক ক্রোশের মধ্যেই মথুরা যার আর একটি নাম শাহ্‌-কি-সরাই। এখানে ভারতীয়দের বৃহত্তম মন্দিরের একটি আছে। বাঁদরের জন্য একটি হাসপাতাল আছে ওখানে। ঐ অঞ্চলের আশেপাশে যত বাঁদর আছে সব ওখানে আশ্রয় পায়। বেনিয়া সমাজ এই প্রাণীগুলির খাদ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নশীল। মন্দিরময় স্থানটির প্রকৃত নাম মথুরা। বর্ত্তমানে যা অবস্থা তার চেয়ে পুরাকালে এ জায়গাটি ঢের বেশী পবিত্র ও ভক্তি শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল। তখন যমুনা নদী একেবারে মন্দিরের ভিত স্পর্শ করে ছিল প্রবাহমানা। সেই সময়ে বেনিয়া সমাজও ঐ অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীরা সকলেই নদীতে স্নান করে মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা করতেন। বারবার তাঁরা এই স্নান করেন একটি বিশ্বাসে যে সেই পূত স্রোতের জলে স্নান করলে তাঁদের পাপ কলুষরাশি ধুয়ে যাবে। এখন নদীর গতিপথ আরও উত্তরে সরে যাওয়ার ফলে মন্দির থেকে নদীটি অনেক দূরে চলে গিয়েছে। এর ফলে তীর্থ যাত্রীর ভিড় পূর্ব্বাপেক্ষা কম। মথুরা থেকে আগ্রা বেশী দূরে নয়।

আগ্রা সহর ২৭ ডিগ্রী, ৩১ মিনিট অক্ষাংশে বালুকাময় ভূমিতে অবস্থিত। কাজেই জায়গাটি অত্যন্ত গরম। ভারতবর্ষের বৃহত্তর সহরের মধ্যে এটি একটি। পূর্ব্বে এখানে রাজা মহারাজাদের বাসস্থান ছিল। সম্ভ্রান্ত ধনীব্যক্তিদের গৃহাবাস যেমন দেখতে মনোরম, তেমনি সুগঠিত। কিন্তু দরিদ্রশ্রেণীর ঘরবাড়ী ভারতের অন্যান্য সহরের মতই অতি সাধারণ। একটি বাড়ির পরে যথেষ্ট ব্যবধানে আর একটি বাড়ী। সব বাড়ীই উঁচু দেয়ালে ঘেরা। তার কারণ মেয়েদের বাইরে থেকে দেখা না যায়। তাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে এদেশের সহরগুলি আমাদের ইউরোপের সহরের মত প্রীতিকর নয় একেবারেই। আগ্রা সহরের চারদিকে বালির স্তূপ রয়েছে বলে এখানে উত্তাপ অত্যধিক। শাহজাহান এই কারণেই ঐ স্থানটি ত্যাগ করে জাহানাবাদে নতুন একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

আগ্রার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিস বাদশার প্রাসাদ। সহরের আশপাশে আরও অনেক কীর্ত্তিসৌধ আছে। বিরাট এক ভূখণ্ডে সম্রাটের প্রাসাদ। দুই

বহরের প্রাচীর শ্রেণীতে উহা বেষ্টিত। জায়গায় জায়গায় খোলা চত্বর আছে। এই সব জায়গায় রাজ দরবারের কিছু বিশিষ্ট কর্মীর বাসস্থান হয়েছে নির্দ্দিষ্ট। প্রাসাদের সম্মুখেই যমুনা নদী প্রবহমানা। প্রাসাদ প্রাচীর ও নদীর মধ্যে যে প্রশস্ত উন্মুক্ত স্থান আছে সেখানে সম্রাট হাতীর লড়াইএর আয়োজন করেন। জলের ধারেই এই জাতীয় লড়াইএর ব্যবস্থা হয়। কারণ যে হাতীটি জয়ী হয় সে এমন উত্তেজিত ও উন্মত্ত হয়ে পড়ে যে তাকে জলে নামাতে না পারলে বাগে আনা যায় না। তার পরে ছোট লাঠির মাথায় বোমা পট্‌কা বেঁধে জলের মধ্যেই উহা ছুঁড়ে ওকে ভয় দেখানো হয়। হাতীটি গভীর জলের মধ্যে কিছুক্ষণ থেকে তারপরে শান্ত হয়।

সহরের একপাশে প্রাসাদের সামনেই মস্ত বড় একটি চতুষ্কোণ চত্বর আছে। তার প্রথম তোরণটিতে কোন জাঁকজমক নেই। ওখানে কয়েকজন সৈনিক থাকে প্রহরারত। আগ্রা থেকে জাহানাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার তোড়জোর চলছে। সম্রাট তখন কিছুদিনের জন্য সাম্রাজ্যের অন্য এক জায়গায় গিয়েছিলেন। তখন প্রাসাদ, বিশেষ করে ধনাগারের দায়িত্বভার দিয়েছিলেন জনৈক মুখ্য ওমরাহের উপরে। এই ওমরাহটি সম্রাটের বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। সেই দায়িত্বভারপ্রাপ্ত ওমরাহ যতদিন বাদশাহ ফিরে আসেননি ততদিন দিনেরাতে কখনও তোরণের বাইরে যাননি। সর্ব্বদা প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকতেন। এই রকম একটি সময়েই আমি আগ্রার প্রাসাদ দেখার অনুমতি পেয়েছিলাম।

সম্রাট যখন নতুন রাজধানী জাহানাবাদে গেলেন তখন সমস্ত রাজ দরবার ও হারেম তাঁর সংগে গিয়েছিল। আর আগ্রার প্রাসাদ তত্ত্বাবধানের ভার পড়েছিল যাঁর উপর তিনি ছিলেন ওলন্দাজদের বিশেষ বন্ধু। বস্তুতঃ তিনি সমস্ত ইউরোপীয়দেরই বন্ধু ছিলেন। সম্রাট আগ্রা ত্যাগ করে যেতেই ডাচ্ ফ্যাক্টরীর অধিকর্ত্তা সেন্হীর ভেলাণ্ট পরিত্যক্ত প্রাসাদের কর্ত্তা ব্যক্তির সংগে দেখা করে তাঁকে নিয়মমত উপঢৌকন প্রদান করলেন। তার মধ্যে ছিল ছয় হাজার ক্রাউন মুদ্রা, নানারকম মশলা, জাপানী টেবিল এবং চমৎকার সব ওলন্দাজী বস্ত্র সম্ভার। মিঃ ভেলাণ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে তিনি যখন প্রাসাদের অধ্যক্ষকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে যাবেন তখন তাঁর সংগে আমি যেন যাই। কিন্তু ভেলাণ্টের আয়োজনের বহর দেখে তিনি (অধ্যক্ষ) বিরক্তি প্রকাশ করলেন। আর বললেন যে অত ব্যয়বাহুল্য করা উচিত

হয়নি। অবশেষে তাঁকে জিনিসপত্র ফেরত নিয়ে আসতে বাধ্য করেছিলেন। সেই জিনিসপত্রের মধ্যে ছয়খানি জাপানী বেতের ছড়ি ছিল। তিনি তার একখানি রেখে ডাচ্ অধিকর্ত্তাকে বলে দিলেন যে আর কিছুই রাখবেন না। স্বর্ণমণ্ডিত হাতলওয়ালা ছড়িও তিনি গ্রহণ করলেন না। সেগুলিও ফেরত আনতে হোল। অভিনন্দনের পালা শেষ হতে তিনি সেন্‌হীর ভেলাণ্টকে জিজ্ঞেস করলেন যে কিভাবে তিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। তদুত্তরে ভেলাণ্ট বললেন যে রাজদরবার, হারেম ইত্যাদি যখন আগ্রা থেকে চলে গিয়েছে তখন প্রাসাদের অভ্যন্তর দেখবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর রয়েছে। গভর্ণর তখনই তাঁর সে ইচ্ছে পূরণ করে ছয়জন লোক নিযুক্ত করে দিলেন তাঁকে প্রাসাদ দেখাবার জন্য।

প্রথম ফটকের যেখানে গভর্ণর থাকেন সেটি হোল পৃষ্ঠদেশ আবদ্ধ একটি খিলান। এই ফটক দিয়ে পৌঁছোনো যায় একটি বড় প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণটির চারদিকে বারান্দা বেষ্টিত। এটা ঠিক আমাদের কন্‌ভেণ্ট উদ্যানের মত। প্রাঙ্গণের সামনে যে দালানের বহর আছে তা যেমন বড়, তেমনি উঁচু। তিন স্তরের স্তম্ভ সারির উপরে উহা স্থাপিত। গ্যালারী ধরণের এই বারান্দা ও ঘরগুলির নীচে প্রাঙ্গণের ওপাশে যে জায়গাটুকু তা যেমন সরু, তেমনি নীচু। ওখানে রক্ষীদের জন্য ছোট ছোট কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে। বড় বারান্দার দেয়ালে একটি কুলুঙ্গীমত অংশ আছে। সেখান থেকে একটি বেসরকারী সিঁড়ি নেমে গিয়েছে হারেমের দিকে। এই সিঁড়ি দিয়েই সম্রাট অন্দর মহলে যাতায়াত করেন। সম্রাট অন্তঃপুরে থাকাকালে মনে হয় তিনি সমাধি গর্ভে আছেন। ঐ সময় সম্রাটের আশেপাশে কোন রক্ষী থাকে না। কারণ ভয়ের কোন হেতু নেই। ওখানে অন্য কারোর প্রবেশের কোন পথ নেই। দিনমানে গরমের সময় একটি খোজা থাকেন সম্রাটের কাছে। অধিকাংশ সময় তাঁর কোন পুত্রও থাকেন সেবা করার জন্য। দরবারের প্রধান ব্যক্তিরা সেই গ্যালারীর মত ঘরগুলির নীচেই সর্ব্বদা থাকেন।

এই চত্বরের আর এক প্রান্তে একটি তোরণ পথ ধরে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। ওটিও গ্যালারীর মত ঘর বারান্দায় পরিবেষ্টিত। এই ঘরগুলি প্রাসাদের কতিপয় কর্ম্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট। এরপরে তৃতীয় চত্বর। সেখানে সম্রাটের আবাস। দক্ষিণদিকের গ্যালারী ঘরের সমস্ত খিলানকে সম্রাট শাহজাহান রৌপ্যমণ্ডিত করার সংকল্প করেছিলেন। অস্টিনদ্দ বোরডক্স্

নামে জনৈক ফরাসী এই মণ্ডপের কাজটি করেন। সম্রাট এদেশে ঐ লোকটির মত সুযোগ্য কারিগর না পেয়ে তাঁকে দিয়েই নক্সার কাজ করিয়েছিলেন। সেই সময়ে বাদশাহ গোয়ার পর্তুগীজদের সংগে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে আলোচনা ও সন্ধি ইত্যাদির প্রস্তাব চালাচ্ছিলেন। অস্টিনের রাজ দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে পর্তুগীজরা সন্দেহাকুল হলেন। তিনি কোচিনে ফিরে গেলে তাঁরা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন।

গ্যালারীসমূহ অলংকৃত হয়েছিল সোনা এবং আশমানী নীল রংএর লতা পাতার নক্সা দ্বারা। নীচের দিকে টাঙানো হয়েছিল নক্সাযুক্ত তন্তুজ কাপড়। গ্যালারীর নীচে অনেক দরজা। ঐ পথে ছোট ছোট চৌকো কক্ষগুলিতে যাওয়া যায়। সেই কক্ষগুলির মধ্যে দু'তিনটি দেখলাম উন্মুক্ত। শুনলাম বাকীগুলিও ঠিক একই প্রকার। প্রাঙ্গণটির তিন দিক খোলা। একদিকে মাত্র দেয়াল এবং তাও একজন লোক কোন প্রকারে হেলে দাঁড়াতে পাবে এমন উঁচু।

নদীর দিকে মুখকরে যে অংশটি সেখানে একটি দিভানের মত অথবা বাইরের দিকে উদ্‌গত একটি ঝোলানো বারান্দা (বারোথা) আছে। এখানে বসে বাদশাহ নদীতে ভাসমান নৌকো অথবা হাতীর লড়াই দেখেন। দিভানের সামনে একটি গ্যালারীর মত আছে। সেটি বারান্দার কাজ করে। শাহজাহানের পরিকল্পনা ছিল বারান্দাটিকে মরকত ও পদ্মরাগ মণি বসিয়ে একপ্রকার জাফ্‌রির কাজ করিয়ে সাজাবেন। মণিরত্ন দিয়ে প্রকৃত আঙ্গুর ফলের আকৃতি রচনা করা হবে এবং তা প্রথম পাতে থাকবে সবুজ, আবার তার পাশেই দেখা যাবে পরিপক্করূপে। সম্রাটের এই পরিকল্পনা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর তাতে এত অর্থের প্রয়োজন হোত যে সমগ্র পৃথিবীর ধনরত্ন একত্র করলেও নিখুঁতভাবে করে তোলা যেত না। কাজেই সে পরিকল্পনা অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে। কেবলমাত্র পত্রালিসহ তিনগুচ্ছ আঙ্গুর তৈরী হয়েছিল। বাকীগুলিও ঐ ধরনেই হবে এমন প্রস্তাব ছিল। যে কয়টি আঙ্গুরের রূপ রচিত হয়েছিল তা মরকত ও পদ্মরাগ মণি, গ্রাণিট পাথর ইত্যাদি দিয়ে। ঠিক স্বাভাবিক আঙ্গুরের মত বর্ণবাহার নিযে ধরা দিয়েছিল। চত্বরটির মাঝখানে বিরাট একটি চৌবাচ্চার মত রয়েছে স্নানের জন্য। তার ব্যাস চল্লিশ ফুট। গোটাটি ধূসর বর্ণের প্রস্তরে গড়া। তাতে নামা ওঠার জন্য প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী আছে।

আগ্রা সহরে ও তার আশে পাশে যে সকল সৌধ আছে তা অতীব রমণীয়। বাদশার হারেমে এমন একটি খোজা নেই যার মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ রেখে যাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হয়নি। বস্তুতঃ তাদের হাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হলে তারা মক্কায় গিয়ে মহম্মদকে শ্রদ্ধার্ঘ্যদানের জন্য ব্যগ্র হতেন। কিন্তু মহান মুঘল সম্রাটগণ দেশের টাকা বিদেশে চলে যায় তা সমর্থন করতেন না। ফলে এরা কচ্চিৎ কখন তীর্থ যাত্রার অনুমতি লাভ করতেন। সুতরাং সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করার কোন সুযোগ না পেয়ে তারা (খোজা) শেষ পর্য্যন্ত একটি করে স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করে যেতেন নিজেদের স্মৃতিকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে।

আগ্রার সমস্ত স্মৃতিসৌধ মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার ও জাকাঁলো হচ্ছে শাহ্জাহান পত্নীর সমাধি সৌধ। এই সৌধটি তাসিমাকানের কাছে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে হয়েছিল নির্মিত। তাসিমাকান হোল একটি বৃহৎ বাজার। ওখানে আগন্তুকরা সকলেই আসবেন এবং সৌধটি দেখে প্রশংসা করবেন, এই ছিল উদ্দেশ্য। ওখানে ছয়টি বিরাট চত্বর। আর সবগুলিই বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত। বারান্দাগুলিতে বণিক ব্যবসায়ীরা তাঁদের মালপত্র মজুত রাখেন। ওখানে আশ্চর্য্য রকমের ও প্রচুর পরিমাণে সূতীবস্ত্র ক্রয় বিক্রয় হয়। বেগম সাহেবার এই স্মৃতিসৌধটি নদীতীরে সহরের পূর্বদিকে দণ্ডায়মান। প্রাচীর বেষ্টিত বিরাট এক ভূখণ্ডে এর অবস্থান। ইউরোপের অধিকাংশ সহরেই প্রাচীরের উপরে যেমন গ্যালারীর মত স্তরে স্তরে কক্ষরাজি থাকে, এখানেও ঠিক সেই রকমটি আছে। আমাদের দেশে উদ্যান যে রকম নানা-ভাবে বিভক্ত থাকে এটিও ঠিক সেইভাবে ভাগ করা। তবে আমাদের উদ্যান বাটিকার শ্বেতকৃষ্ণ মর্মরে বাঁধানো।

একটি প্রকাণ্ড ফটক দিয়ে ঢুকলেই দূরে বাঁদিকে দেখা যাবে চমৎকার একটি গ্যালারীর মত কিছু। যেন মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। ওখানে তিন চারটি কুলুঙ্গীর ন্যায় জায়গা আছে। নির্দ্দিষ্ট একটি সময়ে কোরাণ ব্যাখ্যাত জনৈক সুফ্তী সেখানে নমাজ করতে আসেন। জায়গাটির মধ্য কেন্দ্রের সামান্য ওধারে নদীর কাছাকাছি জায়গাতে তিনটি ভিত্তি স্তর রয়েছে পর পর সাজানো। তার চার কোণে চারটি মিনার বা ছোট গম্বুজ। প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে যাবার সিঁড়ি বা সোপান শ্রেণী। সিঁড়ি দিয়ে মিনারের চূড়ায় উঠে তাঁরা নমাজের পূর্ব্বে আজান দেন অর্থাৎ সকলকে প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ

করেন। মাঝখানেও সকলের উপরে একটি গম্বুজ। প্যারিসের ভাল্ দে গ্রেসের চেয়ে এর জাঁকজমক কিছু কম নয়। এর ভিতর বাহির দুই-ই কালো রংএর আভাযুক্ত মর্মর প্রস্তরে আবৃত। ভেতরের গাঁথুনি ইঁটের। গম্বুজের অভ্যন্তরে শূন্য একটি সমাধিক্ষেত্র। বেগমের মৃতদেহ একেবারে নিম্নভিত্তির খিলানের তলায় রয়েছে স্থাপিত। সেখানে যা কিছু অনুষ্ঠান ও পরিবর্ত্তনাদি হয় তা উপর থেকেও সমানভাবে দেখা যায়। সমাধির আবরণ বস্ত্র, দীপ ও অন্যান্য অলঙ্কার পত্রের পরিবর্ত্তন হয় অনবরত। মোল্লারা সর্ব্বদাই হাজির থাকেন প্রার্থনা করার জন্য। আমি এই সমাধি সৌধটির নির্মাণ কার্য্য শুরু থেকে শেষ অবধি সবই দেখার অবকাশ পেয়েছিলাম। এটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে সময় লেগেছিল বাইশ বছর; আর বিশ হাজার লোকের নিরবচ্ছিন্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম। সুতরাং অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কল্পনা করাও দুরূহ ব্যাপার। শাহজাহান নিজের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করাতে আরম্ভ করিয়েছিলেন যমুনার ওপারে। কিন্তু পুত্র ঔরংজেবের যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সে কল্পনা ও চেষ্টা সার্থক ও সফল হতে পারে নি। এখন ঔরংজেব রাজতক্তে সমাসীন হয়েও সেটিকে সম্পূর্ণ করে তুলতে আগ্রহশীল নন। একজন খোজা আছেন যার অধীনে দু'হাজার লোক। তিনি সেই জনবাহিনী দ্বারা শাহজাহান পত্নীর সমাধিক্ষেত্রই কেবল রক্ষা করেন না, তাসিমকান বাজারটিকে দেখা-শোনা করেন।

আগ্রা সহরের অনতিদূরে অবস্থিত আছে সম্রাট আকবরের সমাধি। খোজাদের সমাধিতে একটি ভিত্তি স্তরের উপরে চার কোণে চারটি ক্ষুদ্র কক্ষ থাকে। দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে রাস্তায় একটি বাজার আছে। তার কাছেই একটি উদ্যান। সেখানে শাহজাহানের পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর সমাধি শয়নে শায়িত। বাগিচার ফটকের উপরেই সমাধি স্তম্ভটি বিদ্যমান। নানা প্রতিকৃতি চিত্র দিয়ে তা অলংকৃত। শবাধার একটি আচ্ছাদনে আবৃত। সাদা মোমবাতিতে স্থানটি আলোক দীপ্ত। তার দু'পাশে দু'জন জেসুইটের দাঁড়ান মূর্তি খোদিত। এই দেখে অনেকে হয়ত বিস্মিত হবেন যে ইসলামী নীতিতে মনুষ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে নিষেধ ও বিতৃষ্ণা রয়েছে তা উপেক্ষা করেই ওখানে নানা মূর্ত্তি প্রতিকৃতি চিত্রিত ও উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। তার একটি কারণ অনুমান করা যায় যে শাহজাহান ও তাঁর পিতা উভয়েই জেসুইটদের কাছে গণিত বিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের কতকগুলি বিশেষ তত্ত্ব

সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। আর সেই সহায়তার কথা স্মরণ করেই হয়ত এই মূর্ত্তি খোদিত হয়েছিল। তবে সব সময় কিন্তু সম্রাট জেসুইদের প্রতি দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রদর্শন করেননি।

সম্রাট শাহজাহান একদিন কর্জিয়া নামে একজন পীড়িত আর্মেনীয়কে দেখতে গিয়েছিলেন। সম্রাট একে খুব ভালবাসতেন। নানা রাজ কার্য্যে তাঁকে নিযুক্ত করে সম্মানিতও করেছিলেন। কর্জিয়ার বাড়ীর পাশেই থাকতেন জেসুইটগণ। সম্রাট যখন পীড়িত কর্জিয়ার ওখানে ছিলেন তখন জেসুইটদের আবাসে প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে চলছিল। সেই ঘণ্টা ধ্বনি শুনে সম্রাট বিরক্ত হয়ে মনে করলেন অসুস্থ লোকের পক্ষে ঐ শব্দ ক্ষতিকর। তারপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তেজনা সহকারে হুকুম দিলেন ঘণ্টাটিকে কেড়ে এনে তাঁর হাতীর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। আবার কিছুকাল পরে হাতীর গলায় সেই ভারী ঘণ্টা দেখে বিচলিত হলেন এই ভেবে যে ঘণ্টার ওজনে হাতীটির ক্ষতি হতে পারে। তখন আবার হুকুম দিলেন ওটিকে খুলে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাওয়া হোক্। কোতোয়ালী একটি রেলিং বেষ্টিত স্থান। সেখানে নগরের শান্তি রক্ষক বসেন বিচারকের আসনে; আর সেই পল্লীর অধিবাসীদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার করেন। সেখানেই ঘণ্টাটি স্থায়ীভাবে স্থান পেল।

সেই আর্মেনীয়টি শাহজাহানের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি চমৎকার বুদ্ধি বৃত্তিরও পরিচয় দিতেন। আরও হয়েছিলেন সুকবি। সম্রাটের যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। সম্রাট তাঁকে নানাভাবে সম্মানিতও করেছিলেন। কিন্তু কোন আশা ভরসা দিয়ে বা ভীতি প্রদর্শন করে—কোন প্রকারেই তাঁকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি।

অধ্যায় আট

আগ্রা থেকে পাটনা ও বাংলা প্রদেশের ঢাকা যাত্রা। সম্রাটের মাতুল শায়েস্তা খানের সংগে গ্রন্থাকারের বিবাদ বিসম্বাদ।

আগ্রা থেকে বাংলাদেশের দিকে আমি রওনা হয়েছিলাম ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নভেম্বর। আর সেই দিনটিতে আমি মাত্র তিন ক্রোশ পথ চলে একটি অতি বিশ্রী সরাইখানাতে পৌঁছোতে পেরেছিলাম। ২৬শে তারিখে পৌঁছোলাম ফিরোজাবাদে। এটি ছোট সহর। আমি এখানে জাফর খাঁর কাছ থেকে আট হাজার টাকা পেয়েছিলাম। জাহানাবাদে তাঁর কাছে জিনিসপত্র বিক্রী করে এই টাকা পাওনা হয়েছিল।

ওখান থেকে আরও কয়েকটি জায়গা পেরিয়ে ১লা ডিসেম্বর পৌঁছোই সংকুয়ালে। এই দিনটিতে আমি ১১০টি মালবাহী শকট দেখবার সুযোগ পাই। প্রতিটি গাড়ী টেনে নিচ্ছিল দু'টি করে বলীবর্দ্দ। এক একটি গাড়ীতে ছিল পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা। বাংলাদেশের রাজস্ব। সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ এবং সুবাদারের পকেট ভালভাবে ভর্ত্তি হয়ে তারপর পাঁচ কোটি, পাঁচ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। সুংকুয়ালএর এক লীগ দূরে সৈনগুর নামে একটি নদী প্রস্তরময় সেতুর উ .র দিয়ে অবশ্যই পার হতে হবে। কাউকে যদি বাংলা দেশ থেকে সিরোঞ্জ বা সুরাটের দিকে যেতে হয় এবং ভ্রমণ পথকে দশ-দিন আন্দাজ সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছে থাকে তাহলে তাঁকে অবশ্যই আগ্রার পথ ত্যাগ করে এই সেতু পার হয়ে যমুনাতে খেয়া পার হতে হবে। অন্য রাস্তা ধরে যেতে হলে এক নাগাড়ে পাঁচ কি ছয় দিন পাথরের উপর দিয়ে চলতে হয়। তাছাড়া এই পথে গেলে এমন সব রাজার রাজ্য মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেখানে ডাকাতের হাতে পড়ার বিশেষ আশংকা।

দ্বিতীয় দিনে আর একটি সরাইতে পৌঁছোই। দূরত্ব প্রায় বার ক্রোশ। অর্দ্ধেক রাস্তা চলার পরে গিয়ানাবাদ নামে একটি ছোট সহরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সহরটি থেকে প্রায় এক চতুর্থাংশ লীগ দূরে রাস্তার দিকে জোয়ারের ক্ষেত আছে। সেখানে দেখলাম একটি গণ্ডার জোয়ারের ডাঁটা খেতে ব্যস্ত। নয় দশ বছরের এক বালক ওকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। আমি বালটির কাছে যেতে সে আমাকে কিছু জোয়ার দিল গণ্ডারকে খাওয়ানোর জন্যে। ঐ দেখে জন্তুটি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে এসে চোয়াল

খুলে হাঁ করলো, আর আমি জোয়ারগুলি ওর মুখে পুরে দিলাম। ওগুলি খেয়ে আবার মুখ খুললো আরও খাদ্যের জন্যে।

তারপর ৫ই ডিসেম্বর বেশ বড় একটি সহর ঔরংগাবাদ পৌঁছোই। সহরটির পূর্ব্বে অন্য নাম ছিল। এখানেই ঔরংজেব তাঁর ভ্রাতা সুলতান সুজার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। সুজা ছিলেন সুবে বাংলার শাসনকর্ত্তা। সুজার সংগে যুদ্ধে জয় লাভের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করার জন্য ঔরংজেব নিজের নামানুসারে এ স্থানের নাম করলেন ঔরংগাবাদ। আর ওখানে উদ্যান সমন্বিত সুন্দর একটি আবাস ও ছোট একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করান।

৬ই তারিখে আলমচাঁদ। এই স্থানটির দু'লীগ ওধারে গঙ্গা নদীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সম্রাটের চিকিৎসক মসিয়ে বার্ণিয়ে, আর একটি লোক যাঁর নাম র‍্যাচ্‌পো আর আমি একত্রে ভ্রমণ কচ্ছিলাম। ওঁরা দু'জনে গঙ্গা নদী দেখে তো অবাক। ভাবলেন, এই নদীটিকে নিয়ে বিশ্ব শুদ্ধ এত কোলাহল! এটা তো ল্যুভরের সামনে সীন নদী থেকে এতটুকুও প্রশস্ত নয়। এটি হোল বেলগ্রেডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দানিউবের মত চওড়া। গঙ্গা নদীতে মার্চ্চ মাস থেকে জুন, জুলাই পর্য্যন্ত জল এত কম থাকে যে বৃষ্টি পাতের আগে পর্য্যন্ত ছোট নৌকাও চলতে পারে না। আমরা গঙ্গা তীরে পৌঁছে সকলেই এক এক গ্লাস সুরার সংগে নদীর জল মিশিয়ে পান করেছিলাম। ফলে আমাদের পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। আমাদের ভৃত্যরা শুধুমাত্র গঙ্গাজল পান করাতে তাদের পেটে ব্যথা যন্ত্রণা আমাদের তুলনায় ঢের বেশী হয়েছিল। এই নদীর তীরে যে সকল ওলন্দাজ বাস করেন তারা নদীর জল না ফুটিয়ে পান করেন না। কিন্তু এদেশের স্থায়ী বাসিন্দারা শিশুকাল থেকে এই জল খেতে অভ্যস্ত। রাজা বাদশা থেকে মন্ত্রী সভার সদস্যরা সকলেই এই জল পান করেন। প্রচুর উট দেখা যায় প্রতিদিন। ওদের কাজ হোল গঙ্গার জল বহন করে নিয়ে যাওয়া।

৭ই পৌঁছোলাম এলাহাবাদে। সহরটি বেশ বড়। এমন একটি কেন্দ্রে এ সহর অবস্থিত যেখানে গঙ্গা ও যমুনা নদী মিলিত হয়েছে। খণ্ড খণ্ড প্রস্তরে গঠিত চমৎকার একটি দুর্গ আছে দুই স্তরের পরিখা বেষ্টিত। এই কেল্লাতেই প্রদেশপাল বাস করেন। তিনি সমগ্র ভারতের একজন প্রধান শাসক ও সুবাদার। ইনি অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় তাঁর কাছে সর্ব্বদা দশজন পারসীক চিকিৎসক থাকেন। এছাড়া আরও নিযুক্ত হয়েছেন ক্লডিয়াস মেলি অব্

বোর্জেস্। ইনি শল্য চিকিৎসায় ও সাধারণ রোগ নিরাময়ে দুইএতেই সুনিপুণ। ইনি আমাদের গঙ্গার জল পান করতে বারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন উহাতে পেটের গোলমাল সৃষ্টি হয়। ওর চেয়ে বরং কূয়োর জল পান করা ভাল।

প্রদেশপাল নিয়োজিত পারস্য দেশীয় চিকিৎসক গোষ্ঠীর নেতা একদিন গৃহ প্রাচীরের উপর থেকে তাঁর স্ত্রীকে ফেলে দিয়েছিলেন মাটিতে। তাঁর মনে কতকগুলি ঈর্ষামূলক ভাবের জন্যই তিনি ঐ নিষ্ঠুর কাজ করেন। মনে করে-ছিলেন সেই পতনের ফলে মহিলার মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তা হয়নি। পাঁজরে আঘাত লেগেছিল, আর সামান্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। এই ঘটনার পরে মহিলাটির আত্মীয় স্বজনরা এসে প্রদেশপালের কাছে দাবী জানান। তিনি চিকিৎসককে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে আর কার্য্যে বহাল রাখা হবে না বলে বিদায় দিলেন। তিনি সেই আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করে বিকলাঙ্গ স্ত্রীকে পাল্‌কিতে বসিয়ে পরিবার বর্গসহ পথযাত্রা শুরু করলেন। কিন্তু তিন চার দিনের যাত্রা সমাপ্ত হতে না হতে এদিকে সুবাদার আরও বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অথচ এরকমটা হওয়াব কথা ছিল না। চিকিৎসক ব্যাপারটা উপলব্ধি করে স্ত্রী, চারটি সন্তান ও তেরজন ক্রীতদাসকে ছুরিকা দ্বারা নিধন করে ফিরে এলেন প্রদেশ পালের কাছে। তিনিও একটি কথা না বলে আবার তাঁকে সাদরে স্বীয় কার্য্যে বহাল করলেন।

অষ্টম দিবসে সুবৃহৎ একখানি নৌকা করে নদী পার হলাম। সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত অপেক্ষমান ছিলাম এই আশাতে যে ম'সিয়ে মেইসী প্রদেশপালের কাছ থেকে আমার জন্য পাসপোর্ট নিয়ে আসবেন। নদীর দুই তীরে একজন করে দারোগা আছেন। কোন লোককেই তিনি অনুমতি পত্র ব্যতীত ঐ স্থান অতিক্রম করতে দেবেন না। এছাড়া কি জাতীয় জিনিসপত্র আনা নেয়া চলছে তাও তিনি দেখেন। প্রতিটি মালবাহী শকটের জন্য চার টাকা ও মনুষ্যবাহী গাড়ীর জন্য এক টাকা করে শুল্ক দিতে হয়। নৌকোতে পারাপারের জন্য যা দিতে হবে তা স্বতন্ত্র। গাড়ীর সংগে তা যুক্ত নয়। ঐ দিনেই আমি গিয়েছিলাম শাহদুলসরাই। তারপরে আরও দু'টি সরাই হয়ে বারাণসী।

বারাণসী মস্ত বড় একটি সহর এবং অত্যন্ত সুগঠিত ও সুন্দর। অধিকাংশ ঘর বাড়ী ইঁট বা প্রস্তরে নির্মিত। ভারতের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানকার

৬

বাড়ীগুলি অনেকটা উঁচু। কিন্তু অসুবিধা হোল রাস্তাগুলি বড় বেশী সরু। সহরের মধ্যে অনেক সরাইখানা ও হোটেল আছে। বাকী গৃহাবাসের মধ্যে বিরাট ও রমণীয়রূপে নির্মিত একটি জায়গা আছে। সেখানে চত্বরের মধ্যে গ্যালারীর মত সাজানো অনেক ঘর। সে সব ঘরে সূতীবস্ত্র, রেশমী কাপড় ও আরও অন্যান্য সব পণ্যদ্রব ক্রয় বিক্রয় হয়। বিক্রেতাদের বেশীর ভাগ কারিগর সম্প্রদায়ের লোক। প্রথম পাতে ব্যবসায়ীরাই জিনিসপত্রগুলি কেনেন। যে কোন জিনিস বাজারে বিক্রীর জন্য হাজির করার আগে সহরের শাসনকর্ত্তার কাছে নিয়ে সম্রাটের সীলমোহর দিতে হয়; আর তা বিশেষ করে দিতে হয় লিনেন ও রেশমী কাপড়ে। এই কাজটি না করলে তাদের জরিমানা দিতে হবে, না হয়তো বেত্রাঘাত সহ্য করতে হবে। এই সহরটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। নদীটি সহরের প্রান্ত প্রাচীর ধরে প্রবাহিত। আর একটি নদী এসে গঙ্গায় পড়েছে প্রায় দুই লীগ পশ্চিমদিকে। হিন্দুদের প্রধান মন্দির-গুলির একটি বারাণসীতে অবস্থিত। আমি যখন বেনিয়া সমাজের ধর্ম্মাদর্শের কথা আলোচনা করবো তখন এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এখানকার মন্দিরের বর্ণনা দেব।

সহরের উত্তর প্রান্তে প্রায় ৫০০ পদক্ষেপমত দূরে একটি মসজিদ আছে। ওখানে মুসলমানদের কবরখানাও রয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি সমাধি স্তম্ভ অতি সুন্দর স্থাপত্য নিদর্শন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট যেটি সেটি রয়েছে দেয়াল ঘেরা একটি উদ্যানের মাঝখানে। তাতে আধ ফুট মাপের চৌকো সব ফোকর আছে। ঐ ফাঁকা দিয়ে মূল কবরটি দেখা যায়। সবচেয়ে দেখার মত হচ্ছে চারটি চতুষ্কোণ ভিত্তিস্তর। প্রতিটি স্তর প্রায় চল্লিশ পদক্ষেপ আন্দাজ চওড়া। সেই ভিতের উপরে খাড়া হয়ে উঠেছে একটি স্তম্ভ। উচ্চতায় বত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ ফুট, ব্যাস এমন যে তিনজন লোকের পক্ষে বেষ্টন করা সম্ভব নয়। যে প্রস্তরে গঠিত তা ধূসর বর্ণের ও এত সুদৃঢ় যে আমি অনেক চেষ্টা করেও ছুরি দিয়ে একটি আঁচড় কাটতে পারিনি। স্তম্ভটির শীর্ষদেশ পিরামিডের মত। সব কিছুর উপরে একটি গোলাকার পাথর। পাথরটির মাথায় বড় বড় গমের দানা বসানো। স্তম্ভের মুখপাত প্রস্তর খোদিত পশুমূর্ত্তিতে আকীর্ণ। এখন ভিতকে যতটা উঁচু দেখা যায় আগে তার চেয়ে ঢের বেশী উঁচু ছিল। কারণ অনেক সুপ্রবীণ লোক যাঁরা এই সমাধিগুলিকে সুদীর্ঘকাল আগে থেকে দেখেছেন, তাঁরা আমাকে বলেছেন যে ত্রিশ ফুটেরও

অধিক মাটির তলায় বসে গিয়েছে বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে। তাঁরা আরও বলেছেন যে এই সমাধিটি হোল ভুটানের কোন রাজার।* তিনি এখানে সমাধিস্থ হওয়ার কারণ তিনি তৈমুরলঙের কোন বংশধর দ্বারা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এই রাজ্যটি জয় করতে এসেছিলেন। ভুটান রাজ্য থেকে এদেশীয়রা মুখোস সংগ্রহ করেন। আমি এ বিষয়ে তৃতীয় ভাগে বর্ণনা দেব।

বারাণসীতে আমি ১২ই, ১৩ই দু'দিন ছিলাম। ঐ দু'দিন ওখানে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হয়েছিল। তবে আমার যাত্রা তাতে বন্ধ হয়নি। সুতরাং ১৩ই তারিখে সন্ধ্যাবেলা আমি গঙ্গা পার হয়েছিলাম শাসনকর্ত্তার অনুমতি পত্র-সহ। নৌকোতে উঠবার সময় যাত্রীদের মালপত্র তল্লাসী করা হয়। নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র পোষাকের জন্য কোন শুল্ক দিতে হয় না। শুল্ক দিতে হয় ক্রয় বিক্রয়ের পণ্যদ্রব্যাদির জন্য।

১৫ই গিয়ে পৌঁছোলাম মোহনিয়া সরাইতে। ঐদিন সকালে দু'লীগ পথ চলার পরে একটি নদী পার হতে হয়েছিল। নাম কর্ম্মনাশা। তিন লীগ পরে দুর্গাবতী নামে আর একটি নদী। দু'টি নদীই পায়ে হেঁটে পার হই। ১৬ তারিখে পৌঁছোলাম গুর্মাবাদ নামে একটি সহরে। কুদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। নদী পার হওয়ার জন্য সেতু আছে।

১৭ই হাজির হলাম সাসারামে। পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত সহর এটি। কাছেই বিরাট একটি হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে ছোট একটি দ্বীপ। আর সেখানে চমৎকার একটি মসজিদ। তার মধ্যে শের খান নামে এক নবাবের সমাধি দেখতে পাওয়া যাবে। তিনি ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নিজেই সমাধি সৌধটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। দ্বীপটিতে যাতায়াতের জন্য সুন্দর একটি সেতু আছে। খণ্ড খণ্ড বড় পাথর দিয়ে আবৃত। হ্রদের এক পাশে সুবৃহৎ একটি উদ্যান। তার কেন্দ্রস্থলে মনোরম আর একটি সমাধি স্থান দেখা যায়। সেটি নবাব শের খাঁর পুত্রের। পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রের উপরেই ওখানকার শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল। যদি কেউ সুলেমানপুরে আমার রাস্তা ধরে যেতে চান তাহলে আমি সে সম্বন্ধে শেষ অধ্যায়ে বর্ণনা দেব। তাঁকে অবশ্যই তখন পাটনার বড় সড়ক ত্যাগ করে

---

* চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েনসঙ এটিকে দেখেছিলেন সহরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে। এটি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের এক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হয়েছে। লাট ভৈঁরো নামে এটি পরিচিত এবং অশোকের শিলালেখ যুক্ত।

এগোতে হবে এবং রাস্তা পরিবর্তন করে দক্ষিণ দিকে আকবরপুর এবং বিখ্যাত রোটাস্ দুর্গের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এ সম্বন্ধেও শেষ খণ্ডে বলবো।

খেয়া নৌকো করে শোণ নদী পার হয়েছিলাম ১৮ই তারিখে। নদীটি দক্ষিণ দিকের একটি পর্ব্বত থেকে উদ্ভূত। নদী পার হয়েই পণ্যদ্রব্যের জন্য শুল্ক দিতে হয়। ঐ দিনেই আমি যাত্রা করেছিলাম দাউদনগর সরাইতে (গয়া জেলায়)। ওখানেও চমৎকার একটি সমাধি স্তম্ভ আছে। ২০শে তারিখে আর একটি সরাইতে পৌঁছে সকালবেলায় দেখলাম ছোট বড় মিলিয়ে একশ' ত্রিশটি হাতীর দল। এই হস্তীবাহিনীকে তারা নিয়ে চলেছিলেন দিল্লীতে মহানুভব মুঘল সম্রাটের কাছে।

পাটনায় পৌঁছে যাই ২১শে। ভারতের বৃহত্তম সহরগুলির মধ্যে পাটনা একটি। পশ্চিম দিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। সহরটি দৈর্ঘ্যে দুই লীগের কম নয়। ভারতের অন্য বড় সহরের বাড়ী ঘরের মত এখানকার গৃহাবাস সুন্দর নয়। এখানে ঘর বাড়ী অধিকাংশ খড় বাঁশে তৈরী। ওলন্দাজ কোম্পানীর একটি কুঠী আছে এখানে। তাঁরা এখানে যবক্ষার বা শোরার ব্যবসা চালান। পাটনা থেকে দশ লীগ ওধারে গঙ্গার উপরেই ছাপরা নামে একটি সহরে শোরা শোধন ও নির্মল করা হয়।

পাটনায় গিয়ে আমরা ওলন্দাজদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। দেখা হয়েছিল ছাপরা থেকে ফেরার পথে। তাঁরাই রাস্তায় আমাদের গাড়ী থামিয়েছিলেন অভিবাদন জ্ঞাপনের জন্য। খোলা রাস্তায় দুই বোতল সিরাজী মদ্য যতক্ষণে শেষ না হোল ততক্ষণ তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া সম্ভব হয়নি। তাতে ওখানে কেউ কিছু মনে করেনি। কোন নিয়ম কানুনের বাধ্যতায় না গিয়েই একে অপরের সংগে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় করতে পারেন।

আমি পাটনায় ছিলাম আট দিন। তার মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার বিবরণ শুনে পাঠকমণ্ডলী উপলব্ধি করতে পারবেন যে মুসলমানদের যৌন ব্যাপারে কোন অস্বাভাবিকতা একেবারেই ক্ষমার্হ নয়। জনৈক মিঙ্‌বাসীর (তুর্কী) অধীনে এক হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। নিজের কুপ্রবৃত্তি বশতঃই তিনি একদিন নিজের অধীনস্থ এক বালককে গালমন্দ করেন। বালক মনিবের কু-অভ্যাসকে বহুবার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করার পরে শাসনকর্ত্তার কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন যে তিনি (মনিব) যদি তাঁর স্বভাবব্যবহার পরিবর্ত্তন না করেন তাহলে সে তাঁকে হত্যা করবে। এর

পরেও সেনাপতি সুযোগ নেবার চেষ্টা করেন এবং গ্রামাঞ্চলের একটি ঘরে বালকটির উপর বলপ্রয়োগ করেছিলেন। বালকটি রাগে দুঃখে আত্মহারা হয়ে যায়। আর সুযোগমত প্রতিশোধ নেবার অপেক্ষায় থাকে। এর পরে একদিন মনিবের সংগে শিকারে গিয়ে অন্যান্য ভৃত্যদের থেকে প্রায় এক-চতুর্থাংশ লীগ দূরে তাঁর পেছনে পেছনে থাকলো। সুযোগ বুঝে হঠাৎ তলোয়ার চালিয়ে মনিবের মাথাটি কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। হত্যাকাণ্ড সমাধা করে সে দ্রুত বেগে সহরের দিকে ছুটে গিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, কেঁদে কেঁদে মনিবকে হত্যার কথা বর্ণনা করতে লাগলো। খানিক পরে সে নিজেই শাসনকর্ত্তার গৃহে হাজির হলে তিনি ওকে বন্দী করে বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ছয় মাস পরে আবার মুক্তি প্রদান করেন। সেনাপতির আত্মীয় স্বজনরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন বালকটিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য। কিন্তু শাসনকর্ত্তা তা করতে সাহস পেলেন না। আর তা পাননি জনসমাজের ভয়েই। কারণ তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বালকটি উত্তম কাজই করেছে।

আমি নৌকো করে পাটনা ছেড়ে রওনা হলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। দিনটি ছিল ২৯শে জানুয়ারী; সময় বেলা এগারটা থেকে বারটার মধ্যে। বর্ষাকালের পর যে রকম নদীর জল সুগভীর হয় সেরকমটা হলে আমাকে এলাহাবাদ অথবা নিতান্ত বারাণসী থেকেও নৌকারোহণ করতে হোত।

সেই দিনই বৈকুণ্ঠপুর সরাইতে এলাম বিশ্রামের জন্য। বৈকুণ্ঠপুরের পাঁচ লীগ দূরে একটি নদী, নাম পুনপুন বা ফতোয়ানালা। এটি দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। ৩০শে ডিসেম্বর পৌঁছোলাম দেরিয়াসরাই।

৩১শে তারিখে চার লীগ আন্দাজ চলার পরে আমরা দক্ষিণ দিক থেকে আগত আর একটি নদী দেখতে পেলাম। তিন লীগ নীচে আরও একটি নদী আছে নাম চন্দুখাল। এটি এসেছে উত্তর দিক থেকে। আরও চারলীগ ব্যবধানে দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তিলগুজা নদী। পরিশেষে দেখলাম যে ছয় লীগ পর করগরিয়া নদীও ঐ অঞ্চল ধরেই এগিয়ে এসেছে। এই চারটি নদীই গঙ্গায় মিশে নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেছে। সারাদিন ধরেই আমি দক্ষিণমুখো বিরাট এক পর্ব্বতমালা দেখতে পেলাম। গঙ্গা নদী থেকে তার দূরত্ব কখনও দশ, কখনও পনের লীগ। তারপরে মুঙ্গেরে পৌঁছে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিনটিতে আমি দু'ঘণ্টা জলপথ অতিক্রম করে দেখলাম যে গণ্ডক উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে গঙ্গায় মিশেছে। গণ্ডক বিশাল নদী এবং তাতে নৌকো চলাচল করে।

সন্ধ্যার দিকে জঙ্গিরা পৌঁছে যাই। গঙ্গানদীর বাঁকগুলি হিসেব করে বলা যায় জলপথে জঙ্গিরা বাইশ লীগ দূরে।

দ্বিতীয় দিনে সকাল ছয়টা থেকে এগারটা পর্য্যন্ত আমি তিনটি নদী দেখেছিলাম। সব কয়টিই উত্তর দিক ধরে নেমে এসে গঙ্গায় বিলীন হয়েছে। প্রথমটি নাম রনোভা, দ্বিতীয়টি তাই-ই, আর তৃতীয়টি হচ্ছে চন্দন।

এবারে ভাগলপুর। তৃতীয় দিনে চার ঘণ্টা গঙ্গার উপরে কাটিয়ে আমি কোশী নদীর সাক্ষাৎ পেলাম। এটির উৎসস্থলও উত্তর দিকে এবং এগিয়ে চলেছে আধুনিক সক্ড়ীগলিঘাট নামে একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে এবং কতকগুলি পর্ব্বতের পাদদেশ ধরে। এই নদীটিও গঙ্গায় অবতরণ করেছে।

সকড়িগলিঘাট ছেড়ে চার তারিখে একঘণ্টা নৌকোতে চলে আমি কালিন্দ্রী (সম্ভবতঃ) নামে দক্ষিণ দিক থেকে একটি নদী দেখেছিলাম। তারপরে রাজমহল হোল আমার বিশ্রামস্থল।

রাজমহল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি সহর। স্থল পথে গেলে বড় একটি রাজপথ পাওয়া যাবে। সহরের দিকে এক লীগ কি দুই লীগ পর্যন্ত ইঁট দিয়ে বাঁধানো। বাংলার শাসনকর্ত্তা একদা এখানে বাস করতেন। জায়গাটি শিকারের পক্ষে চমৎকার। ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রচলন আছে ওখানে। কিন্তু অধুনা নদীটির গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সহর থেকে প্রায় আধ লীগ দূরে চলে যাওয়ায় এবং আরাকানের রাজা ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপীড়ন অত্যাচারের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে শাসনকর্ত্তা নিজে এবং সওদাগর বণিকেরাও সব ঢাকায় চলে গিয়েছেন। ঢাকা এখন যেমন বিরাট সহর, তেমনি আবার বড় ব্যবসা ক্ষেত্র। পর্ত্তুগীজ ও আরাকানী দস্যুরা এখন গঙ্গার মোহনামুখে সরে গিয়েছে। তারা ঢাকা সহর পর্য্যন্তও যায়।

৬ই তারিখে রাজমহলের ছয় লীগ দূরে দোনপুর নামে একটি বড় সহরে পৌঁছোই। তখন আমি মঁসিয়ে বার্ণিয়ের কাছে বিদায় নিলাম। তিনি কাশিমবাজার গেলেন। পরে যাবেন স্থল পথে হুগলী। নদীতে যখন জল কম থাকে তখন নৌকোতে করে যাওয়া চলে না। এই রকমটা হয়েছিল

সুতী (মুর্শিদাবাদ) নামে একটি সহরের সামনে। ওখানে নদীতে বিরাট এক চড়া পড়েছিল।

আমি সেই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম রাজমহল থেকে কিছু দূরে তর্তিপুরে। সূর্য্যোদয় হতে দেখলাম নদীর চড়ায় কতকগুলি কুমীর শুয়ে আছে। সাত তারিখে পৌঁছে গেলাম হাজরা হাটে।

স্থলপথে হাজরাহাট থেকে ঢাকার দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ লীগ। সারাদিন ধরে এত বেশীসংখ্যক কুমীর দেখেছিলাম যে ইচ্ছে হয়েছিল একটিকে আমি গুলীবিদ্ধ করি। সাধারণ একটা মত শোনা যেত যে ছোট বন্দুকের গুলী কুমীরের চামড়া ভেদ করতে পারে না। এই কথার সত্যতা পরীক্ষারও ইচ্ছে হয়েছিল। একটি গুলী ছুঁড়লাম, একটি কুমীরের চোয়াল বিদ্ধ করে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হোল। তারপরে যে করে হোক ওটি স্থান ত্যাগ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পরের দিন আরও অনেক কুমীর নজরে পড়লো সব নদী তীরে শুয়ে আছে। আমি পরপর তিনটি গুলী ছুঁড়লাম ওদের লক্ষ্য করে। কয়েকটি আহত হোল, আর মুখ খুলে হাঁ করে কিছুটা পিছু হটলো এবং সেইখানেই মারা গেল।

ঐদিনই আমি দোলোদিয়াতে গিয়েছিলাম বিশ্রাম নেবার জন্য। ওখানে অনেক মাছ দেখতে পেলাম। কাকেরও খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। জেলেরা চুবড়ি ভর্ত্তি করে সব মাছ রেখে দিয়েছিল। সেখানেই কাক উড়ছে আর চীৎকার করে ডাকছে। আমাদের মাঝিরা তখনই বুঝে নিল ওখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে। তখন তারা অনেক খুঁজে পেতে এক থলে মাংসও আবিষ্কার করেছিল।

নয় তারিখে বেলা দ্বিপ্রহরেরও দু' ঘন্টা পরে আমরা একটি নদীর দেখা পেলাম, নাম ছাতিওয়ার। উত্তর দিক থেকে এগিয়ে এসেছে। আমরা বাসস্থান নিলাম দমপুরে। ১০ই আমরা লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে নদীতীরে কাটালাম, আর সারাদিনই প্রায় ভ্রমণে কাটলো।

১১ই সন্ধ্যার দিকে আমরা এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছোলাম যেখানে গঙ্গা নদী ত্রিধারায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা চলে গিয়েছে ঢাকার দিকে। সেই বিশাল নদীমুখে একটি বড় সহরে আমরা আশ্রয় নিলাম। সহরটির নাম যাত্রাপুর। যাঁদের সংগে বেশী মালপত্র থাকে না তাঁরা যাত্রাপুর থেকেই ঢাকা যেতে পারেন। তাতে অনেকটা পথ বেঁচে যায়। কারণ অন্য পথে নদীতে অনেক বাঁক আছে।

১২ই প্রায় মধ্যাহ্নে আমরা বাগমারা নামে এক গ্রাম পেরিয়ে বিশ্রামের জন্য চলে গেলাম কাজিহাটে। এ জায়গাটি সহর অঞ্চল। ১৩ই প্রায় দ্বিপ্রহরে ঢাকা থেকে দুই লীগ ব্যবধানে লক্ষা নামে একটি নদী দেখা গেল। ওটি উত্তর পূব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। যেখানে দু'টি নদীর মিলন হয়েছে ঠিক সেই জায়গাটির দু' পাশেই একটি করে কেল্লা আছে। অনেকগুলি কামানও রয়েছে দেখলাম। আধ লীগ আন্দাজ নীচে পাগলা নামে আর একটি নদীর স্রোত দেখা গেল। নদীর উপরে চমৎকার একটি ইটের তৈরী সেতু আছে। ওটি তৈরী হয়েছে মীর্জা মোল্লার দ্বারা। এটি এসেছে উত্তর পূর্বদিক থেকে। আরও আধ লীগ উপরে আর একটি নদী আছে, নাম কদমতলী। এটি এসেছে উত্তর দিক থেকে। এর উপরেও ইটের তৈরী পুল আছে। নদীর দু' পারেই অনেকগুলি করে গম্বুজ। মনে হয় তাতে অনেক নরমুণ্ড খোদিত রয়েছে। রাজপথে ডাকাতির জন্য প্রাণদণ্ডের স্মৃতিচিহ্ন মনে হোল। সারাদিন জলপথে কাটিয়ে প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ঢাকায় পৌঁছোলাম।

ঢাকা সহর খুব বড়। দৈর্ঘ্যেই সুবিস্তৃত। প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা ওখানে গঙ্গাতীরে একটি বাড়ী করবেন। সহরটি লম্বায় দুই লীগের উপরে। বস্তুতঃ শেষে যে ইষ্টক নির্মিত সেতুর কথা উল্লেখ করেছি সেখানে মাত্র এক সারি বাড়ীঘর আছে। প্রত্যেকটি বাড়ী স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। ওখানে বেশীর ভাগ অধিবাসী হোল ছুতোর মিস্ত্রী। তারা বড় বড় নৌকো ও অন্যরকম ছোট সব জলযান তৈরী করেন। এদের বাড়ীগুলি বাঁশ খড়ের কুঁড়ে ছাড়া আর কিছু নয়। দেয়ালগুলি মোটা করে মাটির লেপ দিয়ে তৈরী। ঢাকা সহরের বাড়ীঘরও এর চেয়ে বেশী একটা সুগঠিত নয়। শাসনকর্ত্তার (সুবাদার) প্রাসাদ বাড়ীটি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। তার মধ্যেও একটি বাড়ীর অবস্থা শোচনীয়। সেটিও পুরোপুরি কাঠ দিয়ে তৈরী। তিনি অবশ্য সাধারণতঃ তাঁবুতেই বাস করেন। তাঁবুটি খাটানো হয় সেই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের একটি বিরাট প্রাঙ্গণে। ওলন্দাজরা যখন দেখলেন যে ঢাকার সাধারণ বাড়ীতে জিনিসপত্র রাখা নিরাপদ নয় তখন তাঁরা নিজেদের জন্য ভারি চমৎকার একটি বাড়ী তৈরী করিয়ে নিয়েছেন। ইংরেজদেরও একটি কুঠী আছে; আর সেটি বেশ সুদৃশ্য। অস্টিন ফ্রায়ারের গীর্জাটি পুরোপুরি ইটে গড়া এবং অতি রমণীয় একটি স্থাপত্য।

আমি শেষবার যখন ঢাকা যাই তখন সুবে বাংলার তৎকালীন সুবাদার আরাকানের রাজার সংগে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। আরাকানরাজের নৌ বহরে ছিল দু'শ' সুবৃহৎ রণপোত এবং আরও অনেক ছোটখাট জলযান। সেই রণতরীর বহর বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করে। তখন ঢাকা সহর থেকেও উঁচুতে সাগরের জলোচ্ছ্বাস হয়। বর্ত্তমান মুঘল সম্রাট ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খান ছিলেন সুবাদার মহলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি একটি পন্থা আবিষ্কার করে আরাকানরাজের কয়েকজন সেনাপতিকে নীতিভ্রষ্ট করে তুললেন। এছাড়া হঠাৎ পর্ত্তুগীজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত চল্লিশখানি রণপোত এসে যোগ দিয়েছিল তাঁর বাহিনীর সংগে। এই সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের পক্ষে আরও বিশেষভাবে নিযুক্ত রাখার জন্য তিনি (খান সাহেব) সমস্ত পর্ত্তুগীজ উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে দিলেন। সৈন্যদেরও সেই অনুপাতে বেতন বৃদ্ধি পেল। কিন্তু নিজের দেশীয় সৈন্যদের তেমন বেশী কিছু হয়নি। একটি বিষয় খুব বিস্ময়কর হোল যে সেই নৌবহর কিরকম দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল। কতকগুলি নৌকা এত লম্বা ছিল যে এক একদিকে পঞ্চাশটি দাঁড় যুক্ত করতে হয়। এক একটি দাঁড়ে লোক দরকার হোত দু'জন করে। কতকগুলি নৌকো আবার চমৎকার-ভাবে সুচিত্রিত। তাতে সোনালী ও আশমানী নীল রংএর জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছিল। ওলন্দাজরা নিজেদের মালপত্র বহনের ব্যবস্থা নিজেরাই করতেন। কখনও আবার যানবাহন ভাড়াও করতেন। তাতে অনেক লোকের জীবিকার সংস্থান হোত।

পরদিন অর্থাৎ ১৪ই জানুয়ারী আমি ঢাকা সহরে পৌঁছেই গিয়েছিলাম নবাব সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করতে। তাঁকে আমি উপঢৌকন দিয়েছিলাম সোনার জরিতে তৈরী অর্থাৎ টিসু কাপড়ের একটি পোষাক। তার ঝালর ও কিনারা মণ্ডিত ছিল স্পেনদেশীয় সোনালী জরির সূতোতে। তাঁকে আরও দিলাম সোনালী রূপালী নক্সাযুক্ত একখানি চাদর বা অঙ্গাবরণ, আর সুন্দর একটি মরকত মণি। সন্ধ্যার দিকে আমি ওলন্দাজদের কুঠীতে ফিরে আসতে নবাব আমাকে পাঠিয়েছিলেন স্ফটিক পাথর, চীনে কমলালেবু, দু'টি পারসীক ফুটি এবং তিনরকম নাসপ্যাতি।

১৫ তারিখে আমি নবাবকে আমার জিনিসপত্র দেখিয়ে দিলাম। নবাব পুত্রকে উপহার দিলাম সোনার জলে মীনে করা বাক্সে একটি ঘড়ি,

রৌপ্যখচিত একজোড়া ছোট পিস্তল, অতি সুন্দর একখানি ম্যাগনিফাইং গ্লাস। পিতা পুত্রকে মিলিয়ে যা আমি দিয়েছিলুম তার মূল্য পাঁচ হাজার লিভারেরও বেশী ছিল। পুত্রটির বয়স আন্দাজ দশ বছর।

জিনিসপত্রের দাম সম্বন্ধে আমি চুক্তিবদ্ধ হলাম ১৬ই তারিখে। অবশেষে তাঁর গোমস্তার কাছে গেলুম আমার বিনিময় মুদ্রার জন্য চিঠি আনার উদ্দেশ্যে যাতে আমার প্রাপ্য টাকা আমি কাশিমবাজারে পেতে পারি। ঢাকাতে বসে তিনি টাকা দেবেন, কি দেবেন না তার জন্য আমি বিনিময় পত্রের আবেদন করিনি, করেছি একটি কারণে। ওলন্দাজগণের ব্যবসা বুদ্ধি আমার চেয়ে ঢের বেশী। তাঁরা আমাকে বললেন সংগে টাকাকড়ি নিয়ে কাশিমবাজার যাওয়া নিরাপদ নয়। আবার গঙ্গানদীর পথ ছাড়া যাবার দ্বিতীয় কোন উপায়ও নেই। স্থলপথ যা আছে তাও পাঁকে, জলায় পরিপূর্ণ। তাছাড়া জলপথে আরও বিপদ আছে। যে জাতীয় নৌকোর ব্যবহার হয় তা সামান্য ঝড়বাতাসেও উল্টে যাওয়ার আশংকা। তদুপরি মাঝি মাল্লার যদি জানা থাকে যে যাত্রীর সংগে যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে তাহলে খুব অনায়াসেই তারা নৌকো উল্টে দিতে পারে। তারপরে টাকাকড়িগুলি নদীর জলের তলায় জমা পড়ে থাকবে এবং সময়মত অবাধে তারা তা তুলে নিতে পারবে।

জানুয়ারী মাসের বিশ তারিখে আমি নবাবের কাছে বিদায় নিলাম। তিনি আমাকে একটি অনুমতি পত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন, আর ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে আমি যেন তাঁর সংগে আবার দেখা করি। তিনি আমাকে তাঁর পরিবার পরিজনের একজন মনে করে একটি উপাধিও দান করেছিলেন। তিনি সেনাপতিরূপে কিছুদিন দাক্ষিণাত্যেও ছিলেন। সেই সময়ই সেখানে শিবাজীর আক্রমণ অভিযান চলে। এ বিষয়ে পরে বিবরণ দেব। নবাবের প্রদত্ত অনুমতি পত্র নিয়ে মুঘল সম্রাটের পারিবারিক বন্ধুরূপে আমি তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধে ভ্রমণ করার অবকাশ পেয়েছিলাম।

একুশ তারিখে ওলন্দাজরা আমার সম্মানার্থে বিরাট এক ভোজসভার আয়োজন করেন। সেই ভোজপর্বে তাঁরা ইংরেজ, কিছু পর্তুগীজ ও পর্তুগালের অষ্টিন ফ্রায়ারদেরও আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি ইংরেজ কুঠীতে যাই ২২শে। তখন অধিকর্তা ছিলেন মিঃ প্রাট্। ২৩শে থেকে ২৯শে পর্য্যন্ত আমি এগার হাজার টাকা মূল্যের জিনিসপত্র সংগে রেখেছিলাম।

তারপরে নৌকোতে তুলে দিয়ে আমি ঢাকা ত্যাগ করি। আমার ঢাকা সহর ত্যাগের সময় ওলন্দাজরা প্রায় দু'লীগ রাস্তা আমার সংগে এসেছিলেন ছোট ছোট সশস্ত্র নৌকোতে করে। এই সময় আমরা স্পেনীয় সুরা সর্বদা পান করিনি।

২৯শে জানুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত নদীতে কাটিয়ে আমি মালপত্র ও ভৃত্যদের নৌকোতে রেখে চলে আসি। তারপরে আর একটি নৌকো করে খুব বড় একটি গ্রাম মীর্দাপুরে যাই।

পরদিন আমি নিজের জন্য একটি অশ্ব ভাড়া করেছিলাম। কিন্তু মালপত্র বহন করার জন্য আর একটি ঘোড়া সংগ্রহ করতে না পেরে আমি দু'টি মহিলাকে নিযুক্ত করেছিলাম মালপত্র বয়ে নেবার জন্য। ঐদিন সন্ধ্যায়ই আমি কাশিমবাজারে পোঁছে যাই। সেখানে আমাকে স্বাগত করলেন বাংলাদেশের সমস্ত ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর সর্বাধ্যক্ষ মেন্হীর আর্ণেগু ভান্ ওয়াচ্‌টেনডন্‌ক্। তিনি তাঁর গৃহে অবস্থানের জন্য আমাকে অনুরোধ জানালেন।

মেন্হীর ওয়াচ্‌টেনডন্‌ক্ হুগলীতে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁদের সাধারণ বৃহৎ ফ্যাক্টরী। ঐদিনই আমার এক ভৃত্য সংবাদ নিয়ে এল আমার লোকজন ও মালপত্র সহ নৌকো অত্যন্ত বিপদ সংকুল অবস্থায় পড়েছে। কারণ দু'দিন একটানা প্রচণ্ড ঝড় চলছে নদীর উপর দিয়ে।

১৫ই তারিখে ওলন্দাজগণ আমাকে একটি পাল্‌কীর ব্যবস্থা করে দিলেন মুর্শিদাবাদ যাবার জন্য। কাশিমবাজারও এই স্থানটির মধ্যে দূরত্ব তিন লীগ। শায়েস্তা খানের বিষয় সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক সেখানে থাকেন। তাঁর কাছে আমি বিনিময় পত্রখানি হাজির করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সব ঠিকই আছে। তিনি আমাকে সাগ্রহেই টাকা পয়সা সব মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বরাত্রে এ বিষয়ে একটি নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। আমাকে যে টাকাটা দেয়া হয় নি তা যেন তিনি সৌভাগ্যের বিষয় মনে করলেন। কি কারণে আমার সাথে শায়েস্তাখান ঐরকম ব্যবহারটা করলেন তা জানা গেল না। সুতরাং আমি অপরিসীম আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে নিজ আবাসে ফিরে গেলাম।

পরদিন আমি নবাবকে চিঠি লিখলাম এবং জানতে চাইলাম কি কারণে আমাকে টাকা দিতে তিনি বারণ করেছেন।

১৭ই সন্ধ্যায় ওলন্দাজদের প্রদত্ত চৌদ্দ দাঁড়ের নৌকোতে চেপে আমি হুগলীর দিকে যাত্রা করি। সেই রাত্রিটা এবং পরের দিনটি আমি নদীর উপরেই কাটাই।

১৯শে সন্ধ্যার দিকে আমি একটি বড় সহর অতিক্রম করে গেলাম। নাম নদীয়া। সমুদ্রের জল যতটা আসে এই জায়গাটি তার চেয়ে অনেক দূরে। এখানে বাতাস এত প্রবল বেগে চলছিল, আর জলে ঢেউ এত বেশী ছিল যে আমাদের তিন চার দিন ওখানে অপেক্ষা করতে হয়।

আমি হুগলী পৌঁছে গেলাম ২০শে তারিখে। সেখানে আমি ২রা মার্চ পর্য্যন্ত থাকি। ওলন্দাজরা ওখানেও আমাকে খুব খাতির যত্ন করেন। এদেশে যত রকম আমোদ প্রমোদের প্রচলন আছে তা সব তাঁরা আমাকে দেখিয়েছিলেন। আমরা নদীতে অনেকবার প্রমোদ তরণী করে বেড়িয়েছি। সমস্ত রকম সুখাদ্যের ব্যবস্থা করে একটি সান্ধ্য ভোজেরও আয়োজন হয়েছিল। ইউরোপে ভোজসভায় যা কিছুর আয়োজন থাকে এখানে তার চেয়ে কিছু কম হয় নি। সব রকম স্যালাড্, নানা প্রকার কপি, ডুমুর জাতীয় সব্জী, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি। সবচেয়ে সস্তা খাদ্য ছিল জাপানী সীম। ওলন্দাজদের সব রকম ডাল ও শাকসব্জী ফলাবার দিকে খুব ঝোঁক। তবে এইসব দেশে তাঁরা আর্টিচোক্ (এক প্রকার ফুল গাছের মূল যা খুব সুখাদ্য) কখনও জন্মাতে পারেন না।

মার্চ্চ মাসের দুই তারিখে আমি হুগলী ছেড়ে ৫ই পৌঁছে গেলাম কাশিম-বাজারে। পরদিন আমি মুর্শিদাবাদে গেলাম জানার জন্য যে নবাব সাহেব তাঁর খাজাঞ্চীকে কোন হুকুম পাঠিয়েছেন কিনা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেও কিছু আলোচনা করেছি। আমি শায়েস্তা খানকেও চিঠি লিখেছিলাম তাঁর কর্ম্ম প্রণালী সম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং কি কারণে তিনি আমার বিলের টাকা দিতে হুকুম দিচ্ছেন না, তাও জানতে চাইলাম। ডাচ্ ফ্যাক্টরীর পরিচালকও আমার পক্ষ হয়ে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন নবাব সাহেবকে। সেই পত্রখানিও আমি জুড়ে দিলাম এই সংগে। হল্যাণ্ড ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ লিখেছিলেন যে আমি তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাছাড়া আমিও নবাবের পূর্ব্ব পরিচিত। তাঁর সংগে দাক্ষিণাত্যের সৈন্য সমাবেশে, আমেদাবাদে এবং অন্যত্রও আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। কাজেই আমার সংগে এই প্রকার রূঢ় ব্যবহার নীতি সংগত হয় নি। তাছাড়া নবাবের একটি বিষয়

বিবেচনা করা উচিত ছিল যে আমিই একমাত্র লোক যিনি ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু সম্ভার ভারতে বহন করে নিয়ে আসেন। এই ব্যবহার পেয়ে আমার এদেশে আর ফিরে আসার আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা হবে না। অথচ তিনি নিজেই আমাকে পুনরায় এদেশে আগমনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু আবার তিনিই আমাকে অসন্তুষ্ট মন নিয়ে ফিরে যাবার অবকাশ দিচ্ছেন। আমার এই টাকা অনাদায়ের খবর যখন অন্যান্য বিদেশী ব্যবসায়ীদের কানে পোঁছোবে তখন তাঁরাও আর এদেশে আসতে আগ্রহী হবেন না। আমি যে ব্যবহার পেলাম, তাঁরাও এই রকমটাই আশংকা করবেন।

ওলন্দাজ অধ্যক্ষ ও আমার—দু' জনার চিঠি দ্বারা যে ফলাফল প্রত্যাশা করেছিলাম, তার কিছু হোলনা। উপরন্তু নবাবের নতুন হুকুম নামায় আমি কোন প্রকারেই খুসী হতে পারিনি। তিনি খাজাঞ্চীকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন আমার সংগে চুক্তিতে যা প্রাপ্য হয়েছে তার থেকে বিশ হাজার টাকা কম আমাকে দেবার জন্য। আমি যদি এইভাবে টাকা নিতে রাজী না হই তাহলে সেখানে গিয়ে জিনিসপত্র ফিরিয়ে আনতে পারি।

নবাব নাজিমের এই দুর্ব্যবহার উদ্ভূত হয়েছিল হীন ধরণের এক ধূর্ত্ত বুদ্ধি থেকে। এই রকম খারাপ ব্যবহার আমি আরও পেয়েছিলাম মহান মুঘল দরবারের তিন জন ধূর্ত্ত লোকের কাছ থেকে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই :

তৎকালীন সম্রাট ঔরংজেব দু'জন পারসীক ও জনৈক বেনিয়ার প্ররোচনায় এমন একটি নিয়ম প্রথা চালু করেন যাতে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীদের, বিশেষ করে যাঁরা দরবারে মণিরত্ন বিক্রী করতে আসতেন, তাঁদের অত্যন্ত অসুবিধা পড়তে হোত। কারণ জল পথে বা স্থল পথে যে ভাবেই তাঁরা ভারতে আসুন না কেন, যে অঞ্চলে প্রথমে পোঁছোবেন সেখানকার শাসনকর্ত্তার অধিকার থাকবে মালপত্র শুদ্ধ তাঁদের সম্রাটের কাছে নিয়ে যাবার। সংগে জিনিসপত্র কি আছে বা নেই তার কোন প্রশ্ন থাকবে না। এই প্রথানুসারে সুরাটের সুবাদার ১৬৬৫ সালে আমার সংগে কথাবার্ত্তার পরে আমাকে পাঠিয়েছিলেন দিল্লী এবং জাহানাবাদে সম্রাটের কাছে। তখন সম্রাটের অধীনে কর্ম্মরত ছিলেন দু'জন পারসীক ও একজন বেনিয়া। তাঁদের উপর ভার ছিল সম্রাটের কাছে

বিক্রীর উদ্দেশ্যে আনীত মণিমুক্তা দেখা ও পরখ করা। পারসীক দু'জনার মধ্যে একজনের নাম ছিল্ নবাব আকেল খান, অর্থাৎ মন মেজাজের রাজা। এঁর হেফাজতেই বাদশার সমস্ত মণিরত্ন থাকতো। দ্বিতীয় মীর্জামোসন। তাঁর কাজ হোল প্রতিটি পাথরের মূল্য নির্দ্ধারণ করা। আর বেনিয়াটির নাম নালিকান। তিনি দেখতেন পাথরগুলি খাঁটি না ঝুঁট অথবা কোন দোষ ত্রুটী আছে কিনা।

এই তিনটি লোকই সম্রাটের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছিলেন যাতে বিদেশী বণিকরা যা কিছু বাদশার সভায় হাজির করতে চান তা এঁরা আগে দেখে নিজেরাই বাদশাকে দেবেন। যদিও তাঁরা শপথ নিয়েছিলেন যে কখনও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না, তাহলেও যাঁর কাছ থেকে যেটুকু গ্রহণ করা যেত তাই-ই অন্যায়ভাবে আদায় করে নিতেন। তাঁরা আরও অনিষ্ট করতেন। যে জিনিসটি দেখবেন সুন্দর এবং বিশেষ লাভজনক, তখুনি ব্যবসায়ীকে প্ররোচিত করে সম্রাট যা মূল্য দেবেন তার থেকে প্রায় অর্দ্ধমূল্যে নিজেরা তা নেবার ব্যবস্থা করবেন। যদি ব্যবসায়ীরা তাতে রাজী না হন তাহলে বাদশার সামনে দরকষাকষি করে সেই অর্দ্ধমূল্য স্থির করে দেবেন। এঁরা ভাল করেই জানতেন যে ঔরংজীবের মণি রত্নের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তিনি নগদ অর্থকে ঢের বেশী পছন্দ করেন। বাদশার খাস উৎসব দিনে দরবারের সমস্ত উচ্চ কর্ম্মচারীরা ও রাজা মহারাজাগণ তাঁকে চমৎকার সব উপহার প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করবো।

যখন তাঁরা মণিরত্ন সেরকম সংগ্রহ করতে পারেন না তখন তাঁরা বাদশাহকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেন। সুতরাং উৎসব পর্ব্ব এগিয়ে এলে বাদশাহ তাঁর কোষাগার থেকে প্রচুর হীরা পদ্মরাগ মণি, মরকত মণি এবং মুক্তা বের করে দেন মূল্য নির্দ্ধারণের ভারপ্রাপ্ত লোকের হাতে। তিনি সেগুলির মূল্য নির্ণয় করে ব্যবসায়ীদের দিয়ে দেন দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে বিক্রয়ের জন্য। সে সব ক্রয় করে তাঁরা আবার সম্রাটকেই উপহার প্রদান করেন। এই করে সম্রাট এক দফায় মণিরত্ন বিক্রয় করে টাকা পান, আবার দ্বিতীয় দফায় তাই ফিরে আসে তাঁর কাছে উপহার স্বরূপ।

এই প্রকার আরও একটি ভয়ংকর অসুবিধাজনক ব্যাপার আছে মণিকার ব্যবসায়ীদের পক্ষে। তা হচ্ছে স্বয়ং সম্রাট মণি রত্ন দেখলেও তা যদি রাজা

মহারাজা বা দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা না দেখে থাকেন তাহলে মনিরত্ন কখনও ক্রয় করা হবে না। তাছাড়া এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত তিন ব্যক্তিই জিনিসপত্র বিচার যাচাই করেন নিজেদের গৃহে বসে। আরও অনেক বেনিয়া সেখানে গিয়ে ভিড় জমান। তাঁরাও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কেউ হয়ত হীরকের জহুরী, কেউ ভাল বোঝেন পদ্মরাগ ও মরকত মণির বিশিষ্টতা। মুক্তা ভাল চেনেন এমন লোকও থাকেন। তাঁরা সব দেখে দেখে, বিচার করে প্রত্যেকটি জিনিসের ওজন, উৎকর্ষ, ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণবাহার সব লিখে দেন। তারপর ব্যবসায়ী কোন রাজা বা সুবাদারের কাছে গেলে পরখকারী ও মূল্য নির্দ্ধারণ-কারীর লিখিত মন্তব্য সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তখন দেখা যায় মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে প্রায় অর্দ্ধ হারে। ব্যবসাক্ষেত্রে এই বেনিয়া সমাজ ইহুদীদের চেয়েও সহস্রগুণে নিকৃষ্ট। সব রকম ধূর্ত্ত নীতিতে এরা ওস্তাদ। আর ঈর্ষা-মূলক প্রতিশোধ গ্রহণে এরা দুর্নীতি পরায়ণ। সেই অপদার্থ লোকগুলি আমার সংগে কি রকম ধূর্ত্ত ব্যবহার করেছিলেন তা এখন বর্ণনা কচ্ছি।

আমি জাহানাবাদে পৌঁছোলে এই জাতীয় জনৈক বেনিয়া আমার কাছে এসে বললেন যে তিনি বাদশার হুকুম পেয়েছেন আমার কাছে কি কি জিনিস আছে তা দেখার জন্য। বাদশাকে জিনিসপত্র দেখাবার আগেই তাকে সব দেখাতে হবে। আসলে সম্রাট তখন জাহানাবাদে ছিলেন না। বণিকের উদ্দেশ্য ছিল সেই অবকাশে আমার কাছ থেকে জিনিসগুলি কিছু কম মূল্যে খরিদ করে নিয়ে পরে সম্রাট বা আমীর ওমহারদের কাছে আরও চড়া দামে বিক্রী করে বেশ লাভবান হবেন। কিন্তু আমাকে প্ররোচিত করার শক্তি তাঁর ছিল না। পরদিন তাঁরা তিনজন এলেন এক এক করে। আমার জিনিসের মধ্যে তাঁরা দেখতে পেলেন নয়টি বড় মুক্তা সমন্বিত নাশপাতির মত আকারের একটি মণি। এগুলির মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎটির ওজন ছিল ত্রিশ ক্যারাট; সবচেয়ে ছোটটি ষোল ক্যারাটের। আর একটি আলাদা মুক্তা ছিল নাশপাতির মত আকারেরই। ওজনে ছিল পঞ্চান্ন ক্যারাট। মুক্তা খচিত রত্নটি নিলেন স্বয়ং বাদশাহ। আর আলাদা মুক্তাটির জন্য যা দাম ধরলেন তাতে আমি বিক্রী করতে রাজী হইনি যাতে তাঁরা লাভ করতে না পারেন। সুতরাং সেদিন ঐ পর্য্যন্তই হোল। সম্রাটকে সেই মণিরত্নগুলি দেখাবার আগেই আমি দেখিয়েছিলাম তাঁর খুল্লতাত জাফর খানকে। তিনি জিনিসগুলি দেখে বললেন সম্রাট যা মূল্য দেবেন, তিনিও তাই-ই দেবেন। একথা আবার কাউকে

জানাতে বারণ করে দিলেন। কারণ বস্তুতঃ তাঁর পরিকল্পনা ছিল সম্রাটকে এগুলি উপহার দেবেন।

বাদশাহ খুশীমত আমার রত্নাদি পছন্দ করলেন। জাফরখানও তখন কয়েকটি জিনিস আমার কাছ থেকে খরিদ করলেন। আর তখুনি সেই সুবৃহৎ মুক্তাটির দর দাম সম্বন্ধে আমার সংগে চুক্তিবদ্ধ হলেন। কয়েকদিন পর মুক্তাটির মূল্য ব্যতীত সমস্ত টাকা পরিশোধ করে দিলেন। মুক্তাটির মূল্যের উপর তিনি আমাকে দশ হাজার টাকা কম দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ সেই দু'টি পারসীক বণিক তাঁকে খবর দিয়েছিলেন যে আমি প্রথম বারে ভারতবর্ষে এসে তাঁদের কাছে মুক্তা বিক্রী করেছি এর চেয়ে আট দশ হাজার টাকা কম মূল্যে। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এরপরে জাফরখান আমাকে বললেন যে আমি তাঁর প্রস্তাবিত অর্থ গ্রহণ না করলে জিনিসগুলি ফিরিয়ে নিতে পারি। একথা শুনে আমি জিনিস ফিরিয়ে নিলুম। আর তাঁকে বললুম যে তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এরকম জিনিস আর দেখতে পাবেন না। আমি আমার কথা ঠিক রেখেছিলাম। বস্তুতঃ আমার ঐরূপ দৃঢ় সংকল্পের কারণ যা ছিল তা হচ্ছে শায়েস্তা খানের উপযুক্ত কিছু জিনিস তাঁর জন্য নিয়ে যাবার ইচ্ছে। সুরাটে পৌঁছে তাঁর কাছে সরাসরি যাবার স্বাধীনতা আমার ছিল। আমি জাহানাবাদে গিয়ে সম্রাটের সংগে কখনও সাক্ষাৎ করিনি। এইজন্য সুরাটের শাসনকর্ত্তার সংগে আমার মনোমালিন্য হয়। তাঁর সংগে দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, নিয়মকানুন পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকালের রীতিনীতি আর নেই। মুঘল সাম্রাজ্যে যত দুষ্প্রাপ্য জিনিস আমদানী হবে তা সর্ব্বাগ্রে বাদশাকে দেখাতে হবে। সুবাদারের সংগে তর্কবিতর্ক করে আমি চার মাস সময় বৃথাই অতিবাহিত করলাম। তাতে কিছু ফল হয়নি। আমাকে সম্রাটের কাছে যেতেই হবে এবং বিপদের আশংকায় অন্য রাস্তা ধরে যেতে হবে। আমার সংগে সালাউর পর্য্যন্ত পনের জন অশ্বারোহী যাবে তিনি এমন ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমি যখন বাংলাদেশে যাবার উদ্যোগ করছি সেই সময় মণি মুক্তার উপদর্শকরা নিছক বিদ্বেষ বশতঃই শায়েস্তা খানকে লিখে পাঠালেন যে আমি তাঁকে যে মণিরত্ন দেখাতে যাচ্ছি তার মধ্যেকায় চমৎকার একটি মুক্তা জাফর খান ক্রয় করেও আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ মুক্তাটির যা ন্যায্য মূল্য আমি তার চেয়ে দশ টাকা বেশী তাঁর কাছ থেকে আদায় করার চেষ্টা

করেছিলাম। এই জাতীয় সংবাদ প্রেরণের মূলে জাফর খানেরও হয়ত হাত ছিল। কারণ আমি তাঁকে মণি মুক্তা বিক্রয় করিনি। সেই উপদর্শকরা আমার সমস্ত মণিরত্নের বিবরণও তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। শায়েস্তা খান আমাকে বিনিময় পত্র দেবার আগে সেই সংবাদ অবশ্য পাননি। কিন্তু পরে পেয়ে তিনি আমার প্রাপ্য অর্থ থেকে বিশ হাজার টাকা কম দিতে প্রস্তুত হলেন। অবশেষে দশ হাজারে নামালেন; আর আমিও অনন্যোপায় হয়ে তাই-ই মেনে নিলাম।

শায়েস্তা খানকে আমি কি কি উপহার দিয়েছি তার বিবরণ পূর্ব্বেই দেয়া হয়েছে। এবারে আমি সম্রাটকে, নবাব জাফর খাঁকে, মহিমান্বিতা বেগম সাহেবার খোজা, ঔরংজেবের ভগ্নী, প্রধান খাজাঞ্চীখানার দারোয়ানদের কত উপহার দিয়েছি তার যদি বর্ণনা প্রদান করি তাহলে হয়ত বিরক্তিকর হবে না। একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করার মত যে কোন লোক রাজার দর্শন প্রার্থী হলেই তাঁরা অর্থাৎ রাজ পারিষদরা সেই দর্শনাকাঙ্ক্ষীর কাছে জানতে চাইবেন যে উপহার দ্রব্যগুলি কোথায়। তারপরে সেগুলি পরখ করে দেখবেন। কোন লোকেরই রাজা বাদশার সংগে সাক্ষাতের সময় খালি হাতে আসা উচিত নয়। আর যত মহার্ঘ্য বস্তু প্রদান করা যায়, ততই সম্মানজনক। আমি সে সময়ে জাহানাবাদে পৌঁছেই বাদশাহকে শ্রদ্ধা-অভিবাদন জানাতে যাই। আমি তখন তাঁকে নিম্নে বর্ণিত উপহার রাজি দিয়েছিলুম। প্রথম দিলুম ছোট একটি পিতলের ঢাল, যার সর্ব্বাঙ্গ খুব উচ্চ পর্য্যায়ে অলংকৃত ও গিল্টী করা। শুধু গিল্টী করতেই দু'শ ডুকাট অথবা আটশ লিভার মূল্যের সোনা প্রয়োজন হয়েছিল। গোটা জিনিসটির মূল্য চার হাজার, তিন'শ আটাত্তর লিভার। ঢালখানির কেন্দ্রস্থলে খোদিত ছিল কাটিয়াসের আখ্যান। রোমের নিকটে মেদিনী যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল তখন কার্টিয়াস তাঁর অশ্বসহ তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ঢালের কিনারায় রোচেল অবরোধ রূপবদ্ধ হয়েছিল। এই অলঙ্করণের কাজ করানো হয়েছিল ফ্রান্সের জনৈক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারুকৃৎ দ্বারা এবং তিনি তা করেছিলেন কার্ডিনাল রিসলিউর হুকুমে। ঔরংজেবের দরবারে যত বড় বড় আমীর ওমরাহ ছিলেন তাঁরা সকলেই সেই ঢালখানির কারুকলার সৌন্দর্য্য দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সম্রাটকে বলেছিলেন যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ হবে ওটিকে তাঁর প্রধান হাতীটির উপরে স্থাপন করা। এই হাতীটি

সম্রাটের সামনে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজপতাকা ইত্যাদি বহন করে নিয়ে যায়।

সম্রাটকে আমি আর দিয়েছিলাম স্ফটিক পাথরের যুদ্ধ-কুঠার। তার কিনারাগুলিতে খচিত ছিল চুণী ও মরকত মণি। স্ফটিকের উপরে ছিল স্বর্ণাবরণ। তার মূল্য তিন হাজার একশ' উনিশ লিভার। তাঁকে আরও যা দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তুর্কী রীতিতে তৈরী একটি ঘোড়ার জীণ। তার গায়ে ছিল ছোট ছোট চুণী, মুক্তাবলী ও হীরার অলঙ্করণ। দাম দু' হাজার আটশত বিরানব্বুই লিভার। এ ছাড়া একটি জীণ ও পাজামার কাপড় দিয়েছিলাম। তাতেও ছিল সোনা রূপার কারুকার্য্য। মূল্য একহাজার সাতশ' ত্রিশ লিভার। সম্রাটকে প্রদত্ত সমগ্র উপহার দ্রব্যের মূল্য সর্বসাকুল্যে হয়েছিল বার হাজার একশ' উনিশ লিভার।

মহিমান্বিত মুঘল সম্রাটের খুল্লতাত জাফর খাঁকে যা দিয়েছিলাম তা হোল—

একটি টেবিল এবং আরও উনিশ খণ্ড জিনিস যা দিয়ে আর একটি টেবিল তৈরী করা যায়। সমস্তই খাঁটি পাথর এবং তা বর্ণময়। পাথরগুলির গড়ন ছিল বিভিন্ন প্রকারের পাখী ও ফুলের মত। এই পাথরের কাজগুলি হয়েছিল ফ্লোরেন্সে। ব্যয় হয়েছিল দু' হাজার একশ' পঞ্চাশ লিভার। একশ লিভার মূল্যের চুণীখচিত একটি আংটিও ছিল।

প্রধান খাজাঞ্চীকে দিয়েছিলাম স্বর্ণাধারে একটি ঘড়ি। তাতেও মরকত মণি খচিত ছিল। মূল্য সাত হাজার বিশ লিভার।

খাজাঞ্চীখানার দ্বাররক্ষী যারা টাকাকড়ি বের করে দেন তারা পেল তিনশ' লিভার মূল্য ধরে দু'শ টাকা।

ঔরংজেবের ভগ্নী বেগম সাহেবার খোঁজাকে দিতে হোল সূচিচিত্রিত আধারে একটি ঘড়ি। মূল্য তার দু'শ' ষাট লিভার।

সম্রাট থেকে শুরু করে শায়েস্তা খান, জাফর খান, প্রধান খাজাঞ্চী, খানসাহেবদের গৃহাবাসের তত্ত্বাবধায়ক এবং সম্রাটের প্রদত্ত খেলাত বহনকারী, বেগমসাহেবার প্রেরিত খেলাতসমূহের বাহকগণ, জাফর খাঁর প্রেরিত উপহার যারা নিয়ে এসেছেন এঁদের সকলকে আমি যে উপহার দিয়েছি তার সর্বসাকুল্যে মূল্য দাঁড়িয়েছিল বহু শত সহস্র লিভার।

একটি বিষয় অতীব সত্য যে, যে সকল লোক তুর্কীস্তান, পারস্য ও ভারতবর্ষে রাজা বাদশাদের দরবারে কোন কাজে নিযুক্ত থাকেন তাঁরা যতক্ষণ কোন উপহার বকশীস্ না পাবেন ততক্ষণ সব কাজেই অক্ষম অপারগ এই রকম ভাবভঙ্গী দেখাবেন এবং কিছু ভান করবেন। তবে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা প্রস্তুত থাকেন অপরকে সহায়তা দানের জন্য। কাজেই স্বল্প মর্য্যাদার রাজকর্ম্মচারীদের সামনে টাকা পয়সার থলি উন্মুক্ত করতে পারলেই তাঁদের সাহায্য সহায়তা আশা করা যায়। আমার বিবরণীর প্রথম খণ্ডে আমি এটা উল্লেখ করিনি যে যিনি পারস্যাধিপতির দূত হয়ে আমার জন্য খেলাত (সম্মান পরিচ্ছদ) বহন করে এনেছিলেন তাঁকে আমি কি উপহার দিয়েছিলাম। তাকে দিয়েছিলাম দু'শত' ক্রাউন মুদ্রা।

অধ্যায় নয়

সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা।

আমি অনেকবার গোলকুণ্ডায় গিয়েছি। আর যাতায়াত করেছি বিভিন্ন রাস্তা ধরে। কখনও গিয়েছি অর্মাস থেকে জাহাজে উঠে মসলীপত্তম পর্য্যন্ত জল পথে আবার কোন সময় আগ্রা থেকে। তবে বেশীরভাগ গিয়েছি সুরাট থেকে। সুরাট হচ্ছে হিন্দুস্থানের মুখ্যতম বন্দর। এই অধ্যায়ে আমি কেবল মাত্র সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাওয়ার সাধারণ রাস্তাটিরই বর্ণনা দেব। আমি এখানে আগ্রার রাস্তাটির কথা এড়িয়ে যেতে চাই। কারণ আমি সেই পথে ১৬৪৫ ও ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে দু'বার গিয়েছি। সুতরাং এখন আবার উল্লেখ করলে পাঠকদের কাছে একঘেঁয়ে মনে হবার আশংকা থাকবে।

সুরাট ত্যাগ করে আমি যাত্রা করেছিলাম ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী। প্রথমে যাত্রা ভঙ্গ করি খুমবারিয়াতে। তারপরে নবপুরে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। নবপুরে পৃথিবীর সেরা চাউল উৎপন্ন হয়। এ চাউলের সুগন্ধ কস্তুরী মৃগনাভির মত। নবপুরের পরে আরও বহু জায়গা অতিক্রম করে পৌঁছোই দৌলতাবাদে।

বিরাট মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে দৌলতাবাদের কেল্লা হোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। সর্ব্বতোভাবে অত্যন্ত খাড়া ও উঁচু। সেখানে যাবার একটি মাত্র রাস্তা। কিন্তু তা এত সংকীর্ণ যে এক সময়ে একটি ঘোড়া বা উটের বেশী সে পথে চলতে পারে না। সহরটি পর্ব্বতমালার ঠিক পাদদেশে এবং সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের রাজাদের বিদ্রোহের ফলে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ স্থানও মুঘল সম্রাটদের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বিশেষ চতুরতাপূর্ণ রণনীতি দ্বারা তা পুনরুদ্ধার করা হয়। সুলতান খুরম যিনি পরবর্ত্তীকালে শাহজাহান নাম ধারণ করেন, তিনি তাঁর পিতার আমলে দাক্ষিণাত্যে সৈন্য বাহিনী পরিচালনা করেন। তখন শায়েস্তা খানের শ্বশুর আসত খান ছিলেন সেনাপতিদের একজন। তিনি বাদশাহ নন্দনকে এমন কিছু একদিন বলেছিলেন যা তাঁর পক্ষে হয়েছিল অত্যন্ত অসম্মানজনক। সুলতান তখুনি তাঁর একখানি জুতা আনিয়ে খান সাহেবকে ছয় ঘা জুতো মারলেন তার

পাগড়ীর উপরে। ভারতীয়দের মধ্যে এই জাতীয় জুতো দিয়ে প্রহার করা অতিশয় অমর্য্যাদকর ব্যাপার। তারপর তিনি আর কখনও সুলতানের সামনে হাজির হননি।

এই কাজটি করা হয়েছিল সুলতান ও দুই সেনাপতির মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করেই। একটি বিশেষ কারণও ছিল এই ঘটনার পিছনে তা হোল সমাজকে প্রতারিত করা। বিশেষতঃ সুলতানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিজাপুরের শাসকের যে গুপ্তচর ছিল তাঁদেরকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। আসত খাঁর অপমান অসম্মানের কথা তখুনি প্রচারিত হয়ে গেল চারদিকে। তিনি নিজে গিয়ে আশ্রয় নিলেন বিজাপুরের সুলতানের কাছে। আসত খাঁনের চতুরতা বুঝবার মত ধূর্ত্ত বুদ্ধি তাঁর ছিল না। তিনি সাদরে খাঁন সাহেবকে গ্রহণ করলেন। আরও বললেন যে তাঁর (আসত খাঁন) অন্তঃপুরচারিণীদের দশ বার জনকে এবং যত খুসী সংখ্যক ভৃত্য অনুচর নিয়ে তিনি দৌলতাবাদের কেল্লাতে আসতে পারেন। এইভাবে খাঁন সাহেব কেল্লায় অবস্থানের আদেশ লাভ করলেন। তিনি দৌলতাবাদে পৌঁছোলেন আট দশটি উটের বহর নিয়ে। মাঝখানে দু'টি শিবিকা স্থাপন করে দু'পাশে উটগুলিকে এমন ঘন-সন্নিবিষ্ট করে সাজালেন যেন মহিলাদের বাইরে থেকে একেবারেই দেখতে পাওয়া না যায়—এমন ভাব। প্রতিটি শিবিকায় দু'জন করে সৈন্য মোতায়েন ছিল। তারা সব সাহসী ও দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন ছিল। সুতরাং দুর্গরক্ষীদের মধ্য দিয়ে রাস্তা করে যেতে তাঁদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি।

ক্রমান্বয়ে আসত খাঁ স্থানটি নিজের দখলে অনায়াসে নিলেন। এজন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। সেই থেকে সহরটি মহান মুঘল সম্রাটের অধীনেই আছে। ওখানে বহুসংখ্যক চমৎকার কামান রয়েছে। ওগুলি চালাবার দায়িত্ব থাকে সাধারণতঃ ইংরেজ ও ওলন্দাজের উপরে। কেল্লা থেকে উঁচু একটি মাত্র পাহাড় আছে ওখানে। পাহাড়টিতে ওঠা অত্যন্ত দুরূহ। একমাত্র রাস্তা হোল কেল্লার মধ্য দিয়ে। জনৈক ওলন্দাজ এঞ্জিনিয়ার বিজাপুরের সুলতানের অধীনে বহু বছর কাজ করার পরে চাকুরী ছেড়ে দেবার মনস্থ করলেন; ওলন্দাজ কোম্পানীর অনুরোধেই তিনি কাজে বহাল হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আর রাখা গেল না। এই লোকটি খুব উঁচু দরের কামান চালক। তাছাড়া গোলা বারুদ, বাজি ইত্যাদি তৈরী করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত।

ভারতের হিন্দু রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ছিলেন রাজা জয়সিংহ। ঔরংজেবের সিংহাসন অধিকারের ব্যাপারে ইনি ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সহায়ক। সম্রাট এঁকেই পাঠিয়েছিলেন শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তিনি ছিলেন তখন বাদশার সেনাপতি। জয়সিংহ যখন দৌলতাবাদ কেল্লার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই ওলন্দাজ কামান চালক তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেন। ওখানকার অন্যান্য কামানবাহী সৈন্যরাও ছিলেন ইউরোপীয়। ওলন্দাজ এঞ্জিনীয়রটি সেই অবকাশে রাজা জয়সিংহকে বললেন যে তিনি তাঁকে কামানসজ্জা ও চালনার পন্থা দেখিয়ে দেবেন। আর কামানগুলিকে সেই পাহাড়ে তুলে দেবেন। এই পাহাড়টিই কেল্লা রক্ষা করে। পাহাড়ে সৈন্য মোতায়েন রেখেই কেল্লাকে নিরাপদ রাখা হয়। জয়সিংহ এই প্রস্তাব শুনে খুসী হলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি বিজাপুর রাজের কাছ থেকে বিদায়পত্র সংগ্রহ করে দেবেন। তবে একটা চুক্তি যে তাঁর বিশেষ মতলব হাসিল করে দিতে হবে। অবশেষে ওলন্দাজটি সমস্ত পরিকল্পনা সফল করে তুললেন; রাজাও বীজাপুর শাসকের অনুমতি পত্র আদায় করে দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ওলন্দাজ এঞ্জিনীয়রকে আর ওখানে কাজ করতে হয়নি। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রায় গোড়াতে আমি সুরাটে ছিলাম। তখন তিনি ওখান থেকে হল্যাণ্ডগামী জাহাজে আরোহণ করেন।

দৌলতাবাদ থেকে ঔরংগাবাদ মাত্র চার ক্রোশ দূরে। ঔরংগাবাদ পূর্ব্বে একটি গ্রাম মাত্র ছিল। ঔরংজীবই সেটাকে সহরে পরিণত করেন। তবে প্রাচীর বেষ্টিত করেননি। তার ফলে সহরটি ক্রমশঃ চারদিকে বিস্তার লাভ করে এত বড় হয়ে উঠেছে। এই বিস্তারের আর একটি কারণ হচ্ছে প্রায় দুই লীগ আয়তনের একটি হ্রদের তীরে এর অবস্থিতি। এটি তৈড়ী হয়েছিল তাঁর প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থে। এই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততিও ছিল। বেগম সাহেবাকে সমাহিত করা হয়েছিল হ্রদটির পশ্চিম প্রান্তে। বাদশাহ ওখানে জমকালো একটি স্মৃতিসৌধ ও চমৎকার সরাইখানা সমন্বিত একটি মসজিদও নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ দু'টিকেই অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতিতে যত্ন ও রক্ষা করা হোত। দু'টি স্থাপত্যই শ্বেত-মর্মরে গঠিত। প্রস্তররাজি আনা হয়েছিল লাহোর থেকে মালবাহী শকটে করে। ঔরংগাবাদ ও লাহোর মধ্যে যাত্রাপথ ছিল চার মাসের। একবার সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার সময় দেখেছিলাম ঔরংগাবাদ থেকে যেতে

পাঁচ দিন সময় লাগে এমন একটি জায়গায় তিনশ' গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীগুলি সব মর্মর প্রস্তরে পূর্ণ। কমপক্ষে বারটি করে বলীর্বদ এক একটি গাড়ীকে চালিয়ে নিচ্ছে।

ঔরংগাবাদ থেকে পিপ্‌লী এবং আরও অনেক জায়গা পেরিয়ে নান্দরে পৌঁছোতে হয়। এখানে একটি নদী পার হতে হবে। নদীটি গঙ্গা অভিমুখে চলেছে। প্রতিটি গাড়ীর জন্য ওখানে চার টাকা করে দিতে হয়। তাছাড়া ওখানকার শাসনকর্ত্তার কাছ থেকে একটি অনুমতি পত্রও অবশ্যই নিতে হবে।

এখান থেকে শতনগরে গিয়ে যাত্রীকে গোলকুণ্ডার রাজার অধীনস্থ স্থানসমূহে প্রবেশের জন্য যাত্রা শুরু করতে হয়। শতনগরের পরে আরও তিনটি জায়গা পেরিয়ে গেলে গোলকুণ্ডা। সুরাট ও গোলকুণ্ডার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩২৪ ক্রোশ। এই দূরত্ব অতিক্রম করেছিলাম আমি সাতাশ দিনে। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের ভ্রমণ যাত্রায় আমি পাঁচবার বেশী ভ্রমণ করেছি। অন্য একটি রাস্তা ধরেও গিয়েছিলাম পিম্পলনারে। ওখানে পৌঁছোই ১১ই মার্চ্চ। সুরাট থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম ৬ই তারিখে।

এরপরে ১৪ই পৌঁছে গেলাম একটি সুদৃঢ় দুর্গে, অর্থাৎ থনূকাই-টনূকাইতে। এই নামটি হয়েছে দু'জন ভারতীয় রাজার নাম অনুসারে। একটি খাড়া পাহাড়ের উপরে দুর্গটির অবস্থান। দুর্গে ওঠবার একটি মাত্র পথ এবং তা পূর্ব্ব সী৲ যাতে। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে সুবৃহৎ একটি সরোবর ও এমন উন্মুক্ত স্থান আছে যাতে পাঁচ ছয় শত লোকের উপযুক্ত খাদ্যশস্যের চাষ হতে পারে। রাজা সেখানে কোন রক্ষীবাহিনী রাখেননি। জায়গাটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত।

১৬ই তারিখে লাজুরে পৌঁছে একটি নদী পার হতে হয়েছিল। ফেরী ঘাটের কাছেই নদী তীরে কয়েকটি বিরাট দেশীয় মন্দির দেখা গেল। প্রচুর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয় ওখানে প্রতিদিন। তারপর ঔরংগাবাদ হয়ে আর কয়েকটি জায়গা ছেড়ে পৌঁছোলাম কলধারে। ওখানেও একটি সুবৃহৎ দুর্গ আছে। আশে পাশে রয়েছে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী।

তারপর ২৯শে পৌঁছোলাম বাজাবলীতে। তার কাছাকাছি দু'টি স্থানের মধ্যে একটি নদী আছে। এই নদীটি মহান মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য ও গোলকুণ্ডার রাজার রাজ্য মধ্যে সীমানা বিভক্ত ও নির্দিষ্ট করেছে। ১লা এপ্রিল গোলকুণ্ডাতে পৌঁছে গেলাম। আগ্রা থেকে গোলকুণ্ডা যেতে হলে

বুরহানপুর হয়েই যেতে হবে। বুরহানপুর থেকে দৌলাতাবাদ যাবার রাস্তা পূর্ব্বেই বর্ণনা করেছি।

সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা যাবার অন্য আরও একটি রাস্তা আছে। সেটি গোয়া ও বিজাপুরের মধ্য দিয়ে। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেবো গোয়া যাত্রা প্রসংগে। এখন বলবো গোলকুণ্ডা রাজ্যে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেই সম্বন্ধে। এ ছাড়া গোলকুণ্ডার রাজার সংগে তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের যুদ্ধবিগ্রহকালে যা যা ঘটেছিল এবং সে সময় ভারতীয়দের যতটা জেনেছি তারও বর্ণনা দেবো।

অধ্যায় দশ

গোলকুণ্ডা রাজ্য ও বিগত কয়েক বছরে যে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে ওখানে তার বিবরণ।

সাধারণভাবে বলতে গেলে গোলকুণ্ডা রাজ্যটি একটি উৎকৃষ্ট দেশ। এখানে প্রচুর দানা শস্য, চাল, গাভীগরু, মেষ, হাঁস মুরগী এবং মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া যায়। সরোবর পুষ্করিণী আছে অনেক; মাছের আমদানীও যথেষ্ট। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে একটি মাত্র কাঁটা বিশিষ্ট এমন চমৎকার একটি মাছ পাওয়া যায় যা খেতে অতি সুস্বাদু। হ্রদ পুষ্করিণীগুলি গঠনে মানুষের শক্তি কৌশল অপেক্ষাও প্রকৃতির দান অধিকতর। সারা দেশ জুড়ে প্রচুর হ্রদ সরোবর। ওগুলি সাধারণতঃ একটু উঁচু জায়গাতে অবস্থিত। হ্রদের জলকে অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখার জন্য সমতল ক্ষেত্রের দিকে ছোট ছোট বাঁধ তৈরী করার প্রয়োজন হয়। বাঁধ ও তীরভূমি আধ লীগ আন্দাজ লম্বা। বর্ষাকাল কেটে গেলে মাঝে মাঝে বাঁধের মুখ খুলে দেয়া হয় আশেপাশের শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের উদ্দেশ্যে। বাঁধের মুখে অনেক ছোট ছোট খাত বা নালী কাটা আছে। তা দিয়ে বিশেষ বিশেষ সময় ক্ষেতে জল সরবরাহ করা হয়।

এই রাজ্যের রাজধানীর নাম বাগ-নাগর। তবে সাধারণভাবে বলা হয় গোলকুণ্ডা। এই নামটির উৎপত্তি হয়েছে একটি কেল্লার নাম থেকে। কেল্লা থেকে রাজার দরবার দু' মাইলের মধ্যে। দুর্গটির আয়তন দু' লীগের মত। এইজন্য প্রচুর দুর্গরক্ষীর প্রয়োজন হয়। এটি একটি সহরের অনুরূপ। রাজার যাবতীয় ধন সম্পদ এখানেই থাকে। ঔরংজীবের সৈন্যবাহিনী দ্বারা বাগ-নাগর বিধ্বস্ত হওয়ার পরে রাজকোষ ইত্যাদি ব্যাপারে স্থানটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

বাগ-নাগর সহরটিকেই গোলকুণ্ডা আখ্যা দেয়া হয়েছে। বর্ত্তমান রাজার প্রপিতামহ এই সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর এক স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি এ কাজটি করেন। স্ত্রীর নাম ছিল নাগর। রাজা তাকে গভীর-ভাবে ভালবাসতেন। স্থানটি সহরে রূপান্তরিত হওয়ার আগে ছিল নিছক একটি প্রমোদক্ষেত্র। ওখানে রাজার চমৎকার সব বাগান-বাগিচা ছিল। অবশেষে তাঁর স্ত্রী অনবরত এটাকে সহরে পরিবর্ত্তিত করার জন্য অনুরোধ করে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণের উপযোগিতা ও রমণীয়তা উপলব্ধি

করালেন। নদীটির কথাও বারবার বলেছিলেন। রাজা তখন সহরের পত্তন করে স্ত্রীর নামানুসারেই সহরের নামকরণ করার হুকুম দিলেন। নাম হোল "বাগ-নাগর" অর্থাৎ বেগমসাহেবা নাগরের উদ্যান বা বাগিচা। সহরটি ৬৮° ডিগ্রী উচ্চে অবস্থিত। চারদিকে সমতল জায়গা। সহরের কাছে ঠিক ফাউন্‌টেন ব্লোর মত পাহাড়। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সহরের প্রাচীরকে ধুয়ে দিয়ে চলেছে একটি বড় নদী। নদীটি মসলিপত্তনের কাছে গিয়ে বঙ্গোপ-সাগরে পড়েছে। বাগ-নাগরে এই নদী পার হওয়ার জন্য একটি সেতু আছে। সেটি প্যারিসের "পন্ট নিউফ" থেকে সৌন্দর্য্যে কিছু কম নয়। সহরটি অর্লিন্স থেকে কিছু ছোট। তবে খুব সুগঠিত, প্রচুর দ্বার পথ ও অলিন্দযুক্ত। অনেক সুপ্রশস্ত রাস্তা আছে শহরে; কিন্তু ভাল করে বাঁধানো নয়। পারস্য ও ভারতের অন্যান্য সহরের রাস্তার মত এগুলিও ধূলিকীর্ণ। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও ক্ষতিকারক।

সেতু পর্য্যন্ত পৌঁছোতে হলে একটি বৃহৎ সহরতলী অঞ্চল অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। জায়গাটির নাম ঔরংগাবাদ। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক লীগ। ওখানে সওদাগর, ব্যবসায়ী, দালাল, কারুকৃৎ, ও ব্যাপারী ছাড়া সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরও বাস। কিন্তু সহরের বাসিন্দাদের মধ্যে উচ্চ পর্য্যায়ের লোক, রাজদরবার ও প্রাসাদের কর্ম্মীগণ, বিচারকমণ্ডলী ও সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষই রয়েছেন বেশী। বেলা দশটা এগারটায় দুপুরের মুখে সব ব্যবসায়ী, দালাল এবং কারিগর শ্রেণীর লোকেরা সহরে আসেন বিদেশী বণিকদের সংগে ব্যবসাবাণিজ্য চালাতে। কাজকর্ম্ম শেষ করে তারা ফিরে যান স্বগৃহে। সহরতলীতে দু' তিনটি সুন্দর মসজিদ আছে। সেগুলি আবার বিদেশীদের পান্থশালারও কাজ করে। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অনেকগুলি মন্দিরও রয়েছে। সেই সহরতলীর মধ্যে দিয়েই গোলকুণ্ডার দুর্গে যাওয়ার রাস্তা।

সেতুটির উপরে উঠলেই যাত্রীরা একটি বড় রাস্তায় গিয়ে পড়বেন। ঐ রাস্তাই তাঁদের রাজপ্রাসাদের অভিমুখে নিয়ে যাবে। রাস্তার ডানদিকের বাড়ীঘরগুলি রাজদরবারের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকদের। এ ছাড়া আরও চার পাঁচটি দোতলা বাড়ী আছে পান্থশালারূপে। তার মধ্যে বেশ বড় বড় কক্ষ আছে। আর তাতে অবাধে মুক্ত বায়ু চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা। রাস্তার শেষপ্রান্তে সুবৃহৎ একটি চতুষ্কোণ উদ্যানমত আছে। তার উপরেই প্রাসাদের একটি দিক অবস্থিত। মাঝখানে একটি ঝুলবারান্দা বা ঝরোখা।

রাজার যখন প্রজাদের দর্শন দান ও আবেদন শোনার ইচ্ছে ও অবকাশ হয় তখন তিনি এই বারান্দায় বসেন। প্রাসাদের প্রধান ও বিরাট তোরণ দ্বারটি এই চত্বরের উপরে নয়। সেটি তারই কাছাকাছি আর একটি উন্মুক্তস্থানে। প্রথমে যেতে হয় বিরাট একটি চত্বরে। তার চারদিক বেষ্টিত রয়েছে স্তম্ভ-সমন্বিত বারান্দার দ্বারা। তার নীচে থাকে রাজার রক্ষীবাহিনী। এই চত্বরটির ওধারে আর একটি প্রাঙ্গণ আছে ঠিক ঐরকম পদ্ধতিতেই নির্মিত। তবে সেটি অনেকগুলি সুন্দর কক্ষ বেষ্টিত। ছাদ সমতল। এই জাতীয় অনেক ছাদে যেমন হাতী থাকে, এখানে রয়েছে সুন্দর বাগান। বাগানে বড় বড় গাছপালা। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যে কি করে খিলানগুলি অত গুরুভার বহন কচ্ছে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এঁরা সহরের মধ্যে জ াকালো রকমের একটি উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সেটিকে যদি সম্পূর্ণ করে তুলতে পারা যেত তাহলে সারা ভারতে সুন্দরতম বলে পরিচিত হোত। পাথরগুলি প্রশংসার যোগ্য হয়েছে আয়তন ও ওজনের জন্যে। কুলুঙ্গীর মত যে জায়গাটির দিকে মুখ করে এঁরা প্রার্থনা করেন সেটি আস্ত একখানি পাথরে গড়া। পাথরটি এত অদ্ভুত রকমের যে পাঁচ ছয় শত লোকের সর্ব্বদা কাজে নিযুক্ত থাকার প্রয়োজন হয়েছিল এটিকে মূল জায়গা থেকে কেটে কুঁদে বের করে আনার জন্যে। চাকাওয়ালা একটি যন্ত্র বা গাড়ীর উপরে ওটাকে ঠেলে তুলে তারপর উপাসনা গৃহে আনা হয়। আমাকে অনেকে বলেছেন যে ওটিকে বয়ে আনতে চৌদ্দশত বলীবর্দের প্রয়োজন হয়েছিল। এরপরে আমি বলবো যে কি কারণে সৌধটি অসম্পূর্ণ থেকে গেল। পুরোপুরি গড়ে উঠলে সর্ব্বতোভাবে এশিয়ার সমস্ত সুদৃঢ় ও সুগঠিত স্থাপত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করতো।

মসলিপত্তনে যাবার রাস্তায় সহরের অন্য প্রান্তে দু'টি বিরাট হ্রদ আছে। প্রত্যেকটি আয়তনে প্রায় এক লীগ। হ্রদে ছোট ছোট নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে। সেগুলি খুব জমকালোভাবে সাজানো হয়েছে রাজার আনন্দ লাভের জন্য। তীরবর্ত্তী জায়গা জুড়ে আছে রাজ দরবারের প্রধান পুরুষদের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী ঘর।

সহরের একটি দিকে দাঁড়িয়ে আছে ভারি চমৎকার একটি মসজিদ। সেখানে গোলকুণ্ডার সুলতানগণ সমাধি শয়নে শায়িত রয়েছেন। প্রত্যহ ওখানে অপরাহ্ণ চারটের সময় সমাগত দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য হিসেবে

রুটি ও কিছু পোলাও দেবার ব্যবস্থা আছে। দুষ্প্রাপ্য বস্তু দেখতে হলে কোন উৎসব পর্বের দিনে ঐ সকল সমাধি ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত। কারণ সেই সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মূল্যবান সব বয়নশিল্প ও নকসাযুক্ত কাপড় পর্দা ইত্যাদি টাঙানো থাকে।

শাসননীতির দিকে প্রথমত লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে কোন অজানা আগন্তুক সহরের ফটকে এসে হাজির হতেই তল্লাসী করে দেখা হয় যে তার সংগে লবণ বা তামাক আছে কিনা। এই দু'টি জিনিসের জন্য শুল্কের হার বেশী। কোন কোন সময় নবাগতকে সহরে প্রবেশ করার জন্য দু'দিনও অপেক্ষা করতে হয়। তার আগে হয়ত অনুমতি পাওয়া যায় না। প্রথমে কোন এক সৈনিক গিয়ে রক্ষী বাহিনীর কর্ত্তাকে আগন্তুকের আগমণ বার্ত্তা দেবেন। তখন তাকে পাঠানো হবে দারোগার কাছে। অনেক সময় হয়ত এমনও হয় যে দারোগা খুব ব্যস্ত রয়েছেন বা সহরের বাইরে কোথাও গিয়েছেন। আবার এও হয় যে সৈনিকটি ভান করবে যে দারোগার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে সৈনিকের সুবিধা; আগন্তুকদের কাছ থেকে আরও বেশী টাকা আদায় করা যাবে। আর তিনিও বিলম্বজনিত কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য হন। এইজন্য দু'দিনও বিলম্ব ঘটে।

আমি লক্ষ্য করেছি, বিচারের সময় রাজা সেই ঝুল বারান্দায় বসেন। বারান্দাটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ মুখো। রাজার কাছে যাঁদের আবেদন নিবেদন থাকে তারা সেই বারান্দার ঠিক নীচে জমায়েত হন। জনসমাবেশ ও প্রাসাদ দেয়ালের মাঝখানে মাটিতে তিন সারি একটি বর্শার অর্দ্ধেক মাপ আন্দাজ খুঁটি পোতা থাকে; প্রতিটি খুঁটির সংগে অর্গলরচনা করে আড়াআড়ি দড়ি বাঁধা থাকে। যতক্ষণ ডাক না আসবে ততক্ষণ বিচার প্রার্থীকে দড়ির বন্ধনীর মধ্যে থাকতে হবে। রাজা বিচারে বসলেই এই রকম অর্গলের ব্যবস্থা। সবটা উন্মুক্ত স্থান জুড়েই অর্গল রচিত হয়। দু'জন লোক দড়ি ধরে থাকেন। সারিবদ্ধ লোকেদের এক এক করে ডাক এলে তারা দড়ি ছেড়ে দিয়ে রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন। বারান্দার নীচে জনৈক মন্ত্রী বসে সমস্ত দরখাস্ত গ্রহণ করে পেশ করেন। পাঁচ ছয়টি দরখাস্ত জমা হলে মন্ত্রী মহোদয় ওগুলিকে একটি থলেতে পুরে রাখেন। রাজার পাশে প্রহরীরত খোজা একগাছি দড়ি নীচে ঝুলিয়ে দিলে থলেটি তাতে বেঁধে দেয়ার পরে আবার টেনে উপরে রাজার কাছে তুলে দিতে হয়।

সম্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি মুখ্য তাঁকে প্রতি সোমবার প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে হয়। পালাক্রমে সকলের উপরেই এই দায়িত্ব পড়ে। সকলকেই আট দিন করতে হয়। এমন এক একজন অভিজাত কর্ম্মচারী আছেন যাঁর অধীনে থাকে পাঁচ ছয় হাজার রক্ষী। এরা সকলে সহরের চারদিকে তাঁবুর মধ্যে বাস করে। পাহারা দেবার সময় হলে সকলে একটি মিলন স্থলে একত্রিত হয়। কাজ শেষ হলে সুশৃঙ্খলায় নিয়মিত পদক্ষেপে সেতুটি পার হয়ে চলে যায়। অনেক সময় রক্ষীবাহিনী বড় রাস্তা ধরে উন্মুক্ত চত্বরে গিয়ে সেই ঝুল বারান্দার সামনে সমবেত হয়। প্রথমে দশ বারটি হাতীর মিছিল। হাতীগুলি নির্ব্বাচিত হয় রক্ষীবাহিনীর অধিনায়কের গুণাগুণ বিচার করে। কতকগুলি হাতীর পিঠে খাঁচার মত একটি জিনিস থাকে। দেখতে অনেকটা ছোট গাড়ীর মত। খাঁচাতে একটি লোক বসে পতাকা বহন করেন। আর সবগুলি হাতীকে একটি লোক চালিয়ে যায়।

হস্তীবাহিনীর পরে ছুটি সারিতে ত্রিশ চল্লিশটি উটের একটি বাহিনী থাকে। প্রতিটি উটে একটি করে মালবাহী জীন। সেই জীনে ছোট একটি সেকেলে কামান বাঁধা থাকে। একজন বিশেষ এঞ্জিনিয়র আপাদ-মস্তক চামড়ার পোষাকে আচ্ছাদিত হয়ে উটের লেজের কাছে বসে থাকেন একটি জ্বলন্ত দীপশলাকা হাতে নিয়ে। তিনি বিশেষ দক্ষতার সংগে রাজা যে বারান্দায় বসে থাকেন তার চারদিক রক্ষা করেন।

এদের পরে আসে শকটরাজি। তার সংগে থাকে সেনাপতির গৃহ-ভৃত্যগণ। এবারে আসে প্রধান অশ্ববাহিনী। তারপরে দেখা যাবে মন্ত্রী ও আমির ওমরাহদের। আরও থাকে সমস্ত সাজ সরঞ্জামের বহর। দশ বারজন বারাঙ্গনা নর্ত্তকী যাবেন এদের পশ্চাতে। এরা সেতুটির কিনারায় থাকেন। পরে আমির ও ওমরাহদের সামনে এগিয়ে গিয়ে সেই উন্মুক্ত চত্বর পর্য্যন্ত তারা লাফ ঝাঁপ ও নৃত্য করতে করতে এগিয়ে চলেন। মন্ত্রীর পেছনে আবার অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্যরা যায় নিয়মিত পদক্ষেপে। দৃশ্যটি দর্শনযোগ্যই বটে। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। আমি বাগ-নাগরে প্রায় চার মাস ছিলাম। প্রতি সপ্তাহে এরা আমার বাসগৃহের পাশ দিয়ে যেত। তখন সে দৃশ্য দেখে আমি আনন্দই পেতাম।

সৈন্যরা তিন কি চার এল্ মাপের সূতী বস্ত্র ছাড়া আর কিছু পরিধান করে না। ঐ বস্ত্র দিয়েই তারা সামনে ও পেছনে শরীরের অর্দ্ধেকটা আবৃত

করে। তাদের চুল লম্বা। সেই কেশগুচ্ছকে মাথার উপরে তুলে মেয়েদের মত গ্রন্থি বদ্ধ করে রাখে। এখানে স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ বলতে বিশেষ কিছু নেই। একখণ্ড তিন কোনাকার লিনেন কাপড়কে মাঝখানে ধরে মাথার উপরে দিয়ে দুই কোণকে চিবুকের নীচে বেঁধে দেখা হয়। এখানকার সৈন্যরা পারসীকদের ন্যায় ছুরিকা বা ভোজালি ব্যবহার করে না। এরা সংগে রাখেন সুইজারল্যাণ্ড বাসীদের মত চওড়া তলোয়ার। তলোয়ার লোকের দেহে বসিয়ে দেয়াও চলে আবার আঘাত করাও যায়। ওটাকে তারা কোমর বন্ধের সংগেও ঝুলিয়ে রাখে। এদের ছোট বন্দুকের নল আমাদের দেশের থেকে ঢের সুদৃঢ় ও পরিচ্ছন্ন। কেননা এদের লোহা অনেক বেশী উৎকৃষ্ট ও ভাঙ্গবার মত নয়। এদেশের অশ্বারোহী সৈন্যদের সংগে থাকে তীর ধনুক, ঢাল ও একটি করে যুদ্ধের কুঠার। আর থাকে শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম্ম। ওটা শিরস্ত্রাণের নীচে কাঁধের উপরে ঝোলানো থাকে।

এই অঞ্চলের সহর ও সহরতলীতে অধিক সংখ্যক নিম্নস্তরের মহিলা বা বারাঙ্গনা আছে। কেল্লাটি তো একটি সহরেরই অনুরূপ। সেখানেও এই জাতীয় নারীর সংখ্যা প্রচুর। দারোগার রেকর্ড বইএ এদের সংখ্যা বিশ হাজারেরও বেশী। তাদের কোন লাইসেন্স বা অনুমতি নেই। অথচ অনুমতি ব্যতীত কোন স্ত্রীলোকের এই বৃত্তি গ্রহণ করা আইনসঙ্গত নয়। এরা রাজাকে কোন কর দেয় না। এদের কতককে পরিচারিকাসহ রাজার সামনে হাজির হতে হয়। প্রতি শুক্রবারে এদের সংগীত পরিবেশন করার কথা। রাজা বারান্দায় হাজির থাকলে এরা তাঁর সামনে নৃত্য প্রদর্শন করে। রাজা ওখানে না এলে একজন খোজা এসে ওদের চলে যেতে নির্দ্দেশ দেবে। সন্ধ্যার শীতল আবহাওয়ায় এই স্ত্রীলোকেরা তাদের গৃহদ্বারে থাকে দাঁড়িয়ে। এদের বাড়ী ঘর বেশীরভাগ ছোট চালাঘর। রাত্রি ঘনিয়ে এলে তারা ঘরে একটি মোমবাতি বা দীপ জ্বালিয়ে রাখে সংকেত হিসেবে। এছাড়া ঘরে ঘরে তারা দোকান খুলে বসে যাতে 'তাড়ি' (মাদক) বিক্রীত হয়। তাড়ি হচ্ছে এক প্রকার গাছের রস দ্বারা নির্মিত মদ্য জাতের পানীয়। আমাদের তাজা সুরার মতই মিষ্টি স্বাদ। এ জিনিস আমদানী হয় পাঁচ ছয় লীগ দূর থেকে ঘোড়ায় করে। ঘোড়ার দুই পাশে দু'টি করে মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ঘোড়াটি খুব দ্রুতগামী। পাঁচ ছয় শতাধিক পাত্র পূর্ণ হয়ে ঐ জিনিস প্রতিদিন সহরে আসে। তাড়ির উপর নির্দিষ্ট

শুল্ক থেকে রাজার যথেষ্ট আয়। এত অধিক সংখ্যক বারাঙ্গনাকে দেশের মধ্যে. স্থান দেবার কারণও বোধ হয় এই। কারণ এদের জন্যই অত বেশী 'তাড়ি' ক্রয়-বিক্রয় ও খাওয়া হয়। তাড়ির ব্যবসায়ীরাও এইজন্যই দোকানগুলি বার-নারীদের গৃহে খুলে বসেন।

এই জাতীয়া নারীরা এত কর্ম্মঠ ও তৎপর প্রকৃতির যে যখন বর্ত্তমান সুলতান মসলিপত্তন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তখন এদের মধ্যে নয়জন মিলে নিজেদের দেহ দ্বারা একটি হাতীর দেহাকৃতি রচনা করেছিলেন। চারজন হলেন হাতীর চারটি পা, চারজন মিলে করলেন দেহ রচনা ; আর একজনের দ্বারা হয়েছিল শুঁড়। নরনারীদেহ দ্বারা গঠিত কুঞ্জর পৃষ্ঠে একটি সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজা মসলীপত্তনে প্রবেশ করেন।

গোলকুণ্ডার সমস্ত স্ত্রী পুরুষের চেহারাই খুব সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও সুষম গড়নের। অত্যন্ত লাবণ্যময়ও। এদের মুখাকৃতি বেশ সুন্দর, গায়ের রং ফর্সা। গ্রামের লোকেদের চেহারা কিছুটা কাল।

এ রাজ্যের বর্ত্তমান সুলতানের নাম আবদুল্লা কুতুব শাহ। তাঁর বংশোৎপত্তি সম্বন্ধে আমি পাঠকদের অল্প কথায় কিছু বলবো। জাহাঙ্গীরের পিতা আকবর বাদশার রাজত্বকালে মহানুভব মুঘল সম্রাটের রাজ্যসীমা নর্মদা থেকে আর দক্ষিণে বিস্তার লাভ করেনি। কেননা যে নদীটি তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিল এবং যেটি দক্ষিণ দিক থেকে এসে গঙ্গা নদীতে (কাবেরি গঙ্গা) মিলিত হয়েছে, সেটি মুঘল সাম্রাজ্যকে নরসিংহ গড়ের রাজ্য সীমা থেকে দিয়েছিল বিচ্ছিন্ন করে। নরসিংহ গড়ের বিস্তার ছিল কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত। ঐ অঞ্চলের অন্যান্য রাজারাও ছিলেন নরসিংহ গড়ের রাজার অধীনস্থ। এই শক্তিমান রাজা ও তাঁর বংশধরগণ ভারতবর্ষে তৈমুরলঙের বংশধরদের সংগে বরাবর যুদ্ধ চালিয়েছেন। রাজা ও তাঁর পুত্রপৌত্রাদির শক্তি ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। শেষ রাজা আকবরের সংগে যুদ্ধকালে চার প্রকার সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে ; চারজন ছিলেন সেনাধ্যক্ষ। গোলকুণ্ডাতেই তিনি সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন। দ্বিতীয় বাহিনীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিজাপুর প্রদেশে। তৃতীয় দৌলতাবাদে, আর চতুর্থটি বুরহানপুর অঞ্চলে। নরসিংহ গড়ের (নাসিরগড়) শেষ রাজার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তখন তাঁর চার সেনাপতি নিজেদের এলাকা অনুসারে রাজ্যটিকে চার ভাগ করে সেখানে স্ব স্ব অধিকার প্রতিষ্ঠা

করলেন। আর নিজেদের 'রাজা' আখ্যায় মণ্ডিত করলেন। রাজ্য চারটি হোল গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, বুরহানপুর ও দৌলতাবাদ। যদিও মূল রাজা সাহেব ছিলেন হিন্দু, কিন্তু তাঁর সেনাপতিরা ছিলেন মুসলমান। যিনি গোলকুণ্ডার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আলী সম্প্রদায়ের এবং প্রাচীন তুর্কী পরিবারের সন্তান। এই তুর্কী বংশ পারস্যের হামাদান অঞ্চলে বাস করেন। অন্যান্যদের তুলনায় এই সেনানায়ক ছিলেন অতি মাত্রায় বিবেচক ও বিচক্ষণ। তাঁর মনিব রাজা সাহেবের মৃত্যুর কয়েকদিন পর তাঁর সৈন্য বাহিনী মুঘলদের সংগে প্রশংসনীয়ভাবে জয়লাভ করেন। তা'সত্বেও তিনি অন্য সেনাপতিদের রাজ্যাংশ লাভে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেননি।

কালক্রমে আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর বুরহানপুর রাজ্য জয় করেন। জাহাঙ্গীর তনয় শাহজাহান পুনরধিকার করেন দৌলতাবাদ। আর তাঁর পুত্র ঔরংজেব জয় করেছিলেন বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশ। কিন্তু গোলকুণ্ডাকে শাহজাহান কি ঔরংজীব কেউই আক্রমণ করেননি। গোলকুণ্ডার সুলতান বরং শান্তিতেই বাস করার অবকাশ পেয়েছিলেন। তাঁর সংগে চুক্তি হয়েছিল যে তিনি প্রতি বছর মুঘলদের ২০০,০০০ সংখ্যক তৎকালীন মুদ্রা দেবেন কর হিসেবে। বর্ত্তমানে গঙ্গা নদীর (সম্ভবতঃ কাবেরী) এধারে যত রাজা আছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ভেলোরের অধিপতি। তাঁর রাজ্যসীমা কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নাসিরগড় (নরসিংহগড়) রাজ্যেরও কতক অংশ অধিকার করেছিলেন। এর ফলে এই রাজ্যে (নাসিরগড়) কোন ব্যবসা বাণিজ্য ভাল চলে না, কোন বিদেশী আগন্তুকের গমনাগমনও নেই। দেশের রাজার সম্বন্ধে কারোর কোন আগ্রহও দেখা যেত না।

গোলকুণ্ডার বর্ত্তমান অধিপতির কোন পুত্র সন্তান নেই। তিনটি কন্যা আছেন, তাঁরা বিবাহিতা। জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয়েছে মক্কার মহান শেখ (শাহ), এর বংশোদ্ভর এক ব্যক্তির সংগে। এই বিবাহের পূর্ব্বে যে ঘটনা হয়েছিল তা ভোলার নয় নয়। গোলকুণ্ডার ভাবী জামাতা শেখ সাহেব প্রথমে গোলকুণ্ডায় আসেন ফকিরের বেশে। কয়েক মাস তিনি প্রাসাদের ফটকের বাইরে বাস করেন। রাজসভাসদ্‌গণ জানবার জন্য চেষ্টা করতেন যে তিনি ওখানে কেন রয়েছেন। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যেত না। অবশেষে ঘটনাটি রাজার কর্ণগোচর হোল। তাঁর প্রধান চিকিৎসক খুব

ভাল আরবী ভাষা জানতেন। তিনি তাঁকে পাঠালেন ফকিরের উদ্দেশ্য ও আগমণের কারণ জানার জন্যে। চিকিৎসক এবং আরও কয়েকজন মিলে দেখলেন যে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। তারপর তাঁকে সুলতানের কাছে নিয়ে আসা হয়। সুলতান তাঁকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফকির জানালেন যে তিনি এসেছেন রাজ কুমারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। এই প্রস্তাব শুনে সকলে তো অবাক। রাজদরবারের সকলে মনে করলেন যে কোন সুবুদ্ধি সম্পন্ন সুস্থ লোকের প্রস্তাব এটা নয়। রাজা প্রথমে কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তারপর দেখলেন লোকটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে দাবী পূরণের চেষ্টা কচ্ছেন আর ভীতি প্রদর্শন করে বলছেন যে রাজপুত্রীকে তাঁর কাছে বিয়ে না দিলে তাঁর (রাজার) রাজ্য অদ্ভুত কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে। রাজা তখন তাঁকে বন্দী করে জেলখানায় পাঠালেন। সেখানে তাঁকে দীর্ঘ দিন কাটাতে হয়েছিল। অবশেষে রাজা নানা বিবেচনা করে তাঁকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া সমীচিন মনে করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে মসলীপত্তন থেকে একটি জাহাজে তুলে দেয়া হয়। জাহাজটি তীর্থ যাত্রী নিয়ে মক্কা পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

দু' বছর পরে সেই শেখই প্রকৃত পরিচয় দিয়ে আবার গোলকুণ্ডায় ফিরে এলেন। আর এমন কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিলেন যে শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রীকে বিয়ে রাও সম্ভব হয়েছিল। ক্রমশঃ সমগ্র রাজ্যমধ্যে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করে। এখন তিনিই ওদেশের শাসনকর্ত্তা এবং বিশেষ ক্ষমতাশালী। সপুত্রক ঔরংজেব যখন বাগ-নাগর দখল করেছিলেন তখন শেখসাহেবই গোলকুণ্ডার কেল্লা মুঘলদের হাতে সমর্পণে বাধা প্রদান করেন। সুলতান সেই সময় ঐ কেল্লাতেই অবসর বিনোদন কচ্ছিলেন। আমি ক্রমান্বয়ে ঘটনাটি বিবৃত করবো।।

শেখ সাহেব শেষ পর্য্যন্ত সুলতানকে হত্যা করা হবে এমন ভীতিও প্রদর্শন করেছিলেন যাতে তিনি শত্রুপক্ষকে কেল্লার দ্বার উন্মুক্ত করে না দেন। তাঁর এই দুঃসাহস ও কঠোর নীতির জন্যে তিনি চিরকাল সুলতানের স্নেহ ভালবাসার অধিকার লাভ করেছিলেন। আর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সুলতান তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এই স্নেহ প্রীতি দান ও পরামর্শ গ্রহণ তিনি জামাতা হিসেবে করেননি। সুলতান তা করেছেন একজন প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যতম ব্যক্তি হিসেবে। দরবারে সুলতানের পরেই ছিল তাঁর স্থান। ইনিই

বাগ-নাগরের সেই উপাসনা গৃহ নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি রাজ্য মধ্যে একটি বড় রকমের দুর্ঘটনার আশংকা করেছিলেন।

যাঁরা গণিত বিদ্যায় পারদর্শী শেখ সাহেব তাঁদের প্রতি খুব স্নেহ প্রীতি-পরায়ণ। তিনি মুসলমান বটে, কিন্তু গণিত বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এই বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন জনৈক কাপুচিন যাজক ফাদার ইফ্রেসের সংগে। তিনি গোলকুণ্ডা হয়ে পেগু যাচ্ছিলেন। তাঁর সংঘের নির্দ্দেশেই তিনি পেগু যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু শেখ তাঁকে এদেশে থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। নিজে ব্যয়ভার বহন করে তাঁর জন্য একটি বাড়ী ও গীর্জা নির্মাণেরও প্রস্তাব দিলেন। তাঁকে আরও বললেন যে তাঁর কোন কাজ করতে হবে না, কোন হুকুম তামিল করার প্রয়োজন নেই। রাজার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ওখানে পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান এবং আর্মেনীয় রয়েছেন। তাঁরা ব্যবসা করতেই ওখানে এসেছেন। কিন্তু ফাদার ইফ্রেসের উপরে পেগু যাবার বিশেষ নির্দ্দেশ থাকায় তিনি সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষমতা জানালেন।

অবশেষে ফাদার শেখের কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি তাঁকে একটি খেলাত (সম্মান-পরিচ্ছদ) উপহার দিলেন। পোষাক পরিচ্ছদ মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই-ই দেয়া হোল। পরিচ্ছদের মধ্যে ছিল টুপি, হাতকাটা বড় ফতুয়া, খাট ধরনের যাজকের পোষাক, দু'জোড়া পাজামা, দু'টি সার্ট, দু'টি উড়নি চাদর। এই জাতীয় স্কার্ফ এঁরা কখনও গলায় জড়িয়ে রাখেন, কখনো বা রৌদ্র তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে মাথায় দিয়ে রাখেন। খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী তো উপহারের বহর ও আড়ম্বর দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি শেখকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর পক্ষে এই পরিচ্ছদ পরিধান করা সংগত হবে না। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত শেখ সাহেব তাঁকে সে সব গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তবে তিনি ফাদারকে বলেছিলেন যে এই ব্যাপারে কোন বন্ধুর সংগে যা হোক একটা ব্যবস্থা তিনি করে নিতে পরেন। দু'মাস পরে ফাদার ইফ্রেস সেই উপহাররাজি সুরাটে বসে আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি প্রতিদানে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শেখ যখন ফাদারকে আটকে রাখতে পারলেন না এবং দেখলেন যে তিনি গোলকুণ্ডা থেকে মসলীপত্তন পর্য্যন্ত পদব্রজে যাবেন, তখন তাঁকে একটি বলদ

ও দু'টি চালক সংগে নিতে রাজী করালেন। তবে তাঁকে তৎকালীন ত্রিশটি মুদ্রা গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব হয়নি। মুদ্রাগুলি শেখ ফাদারকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু চুক্তি হোল বলীবর্দ চালকরা যখন ফিরে আসবে তখন বৃষটি ও মুদ্রা ক'টি ফেরত নিয়ে আসবে। ফাদার ইফ্রেসের কাহিনী শেষ হবে গোয়ার বর্ণনা কালে। গোয়া হোল ভারতের মধ্যে পর্তুগীজদের প্রধান উপনিবেশ।

সুলতানের দ্বিতীয়া কন্যার বিয়ে হয়েছিল ঔরংজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদের সংগে। ঘটনাটি এই: গোলকুণ্ডার সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ মীরজুমলা ছিলেন তাঁর মনিবের বিশেষ সহায়ক। রাজার প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন স্বরূপ চলিত নিয়মানুসারে তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জামিন হিসেবে রেখেছিলেন। তারপরে তিনি বাংলাদেশে যান কয়েকজন বিদ্রোহী রাজাকে দমন করার জন্যে। মীরজুমলার কন্যা ছিল কয়েকটি, পুত্র একটি। পুত্রটি অতি সুশিক্ষিত হয়েছিলেন। রাজ দরবারে তাঁর বেশ সুনামও ছিল। মীরজুমলার খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রচুর অর্থ সম্পদের জন্যে তাঁর অনেক শত্রুও সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরা তাঁকে রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তাঁরা মীরজুমলার এত শক্তি প্রভুত্বকে রাজার মনে সন্দেহের বিষয় বলে প্রতিপন্ন করলেন। আরও বলা হোল, তিনি নিজ পুত্রকে গোলকুণ্ডার আধিপত্য দানের জন্য নানা পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন। সুতরাং রাজার আর সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। এই শত্রুর হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুলতানের এই শত্রুকে দমন করার সহজ উপায় হচ্ছে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা। মীরজুমলার শত্রুদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সুলতান তাঁদের অনুমতি দিলেন তাঁর নিজের ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করা হোক। কিন্তু তাঁরা সে চেষ্টায় সফল হননি। ইতিমধ্যে মীরজুমলার পুত্র ব্যাপারটা আঁচ পেয়ে গেলেন। পিতাকে তা জানাতেও বিলম্ব করেননি। তবে এ বিষয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে কি উপদেশ নির্দ্দেশ পেয়েছিলেন তা জানা যায়নি। পিতার সংগে যোগাযোগের পরেই পুত্র সুলতানের কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁকে সাহসের সংগে অভিযোগ করে বললেন তাঁর পিতার সহায়তা ব্যতীত তিনি কখনই সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন না। তরুণ আমিরটি এত উত্তেজিতভাবে কথাগুলি বলেছিলেন যে রাজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট

হয়ে দরবার থেকে উঠে চলে যান। তখন উপস্থিত আমির ওমরাহরা মীরজুমলার পুত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যন্ত হীন আচরণ করেন। আর তখুনি তাঁকে বন্দী করে মাতা ও ভগিনীগণসহ কারাগারে পাঠানো হোল। অনতিবিলম্বে ব্যাপারটা মীরজুমলারও কর্ণগোচর হোল।

এই সংবাদ শুনে তিনি অবিলম্বে প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন।. তাঁর অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীই তাঁর সহায় ছিল। সৈন্যরা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তিও করতো। তিনি তখন বাংলাদেশের কাছেই ছিলেন। পূর্বেই বলেছি ঐ অঞ্চলে কয়েকজন রাজাকে বশীভূত করার জন্যেই তিনি সেখানে প্রেরিত হয়েছিলেন.। তাঁদের রাজ্য ছিল গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী স্থানে। ঐ সময় বাংলার শাসনভার ন্যস্ত ছিল শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান শুজার উপর। মীরজুমলা তাঁর সংগে যোগাযোগ করাই উত্তম বিবেচনা করলেন। কারণ তিনি হলেন ভাবী মুঘল সম্রাট। তাঁর সংগে মিলিত হয়ে গোলকুণ্ডার সুলতানকে দমন করা যাবে এই ছিল তাঁর ধারণা। গোলকুণ্ডার সুলতানকে তিনি আর নিজের প্রভু মনে করেন না, বরং একজন শক্তিমান শত্রু বলেই মনে হোল। তিনি শুজাকে লিখে পাঠালেন যে যদি তিনি (শুজা) তাঁর সংগে যোগদান করেন তাহলে গোলকুণ্ডা রাজ্যের আধিপত্য একদিন তাঁরই প্রাপ্য হবে। কাজেই মুঘল সাম্রাজ্যকে আরও সুবিস্তৃত করার এই চমৎকার সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নয়। মীরজুমলার ধারণা ছিল যে সুজা তাঁর অন্য ভ্রাতাদের মতই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আগ্রহশীল। কিন্তু শুজার মনোভাব ছিল একেবারে বিপরীত। তিনি মীরজুমলাকে লিখলেন যে এমন একজন লোককে কি করে বিশ্বাস করা যায় যিনি নিজের মনিবের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেষ্টিত। তিনি তো অনায়াসে একজন ভিনদেশীয় রাজকুমারকেও ভ্রান্তপথে চালিত করতে পারেন। আর তিনি যে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা কচ্ছেন তা তো নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যেই। সুতরাং তাঁব পক্ষে মীরজুমলার উপর নির্ভরশীল হওয়া সম্ভবপর নয়।

সুলতান শুজার অস্বীকৃতির পরে মীরজুমলা চিঠি পাঠালেন ঔরংজেবকে। তিনি তখন বুরহানপুরের শাসনভার বহন কচ্ছিলেন। তিনি তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতার ন্যায় সৎ লোক ছিলেন না। কাজেই তিনি সাগ্রহে মীরজুমলার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তারপর মীরজুমলা সৈন্য সহ বাগ-নাগরের দিকে

এগিয়ে গেলে ঔরংজেব অতি দ্রুত সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। দুই সৈন্যবাহিনী মিলিত হয়ে বাগ-নাগরের (আধুনিক হায়দরাবাদ) তোরণদ্বারে গিয়ে পৌঁছালে সুলতান কোন রকমে গোলকুণ্ডার দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেবার অবকাশ পেলেন। আর ঔরংজেব বাগ-নাগরকে বিধ্বস্ত ও প্রাসাদ লুণ্ঠন করে গোলকুণ্ডার উপরে দৃঢ় অবরোধ চালালেন। এভাবে ভয়ংকর এক অবস্থার চাপে পড়ে গোলকুণ্ডার সুলতান অতি সম্মানজনক ভাবে মীরজুমলার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের মুক্তি দিলেন। এই রকম সদাশয়তা ও সংগুণ ইউরোপীয়দের ন্যায় ভারতীয়দের মধ্যেও আছে। এই প্রকার একটি সদগুণের অদ্ভুত উদাহরণ আমি গোলকুণ্ডার সুলতান সম্বন্ধেই দেব।

তাঁর দুর্গটি অবরোধের কয়েকদিন পরে জনৈক কামান চালক দূর থেকে দেখলেন যে ঔরংজেব তাঁর হাতীর পিঠে করে কেল্লার প্রাচীরের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এই দেখে উক্ত কামান চালক সুলতানকে বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছে করলেই একটি মাত্র গুলি ছুঁড়েই ঔরংজেবকে ভূতলশায়ী করতে পারেন। এই কথা বলে সেই লোকটি গুলী ছুঁড়তে প্রায় উদ্যত হয়েছিল আর কি। কিন্তু সুলতান তার হাতটি ধরে বললেন, তিনিও ঔরংজেবকে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে সুলতানদের উচিত হচ্ছে রাজকুমারীদের স্বামীরূপে সদ্ব্যবহাব সম্পন্ন হওয়া। কামান চালক সুলতানের কথা মেনে নিল। কিন্তু সে ঔরংজেবকে গুলী না করে তাঁর সৈন্য বাহিনীর অধিনায়কের মস্তক বিচ্ছিন্ন করলো। তাতে দুর্গ আক্রমণের ব্যাপারটা একটু বন্ধ হোল। সেনাপতির মৃত্যুতে সৈন্যরা গেল ছত্র ভঙ্গ হয়ে।

গোলকুণ্ডার সুলতানের সেনানায়ক আবদুল জব্বর বেগ পলায়ণপর মুঘল সৈন্যদের শিবিরের অনতিদূরেই ছিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে মুঘল সৈন্য মহলে বিশৃঙ্খলা এসেছে দেখে তিনি বেশ একটা সুযোগ মনে করলেন। আর খুব জোর আক্রমণ চালিয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে শত্রু সৈন্য বাহিনীর পশ্চাতে রাত্রি পর্য্যন্ত ধাবিত হয়ে চার পাঁচ লীগ দূরে তাদের হটিয়ে নিয়ে গেলেন। মুঘল সেনাপতির মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে গোলকুণ্ডার সুলতান দেখলেন দুর্গ মধ্যে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। তখন তিনি দুর্গের চাবি শত্রুর হাতে সমর্পণ করতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর তৎক্ষণাৎ তাঁর জামাতা মীর্জা মহম্মদ সেই চাবি ছিনিয়ে নিয়ে বললেন তিনি যদি

পুনরায় ঐ জাতীয় চেষ্টা করেন তাহলে তাঁর প্রাণহানি করতেও তিনি (জামাতা) কুণ্ঠিত হবেন না। সুলতান পূর্ব্বে জামাতার প্রতি স্নেহপরায়ণ না হলেও এই ঘটনার পর বাকী জীবন তিনি তাঁকে স্নেহ ভালবাসার অফুরন্ত ধারায় অভিষিক্ত করেছেন।

ঔরংজেবের অবরোধ কার্য্য এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হতে তিনি আবার সৈন্য সমাবেশ করতে কিছুদিন সময় নিলেন। অবশেষে নতুন সৈন্য বহর গঠন করে নব উদ্যমে আবার এলেন এগিয়ে। কিন্তু মীর জুমলার অন্তরে গোলকুণ্ডার সুলতানের প্রতি খানিকটা সহানুভূতি তখনও ছিল। তাই তিনি চূড়ান্ত চেষ্টা করে ঔরংজেবকে দুর্গ আক্রমণের অবকাশ দিলেন না। বরং উল্টে নিজের বুদ্ধি ও পরিচালনা কৌশলে তিনি তাঁর সৈন্যদের অগ্রগতি রোধ করলেন।

ঔরংজেবের পিতা শাহজাহান একদা গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে যে সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন তা তিনি ভুলে যান নি। শাহজাহান তাঁব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সংগে মিলিত হয়ে পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। মুঘল সম্রাট জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বন্দী করিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর চোখ দু'টিকে দৃষ্টি শক্তি হীন করে দেন। কিন্তু শাহজাহান অতি মাত্রায় সতর্ক থেকে রেহাই পান। আর পলায়ণ করে তিনি আশ্রয় ও সাহায্য পেয়েছিলেন গোলকুণ্ডার সুলতানেরই কাছে। এই সূত্রে শাহজাহান গোলকুণ্ডাধিপতির সংগে এক সুদৃঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল যে শাহজাহান গোলকুণ্ডা রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবেন, কোন অবস্থায় এবং কোন কারণেই তিনি ঐ রাজ্যেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবেন না। সুতরাং মীর জুমলা উপলব্ধি করলেন যে পুরাতন বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দুই রাজাকে গোপন চেষ্টা দ্বারা সন্ধি সূত্রে গ্রথিত করা কিছু কঠিন নয়। মীর জুমলা এক চতুর নীতি প্রয়োগ করে ঠিক করলেন যে গোলকুণ্ডার সুলতান প্রথমে শাহজাহানকে পত্র পাঠাবেন এবং বিনীত অনুরোধ জানাবেন ঔরংজেব ও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ সংগ্রামে তিনি যেন মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দেন। তিনি মুঘল সম্রাটের নীতি ও প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে মেনে নেবেন এবং তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী চুক্তি সই করবেন। পক্ষান্তরে মীর জুমলা শাহজাহানকেও পরামর্শ দিলেন গোলকুণ্ডার সুলতানকে কি লিখতে হবে, সে বিষয়ে।

এই সময়ই শাহজাহান গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যাকে ঔরংজেব তনয় সুলতান মহম্মদের সংগে বিয়ে দেবার প্রস্তাব পাঠান। সর্ত্ত ছিল, রাজপুত্রীর পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর এই জামাতা হবেন ঐ রাজ্যের সুলতান। প্রস্তাবটি গোলকুণ্ডার সুলতান গ্রহণ করলেন, সন্ধি চুক্তি সম্পন্ন হোল। বিবাহ উৎসবও নিষ্পন্ন হয়েছিল অভাবনীয় জ'াকজমক সহকারে। মীর জুমলা তখন গোলকুণ্ডা রাজের কার্য্যভার ত্যাগ করে চলে গেলেন বুরহানপুরে ঔরংজেবের সংগে। কিছুদিন পরে সম্রাট শাহজাহান তাঁকে প্রধান মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রধান মন্ত্রীই ঔরংজেবকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন সুলতান সুজাকে পরাস্ত করে সিংহাসন অধিকার করতে। মীরজুমলা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান। রাজ্য পরিচালনা ও সামরিক কৌশল—দু' দিকেই ছিল তাঁর সমান দক্ষতা। তাঁর সংগে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ আমার কয়েকবারই হয়েছিল। তাঁর ন্যায়-পরায়ণতা, কর্ম্মক্ষমতা ও লোকের সংগে সদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণাই হয়েছিল। তিনি যখন হুকুম নির্দ্দেশ দিতেন ও হুকুম নামা সই করতেন, মনে হতো ঐ একটি কাজেরই বোধহয় তাঁর দায়িত্ব।

গোলকুণ্ডার তৃতীয় নবাব পুত্রী বাগদত্তা হয়েছিলেন মক্কার অন্য আর একজন শেখ সুলতান সৈয়দের সংগে বিবাহের জন্য। এই বিবাহ প্রস্তাব চমৎকার ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। শুভ উৎসবের দিন তারিখ পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেনানায়ক আবদুল জব্বর বেগ এবং আর ছয়জন আমির মন্ত্রী মিলে সুলতানের কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করার অনুরোধ জানান। তাঁদের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে হোল না। পরে রাজপুত্রীর বিয়ে হয়েছিল সুলতানের খুড়তুত কি মামাতো ভাই মীর্জা আবদুল হাসানের সংগে। এই বিয়ের ফলে নবাব নন্দিনীর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরাই পরে ঔরংজেব তনয়ের গোলকুণ্ডার সিংহাসনের দাবী নাকচ করে দেন। এই বিষয়ে একটি সুযোগও এসে যায়। ঔরংজেব তখন পুত্রকে গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ রেখেছিলেন পিতার বিরুদ্ধে খুল্লতাত সুলতান সুজার পক্ষ অবলম্বনের জন্য। সুলতান কনিষ্ঠা কন্যাকে সুলতান মীর্জা আবদুল হাসানের (কাশিম?) সংগে বিয়ে দেবেন স্থির ছিল। কিন্তু তাঁর অমিতাচারের জন্যে তিনি তাঁকে সুযোগ্য পাত্র মনে

করেন নি। কিন্তু পরে বিয়ে হয়ে গেলে মীর্জা হাসান অত্যন্ত সুনীতিপরায়ণ ও মিতাচারী হয়ে ওঠেন।

এই ঘটনার পরে গোলকুণ্ডার সুলতান মুঘলদের সম্বন্ধে আর ভীতিগ্রস্ত হন নি। তাঁদের অনুকরণেই তিনি স্বদেশের অর্থ সম্পদ দেশের মধ্যেই রাখতেন। এই করে তিনি এত পর্য্যাপ্ত অর্থ কড়ি নিজের রাজকোষে জমা করেছিলেন যে যুদ্ধ চালনায় আর কোন অসুবিধার কারণ থাকলো না। তিনি পুরোপুরি আলী সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের মত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন না। শোনা যায় যে আলী ঐ জাতীয় কিছু পরিধান করতেন না। অন্য প্রকার শিরাচ্ছাদন ছিল তাঁর। গোলকুণ্ডার সুলতান আলী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াতে পারস্য দেশের যাঁরা ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আসতেন তাঁরা মুঘল সম্রাট অপেক্ষা গোলকুণ্ডার আশ্রয় নিতে বেশী আগ্রহী হতেন। বিজাপুরের সুলতানের ক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় একরূপ। গোলকুণ্ডার সুলতানের ভগ্নী বিজাপুরের সুলতানাও সে দেশের রাজাকে আলী সম্প্রদায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত করেছিলেন। ফলে সে রাজ্যেও প্রচুর পারস্য দেশীয় লোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

অধ্যায় এগার

গোলকুণ্ডা থেকে মসলীপত্তনের রাস্তা।

মসলীপত্তন ও গোলকুণ্ডার মধ্যে পথের প্রকৃত পরিমাপ করেন এঁরা একশ' লীগ। কিন্তু হীরক খনি হয়ে গেলে তা একশ' বার লীগ হয়। আমি এই রাস্তা ধরেই গিয়েছিলাম। পারসীক ভাষায় হীরক খনি অঞ্চলকে বলা হয় কোলার, ভারতীয়রা বলেন খনি।

গোলকুণ্ডার পরে আতেনারা ভারি সুন্দর একটি জায়গা। ওখানে চারটি মনোরম বাড়ী আছে। প্রতিটি বাড়ীর সংগে এক একটি সুবৃহৎ উদ্যান। একটি বাড়ী রয়েছে রাজপথের বাঁ'দিকে। সেই বাড়ীটিই সবচেয়ে সুন্দর। খণ্ড খণ্ড পাথর দিয়ে তৈরী এবং দোতলা। দোতলায় চমৎকার কক্ষসারি, বড় কক্ষ, বৈঠকখানা এবং শয়ন ঘর। বাড়ীটির সামনে চৌকো একটি বিরাট উন্মুক্ত চত্বর আছে। সেটি প্যারিসের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন চত্বরের চেয়ে কম সুন্দর নয়। তিনদিকে রয়েছে বিশালাকার তিনটি তোরণ দ্বার। সেখানে উত্তম খিলান যুক্ত ও জমি থেকে চার পাঁচ ফুট উঁচু চমৎকার পাটাতন মত আছে। বিশিষ্ট পর্য্যটকদের ওখানে বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকে। প্রতিটি ফটকের মাথায় বেশ সুন্দর একটি কাঠামো এবং মহিলাদের জন্য একটি কক্ষ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যখন ইচ্ছে হয় বাড়ীতে না থেকে উদ্যান বাগিচায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করেন। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে এই তিনটি বাড়ী ব্যতীত আর সাধারণ কোন গৃহাবাস ওখানে নেই। চতুর্থ বাড়ীটি রাণীর। রাণীর অনুপস্থিতে যে কেউ বাড়ীটি পরিদর্শন ও উদ্যানে ভ্রমণ করতে পারেন। বাগানটি অত্যন্ত রমণীয় স্থান। জলের ব্যবস্থাও উত্তম। উন্মুক্ত চত্বরটির চতুর্দিক বহু সংখ্যক কক্ষদ্বারা বেষ্টিত। সেগুলি দরিদ্র পর্য্যটকদের বাসস্থান রূপে নির্দিষ্ট। প্রতিদিন সেই যাত্রীরা কিছু রান্না করা চাল ডালের খাদ্য ভিক্ষা পান। তবে কতক হিন্দু যাত্রী অপরের পাকান্ন গ্রহণ করেন না। তাদের আটা ও ঘি দেয়া হয় রুটী তৈরী করার জন্যে। বড় বড় পাতলা রুটি তৈরী করে তারা ঘৃতের মধ্যে ডুবিয়ে নেয়।

আতেনারা থেকে আরও কয়েকটি জায়গা পেরিয়ে লকবরণ, তারপর কোলার। লকবরণ থেকে কোলার বা খনি যাবার কথা আমি খনি সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলবো।

লকবরণ ও কোলারের মধ্যেকার রাস্তা বিশেষতঃ কোলারের কাছাকাছি অঞ্চল অত্যন্ত পর্ব্বত সংকুল। তার ফলে কতক জায়গায় আমি গাড়ী ঘোড়াকে সাময়িক বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলুম। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ভাল জমি মাটি হলেই সেখানে দেখা যাবে দারুচিনি গাছ। ওখানকার দারুচিনি খুব ভাল। এটা সর্ব্বাপেক্ষা রেচক।

কোলারের পাশ দিয়ে বড় একটি নদী (কৃষ্ণা) প্রবহমান। ওটি মসলিপত্তনের কাছে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

কোলার বা খনির পরে কহকলি ও বেজওয়াদা। কোলারের নদীটি শেষোক্ত জায়গায় গিয়ে পার হতে হয়। বেজওয়াদার পরে ভোচির ও নিরুমোলু। এদু'টি জায়গার মাঝখানে একটি বড় নদী পার হতে হয় কাঠের ভেলার মত নৌকো করে। অন্য আর কোন প্রকার নৌকো নেই। এরপর আর একটি জায়গা পেরোলেই মসলিপত্তন।

মসলিপত্তন বেশ বড় সহর। বাড়ীঘর সব কাঠের তৈরী। আর দূরে দূরে অবস্থিত। স্থানটি সমুদ্র তীরে। জাহাজ যাতায়াতের জন্যই জায়গাটির এত প্রসিদ্ধি। এখানকার জাহাজই বঙ্গোপসাগর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখান থেকে জাহাজ চলাচল করে পেগু, শ্যাম, আরাকান, বাংলা, কোচিন চীন, মক্কা, অর্মাস, মাদাগাস্কার দ্বীপ, সুমাত্রা ও ম্যানিলা দ্বীপে।

একটি বিষয় জানা দরকার। গোলকুণ্ডা থেকে মসলিপত্তন পর্য্যন্ত কোন শকট যানের ব্যবস্থা নেই। কারণ হচ্ছে ঐ রাস্তায় রয়েছে উঁচু পাহাড়, হ্রদ, নদী ইত্যাদি যার ফলে রাস্তা অত্যন্ত খাড়া ও অনতিক্রমণীয়। খুব ছোট গাড়ী নিয়ে যাওয়াও দুষ্কর। এজন্যে গাড়ীটি খুলে বহন করে নিয়ে যেতে বাধ্য হই। গোলকুণ্ডা ও কুমারিকা অন্তরীপ মধ্যে রাস্তাটি যেমন সরু, তেমনি খারাপ। কাজেই গাড়ী শকট নিয়ে চলা বড়ই কষ্টকর। অন্যান্য রাস্তা সম্বন্ধে যেমন বলেছি এখানেও কদাচিৎ তা চলে। অথচ অন্য রাস্তাও নেই যে মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করা যায়। আবার ঘোড়া ও বৃষ ছাড়া একাজ চলেও না। তবে গাড়ীর বদলে এখানে পাল্‌কীর সুবিধা আছে। এখানকার পাল্‌কী ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী ও স্বাচ্ছন্দ্যকর।

অধ্যায় বার

সুরাট থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা এবং বিজাপুর হয়ে গোয়া এবং গোলকুণ্ডা।

সুরাট থেকে গোয়া আংশিক স্থলপথে ও কিছুটা জলপথে যাওয়া যায়। স্থলপথ অত্যন্ত খারাপ। এজন্যে যাত্রীরা সাধারণতঃ সমুদ্র পথেই যাতায়াত করেন। দাঁড় টানা এক রকম নৌকো ভাড়া করে গোয়া তীরে পৌঁছে যান। তবে অনেক সময় মলোবারী ও ভারতীয় জলদস্যুদের ভয় থাকে এই উপকূল অঞ্চলে। সে বিষয়ে আমি যথাস্থানে আলোচনা করবো।

সুরাট থেকে গোয়া পর্য্যন্ত রাস্তা ক্রোশ ধরে হিসেব করা হয়না। যে প্রথায় দূরত্ব নির্ণয় করা হয় তার মাপকে 'গস' বলা হয়। এক গসের পরিমাপ আমাদের সাধারণ লীগের চারগুণ।

সুরাটের পরে দমন। তারপর বেসিন, দাভল, মিন্‌গ্রেলা প্রভৃতি স্থান হয়ে গোয়া পৌঁছোনো যায়।

উপকূল ভাগে বিষম একটি বিপদের আশংকা আছে। সে হচ্ছে মালাবারীদের হাতে পড়ার ভয়। এরা দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান। খৃষ্টানদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর। জনৈক কার্মেলিয় সন্ন্যাসী (শ্বেত পোষাক পরিহিত কার্মেল পাহাড়ের সন্ন্যাসী) কিভাবে সেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তা দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। তাঁর মুক্তিমূল্য দ্রুত আদায়ের জন্য তাঁরা কি রকম অত্যাচার চালিয়েছিল তা বর্ণনা কচ্ছি। বাঁ হাতখানি থেকে ডানটিকে অর্দ্ধেক ছোট করে দেয়া হয়। একখানি পায়ের অবস্থাও করে দিয়েছিল তদনুরূপ। সৈনিকদের যে ছয় মাস সমুদ্রে কাটাতে হয় তখনকার জন্য সেনাপতিরা তাদের ছয় ক্রাউনের বেশী পারিশ্রমিক দান করেন না। ছয় মাস পরে তারা ঘরে ফিরবার অনুমতি পায়। তবে আরও বেশীদিন তাদের সমুদ্রে কাটাতে বাধ্য করলে বেতন বেশী দেয়া হয়। সমুদ্র বক্ষে বিশ পঁচিশ লীগের বেশী তারা বড় এগিয়ে যেতে চায় না। ঐটুকু পর্য্যন্ত জাহাজ ও নৌকোর পক্ষে বিশেষ বিপদজনক নয়। তবে মাঝে মাঝে পর্ত্তুগীজরা নৌকোগুলি ভেঙ্গে তখনকার মত জাহাজে টাঙিয়ে রাখে, না হয়তো জাহাজ থেকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দেয়। মালাবারীরা কখনও দু'শ' আড়াইশ' লোক ও দশ বার খানি নৌকো নিয়ে বড় জাহাজকেও আক্রমণ করে। তারা বড় বড় বন্দুকের আক্রমণকেও গ্রাহ্য করেনা। এক একটি জাহাজের কাছে এরা এত

আকস্মিকভাবে আসে এবং এত বেশী সংখ্যক আগুন ভর্ত্তি পাত্র ডেকের উপরে ছুঁড়তে থাকে, যদি খুব শীঘ্র তার প্রতিবিধান করা না যায় তাহলে অপরিসীম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। জাহাজ চালকগণ সাধারণতঃ ঐ দস্যুদের রীতিনীতি জানেন। ওরা দৃষ্টি সীমার মধ্যে এলে তাড়াতাড়ি কয়লা রাখার ফোকরগুলি বন্ধ করে ডেকের উপরে জল ঢালতে শুরু করেন যাতে আগুনের পাত্রগুলি জলমগ্ন হয়ে আগুন ধরাতে না পারে।

মিঃ ক্লার্ক নামে জনৈক ইংরেজ নৌ সেনাধ্যক্ষ বনৃতম থেকে সুরাটে আগমনকালে কোচিনের অনতিদূরে এই ধরণের একদল মালোবারীর সাক্ষাৎ পান। দস্যুদের সংগে পঁচিশ ত্রিশখানি জাহাজ ছিল। তারা এক একটি করে নৌকো এগিয়ে এনে ভয়ংকর ভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছিল। ক্যাপ্টেন দেখলেন যে প্রথম উত্তেজনার আক্রমণ তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তখন তিনি বারুদপূর্ণ কতকগুলি বন্দুকের নলে আগুন ধরিয়ে জাহাজের ডেকটি দিলেন জ্বালিয়ে। আর অনেকগুলি দস্যুকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিলেন। তাতেও বাকী দস্যুরা দমলো না। দ্বিতীয় দফায় আর একদল দস্যু ক্যাপ্টেনের জাহাজের উপরে এসে উঠলো। ইংরেজ ক্যাপ্টেন আর কোন সাহায্যের আশা না দেখে তাঁর অনুচরদের দু'খানি ছোট নৌকোতে তুলে দিলেন। আর নিজে থাকলেন কেবিনের পেছন দিকে। সেখানে দস্যুরা সহজে ও হঠাৎ প্রবেশ করতে পারেনি। এবারে তিনি আবার বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তিনি নিজে লাফিয়ে পড়লেন সমুদ্রের জলে। পরে অবশ্য তাঁর অনুচররা তাঁকে তুলে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে জাহাজটি পুরো ভস্মীভূত হতে দস্যুর দল জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু এত সত্ত্বেও দু'খানি নৌকোতে যে চল্লিশ জন আন্দাজ ইংরেজকে তুলে দেয়া হয়েছিল তারা মালোবারীদের হাতে পড়ে গিয়েছিল। আরও দস্যু নতুন করে এসে দলে যোগ দিয়েছিল। ঐ সময়ে আমি ইংরেজ কোম্পানীর অধিকর্ত্তা মিঃ ফ্রেমলিনের সংগে প্রাতঃ ভোজনে ব্যস্ত ছিলাম। তখন তিনি ক্যাপ্টেন ক্লার্কের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন এই মর্ম্মে যে রাজা মামোরিণের দাস রূপে তিনি দিন কাটাচ্ছেন। জল দস্যু অধ্যুষিত উপকূলে তিনি হলেন সর্ব্বাপেক্ষা সুবিবেচক শাসক। সেই রাজা ইংরেজদের কখনও দুর্ব্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। কারণ তিনি জানতেন যে দস্যুরা তাঁদের জীবনে কি ভয়ানক বিপদ ঘটাতে পারে। দু'বার জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের

ফলে বার শতেরও বেশী নারী স্বামীহারা হয়েছেন। রাজা তাঁদের সান্ত্বনা দানের একটা পথ খুঁজে বের করলেন। প্রতিটি বিধবা নারীকে তিনি দু'টি করে তুর্কী মুদ্রাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রতিটি মুদ্রার মূল্য চার শিলিং। ক্রাউনে হিসেব করলে হয় দু'হাজার দু'শতের উপর। এছাড়া ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য নাবিকদের উপরে আক্রমণের ক্ষতিপূরণ বাবদ মঞ্জুর করলেন চার হাজার ক্রাউন। ইংরেজ অধ্যক্ষ তখুনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাঁদের ফিরে আসতেও দেখেছিলাম। কয়েকজন ভাল স্বাস্থ্য নিয়েই এসেছিলেন। কতক এসেছিলেন ভয়ংকররূপে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে। মলোবারীরা এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে কোন দূষিত ও অপবিত্র কিছুকে তারা ডান হাত দিয়ে ধরবে না, ছোঁবে না। সেকাজ করবে বাঁ হাত দিয়ে। আর সেই হাতের নখগুলি থাকবে খুব বড়। মেয়েরা বড় বড় চুল রেখে তাও নখ দিয়েই চিরণীর মত আঁচড়ায়। চুলগুলিকে মাথার উপরে জড়িয়ে রেখে তিন কোণ বিশিষ্ট একখণ্ড লিনেন কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখে।

দমনের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এখন বলছি বর্ত্তমান মুঘল সম্রাট কি প্রকারে দমন সহরটিকে আক্রমণ অবরোধ করেছিলেন। অনেকের ধারণা হস্তী বাহিনী যুদ্ধের সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। কখনও কখনও তা সত্য হতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা নয়। অনেক সময় হাতী শত্রুর অনিষ্ট না করে হয়ত চালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে লাফ ঝাঁপ দিয়ে স্বপক্ষের সৈন্যদের দেয় ছত্রভঙ্গ করে। সম্রাট ঔরংজেবের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়। দমন সহরের সম্মুখে তাঁকে বিশ দিন থাকতে হয়েছিল। অবশেষে সংকল্প করলেন এক রবিবারে আক্রমণ চালাবেন। তাঁর ধারণা ছিল ইহুদীদের ন্যায় খৃষ্টানরাও রবিবারে আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন না। দমন সহরের শাসন সংরক্ষণের ভার ছিল জনৈক প্রাক্তন ও প্রবীণ সৈনিকের উপর। ইনি ফ্রান্সেও কাজ করেছেন। এখানে তাঁর সংগে তিন পুত্রও ছিলেন। সহরে ভদ্রশ্রেণীর বাসিন্দা ছিলেন আট শত। একদল শক্তিশালী সৈন্যও ছিল। অন্যান্য স্থান থেকে সৈন্যরা এসে সমবেত হয়েছিল মুঘল আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্যে। মুঘল সম্রাটের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজারেরও অধিক। কিন্তু তাহলেও সমুদ্রের দিক থেকে দমনকে রক্ষা করার যে চেষ্টা চলবে তা ব্যর্থ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই কাজে প্রয়োজন ছিল নৌবহরের। যুদ্ধ সম্পর্কে পরামর্শ সমিতির নির্দ্দেশে সম্রাট দমনের উপর আক্রমণ রবিবারেই চালাবেন স্থির হোল

দমনের শাসনকর্ত্তাও জনসাধারণকে মধ্য রাত্রের পরে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দ্দেশ দিলেন। আর তিনি সমস্ত অশ্বারোহী ও কতক পদাতিক সৈন্যসহ এমন একটি অঞ্চলের উপর আক্রমণ চালালেন যেখানে শত্রু পক্ষের প্রায় দু'শ হাতী ছিল প্রহরারত। সেই হস্তীযূথের মধ্যেই অনেকগুলি বারুদ বাজি ছুঁড়ে দিলেন। ফলে হাতীগুলি রাত্রির অন্ধকারে ভয়ে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে মাহুত বিহীন অবস্থায় সহর অবরোধকারীদের দিকেই উন্মত্তভাবে ধাবিত হোল, দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই ঔরংজেবের সৈন্যবাহিনীর অর্দ্ধাংশের দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনদিনের মধ্যে দমন সহরের উপর থেকে আক্রমণ প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। এই ঘটনার পরে সম্রাট আর খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হননি।

আমি গোয়া ভ্রমণে গিয়েছি দু'বার। একবার ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের গোড়ায়। দ্বিতীয়বার ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের শুরুতে। প্রথমবারে ওখানে ছিলাম পাঁচ দিন। স্থল পথে আমি সুরাটে ফিরে আসি। গোয়া থেকে যাই বিচোলি। এই জায়গাটি প্রধান ভূখণ্ডে। তারপর গেলুম বিজাপুর, গোলকুণ্ডা। সেখান থেকে ঔরংগাবাদ হয়ে যাই সুরাটে। গোলকুণ্ডা না গিয়েও সুরাটে যাওয়া যেত; কিন্তু আমার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজেই ঐ পথে যেতে হয়।

গোয়া থেকে বিজাপুর ৮৫ ক্রোশ দূরে। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে সাধারণতঃ আট দিন আবশ্যক হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার ব্যবধান একশ' ক্রোশ। এতটা রাস্তা আমি অতিক্রম করেছিলাম নয় দিনে। গোলকুণ্ডা ও ঔরংগাবাদের মধ্যে যে রাস্তা তার পর্য্যায়গুলি খুব সুসম্বদ্ধ নয়। কোন কোন স্থানে তা ষোল কি বিশ লীগে বিভক্ত।

ঔরংগাবাদ থেকে সুরাট যেতে সময় ক্ষেপ হয় কখনও বার, কখনও পনের; কোন সময় আবার ষোল দিন।

বিজাপুর সহর আয়তনে বড় হলেও সাধারণ বাড়ী ঘর অট্টালিকা, ব্যবসা বাণিজ্য কোনদিকে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। সুলতানের প্রাসাদ বিরাট বটে কিন্তু সুগঠিত নয়। প্রবেশ পথ অত্যন্ত বিপদজনক। প্রাসাদ বেষ্টিত পরিখা-সমূহের জলে প্রচুর কুমীর। বিজাপুর সুলতানের রাজ্য মধ্যে তিনটি উত্তম বন্দর আছে। রাজাপুর, দাভল, কারিপত্তন। শেষেরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ওখানে সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ে পর্ব্বতের পাদদেশে। তীরের কাছে জলের গভীরতা ছাপান্ন বাট ফুট পর্য্যন্ত। পাহাড়টির চূড়ায় একটি কেল্লা। তার মধ্যেও

একটি ঝরণা ধারা। কারিপত্তন গোয়া থেকে উত্তর দিকে পাঁচ দিনেরও বেশী যাত্রা পথে অবস্থিত; বিজাপুর সুলতানের মরিচ বিক্রয়ের স্থান রায়বাগও পূর্ব্বদিকে ততটাই দূরে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দু'টি রাজ্যই পূর্ব্বে মহান মুঘল সম্রাটগণের অধীনে করদ রাজ্য ছিল। এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন।

বিজাপুর রাজ্য কিছুকালের জন্য অশান্তিপূর্ণ হয়েছিল সুলতানের রক্ষী-বাহিনীর অধিনায়ক শাহজীর বিদ্রোহের ফলে। তারপর তাঁর তরুণ পুত্র শিবাজী সুলতানের বিরুদ্ধে এমন তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করতেন যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত এক দস্যুদলের নায়ক বনে গেলেন। শিবাজী যেমন ছিলেন বুদ্ধিমান, তেমনি উদার। তিনি এত বেশী মানুষ ও অশ্ব সংগ্রহ করেছিলেন যে একটি পুরো মাত্রার সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলাই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর উদার প্রকৃতির কথা শুনে সমস্ত অঞ্চল থেকে সৈন্য সামন্ত এসে জড় হয়েছিল তাঁর পাশে। তিনি যখন সেই বাহিনীসহ আক্রমণ চালাতে উদ্যত হন ঠিক সেই সময়েই বিজাপুর সুলতানের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। সুতরাং অতি অনায়াসে শিবাজী মলোবার উপকূলের একটি অংশ, রাজাপুর, রসিগড়, কারিপত্তন, দাভল ও অন্যান্য স্থান অধিকার করে নিলেন। ওখানকার অধিবাসীদের কাছে শুনেছি যে তিনি রসিগড় এর দুর্গ বিধ্বস্ত করে এত অপরিমেয় ধনরত্ন পেয়েছিলেন যে সৈন্যদের বেতন দান করা বিশেষ সহজ হয়েছিল। তিনি সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সুলতানের মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব্বে বেগম সাহেবার যখন আর সন্তান লাভের সম্ভাবনা রইল না তখন ছোট একটি বালককে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করা হল। তাকে বিশেষ স্নেহ যত্ন সহকাকে আলী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাদর্শে প্রতিপালন করেন। সুলতান মৃত্যুশয্যায় শায়িত থেকে সেই দত্তক পুত্রকে সুলতান পদে অভিষিক্ত করেন। শিবাজী বহু সংখ্যক সৈন্যসহ অনবরত যুদ্ধ চালাতে লাগলেন; আর বেগম সাহেবার রাজ প্রতিনিধিত্বকে বিঘ্নিত করে তুললেন। অবশেষে শিবাজীই শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হোল এই সর্ত্তে যে তিনি যে সকল জায়গা অধিকার করেছেন তা তিনি নির্ব্বিবাদে শাসন করবেন এবং তা করবেন সুলতানের অধীনে করদ রাজ্য হিসেবে। সমগ্র রাজস্বের অর্দ্ধাংশ তিনি সুলতানকে কর স্বরূপ দান করবেন। তারপরে তরুণ নবাব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে রাণীমাতা মক্কায় গিয়েছিলেন তীর্থযাত্রা করতে। আমি ইস্পাহানে থাকতে তিনি সেই সহরের মধ্যে দিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

আমি দ্বিতীয়বার গোয়াতে গিয়ে একখানি ওলন্দাজ জাহাজে আরোহণ করি। নাম মিস্ট্রেস্। জাহাজটি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল মিন্‌গ্রেলাতে (ভিন্‌গ্রেলা)। আমি সেখানে পৌঁছোই ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারী।

মিন্‌গ্রেলা বা ভিন্‌গ্রেলা বড় একটি সহর। বিজাপুর রাজ্যে সমুদ্রতীরে প্রায় আধ লীগ জুড়ে শহরটির বিস্তার। সমগ্র ভারতবর্ষে এই রাস্তাটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হল্যাণ্ডবাসীরা এখান থেকেই প্রতিবারে নতুন খাদ্য দ্রব্য ও বস্তু সম্ভার সংগ্রহ করেন যখন তাঁরা গোয়া পর্য্যন্ত যেতে পারেন না। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য স্থানের সংগে ব্যবসা চালাবার সময়ও এখান থেকেই জিনিসপত্র প্রেরিত হয়। মিন্‌গ্রেলার জল হাওয়া ও চাল দুই-ই চমৎকার। সহরটি এলাচীর জন্য বিশেষ বিখ্যাত। প্রাচ্য দেশীয়রা এই জিনিসটিকে মশলা হিসেবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মনে করেন। এলাচী অন্য আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। তার ফলে এ মশলা যেমন দুর্ম্মূল্য, তেমনি দুষ্প্রাপ্য। এখানে অতিরিক্ত মোটা সূতী কাপড় তৈরী হয় প্রচুর। দেশের মধ্যেই তার ব্যবহার বেশী। এই কাপড় সাধারণতঃ আচ্ছাদন আবরণরূপেই ব্যবহৃত হয়। কতকগুলি জিনিসপত্র প্যাক্ করার কাজে লাগে। ব্যবসা বাণিজ্য ও জাহাজে রসদ যোগানো, দুই ব্যাপারেই ওলন্দাজগণ এই সহরে কারখানা বা ফ্যাক্টরী খুলেছেন। আমি আগেও বলেছি যে বাটাভিয়া, জাপান, বেঙ্গল, সিংহল এবং অন্যান্য স্থান থেকে বহিরাগত যে সকল জাহাজ সুরাট, লোহিতসাগর, অর্মাস, বসোরা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে তারাই যে শুধু ভিন্‌গ্রেলায় নোঙর করে তা নয়, হল্যাণ্ডবাসীরা যখন পর্ত্তুগীজদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং গোয়ার বালির চড়ার সামনে অবস্থান করে আট দশটি জাহাজসহ তখন তাঁরা ছোট নৌকো মিন্‌গ্রেলাতে পাঠান খাদ্য রসদ নেবার জন্যে। কারণ ওলন্দাজদের বছরের আট মাস সর্ব্বক্ষণ গোয়া বন্দরের মুখে প্রহরারত থাকতে হয় যাতে সমুদ্র পথে কেউ গোয়াতে প্রবেশ করতে না পারে। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে গোয়ার সেই বালির চড়া বছরের কয়েক মাস বর্ষাগমনের পূর্ব্বে দক্ষিণ পশ্চিমী বাতাসের প্রবল চাপে এমন বেড়ে ওঠে যে এক দেড় ফুটের বেশী জল নদীতে থাকে না। ফলে ছোট ছোট নৌকোও চলতে পারে না। তারপর ঘন বৃষ্টিপাতে নদী স্ফীত হলে বালিগুলি ধুয়ে যায়। আবার বড় বড় জলযান চলবার মত অবস্থা ফিরে আসে।

অধ্যায় তের

গোয়া সহরের অবস্থা পর্য্যালোচনা

গোয়ার অবস্থান ১৫ ডিগ্রী, ৩২ মিনিট অক্ষাংশে। মাণ্ডরী নদীর উপর ছয় সাত লীগ পরিধির একটি দ্বীপ। নদীর মোহনা থেকে দশ লীগ দূরে। দ্বীপটিতে ধান ও দানাশস্য জন্মায় প্রচুর পরিমাণে। ওখানে আরও নানাপ্রকার ফল, যেমন, আম, আনারস ও নারকেলের প্রাচুর্য্য আছে। কিন্তু অ্যাপেলের মত এক প্রকার ফল হার মানিয়েছে বাকী সমস্ত ফলকে। যাঁরা ইউরোপ এশিয়া ভ্রমণ করেছেন তাঁরা আমার সংগে একমত হবেন যে গোয়া কনস্টান্টি-নোপল ও তুলো বন্দরের মতই উৎকৃষ্ট। গোয়া সহরটি অতি সুবৃহৎ। প্রাচীর শ্রেণী উত্তম প্রস্তরে গঠিত। অধিকাংশ বাড়ীঘর, বিশেষতঃ ভাই-সরয়ের আবাস অতি চমৎকার। ভাইসরয়ের প্রাসাদ বহু কক্ষ বিশিষ্ট। কতকগুলি কক্ষে ও কামরায় বহু সংখ্যক বড় বড় চিত্রপট টাঙানো। বেশীর ভাগ নিজেদের আঁকা। ছবিগুলির বিষয় হোল লিসবন থেকে গোয়ায় আগত প্রত্যাগত জাহাজ। আর তাতে লেখা আছে ক্যাপ্টেনের নাম ধাম ও জাহাজে কত বন্দুক আনা হয়েছিল তার সংখ্যা ইত্যাদি। সহরটি অতি মাত্রায় পর্ব্বত বেষ্টিত। ৮। না হলে ওখানে নিশ্চয়ই আরও জন বসতি গড়ে উঠতো। আবহাওয়া আরও স্বাস্থ্যকর হোত। চারদিকের পর্ব্বতমালা ঠাণ্ডা হাওয়াকে সরিয়ে দেয়। ফলে উত্তাপ খুব বেশী। গোয়াবাসীদের সাধারণ খাদ্য গো মাংস ও শূকরের মাংস। তাঁরা হাঁস মুরগীও পোষেন। কতক লোকের পোষা পাখী পায়রা। গোয়া সমুদ্রের খুব কাছে হলেও ওখানে মাছ খুব দুষ্প্রাপ্য। সবরকম মিঠাই মণ্ডা পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। দেশবাসীরা মিষ্টি খানও খুব বেশী।

ওলন্দাজদের দ্বারা ভারতে পর্তুগীজদের শক্তি হ্রাস পাওয়ার আগে গোয়াতে জাঁকজমক, অর্থ সম্পদ কিছু বিশেষ ছিলনা। পরে ওলন্দাজদেরও ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। তাঁদের সোনা রূপার উৎসও যায় শুকিয়ে ; পূর্ব্ব গৌরবও ম্লানরূপ ধারণ করে। আমার প্রথম গোয়া ভ্রমণকালে আমি সেখানকার সমস্ত কায়দা-দুরস্ত লোকদের দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁরা এক এক জন দু'হাজার ক্রাউনের ও বেশী রাজস্ব পেতেন। কিন্তু দ্বিতীয় যাত্রায় দেখলাম যে সেই সব লোকেরা সন্ধ্যারদিকে গোপনে আমার কাছে

ভিক্ষা প্রার্থী হয়ে এলেন। তাহলেও তাঁরা তাঁদের জন্মগত অহমিকা, ঔদ্ধত্য কিছুই ত্যাগ করতে পারেন নি। কেবল তাই-ই নয়, এঁদের পুরনারীরা পাল্কী করে দ্বারে দ্বারে এসে অপেক্ষা করবেন। আর তাদের একটি বালক ভৃত্য কর্ত্রীর সেলাম জানাবে গেরস্তকে। তখন স্বভাবতঃই কিছু দান করতে হবে। সেই দান ভিক্ষা বালক ভৃত্যের হাতে দেয়া বা নিজে গিয়ে সেই প্রার্থী মহিলার হাতে দেয়াও চলে। যদি তাদের মুখ দেখার কৌতূহল থাকে তাহলে দাতার নিজে গিয়ে দেয়াই ভাল। তবে তাদের মুখ খুব কচ্চিৎ কখনই দেখার সুযোগ হয়। কারণ তাঁরা সর্ব্বদা একটা বোরখা দিয়ে আপাদ মস্তক আবৃত করে রাখেন। কেউ যদি নিজ হাতে তাদের টাকা পয়সা দিতে যান তখন মহিলারা দাতার হাতে একটি ছোট কাগজ দেবেন। তাতে লেখা থাকে কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ মানুষের সুপারিশ এবং বর্ণনা থাকে যে তাঁরা একদা কি রকম সংগতিশালী ছিলেন, আর এখন কেমন করে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সাহায্যদাতা সুপুরুষ হলে মহিলারা অন্দর মহলে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সামান্য কিছু খাদ্যও গ্রহণ করতে চান। এই জাতীয় অন্দরে আগমন ও খাদ্য গ্রহণ অনেক সময় পরের দিন পর্য্যন্তও স্থায়ী হয়। সব জায়গা জমি জুড়ে যদি পর্ত্তুগীজরা এত বেশী কেল্লা দুর্গ নির্ম্মাণ না করতেন ; আর ওলন্দাজদের প্রতি ঘৃণাবশতঃ যদি নিজেদের কর্ত্তব্যে অবহেলা না করতেন তাহলে তাঁদের অবস্থা এত নিম্ন পর্য্যায়ে নেমে যেত না।

পর্ত্তুগীজরা কোড়ো অন্তরীপের নাম উত্তমাশা দিয়েই নিজেদের ভদ্রসন্তান পেদ্রো অথবা জেরোনিমো নামের সংগে 'দোম' উপাধি যুক্ত করলেন। তাঁদের নামকরণের সময় যে নামই দেয়া হোক না কেন ঐ সময় থেকে তাঁরা পরিচিত হলেন উত্তমাশা অন্তরীপের ভদ্রশ্রেণীর লোক। এইভাবে নাম পরিবর্ত্তনের সংগে সংগে তাঁদের স্বভাব প্রকৃতিও গেল বদলে। ভারতীয়—পর্ত্তুগীজরাই বেশী প্রতিহিংসা পরায়ণ। নিজেদের স্ত্রী সম্বন্ধেই অতি মাত্রায় সংশয়ী। আর সে সন্দেহ সংশয় যে কোন লোক সম্বন্ধেই তাঁরা পোষাণ করেন। এই জাতীয় সন্দেহ তাঁদের মনে একবার সঞ্চারিত হলে তাঁরা সেই লোককে বিষ প্রয়োগ করে বা ছুরিকাঘাত দ্বারা শেষ করে ছাড়বেন। কারো সংগে শত্রুতা হলে ক্ষমা বলে কিছু থাকে না। শত্রুটি খুব শক্তিমান সাহসী হলে তাঁর মুখোমুখী হতে সাহসী হন না। পরন্তু নিজেদের সংগে কৃষ্ণকায় ভৃত্য গোছের লোক রাখেন। সেই ভৃত্যকে যদি কোন শত্রুকে হনন করতেও

হুকুম দেয়া হয়, তাহলে সে তা অন্ধভাবে তামিল করবে। সেই হত্যা সাধিত হবে ছুরিকা বা পিস্তল দ্বারা। লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করেও একাজ করা হয়। ভৃত্যদের হাতে সর্ব্বদাই একটি বল্লমের অর্দ্ধেক আন্দাজ মাপের লাঠি থাকে। এমন হয় যে শত্রু অনেক দূরে থাকেন, তাঁর সংগে সহরে বা কোন মাঠে ময়দানে দেখাও হয় না। আর তাঁর কোন ক্ষতি সাধনেরও সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁরা তো সৎবুদ্ধির মানুষ নন। সুতরাং শত্রু যদি ধর্ম্মবেদীতে প্রার্থনারতও থাকেন, তাহলে সুযোগ মত তাঁকে সেখানেও হত্যা করানো হয়। এই জাতীয় দু'টি হীন ঘটনা আমিও দেখেছি। একটি গোয়াতে, দ্বিতীয়টি দমনে। দমনে তিনচারটি কৃষ্ণকায় ভৃত্য শত্রুদের গীর্জায় সমাগত দেখে তাঁদের লক্ষ্য করে জানালা দিয়ে গুলী ছুঁড়েছিল। কিন্তু চিন্তা করেনি যে তাতে অন্যান্য লোকদেরও প্রাণহানি হতে পারে। অথচ অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিদের সংগে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নেই বা তাঁদের হত্যা করারও কোন কথা নয়।

গোয়াতেও ঠিক ঐ প্রকারই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও প্রার্থনাবেদীর সামনেই সাতজন লোক নিহত হন। যে যাজকটি সমবেত লোকদের প্রার্থনা পরিচালনায় রত ছিলেন, তিনিও গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিলেন। পর্ত্তুগীজদের বিচার ব্যবস্থায় এজাতীয় হত্যাপরাধ বিচার্য্য বিষয় নয়। কারণ এই অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই দেশের গণ্যমান্য লোক। আর এদের মামলা মোকদ্দমার সংখ্যাও প্রচুর। মামলা পরিচালিত হয়- কানাড়ীদের দ্বারা। তাঁরাও এদেশের অধিবাসী। এঁদের হাতেই সব আইনের ব্যবসা। পৃথিবীর মধ্যে এঁরা হলেন সর্ব্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত প্রকৃতির।

ভারতবর্ষে পুরোনো শক্তি প্রসংগে আবার আলোচনা করতে হলে একথা সুনিশ্চিত করেই বলতে হয় যে তাঁদের সীমানার মধ্যে যদি কখনও ওলন্দাজদের প্রবেশ না ঘটতো তাহলে কোন পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীর গৃহে একখণ্ড লোহাও দেখা যেত না। কেবল সোনা ও রূপার বহরই দেখা যেত। নিজেদের অর্থ সম্পদশালী করার জন্য তাঁদের তিন চার বার করে জাপান ফিলিপাইন অথবা মালাক্কাদ্বীপে বা চীনদেশে যাবারও প্রয়োজন হোত না। উৎকৃষ্ট সব পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে তাঁদের পাঁচছয় গুণও লাভ হোত। এমন কি সৈন্য, সেনাপতি ও শাসকগোষ্ঠীও ব্যবসা বাণিজ্যে ধনী হয়ে যেতেন। গভর্ণর ছাড়া সকলেই ব্যবসা করতেন। গভর্ণর ইচ্ছে হলে বেনামায় ব্যবসা চালাতেন। তিনি

ব্যবসা ছাড়াও যথেষ্ট রাজস্ব পেতেন। পূর্ব্বে গোয়ায় রাজপ্রতিনিধির কার্য্যভার গ্রহণ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম চাকুরী হিসেবে গণ্য হোত। এই রকম রাজার সংখ্যা খুব কম যিনি এই জাতীয় শাসনক্ষমতা দিয়ে কাউকে নিয়োগ করতে পারেন। গোয়াতে নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধির আরও একটি প্রধান ক্ষমতা হোল মোজাম্বিকের শাসনকর্ত্তার উপরে আধিপত্য এবং তিন বছরের জন্য। সেই তিন বছরের গভর্ণর আরও চার পাঁচশত হাজার ক্রাউন অতিরিক্ত পেয়ে থাকেন। কখনও হয়ত আরও বেশী পান। তবে ঐ সময়ে কাফ্রীদের হাতে পড়ে কোন ক্ষতিও হয়ত স্বীকার করতে হতে পারে। এই কাফ্রীরা যে সকল পণ্য অন্যত্র বহন করে নিয়ে যায় তার বিনিময়ে স্বর্ণ নিয়ে আসেন। যাতায়াতের পথে যদি কারোর মৃত্যু ঘটে তাহলে তাঁর কাছে যা ন্যস্ত ছিল তা ক্ষতির কোঠায়ই পড়বে। সেজন্য কোন ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা থাকে না।

মোজাম্বিকের গভর্ণর নিগ্রোদের সংগেও ব্যবসা বাণিজ্য চালান। এই নিগ্রোরা মালিন্দ (আরবদেশের সহর) উপকূলে বাস করেন। এঁরা যেসব জিনিসপত্র ক্রয় করেন তার মূল্য প্রদান করেন হাতীর দাঁত বা তিমি মাছ থেকে আহরিত চর্ব্বি বা মোমজাতীয় জিনিস দ্বারা। আমি শেষবারে যখন গোয়া যাই তখন মোজাম্বিকের শাসনকর্ত্তা তিনবছর রাজপ্রতিনিধির অধীনে সেখানে কাটিয়ে গোয়ায় আবার ফিরে এলেন। তিনিও সংগে নিয়ে এসেছিলেন তিমি মাছের চর্ব্বি বা মোম এবং দু'শ' হাজার ক্রাউন মুদ্রা। কিন্তু তিনি সোনা ও হাতীর দাঁতের কোন হিসেব দেননি। সে সবের মূল্য আরও কত বেশী।

মালাক্কার শাসন দ্বিতীয় পর্য্যায়ের। এ স্থানটি দ্বিতীয় পর্য্যায় ভুক্ত হয়েছে ওখানকার আদায়ীকৃত শুল্ক হারের পরিমাণ অনুসারে। ঐ স্থানটি একটি প্রণালী। গোয়া থেকে যে সব জাহাজ চীন, জাপান, যাভা, মাক্কাসার, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং আরও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করে তাঁদের ঐ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সুমাত্রাদ্বীপের পাশ ধরেও যাওয়া যায়। আরও যাওয়া চলে সোন্দি প্রণালী হয়ে বা উত্তরে যবদ্বীপকে পাশে রেখে। কিন্তু জাহাজ নিয়ে ফিরে আসার সময় মালাক্কার শুল্ক ভবনের একখানি 'ছাড়-পত্র অবশ্যই থাকা চাই। ওটি না দেখাতে পারলে সেপথে এগিয়ে চলার অনুমতি পাওয়া যায় না।

তৃতীয় রাজ্য হচ্ছে অর্মাস বাহরমুজ। এটি তৃতীয় পর্য্যায়ে স্থান পেয়েছে তার বিস্তৃত বাণিজ্য এবং পারস্য উপসাগরে গমনাগমন কারী জাহাজ থেকে

প্রাপ্ত শুল্ক ও করের জন্য। যারা বাহরেণ দ্বীপে মুক্তা অন্বেষণ করতে যান অর্মাসের শাসক তাদের উপরে প্রচুর কর ধার্য্য করেছেন। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ মুক্তা সংগ্রহে ব্যাপৃত হলে তার জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। উপস্থিত পারসীকরা এই জাতীয় শুল্ক ইংরেজদের উপরেও ধার্য্য করেছেন। ইংরেজদেরও এই ব্যবসাতে অংশ আছে।

আমার পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এবিষয় বর্ণনা দিয়েছি। পর্ত্তুগীজরা বণিক ব্যবসায়ীদের প্রতি কঠোর হলেও তাঁদের শুল্ক নীতিকে গুরুতর কিছু বলা যায় না। মালাক্কাতে ওলন্দাজদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। এই রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁরা যে সৈন্যবহর মোতায়েন করেছেন তাদের ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থও তাঁরা কর স্বরূপ পান না।

চতুর্থ রাজ্য মাসকেট্। এখানকার রাজস্বের পরিমাণ অত্যধিক। কারণ যত জাহাজ ভারতবর্ষ, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর এবং মালিন্দ উপকূল থেকে যাত্রা করে তাদের অবশ্যই মাসকেট্ অন্তরীপে নোঙর করতে হবে। এখান থেকেই সাধারণতঃ জাহাজে লবণ বিমুক্ত জল নেয়া হয়। কোন জাহাজ নোঙর না করে এগিয়ে গেলে গভর্ণর আবার শুল্ক দাবী করে পাঠান। একশ' জাহাজের মধ্যে চারটি হয়ত এই রকম দেখা যাবে। তার পরেও যদি সেই জাহাজগুলির কর্ত্তৃপক্ষ শুল্ক দিতে নারাজ হন, তাহলে জাহাজ ডুবিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়।

পঞ্চম রাজ্য সিংহল দ্বীপ। পর্ত্তুগীজদের অধীনস্থ অন্যান্য স্থান এবং মালাবার উপকূলের উপরিভাগে, বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত স্থান ও ভারতের কিছু অঞ্চল সিংহলের অন্তর্ভুক্ত করেই শাসিত হোত। সমস্ত স্থানের কাজ ও দায়িত্বের মধ্যে এইটি ছিল নিম্নস্তরের। মূল্যমান ছিল বছরে দশ হাজার ক্রাউন।

এই পাঁচটি রাজ্যের অধিকার ব্যতীত রাজ প্রতিনিধির আরও অনেক শাসনের দায়িত্বভার ছিল গোয়ার মধ্যে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে। এই দায়িত্ব এসেছিল দান উপঢৌকনের মাধ্যমে। তিনি প্রথম যে দিনটিতে গোয়ায় প্রবেশ করেন সেদিন রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক চার হাজার ক্রাউনেরও বেশী লাভ করেছিলেন। এঞ্জিনিয়রদের তিনটি অফিস, মেজর, কেল্লার দর্শকরা, জরুরী আইন কানুনের মুখ্য কর্ত্তাব্যক্তিরা প্রতি বছর দিয়েছেন বিশ হাজার পার্দো মুদ্রা (পর্ত্তুগীজ)। প্রতি পার্দো ফ্রান্সের সাতাশ সাউএর

সমতুল্য। পর্তুগীজরা সকলেই খুব ধনী। ধনী হওয়ার কারণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা হয়েছেন আধিপত্য ও শাসননীতির বলে, বণিকরা হয়েছেন বাণিজ্য দ্বারা। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা যতদিন বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি না করেছে ততদিনই এই আধিপত্য ও লাভের ব্যবসা নির্ব্বিঘ্নে চলেছিল। অর্মাস যতদিন পর্তুগীজদের অধিকারে ছিল ততদিন তাঁরা কোন ব্যবসায়ীকে সমুদ্র পথে ভারতে যাতায়াত করতে দিতেন না। তখন তাঁরা স্থলপথে কান্দাহারের মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য হতেন। সুতরাং তুর্কী, পারসীক, আরবীয়, মস্কোভীয়, পোলেনীয় এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যখন আব্বাসী বন্দরে এসে পৌঁছোতেন তখন তাঁরা সকলে একত্রে মিলিত হতেন। আর তাঁদের মধ্যে সর্ব্বাধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চার ব্যক্তিকে মনোনীত করে পাঠাতেন সমস্ত রকম মালপত্র দেখানো ও মালপত্রের গুণাগুণ ও মূল্যাদি বর্ণনা করার জন্যে। তাঁদের বর্ণনা বিবরণ দানের পরে নিজেদের মধ্যে জিনিসপত্রের দরদাম সম্পর্কে মতামত স্থির করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আনুপাতিকভাবে তা বণ্টন করে দেয়া হয়। সমগ্র এশিয়াতেই এই নিয়ম। সাধারণভাবে জিনিস বিক্রী হয় না। লাভের কারবারে দালালের হাত থাকে। বিক্রেতাদের ক্ষতি এরা পূরণ করে দেন। আবার ক্রেতার কাছ থেকে তা আদায় করে থাকেন। আবার এমন সব জিনিস থাকে যার জন্য স্বতন্ত্র দালালীও ধার্য্য থাকে। কখনও তা শতকরা এক, কখনও বা দেড় কি দুই।

এক সময় গিয়েছে যখন পর্তুগীজরা প্রচুর লাভ করেছে। কখনও কোন ক্ষতি তাঁদের স্বীকার করতে হয় নি। কারণ রাজ প্রতিনিধি তখন জলদস্যুদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বর্ষাকাল অন্তেই সমুদ্র যাত্রার সময় আসে। ভাইসরয় তখন যথেষ্ট সংখ্যক রক্ষী পাঠাতেন সমুদ্রে পঁচিশ ত্রিশ লীগ পর্য্যন্ত পাহারা দিয়ে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। মালাবারীরা সাধারণতঃ পনের বিশ লীগের বেশী এগোতে সাহস পেত না। প্রহরী দলের অধিনায়ক এবং সৈন্যরাও সমুদ্র পথে ছোট ছোট ব্যবসা চালাতেন। এজন্য তাঁদের কোন শুল্ক দিতে হোত না। বর্ষাকালেও তাঁরা ব্যবসা চালিয়ে যা লাভ পেতেন তাতে বেশ স্বচ্ছন্দে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হোত। সৈনিক বৃত্তির উন্নতি অগ্রগতির জন্য যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। পর্তুগালে নয় বছর সৈন্য বিভাগে কাজ করার পরে প্রতিটি সৈনিক এদেশে আসেন এবং স্থলে জলে সর্ব্বত্রই তার উপরে কিছু দায়িত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু তিনি যদি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী না হন তাহলে তাঁকে ব্যবসায়ীর

বৃত্তি অবলম্বন করার অনুমতি দেয়া হয়। এঁদের মধ্যে যারা বেশী বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ তাঁরা আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারেন। এরকম লোকও যথেষ্ট আছেন যাঁরা নিজ ব্যয়ে ব্যবসা করতে প্রস্তুত। জাহাজ যদি নিখোঁজ হয়ে যায়, তাহলে যাঁরা টাকাকড়ি দিয়েছেন তাদেরই সব ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। তবে জাহাজ নিরাপদে ফিরে এলে আবার তিন চার গুণ লাভ।

গোয়ার মূল বাসিন্দাদের বলা হয় কানাড়ী। পর্তুগীজদের অধীনে কোন সরকারী কর্ম্মচারীরূপে কাজ করার অধিকার এদের নেই। এরা কেবল আইন আদালতে কাজ করতে পারেন অর্থাৎ অ্যাডভোকেট, সলিসিটর ও দলিল পত্রের লেখকরূপে। পর্তুগীজরা এঁদের সবসময় দমিয়ে রাখেন। কৃষ্ণকায় কানড়ীদের কেউ যদি কোন শ্বেতাঙ্গকে প্রহার করেন তাহলে কোন ক্ষমা নেই। অপরাধীর একটি হাত কেটে ফেলা হবে। পর্তুগীজদের ন্যায় স্পেনদেশীয়রাও তাঁদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়ে থাকেন কানাড়ীদের উপরে। তাঁরা আবার ওদের ইউরোপীয় ধরনে ব্যবসা বৃত্তি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন। ম্যানিলা বা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও এই জাতীয় ধনী কানাড়ী কিছু আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে মোজা জুতা পরার অনুজ্ঞা লাভের জন্য ভাইসরয়কে প্রচুর অর্থ দান করেন। কানাড়ীদের জুতা মোজা পরার অধিকার ছিল না।

কৃষ্ণকায় কানাড়ীদের কারোর কারোর ত্রিশজন পর্য্যন্তও দাস ভৃত্য থাকে। কানাড়ীরা ধনী সুলভ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁদের থাকতে হয় নগ্ন পদে। পর্তুগীজরা যদি ওদের নিজ নিজ জাহাজ চালাবার অনুমতি দিতেন এবং তাঁরা যদি ইচ্ছে মত সেনাপতি ও অন্যান্য কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করার সুযোগ পেতেন তাহলে পর্তুগালের পক্ষে এত অনায়াসে ভারতবর্ষে সুবিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করা সম্ভব হোত। এই কৃষ্ণকায় জনসমাজ অত্যন্ত সাহসী ও উন্নত মানের সৈনিক। কয়েকটি ধর্ম্ম সংস্থার কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁদের কলেজসমূহে কানাড়ীরা ছয় মাসে এমন শিক্ষা লাভ করবেন যা আয়ত্ব করতে পর্তুগীজ সন্তানদের আবশ্যক হবে এক বছর। যে কোন বিদ্যা ও বিজ্ঞানেই তাঁরা (কানাড়ী) সমান সাফল্য দেখাতে পারেন। এই কারণেই পর্তুগীজরা ওদের এত দমন করে নিম্নস্তরে রাখেন।

গোয়ার আশে পাশে যে সকল দেশীয় অধিবাসী আছেন তাঁরা হিন্দু এবং নানাবিধ মূর্ত্তি প্রতিমার পূজা করেন। তাঁদের মতে ঐ মূর্ত্তিসমূহ যে

সকল দেবতার তাঁরা জনসমাজের কল্যাণ সাধন করেন। সুতরাং দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তিকে সুসজ্জিত করে পূজা উপাসনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে আবার বাঁদর বা হনুমানের পূজা করেন। সলসেট দ্বীপে একটি মন্দিরের সিন্দুকে হিন্দুরা বাঁদরের হাড় ও নখ জমা রেখেছে। তাঁরা বলেন এই জিনিসগুলি তাঁদের পিতৃ পুরুষদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। আর সে সাহায্য হয়েছিল সংবাদ সরবরাহ ও বুদ্ধিমত্তা আরোপ করে এবং তা হয়েছিল যখন শত্রু ভাবাপন্ন কোন রাজপুত্রী তাঁদের অভিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় সাগর সমুদ্র মধ্য দিয়েও তাঁদের সাঁতার কেটে যেতে হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতীয়রা মিছিল করে এই মন্দিরে এসে পূজা অর্ঘ্য দান করেন। কিন্তু গোয়ার বিশপ, যিনি ধর্ম্মমতের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিচার করেন তিনি একদিনের মধ্যে মন্দিরটিকে তুলে গোয়াতে নিয়ে আসেন। সেখানে ওটি বেশ কিছু দিন ছিল। তাতে ধর্ম্মযাজক ও জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদও হয়। অর্থশালী হিন্দুরা প্রচুর অর্থ প্রদান করেও তাঁদের হনুমান দেবতার দেহাবশিষ্ট ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ চেয়েছিলেন অর্থ ব্যয় না করে উদ্ধার করতে। তারা বলেছিলেন যে সেই অর্থ যে কোন যুদ্ধকালে অথবা দরিদ্রদের সাহায্য দিয়ে সৎভাবে ব্যয়িত হতে পারবে। কিন্তু ধর্ম্মযাজকদের মত ছিল বিপরীত। তাঁরা বললেন, এই জাতীয় পৌত্তলিকবাদ কোন প্রকারেই অনুমোদন যোগ্য নয়। অবশেষে প্রধান বিশপ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারক মণ্ডলী মিলিত হয়ে নিজেদের দায়িত্বে সেই মন্দিরটিকে জাহাজে তুলে সমুদ্রের মধ্যে কুড়ি লীগ দূরে নিয়ে অতল জলে দিলেন নিমজ্জিত করে। প্রথমে ভস্মীভূত করবেন স্থির হয়েছিল। কিন্তু তাহলে হয়ত ভস্মরাশিকে তাঁরা আবার সংগ্রহ করে নেবেন। তার ফলে হিন্দুদের কুসংস্কার আরও পোষকতা লাভ করবে।

গোয়াতে প্রচুর ধর্ম্মযাজক আছেন। প্রধান বিশপ ও তাঁর অধীনস্থ যাজকগণ ব্যতীত সেখানে আরও রয়েছেন ডেমিনিক্যান্, অস্টিন ফ্রায়ার গোষ্ঠি, ফ্রান্সিস্‌ক্যান্, নগ্নপদ কার্মেলিয়রা, জেসুইটগণ এবং কাপুচিন সম্প্রদায়। এদের দু'টি ভজনালয় আছে। অস্টিন ফ্রায়াররা হলেন সেখানকার পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। সকলের শেষে এসেছেন ধর্ম্মপ্রাণ কার্মেলিয়রা এবং তারা ওখানে সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছেন। তাঁরা সহরের মূলকেন্দ্র থেকে দূরে থাকার ফলে চমৎকার বিশুদ্ধ বায়ুর সুবিধাটা পান। ঐ জায়গাটিই

গোয়াব মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। স্থানটি উচ্চ ভূমি, হাওয়া বাতাস চলার কোন অন্তরায় নেই। বাড়ীটিও বেশ সুদৃঢ় এবং দ্বিতল। অষ্টিন ফ্রায়ারগণ সকলের আগে গোয়াতে এলেও নিজেদের বাসস্থান সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থা করেন নি। তাঁরা বাড়ী করেছিলেন একটি নাতিউচ্চ জমির নিম্ন ভাগে। তাঁদের গীর্জাটি একটি উচ্চ ভূমির উপরে অবস্থিত। তার সামনে আছে একটি উন্মুক্ত চত্বর। কিন্তু তারপর তাঁরা ওখানে বাড়ী তৈরীর উদ্যোগ করতেই জেসুইটরা বললেন সেই উঁচু জায়গাটি তাঁদের কাছে বিক্রী করতে। তখন জায়গাটি খালিই পড়েছিল। তাঁদের প্রস্তাব ছিল ওখানে একটি উদ্যান তৈরী হবে তাঁদের সংঘের পণ্ডিতদের আনন্দ উপভোগের জন্যে। কিন্তু জমিটি নিয়ে তাঁরা সেখানে নির্ম্মাণ করালেন অত্যন্ত জাকাঁলো রূপের একটি কলেজ বা মহাবিদ্যালয়। তার ফলে অষ্টিন ফ্রায়ারদের মঠ ও আশ্রয় একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। কোন হাওয়া বাতাসের স্পর্শ আর তাঁরা পেত না। এই কাজটির জন্য অনেক বাদানুবাদ ও বিরোধ হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জেসুইটদেরই সুবিধে হয়ে যায়। গোয়ার জেসুইটবা পলবাদী নামে পরিচিত। কারণ তাঁরা তাঁদের সুমহান গীর্জা উৎসর্গ কবেছেন সেণ্ট পলের নামে। এরা ইউরোপীয়দের মত সাধারণ টুপি বা কোন বিশিষ্ট টুপি ব্যবহার করেন না। তারা পরেন টুপির ভেতরের ঠুলিটার ন্যায় একটি মস্তকাবরণ। তাতে কোন কিনারা (বর্ডার) থাকে না। অনেকটা গ্রাণ্ড্‌সিগ্‌নরের দাস ভৃত্যদের টুপির মত। সেরাগিয়ো প্রসংগে আমার বর্ণনায় আমি তার কথাও কিছু বলেছি। জেসুইটদের গোয়াতে পাঁচটি বাড়ী আছে, যেমন, সেণ্ট পলস্‌ কলেজ, সেমিনারী, অধ্যাপকদের বাসগৃহ, শিক্ষার্থীদের আবাস এবং পরম দয়ালু যীশুর মন্দির বা ভজনালয়। শেষোক্ত গৃহটিতে এমন সব চিত্রপট আছে যা শ্রেষ্ঠ শিল্প নৈপুন্যের নিদর্শন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এক রাত্রিতে একটি দুর্ঘটনায় কলেজ গৃহটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলে সেটা পুনর্গঠিত করতে হয়েছিল প্রায় ষাট হাজার ক্রাউন মুদ্রা।

পূর্ব্বে গোয়ার হাসপাতালটি সারা ভারতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে খ্যাতি লাভ করেছিল। সেজন্যে সেখানে চিকিৎসা লাভের ব্যাপারট ছিল অত্যন্ত ব্যয় বহুল। তবে চিকিৎসা শুশ্রূষা হোত অতি যত্ন সহকারে ও উঁচু পর্য্যায়ে। কিন্তু গভর্ণর পরিবর্ত্তনের ফলে তার বিধি ব্যবস্থার এখন অবনতি ঘটেছে। যে সকল ইউরোপীয়রা ওখানে চিকিৎসিত হতে যান তাঁরা আর জীবন্ত ফিরে

আসেন না, বেরিয়ে আসেন শবাধারে শায়িত হয়ে। সম্প্রতি তাঁরা কতক লোকের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন অনবরত রোগীর দেহে বাইরে থেকে রক্ত সরবরাহ করে। প্রয়োজনমত তাঁরা ত্রিশ চল্লিশ বারও নিজেদের রক্ত রোগীদের দান করেন। দূষিত রক্ত আসছে দেখেও তাঁরা তা গ্রহণের কাজ বন্ধ করেন না। আমি সুরাটে থাকতে আমার শরীর থেকেও এই প্রকারে একবার রক্ত নেয়া হয়। পীড়িত লোকের পক্ষে ওখানে মাখন ও মাংস খাওয়া বিশেষ বিপদজনক। অনেক সময় প্রাণান্তও ঘটে। পূর্ব্বে এঁরা সদ্য রোগমুক্ত লোকদের জন্য নানারকম সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। এখন রোগীদের জন্য ব্যবস্থা থাকে কেবলমাত্র গোমাংসের সুরুয়া ও একথালা ভাতের। সাধারণত ক্ষীণ স্বাস্থ্যের সদ্য রোগমুক্ত লোকেরা সর্ব্বদাই তৃষ্ণা অনুভব করেন; আর অনবরত জল চান। কিন্তু রোগীদের পরিচর্য্যা-কারীদের মধ্যে থাকে কেবল কৃষ্ণকায় বা এক প্রকার দো-আঁশলা লোক। শেষোক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত অর্থলোলুপ ও নির্দয়। কাজেই ওদের হাতে টাকা পয়সা না দিলে এরা রোগীকে এক ফোঁটাও জল দেয় না। যদি কখনও বা দেয় তাহলে ভাব দেখাবে যেন গোপনে ডাক্তারদের হুকুম অমান্য করেই দিচ্ছে। কিন্তু সদ্য রোগমুক্ত লোকদের হৃতশক্তি উদ্ধারের সময় সে কাজ অত্যন্ত অন্যায়, বিশেষত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। ওখানে মুখ্যত আবশ্যক হোল শরীরকে স্নিগ্ধকারী ও শক্তিদায়ক জিনিস।

আমাদের ইউরোপীয়দের তুলনায় রোগীদেহে অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তদানের ব্যবস্থা প্রসংগে একটি কথা বলা হয়নি। এখানে রোগীদের গায়ের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনার জন্য এবং স্বাস্থ্যকে নির্দোষ করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এক নাগাড়ে বারদিন তিনবেলা—সকালে, দুপুরে ও রাত্রে তিনবার এক গ্লাস করে গোমূত্র (চোনা) পান করতে নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু গোমূত্র পান করা অত্যন্ত কষ্টকর। মুখে দিলেই বমির উদ্রেক হয়। সেজন্যে রোগীরা নিজেদের স্বাস্থ্যের জন্য তা পান করতে ইচ্ছুক হলেও সঠিক পরিমাণ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এঁরা এই নিরাময়কারী ঔষধের ব্যবহার শিখেছেন এদেশের হিন্দুদের কাছে। রোগী এ জিনিস পান করুন আর নাই করুন বারদিন অতিবাহিত না হলে তাঁকে হাসপাতাল ত্যাগের অনুমতি দান করা হয় না। কারণ বারদিন সেই পানীয় গ্রহণ করার কথা।

অধ্যায় চৌদ্দ

১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষবার গোয়া ভ্রমণকালের অভিজ্ঞতা।

মিন্‌গ্রেলা (ভিন্‌গ্রেলা) থেকে গোয়া যাত্রার দু'দিন আগে আমি মঁসিয়ে সেণ্ট আমান্তকে লিখেছিলুম আমাকে একখানি রণপোত পাঠাতে। আর তা বলেছিলাম উপকূলভাগের মালাবারীদের ভয়ে। তিনি তখুনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন। সেণ্ট আমান্ত ছিলেন এঞ্জিনিয়র। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারী আমি মিন্‌গ্রেলা ছেড়ে গোয়াতে পৌঁছোই ২৫শে তারিখে। আমার পৌঁছোতে বেশ বিলম্ব হয়। পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আমি গোয়ার ভাইস্‌রয় ডন্‌ ফিলিপ দ্য মাস্‌কারেগনসের সংগে দেখা করতে যাই। ইনি এর আগে সিংহলের গভর্ণর ছিলেন। তিনি আমাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা জানান। আমি গোয়াতে ছিলাম দু'মাস। তার মধ্যে তিনি আমার কাছে একটি ভদ্রলোককে পাঁচ ছয় বার পাঠিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে সহরের বাইরে বারুদখানায় নিয়ে যান। তিনি সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন। বিভিন্ন ধরণের জমিতে বন্দুক বসাতে ও চালাতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। এই কাজে তিনি আবার আমার পরামর্শ নিতেন। আমি ওখানে পৌঁছে তাঁকে অদ্ভূত ধরনের জমজমাট কারুকার্য্য খচিত একটি পিস্তল দিয়েছিলুম। ওটি তাঁর খুব পছন্দ হয়। ওটি আমাকে দিয়েছিলেন আলেপ্পোর ফরাসী বাণিজ্য দূত। তার জুড়ি আর একটি পিস্তল খুব দুর্ভাগ্যজনক ভাবে হারিয়ে যায়। জোড়াশুদ্ধ পিস্তল ফরাসী জাতির পক্ষ থেকে তিনি উপহার পেয়ে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

ভাইসরয় অন্য কাউকে এমন কি তাঁর সন্তানদেরও তাঁর খাস টেবিলে বসতে দিতেন না। ভোজন কক্ষের মধ্যেং একটি প্রাচীর মত রয়েছে। সেখানে প্রধান কর্ম্মচারীদের জন্য একটি কাপড় বিছানো আছে। তা ঠিক জার্ম্মানীর রাজদরবারের অনুরূপ। পরের দিন-আমি যাই মুখ্য বিশপের সংগে দেখা করতে। তারপর ধর্ম্মীয় বিষয়ে বিচারকের সংগে দেখা করার পরিকল্পনা করতে জানা গেল তিনি পর্ত্তুগালে চিঠি পত্র লেখার ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত। দু'খানি জাহাজ নোঙর তুলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েও তাঁর চিঠিপত্রের জন্যই কেবল অপেক্ষা করছে। অবশেষে সেই জাহাজ ছেড়ে যেতে তিনি জনৈক ভদ্রলোককে পাঠিয়েছিলেন আমাকে জানাবার জন্য যে ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিচার

গৃহেই তিনি বেলা দুটো তিনটে নাগাদ আমার সংগে দেখা করতে চান। আমিও নির্দ্দিষ্ট সময়েই সেখানে হাজির হলাম। আমি পৌঁছোলে একটি ভৃত্য আমাকে বৃহৎ একটি কক্ষে নিয়ে গেল। মিনিট পনের পরে জনৈক কর্ম্মচারী এসে আমাকে নিয়ে গেলেন বিচারপতির কক্ষে। সে কক্ষে যেতে দু'টি খোলা বারান্দা ও কয়েকটি ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হোল। তিনি বিলিয়ার্ড টেবিলের মত বড় একটি টেবিলের কিনারায় বসে ছিলেন। বড় টেবিলটি, চেয়ারগুলি ও অন্যান্য কাষ্ঠাসন সব সবুজ রংএর কাপড়ে মোড়া ছিল। মনে হোল সব ইংলণ্ড থেকে আনীত।

তিনি আমাকে স্বাগত করে দু'তিন বার অভিবাদন জানালেন। তারপরে জানতে চাইলেন আমি কোন ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী। জানিয়ে দিলাম, আমি প্রোটেষ্টান্ট। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, আমার পিতামাতাও এই একই ধর্ম্মমতাবলম্বী কিনা। আমার পিতামাতাও প্রোস্টেন্টান্ট জেনে তিনি খুসী হয়ে আমাকে আবার স্বাগত করলেন। তখুনি আরও কয়েকজন লোককে ঐ কক্ষে আহ্বান করলেন। ঘরের পর্দাগুলি তুলে ধরতে কাছে থেকেই দশবারজন লোক এসে ঢুকলেন। প্রথম সারিতে এলেন দু'জন অষ্টিন ফ্রায়ার, তাঁদের পেছনে দু'জন ডোমিনিকান্, দু'টি নগ্ন পদ কার্মেলিয় এবং আরও কয়েকজন যাজক। বিচারপতি তাঁদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে এই আশ্বাস দিলেন যে আমার সংগে কোন নিষিদ্ধ পুস্তক নেই। ওঁদের সব নিয়মকানুন আমার জানা ছিল বলে আমি আমার বাইবেলটিকে মিন্‌গ্রেলাতে রেখে আসি। প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে আলাপ আলোচনা হোল। তবে বেশীর ভাগ কথাবার্ত্তা হয় আমার ভ্রমণ সম্বন্ধেই। উপস্থিত সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেন আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত আবার শোনার জন্যে।

তার তিন দিন পর বিচারক আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন একটি চমৎকার বাড়ীতে তাঁর সংগে ভোজন পর্ব্বে যোগদানের জন্যে। বাড়ীটি নগ্নপদ কার্মেলিয়দের। সহর থেকে প্রায় আধ লীগ দূরে। সারা ভারতে এই বাড়ীটি সবচেয়ে রমণীয় স্থাপত্য। কার্মেলিয়রা কিভাবে এই বাড়ীটি পেয়েছিলেন তা সংক্ষেপে বলছি। গোয়াতে এমন একটি ভদ্রলোক ছিলেন যাঁর পিতা ও পিতামহ ব্যবসা করে প্রভূত বিষয় সম্পদের মালিক হন। এই বাড়ীটি তিনিই নির্ম্মাণ করান। অতীতে বাড়ীটি সহনীয় রূপের প্রাসাদোপম ছিল আর কি। তিনি বিবাহ করেন নি। আর পুরোপুরি ঈশ্বর ভক্ত হয়ে

যান। সর্ব্বদাই অষ্টিন ফ্রায়ারদের কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁদের প্রতি ভদ্রলোকের এত শ্রদ্ধাপ্রীতি জন্মেছিল যে একটি 'উইল' করে তিনি সমস্ত সম্পত্তি তাঁদের দান করলেন। তবে একটি সর্ত্ত ছিল। তা হোল যে তাঁর মৃত্যুর পরে ভজনালয়ের ডান পাশে তাকে সমাধিস্থ করতে হবে। আরও ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে সেখানে ব্যয় বহুল ও জ াকালো একটি স্মৃতি সৌধ নির্ম্মাণ করতে হবে।

এখন সাধারণের কাছে শোনা যায় যে লোকটি ছিলেন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। কিছু ঈর্ষাপরায়ণ লোক সেকথা প্রচার করে সকলের মনে ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে সেজন্যেই তিনি অষ্টিন ফ্রায়ারদের সম্পত্তি দান করেছেন। তখন ফ্রায়ারদের পক্ষ থেকে বলা হোল যে ভজনালয়ের দক্ষিণ পাশের জমিটি ভাইসরয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাছাড়া কোন কুষ্ঠ রোগীকে সেখানে সমাধিস্থ করা চলে না। এই হোল জনসাধারণের মত ও মন্তব্য এবং অষ্টিন ফ্রায়ারদের মধ্যেও কিছু সংখ্যকের মত এই প্রকারই। পরে অবশ্য সেই মঠের কয়েকজন যাজক তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন গীর্জার মধ্যে অন্য আর একটি স্থান নির্ব্বাচন করার জন্যে। কিন্তু তাতে অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হয়ে তিনি আর কখনও তাঁদের কাছে যান নি। পরে তিনি উপাসনার জন্য যেতেন কার্মেলিয়দের ওখানে। তাঁরা তাঁকে াদরে গ্রহণ করে তাঁর ইচ্ছে ও প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। নতুন সংঘে যোগদানের পরে তিনি আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। মৃত্যুর পরে কার্মেলিয় যাজকগণ তাঁকে খুব জ াকজমক সহকারে যথাস্থানে সমাহিত করলেন। আর সেই বাড়ীটি সহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার লাভ করলেন। সেই সুন্দর রমনীয় আবাসেই আমি আপ্যায়িত হই এবং খাদ্য গ্রহণের সবটুকু সময় চমৎকার সংগীত পরিবেশণেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

২১শে জানুয়ারী থেকে ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত আমি গোয়াতে ছিলাম। ফিরবার দিন আমি ভাইসরয়ের সংগে দেখা করে বিদায় গ্রহণ করি। তাঁর কাছে আমার একটি আবেদনও ছিল। তা হচ্ছে বেলয় নামে একটি ভদ্রলোক যাতে আমার সংগে যান। তিনি আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু সে লোকটির হঠকারিতার জন্য তাঁকে দ্রুত বিদায় নিতে হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে আমাদের ছু'জনকেই সরকারী তদন্তের মুখে পড়ে বিচারালয়ে যেতে হয় নি।

ভদ্রলোকটি স্বদেশ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন হল্যাণ্ড ভ্রমণে। সেখানে দেনার দায়ে পড়েন। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিলেন না যে তাঁকে টাকা ধার দিতে পারতেন। তখন ভারতে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে হল্যাণ্ড কোম্পানীতে একজন বেসরকারী সৈনিক হিসেবে কাজ নিলেন। এমন সময়ে তিনি ব্যাটাভিয়াতে এলেন। তখন সিংহলে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে ওলন্দাজরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাঁরা ব্যাটাভিয়া থেকে এই লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন সিংহলে। ওলন্দাজ সেনাপতি ফরাসী সেনানায়কের অধীনে শক্তিশালী সৈন্য বহর দেখে স্থির করলেন সিংহলের সুদৃঢ় কেল্লা নিগম্বো অবরোধ করবেন। ফরাসী সেনাপতি ছিলেন সেণ্ট আমাণ্ট। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও অভিজ্ঞ লোক। দুর্গটির উপর দু'বার আক্রমণ চালিয়ে ফরাসী সৈন্যরা, বিশেষ করে সেণ্ট আমাণ্ট ও জন দে রোজ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দান করেন। এরা দু'জন আহতও হয়েছিলেন। ডাচ সৈন্য বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ এদের সাহস বিক্রম দেখে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে স্থানটি অধিকৃত হলে ওদের একজনকে সেখানকার গভর্ণর পদে বহাল করবেন। অবশেষে অধিকার পেয়ে সেণ্ট আমাণ্টকে গর্ভনর পদ দান করে ডাচ সেনানায়ক তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। কিন্তু এই সংবাদ ব্যাটাভিয়াতে পৌঁছোলে অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করে। ডাচ সেনাপতির জনৈক নিকট আত্মীয় যুবক সদ্য হল্যাণ্ড থেকে এসে নেগোম্বীর গভর্ণর পদ লাভ করলেন; সেণ্ট আমাণ্ট হলেন পদচ্যুত। সেই যুবকটি ব্যাটাভিয়ার পরিচালক সমিতির হুকুমপত্র নিয়ে এসেছিলেন আমাণ্টকে পদচ্যুত করার জন্যে। তিনি সেই কুমতলবের ইঙ্গিত পেয়েই সৈন্যদলকে প্ররোচিত করলেন পর্তুগীজদের সংগে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ করার জন্যে। তবে তাঁর সৈন্য ছিল মুষ্টিমেয়। তাদের অধিকাংশই আবার ফরাসী। মঁসিয়ে বেলয়, মারেস্‌টস্‌ এবং জন্‌দে রোজও ছিলেন সে দলে।

পর্তুগীজরা নতুন শক্তিশালী সৈন্যদল যদিও সংখ্যায় স্বল্প তাদের নিয়ে নেগোম্বীর উপর আক্রমণ চালিয়ে দ্বিতীয় বারে দুর্গটি অধিকার করতে সমর্থ হলেন। ঐ সময় সিংহল ও তার কাছাকাছি অঞ্চলের গভর্ণর ছিলেন ডন ফিলিপ দে মাস কারেগনস্‌। এর বাসস্থান ছিল কলম্বো সহরে। তিনি তখন গোয়া থেকে পত্র মারফত সংবাদ পেলেন যে সেখানকার ভাইসরয়ের মৃত্যু ঘটেছে। ফলে পরিচালক সমিতি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছা হোল যে তিনি গোয়াতে গিয়ে ঐ পদটিতে বহাল হন। তিনি গোয়া যাত্রাকালে

সেণ্ট আমাণ্ট ও তাঁর সংগীদের সংগে দেখা করে তাঁদের কিছু পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করলেন। দেখা হতে আবার স্থির হোল তাঁদের সকলকে গোয়াতে নিয়ে যাবেন। তিনি কি ভেবে কি করেছিলেন তা জানিনে। হয়ত তাঁদের আগে পাঠাবেন স্থির ছিল, না হয় তো ঐ ধরনের শক্তিশালী লোক নিজের সঙ্গে রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করেছিলেন। কারণ মালোবারীরা হয়ত চল্লিশখানি জাহাজ নিয়ে তাঁর পথ রোধ করতে পারে। কিন্তু গভর্ণরের সংগে ছিল মাত্র কুড়িখানি জাহাজ।

এরা কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পৌঁছোতে না পৌঁছোতে এমন একটা হাওয়া উঠলো যা পরে পরিণত হয়েছিল প্রবল ঝড়ে। তার ফলে সমস্ত জাহাজ গিয়েছিল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কতক গেল নিরুদ্দেশ হয়ে। ডন ফিলিপের জাহাজের যাত্রীরা তীরবর্ত্তী হতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা অসম্ভব হোল। জাহাজখানি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গেল। সেণ্ট আমাণ্ট ও তাঁর ছয়জন সংগী একত্রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দড়ি ও কাষ্ঠ খণ্ডের সাহায্যে। নিজেদের তাঁরা এমন ভাবে চালিয়ে নিলেন ঢেউএর সংগে যে শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষাও হোল, আর ডন ফিলিপকেও বাঁচাতে পেরেছিলেন। এইভাবে তাঁরা পৌঁছোলেন গোয়াতে। সেখানে পৌঁছে তিনি সেণ্ট আমাণ্টকে নিয়োগ করলেন গোলন্দাজ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের পদে। তাঁর উপরে আরও দায়িত্ব দিলেন ভারতে অবস্থিত সমস্ত পর্ত্তুগীজ কেল্লা দুর্গ রক্ষণ ও পরিদর্শনের। তিনি আমাণ্টের বিয়ে দিলেন অল্প বয়স্কা সুন্দরী একটি কুমারী কন্যার সংগে। সেই বিয়েতে আমাণ্ট বিশ হাজার ক্রাউন মুদ্রা লাভ করেছিলেন। নবোঢ়া কন্যার পিতা ছিলেন ইংরেজ। তিনি স্বদেশীয় কোম্পানী ত্যাগ করে গোয়ার ভাইসরয়ের এক পালিতা কন্যাকে বিয়ে করেন।

জন্ দে রোজ কিন্তু ভাইসরয়ের [illegible] বিদায় নিয়ে কলম্বোতে ফিরে যেতে চাইলেন। সেখানে ভাইসরয়ের অনুগ্রহেই তিনি একটি বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেন। মহিলাটি পিতামাতার দুই দিকে সিংহলী ও পর্ত্তুগীজ। এই বিয়ের ফলে জন্ দে রোজ প্রভূত অর্থ সম্পদের মালিক হন। ভাইসরয় মারেস্‌টসকে তাঁর রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। এই পদটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভাইসরয় নিজের জীবনের জন্যও মারেস্‌টসের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনিই তাঁকে কাঁধে তুলে সমুদ্রে নিমজ্জন থেকে রক্ষা করেন।

দ্যু বেলয় বিদায় নিতে চাইলেন মাকায়োতে যাবার উদ্দেশ্যে। তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পর্তুগীজ সম্প্রদায় সেখানে ব্যবসা দ্বারা ধন সম্পত্তি করে অবসর জীবন যাপন কচ্ছেন তাঁরা নবাগতদের সংগে অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র ব্যবহার করেন। এছাড়া তাঁরা জুয়া খেলায়ও খুব আসক্ত। দ্যু বেলয় ঐ খেলায় বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। তিনি দু' বছর মাকায়োতে কাটিয়েছেন অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তোষের মধ্যে। যখনই তাঁর টাকার দরকার হয়েছে তখুনি ওখানকার ভদ্র সম্প্রদায় তাঁকে ধার দিয়েছেন অবাধে। একবার তিনি জুয়াতে জিতে ছয় হাজার ক্রাউন লাভ করেন। কিন্তু আবার খেলতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ সমস্ত টাকা লোকসান করেন। অধিকন্তু বন্ধুদের কাছ থেকে আরও টাকা ধার করে খেলায় পরাজয়ের মাশুল দিতে হয়েছিল।

এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দেখলেন আর টাকা ধার পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ঘরে টাঙানো একটি চিত্রপটকে লক্ষ্য করে শপথ করতে শুরু করলেন। ছবিখানি কোন ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরুর। উত্তেজনা বশে তিনি বললেন যে ঐ ছবিটির জন্যই তাঁর হার হয়েছে। ছবিখানি না থাকলে জিত হোত। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারকের কানে কথাটা গিয়ে পৌঁছোল। পর্তুগীজ অধিকৃত প্রতিটি সহরেই একজন করে বিচারক থাকেন। তবে তাঁর অধিকার সীমিত। অন্য আর কোন কর্ত্তাব্যক্তি নেই যিনি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ মন্তব্যাদির জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। প্রথমে সাক্ষীদের বক্তব্য শুনতে হবে। তারপর সেই রিপোর্টসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গোয়াতে পাঠানোর নিয়ম। গোয়াস্থিত প্রধান বিচারক বিচার করে শাস্তি দেবেন বা মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

দ্যু বেলয়কেও দশবারটি বন্দুক সমন্বিত ছোট একটি জাহাজে তুলে শৃঙ্খলা-বদ্ধ অবস্থায় বাইরের দিকে রাখা হয়। কাপ্তেনের উপর নির্দ্দেশ ছিল তাঁর প্রতি কড়া নজর রাখার। অপরাধী পালিয়ে গেলে তিনি হবেন দায়ী। জাহাজখানি সমুদ্র বক্ষে কিছুটা এগোতেই অতি ভদ্র স্বভাবের কাপ্তেন দ্যু বেলয়কে শৃঙ্খল মুক্ত করে নিজের টেবিলে বসতে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল আসামী উচ্চ বংশ সম্ভূত। কাপ্তেন তাঁকে কিছু জামা পোষাক এবং সমুদ্র যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্রও দিলেন। জাহাজে গোয়ায় পৌঁছোতে সময় আবশ্যক হোত চল্লিশ দিন। সেখানে জাহাজটি পৌঁছোল

১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই আমাণ্ট এসেছিলেন গভর্ণরের আদেশানুসারে। তাছাড়া নিজের চিঠিপত্র নেয়া ও চীনদেশের খবরাখবরের জন্যেও আসতে হয়েছিল। কিন্তু জাহাজে দু বেলয়কে দেখে তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। জাহাজের কাপ্তেন ধর্মসংক্রান্ত বিচারক ব্যতীত আর কারোর হাতেই বেলয় সাহেবকে দিতে পারেন না। তা সত্ত্বেও নিজের সুখ্যাতি প্রতিপত্তির জোরে সেন্ট আমাণ্ট কাপ্তেনকে রাজী করলেন যে বেলয় তাঁর সংগে সহরে যাবেন। বেলয় তখন আবার তাঁর সেই পুরোনো দাগওয়ালা জামা পোষাক পরলেন সেন্ট আমাণ্ট জানতেন যে বিচার ব্যবস্থায় সময়ক্ষেপ চলে না। তাই তিনি অতি দ্রুত বেলয়কে নিয়ে বিচারকের কাছে হাজির করলেন। বিচারপতি একটি ভদ্র সন্তানকে ঐ প্রকার শোচনীয় অবস্থায় দেখে দয়ার্দ্র হলেন এবং সহরের যে কোন জায়গায় অবাধে বেলয় বাস করতে পারবেন, এমন অনুমতি দিলেন। তবে সর্ত্ত ছিল যে হুকুম হলেই তাঁকে সশরীরে এসে হাজির হতে হবে। ইতিমধ্যেই বিচারপতি বুঝতে পেরেছিলেন আসামীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ।

তখন সেন্ট আমাণ্ট দু বেলয়কে নিয়ে এলেন আমার আবাসে। আমি তখন 'সিরার' প্রধান বিশপের সংগে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। কনষ্টাণ্টি-নোপলে তাঁর সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি তখন গালাতে ফ্রানসিস্কান্ সম্প্রদায়ের মঠাধীপ ছিলেন। আমি আমাণ্ট ও বেলয়কে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমার সংগে সান্ধ্য ভোজন করতে অনুরোধ জানালাম। তাঁরাও আমার ইচ্ছে পূরণ করলেন। ভোজন পর্ব্বের পরে আমি দু বেলয়কে আমার ঘর ও টেবিল ব্যবহার করার অনুমতি দিলাম। তিনি আমার সংগেই থাকবেন ঠিক হোল। আর তাঁর জন্যে আমি দুই জোড়া নতুন পোষাক ও কিছু লিনেন কাপড় ·· ন নিয়ে এলাম। কিন্তু আমি যে দশ বার দিন গোয়াতে ছিলুম ততদিন তাঁকে সে নতুন পোষাক পরাতে পারি নি। প্রতিদিনই কথা দিতেন। কি কারণে যে ব্যবহার করেন নি তা বোঝা যায় নি।

আমার গোয়া ত্যাগের সময় এগিয়ে এল। আমি ভাইসরয়ের কাছে বিদায় নিতে যাবো শুনে বেলয় ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে আমি যেন ওঁর কথাও তাঁকে একটু বলি। আমি তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করতে কুণ্ঠিত হই নি। এরপর আমরা দু'জনে একদিন সন্ধ্যায় একই জাহাজে উঠলাম। মধ্যরাত্রির

কাছাকাছি সময়ে সিয়ের বেলয়ের মন মেজাজ, হাবভাব সব কেমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠলো। পুরোনো জামাপোষাক সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বিচারকের বিরুদ্ধে পাগলের ন্যায় উক্তি করে চললেন। ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। আমি তাঁকে কেবল সতর্ক করে দিলুম যে আমরা তখনও পর্তুগীজদের আওতার মধ্যে রয়েছি। জাহাজের চল্লিশজন নাবিক খালাসীর সংগে আমি, তিনি ও মাত্র পাঁচ ছয়জন ভৃত্য কিছুই করে উঠতে পারবোনা। তাঁকে আমি একটি প্রশ্ন করলাম যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর এত অভিযোগ কেন। তদুত্তরে তিনি সব ঘটনা আমাকে বলবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। মিন্‌গ্রেলাতে পৌঁছে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

সময় প্রাতঃকাল, বেলা আটটা আন্দাজ। আমরা মিন্‌গ্রেলাতে পৌঁছোলে কয়েকজন ওলন্দাজ ও তাঁদের দলের অধিনায়কের সংগে আমাদের দেখা হয়। তাঁরা সমুদ্রতীরে বসে শামুকজাতীয় কিছু খাচ্ছিলেন ও সংগে মদ্য জাতীয় পানীয়ও ছিল। তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমার সঙ্গীটি কে? আমি জানালাম, ইনি পর্তুগালে ফরাসী দূতাবাসে কাজ করতেন। সেখান থেকে আরও চার পাঁচজন সহ জাহাজে করে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। সংগীদের তিনি রেখে এসেছেন গোয়াতে। গোয়ার আবহাওয়া পরিবেশ ও পর্তুগীজদের মনমেজাজ কিছুই তাঁর ভাল না লাগায় তিনি আমার সাহায্যে ইউরোপে ফিরে যেতে চান। তিন চার দিন পর আমি একটি বলীবর্দ কিনলাম তাঁকে সুরাটে পৌঁছে দেবার জন্যে। একটি ভৃত্যেরও ব্যবস্থা হোল। আর তাঁকে সংগে দিয়েছিলাম জনৈক কাপুসিন যাজক ফাদার জেননকে একটি চিঠি। তাতে লিখেছিলাম যে তিনি যেন আমার দালালকে বলে দেন দু বেলয়কে প্রতি মাসে দশ ক্রাউন করে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যে দিতে। আর ইংরেজ কোম্পানীর সভাপতি যেন ওঁকে প্রথম সুযোগেই ইউরোপগামী কোন জাহাজে তুলে দেন। কিন্তু ঘটনা ঘটলো একেবারে আমার ইচ্ছে ব্যবস্থার বিপরীত মুখী। কারণ ফাদার জেনন তাঁকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান গোয়াতে। সেখানে ফাদার ইফ্রেমের সংগে তাঁর কিছু কাজ কারবার ছিল। ফাদার ইফ্রেম সম্বন্ধে আমি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কিছু বলবো।

ফাদার জেননের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দু বেলয় বিচারালয়ে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই রেহাই পাবেন। আর তিনি তা পেয়েছিলেনও।

তবে দু'বছর তাঁকে বিচারাধীনে থাকতে হয়েছিল। ঐ সময় তাঁকে গন্ধক মিশ্রিত জামা ব্যবহার করতে হয়। পেটের উপরে আবদ্ধ থাকতো সেন্ট এণ্ড্রুজের একটি ক্রুশ। তাঁর সংগে আরও একটি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর নাম সিয়েনের তীরবর্ত্তী লুইদে বার। তাঁকেও দু বেলয়ের মতই রাখা হয়েছিল। মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মত এদের সর্ব্বদা থাকতে হোত। গোয়াতে ফিরে সিয়ের দু বেলয় আচার আচরণ করেন অত্যন্ত খারাপ। মিনগ্রেলাতে যেন আরও খারাপ হয়ে উঠলো। ওলন্দাজরা ওখানে বুঝতে পেরেছিলেন যে লোকটি পূর্ব্বে তাঁদের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সুরাটের সেনানায়কের কাছ থেকে এ বিষয়ে তাঁরা সংবাদও সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা দু বেলয়কে আবার গ্রেপ্তার করে বাটাভিয়াগামী একটি জাহাজে তুলে বরাবর সমুদ্র পথে সেখানে পাঠিয়ে দেন। ওলন্দাজদের ভাবটা ছিল এই যে তাঁকে কোম্পানীর সর্ব্বাধিনায়কের কাছে পাঠানো হোক। তিনি যা ভাল মনে করবেন, তাই-ই হবে। কিন্তু আমার মনে হয় জাহাজটি মাঝ দরিয়ায় কিছুটা এগোতেই তাঁরা হতভাগ্য লোকটিকে (দু বেলয়) একটি চটের বস্তায় পুরে সাগরের জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এই ভাবে সিয়ের দু বেলয়ের জীবনাবসান ঘটে।

সিয়ের দেস্ মারেস্টস্ সম্পর্কে এই-ই বলা চলে যে তিনি ছিলেন একজন ভদ্র সন্তান। তাঁর জন্ম স্থান লোরিয়লের কাছে। একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে তিনি পালিয়ে যান পোলাণ্ডে। সেখানে তিনি এত পরিচিত ও প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন যে অচিরে পোলোনীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কের শ্রদ্ধা ভালবাসা অর্জন করে ফেললেন। সেই সময়ে তুর্কীর সুলতান কন্সটান্টিনোপলের সপ্ত গম্বুজের কারাগারে দু'জন সম্ভ্রান্ত পোলাণ্ড-বাসীকে রেখেছিলেন বন্দী করে। পোলোনীয় জেনারেল দেস্ মারেস্টসের সাহস ও বুদ্ধির কৌশল দেখে তাঁকে অনুরোধ করলেন কন্সটান্টিনোপলে গিয়ে যে কোন প্রকারে সেই বন্দী রাজপুত্র দু'টিকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করতে। দেস্ মারেস্টস্ ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং ভাল একজন এঞ্জিনিয়রও বটে। তিনি বেশ আগ্রহ সহকারেই সে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং তুর্কীদের হাতে ধরা না পড়লে কাজটা হাসিলও করতে পারতেন। সপ্ত গম্বুজ পরিদর্শন ব্যাপারে তুর্কীরা যেন তাঁকে একটু বেশী সতর্ক দেখলেন। আরও দেখলেন তাঁর হাতে নক্সা করে আনার জন্য খড়ি পেন্সিল। এই

দেখে তাঁদের মনে সন্দেহ হোল যে লোকটির উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভাল নয়। ফরাসী রাজদূত মঁসিয়ে দে কেসি যদি কিছু উপহার উপঢৌকন দিয়ে ব্যাপারটাকে চাপা না দিতেন তাহলে তাঁর বিপদ আরও বেড়ে যেত। তুর্কীদেশে কিছু উপহার দান হোল অনেক বিপদ বিভ্রাট থেকে রেহাই পাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাছাড়া উজিরকে বলা হোল, তিনি আনন্দ লাভের জন্যেই ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এখন প্রথম সুযোগেই পারস্যদেশে যাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু মারেস্টসের তখন বেশী দূরে যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই ছিল না। তাঁর ইচ্ছে ছিল পোলাণ্ডে যাবার এবং তার আগে রাজকুমার দের মুক্ত করার শেষ চেষ্টা আর একবার করার। নিজের নিরাপত্তার জন্যেই পারস্য ভ্রমণের কথা বলতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত পোলাণ্ডে যাওয়াও স্থগিত হয়। কারণ তুর্কী সুলতান সেই দু'জন সম্ভ্রান্ত পোলাণ্ডবাসীকে কখনই মুক্তি দেবেন না সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত বন্দীদ্বয়ের জনৈক তুর্কী যুবার প্রীতি অর্জ্জনের সৌভাগ্য হোল। যুবকটির পিতা ছিলেন সপ্তগম্বুজের প্রধান কর্ত্তাব্যাক্তি। অনেক সময় তাঁর পিতা তাকে কারাগারের চাবি দিতেন দ্বারপথ খোলা ও বন্ধ করার জন্যে। যে রাত্রিতে বন্দীদের পালিয়ে যাবার কথা সেদিন দরজা গুলি বন্ধ হলেও তালা সব বন্ধ হয়নি। তবে প্রথম দু'টি দ্বার পথে সেরকম কোন ব্যবস্থা রাখতে তার সাহস হোল না। ধরা পড়ে যাবার ভয় ছিল। কারণ একটি দরজার কাছেই তার পিতা একজন শক্তিমান রক্ষীসহ বাস করেন। তা সত্ত্বেও যুবকটির একান্ত ইচ্ছা ছিল বন্দীদ্বয়কে সাহায্য করার। নানা অসুবিধার মধ্যেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত রজ্জু নির্মিত সিঁড়ির কথা চিন্তা করলেন। তবে এই ব্যবস্থার জন্য অন্দরের সংগে বাইরের যোগাযোগ ছিল আবশ্যক। আর একটি বিষয়ে সুবিধে হোল। সেই বন্দীদের ব্যাপারে তেমন কিছু কড়াকড়ি ছিল না। ফরাসী রাজদূতের রন্ধনশালা থেকে মাংসপূর্ণ নানা থালি তাঁদের দেবার অনুমতি ছিল। সেই রন্ধনশালার কেরানীকে এই বিষয়ে জানানো হোল। তিনি তখন মাংস পিষ্টকের মধ্যে করে কিছু কিছু দড়ি তাঁদের সরবরাহ করতে লাগলেন। সেই দড়ি দিয়ে তাঁরা বেশ একটি সিঁড়ি বা মই তৈরী করলেন। কাজটি এমন নিখুঁত হয়েছিল যে তার সাহায্যে পলায়নে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। শেষ পর্য্যন্ত তুর্কী যুবকটিও বন্দী জমিদার নন্দনদের সংগে চলে গেলেন পোলাণ্ডে। সেখানে

গিয়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে প্রচুর অর্থ ও একটি চাকুরী পেলেন পুরস্কার। রাজকুমারদের মুক্তিলাভে যাঁরাই সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পুরস্কার পেয়েছিলেন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ। সকলকে সমানভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সিয়ের দেস্ মারেস্টস্ এসে পৌঁছলেন ইস্পাহানে। সেখানে তিনি কাপুসিন সন্ন্যাসীদের সংগে পরিচিত হতে তাঁরা ওঁকে নিয়ে এলেন আমার কাছে। তিনি আমার বাসস্থান ও খাদ্য, দুই-এরই অংশ লাভের যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি ইস্পাহানে কিছুদিন এইভাবে কাটান। ওখানে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সংগেও তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। তাঁরা ওঁকে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাধর ব্যক্তি বিবেচনা করে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু কৌতূহলের প্রাবল্যে তিনি একদিন এমন একটি দুঃসাহসের কাজ করে ফেললেন যার ফলে যেমন তাঁর নিজের সর্ব্বনাশ হয়, তেমনি ইস্পাহানস্থিত সমস্ত ফরাসীদের জীবনেও আসে ভয়ানক দুর্বিপাক।

যে সরাইখানাতে আমরা ছিলুম, সেখানে বড় একটি স্নানাগার ছিল। ওখানে নারী পুরুষ পালাক্রমে এসে স্নান করতেন। বিজাপুরের সুলতানা মক্কা ভ্রমণ শেষ করে স্বদেশে ফিরবার পথে ইস্পাহানে কয়েকদিন ছিলেন। সেই সময় তিনি স্নানাগারটিতে গিয়ে ফরাসী মহিলাদের সংগে গল্প গুজব করে খুব আনন্দ পেতেন। এদিকে মারেস্টসের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা হোল মহিলারা সেখানে কি কচ্ছেন তা দেখার। তিনি আবার স্নান করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে স্নানাগারের গম্বুজের খিলানে একটি ফাটল রয়েছে। একদিন সেই ফাটল দিয়ে নিজের কৌতূহল নিবৃত্ত করে এলেন। তারপর দেখলেন খিলানের উপরে না উঠেও চলতে পারে। স্নানাগারের একটি দিকে এমন একটি গর্ত্তমত জায়গা দেখতে পেলেন যেখান দিয়ে তাঁর বাসস্থানে বসেই সব দেখা যেতে পারে। খিল[illegible] ছিল সমতল। এ কথা আমি পারস্য ভ্রমণ ও সেরাগ্লিয়ো প্রসংগে বলেছি। মারেস্টস্ সেখানে পেটে ভর দিয়ে শুয়ে যতখুশী দেখতে লাগলেন। এইভাবে প্রায় দশ বার দফায় তিনি স্নানাগারের অভ্যন্তরের দৃশ্য দেখেছিলেন। অবশেষে নিজেকে দমন করতে না পেরে সব বৃত্তান্ত একদিন আমাকে বললেন। আমি তাঁকে সতর্ক করে দিলুম যেন বারান্তরে ঐ কাজ তিনি আর না করেন। যদি করেন, তাহলে তাঁর নিজের জীবন এবং ঐ সহরের সমস্ত ফরাসী জাতীয় লোকদের জীবনও

বিপন্ন হবে। কিন্তু আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি আরও দু' তিনবার সেখানে যান। তার মধ্যে একদিন ধরা পড়ে গেলেন ওখানে কর্ম্মরত এক মহিলার কাছে। তিনি ওখানে কাপড় চোপরের তত্ত্বাবধান করতেন এবং বাইরে তা শুকিয়ে নিতেন। জামা কাপড় শুকোতে দেয়া হোত খিলানের উপরে বাঁধা একটি দড়ির সংগে। সেই উঁচুতে ওঠার জন্যে ছিল একটি সিঁড়ি বা মই। একদিন সেখানে উঠতে তিনি দেখলেন একটি লোক উবু হয়ে শুয়ে আছেন। তখুনি তাঁর টুপিটা ধরে ফেললেন, আর চীৎকার শুরু করে দিলেন।

মারেস্টস্ তখন কলঙ্কমুক্ত হওয়ার জন্যে এবং মহিলাটির চীৎকার কোলাহল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁর হাতে দু'টি তোমান মুদ্রা গুঁজে দিলেন। তিনি সরাই খানায় ফিরে আসতে আমার মনে হোল তিনি যেন আতঙ্কগ্রস্ত এবং কোন দুর্ঘটনায় লিপ্ত হয়েছেন। আমি খুব পীড়াপীড়ি করেও ব্যাপরটা প্রথমে জানতে পারিনি। অবশেষে বলতে বাধ্য হলেন যে মহিলাটির কাছে কি প্রকারে ধরা পড়েছেন, আর টাকা দিয়ে কিভাবে তার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। একথা শুনে আমি তাঁকে তখুনী স্থানত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দিয়ে বললাম যে এর ফলে কি জাতীয় গুরুতর বিপদ যে আসবে তা কল্পনাতীত। আমি ওলন্দাজ কোম্পানীর সর্ব্বাধ্যক্ষকে ব্যাপারটা জানানো সমীচিন মনে করলুম। তিনিও আমার সংগে একমত হলেন।

এরপর আমরা তাঁকে একটি খচ্চর বাহক ও প্রয়োজনীয় অর্থকড়ি দিয়ে বললাম বন্দর আব্বাসে চলে যেতে। আর সেখান থেকে যেন সমুদ্র পথে সুরাটে যান। সুরাটের ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষকেও ওঁর হয়ে একটি পত্র দেয়া হোল। তাঁকে লিখলাম প্রয়োজন হলে তিনি যেন মারেস্টস্‌কে দু'শত ক্রাউন মুদ্রা দান করেন। ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। মারেস্টসের প্রশংসা করেও কিছু লেখা হয়েছিল। আরও উল্লেখ করেছিলুম কিভাবে ইস্পাহানের ওলন্দাজ সেনাপতি স্বেচ্ছায় তাঁকে চিঠি দিয়ে জেনারেলের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন। আর সেখানে গেলে ইনি নিশ্চয়ই যোগ্যতা প্রদর্শন করে কোন কাজে নিযুক্ত হতে পারতেন। বস্তুতঃ তখন সিংহলে ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের সংগে যুদ্ধরত ছিলেন। সুতরাং সিয়েুর দেস্ মারেস্ট্‌সের মত বুদ্ধিমান ও সাহসী ব্যক্তি তখন তাঁদের কাছে বিশেষ সমাদরের পাত্র। তার ফলে তাঁরামারেস্টস্ সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহশীল।

কাজে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা ইস্পাহানে ওঁকে চমৎকার সব উপহার পাঠাতেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের সংগে এক ধর্ম্মমতাবলম্বী নন। কাজেই ওলন্দাজদের পক্ষ হয়ে পর্ত্তুগীজদের বিরুদ্ধে কাজকরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই একটি কারণই ছিল তাঁর সেই কার্য্যভার গ্রহণের অন্তরায়। অবশেষে তাঁর পক্ষ হয়ে সমস্ত বিবরণ দিয়ে সুরাটের ইংরেজ কুঠির সভাপতিকে আমি লিখে জানালাম যে সিয়র্ দেস্ মারেস্টস্ গোয়াতে যেতে চান পর্ত্তুগীজদের পক্ষে কাজ করার জন্যে। ইংরেজ প্রেসিডেন্ট ভাইসরয়কে একথা জানালেন। ওলন্দাজদের প্রস্তাব কি ছিল তাও জানানো হোল। এর ফলে তাঁর সেই অনুমোদন বেশ ভালভাবেই গৃহীত হয়েছিল। তাছাড়া গোয়ার ভাইসরয়ের সংগে ইংরেজ প্রেসিডেন্টের সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ। সুতরাং ভাইসরয় মারেস্টস্কে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রথম সুযোগেই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন সিংহলের গভর্ণর ডন ফিলিপ্ মাস্কারেগ-নাসের কাছে। পর্ত্তুগীজদের অধীনস্থ অন্যান্য স্থানও ছিল এই গভর্ণরের আওতায়। কিন্তু তিনদিন পরেই নেগোম্বী পর্ত্তুগীজদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে আবার পুনরুদ্ধার হয়েছিল। ঐ সময় যাঁরা গুরুতরভাবে আহত হন তাঁদের মধ্যে সিয়ের মারেস্টস্ একজন। তবে এই আক্রমণ ব্যাপারে তিনি সম্মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। আর তাঁর সহায়তায়ই ডন্ফিলিপ গোয়াতে যাবার সময় সমুদ্র নিমজ্জন থেকে রক্ষা পান। তিনি গোয়ায় যাচ্ছিলেন ভাইসরয় পদ গ্রহণের জন্যে। সেই ঘটনার পরে তিনি মারেস্টসকে তাঁর রক্ষাবাহিনীর নেতৃত্বপদ দান করেন। ঐ পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিন চার মাস পরেই মারেস্টস্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর বিয়োগ ব্যথায় ভাইসরয় অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়েছিলেন। তিনি মারেস্টসকে অতিমাত্রায় ভালবাসতেন। তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পদ একজন যাজককে দান করে যান। সেই দানের একটি সর্ত্ত ছিল যে মারেস্টস্ আমার কাছ থেকে যে দু'শ' পঞ্চাশ ক্রাউন ধান নিয়েছিলেন তা পরিশোধ করতে হবে। যাই হোক্ যাজকটির কাছ থেকে সেই টাকা আদায় করতে আমাকে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল।

আমার গোয়া বাস কালে দ্রুতগামী একটি জাহাজ সম্পর্কে একটি সুন্দর ঘটনা শুনেছিলুম। আমি ওখানে পৌঁছোবার অল্প কিছু আগে জাহাজটি এসেছিল লিসবন থেকে। জাহাজটি উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করছে এমন

সময় সমুদ্রে প্রবল ঝড় ওঠে। ঝড় স্থায়ী হয়েছিল পাঁচ ছয় ঘণ্টা। নাবিকরা বিপন্ন তো হয়েই ছিল, আর বুঝতেই পারেনি যে কোথায় গিয়ে পড়লেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা একটি উপসাগরে গিয়ে হাজির হলেন আর সেখানে কিছু লোকজনও দেখা গেল। জাহাজটি নোঙর করতেই স্ত্রী পুরুষ ও শিশুতে তীরভূমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তারা অবাক বিস্ময়ে শেতাঙ্গদের দিকে তাকিয়ে রইল। জাহাজটি দেখেও তারা কম বিস্মিত হয়নি। আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা গেল যে তারা একে আবার অপরের ভাষা জানে না। ভাবের আদান প্রদান ক'রে নানা সংকেতের মাধ্যমে। তারা ছিল কাফ্রী। পর্তুগীজরা ওদের কিছু তামাক, বিস্কুট এবং পানীয় দিতে পরের দিন তারা নিয়ে এল অনেকগুলি বাচ্চা উট পাখী এবং আরও কিছু মুরগী জাতীয় প্রাণী। সেগুলি দেখতে ঠিক বড় রাজ হাঁসের মত। কিন্তু এত মোটাসোটা যে বড় একটা নুয়ে চলতে পারে না। পাখীগুলির পালক অতি চমৎকার। পেটের উপরে যে পালক তা বিছানার তোষক গদীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জনৈক পর্তুগীজ নাবিক আমাকে সেই পালকের তৈরী একটি বড় গদী বিক্রী করেছিলেন। তাঁর কাছেই উপসাগরের সব ঘটনা শুনেছিলাম। তাঁরা সেখানে ছিলেন সাতাশ দিন। এক একজন কাফ্রীকে তাঁরা এক একটি জিনিস দিয়েছিলেন, যেমন ছুঁড়ি, কুঠার, ঝুঁট প্রবাল, কৃত্রিম মুক্তা। এইসব জিনিস দেবার প্রধান কারণ যদি নতুন কোন ব্যবসার পথ খুঁজে পাওয়া যায় বা তাদের কাছে সোনা আছে কিনা তা জানার জন্যে। কাফ্রীদের কতকের কানে সোনার জিনিস দেখা গিয়েছিল। সেগুলির গড়ন কোনটি পাতলা করে পেটানো, আর কতকগুলি তালার আংটার মত। কাফ্রীদের দু'জনকে ওঁরা গোয়াতে নিয়ে আসেন। তাদের একজনার কানের নানা অংশে ঝোলানো ছিল খণ্ড খণ্ড সোনা। নাবিকদের কাছে শুনেছিলাম যে সেই জনসমাজে অনেক স্ত্রীলোকের চিবুকের নীচে ও নাকের উপরে সোনা দেখা যায়।

পর্তুগীজরা সেই উপসাগরে পৌঁছোবার আট নয় দিন পরে সেই কাফ্রীরা তাঁদের এনে দিয়েছিল কিছু তিমি মাছের চর্ব্বি নির্ম্মিত মোম, সামান্য কিছু সোনা, কিছু হাতীর দাঁত, কয়েকটি উট পাখী, অন্য রকম আরও পাখী, খানিকটা হরিণের মাংস ও প্রচুর মাছ। পর্তুগীজরা নানা সংকেত ইঙ্গিত করে জানতে চেষ্টা করেছিলেন যে কোথায় তিমি মাছের চর্ব্বি

পাওয়া যায়। সেই চর্ব্বি ছিল অতি উঁচু দরের। ভাইসরয় এক খণ্ড চর্ব্বি দেখিয়েছিলেন আমাকে। ওজনে আধ আউন্সের বেশী নয়; এরকম উৎকৃষ্ট জিনিস আর কখনও দেখা যায়নি বলে তিনিও মত প্রকাশ করলেন। তাদের কাছে সোনা আছে কিনা জানার জন্যেও অনেক চেষ্টা হয়েছিল। হাতীর দাঁত সম্বন্ধে বেশী খোঁজ খবর করা হয়নি। কারণ দেখতেই পেয়েছিলেন যে উপসাগরে এসে পড়েছে এমন একটি নদীতে জল খেতে দলে দলে হাতী আসছে।

তিন সপ্তাহ ধরে নানা অনুসন্ধানে যখন আর কিছু জানা গেল না তখন প্রথম অনুকূল হাওয়াতেই জাহাজ ছাড়বেন স্থির হোল। তাছাড়া কাফ্রীদের সংগে কথাবার্ত্তা বলা ও একে অপরকে বুঝবারও কোন উপায় ছিল না। কয়েকজন কাফ্রী সর্ব্বদাই জাহাজে যাতায়াত করতো। তামাক, বিস্কুট ও কড়া পানীয় সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ ছিল সীমাহীন। তা দেখে পর্ত্তুগীজরা মনে করেছিলেন যে দু' একজনকে জাহাজে নিয়ে এলে ওরা হয়ত পর্ত্তুগীজ ভাষা শিখে নিতে পারবে। হয়ত এমন শিশুও পাওয়া যেতে পারে যারা সহজে ভাষা আয়ত্ব করতে পারে। নাবিকদের কাছে আরও শুনেছিলুম যে জাহাজ ছাড়ার সময় দু'জন কাফ্রীকে জাহাজে দেখে অন্যরা নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়তে ও বুক চাপড়াতে লাগলো উন্মাদের মত। সংগে সংগে চললো বিকট চিৎকার কোলাহল। তাতে বোঝা গেল যে ওরা অবিবেচক বা নিষ্ঠুর নয়। যে দু'জনকে গোয়াতে আনা হোল, তাদের আর পর্ত্তুগীজ ভাষা শিক্ষা দানের কোন চেষ্টা হয়নি। সুতরাং তাদের দ্বারা কোন স্বার্থ সিদ্ধির আশা ছিল না। নতুন কিছু আবিষ্কারের সহায়তাও তারা করতে পারে নি। পর্ত্তুগীজরা ওখান থেকে এনেছিলেন দু' পাউণ্ড সোনা, তিন পাউণ্ড তিমির চর্ব্বি, পঁয়ত্রিশ চল্লিশটি হাতীর দাঁত। কাফ্রীদের একজন জীবিত ছিলেন মাত্র ছয় মাস। দ্বিতীয়টির জীবনাবসান হয় পনের মাস পরে। তাদের অচিরে মৃত্যুর প্রধান কারণ দুঃখ বেদনা ও গভীর মর্ম্ম পীড়া।

গোয়া থেকে আমি গিয়েছিলুম মিংগ্রেলাতে। সেখানে একটি দুর্ঘটনার কথা বিস্মৃত হওয়া যায় না। জনৈক হিন্দুর মৃত্যু হলে তাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী গভর্ণরের অনুমতি নিয়ে স্বামীর চিতার আগুনের কাছে এগিয়ে গেলেন। পুরোহিতদের মধ্যেই মহিলাটি গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর জ্ঞাতি গোষ্ঠী

ও আত্মীয়বর্গ মিলে তাঁকে তাঁর স্বামীর সংগে জীবন্ত দগ্ধ করে ফেলার চেষ্ট করলেন। প্রচলিত প্রথানুসারে তিনবার চিতাটিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। প্রদক্ষিণকালে হঠাৎ প্রবলবেগে শুরু হয় বৃষ্টি। পুরোহিতরা বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মহিলাটিকে হঠাৎ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন। কিন্তু বৃষ্টি এত প্রবল ও এত বেশী সময় স্থায়ী হয়েছিল যে চিতার আগুন অবিলম্বে গেল নিভে। ফলে মহিলাটির মৃত্যু হয়নি, দেহও হয়নি ভস্মীভূত। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি জেগে উঠলেন। তারপর জ্ঞাতিদের গৃহদ্বারে গিয়ে করাঘাত করলেন। এই ঘটনা অর্থাৎ জ্ঞাতি বন্ধুদের বাড়ীর সামনে মহিলাটিকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন ফাদার জেনন ও অন্যান্য ওলন্দাজগণ। মহিলাটির চেহারা এমন বিকট ও বীভৎস হয়েছিল যে যাঁরাই তাঁকে দেখেছেন, ভয়ে বিস্ময়ে তাঁরাই আতঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি অত ব্যথা, অত কষ্ট সহ্য করেও এতটুকু ভীত বা বিচলিত হননি। তিনদিন পরে আবার তিনি জ্ঞাতি গোষ্ঠী ও আত্মীয় স্বজনদের সংগে নিয়ে তাঁদের সম্মুখে পূর্ব্ব কল্পিত প্রথায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে আত্মবিসর্জন করেন।

অধ্যায় পনের

ফাদার ইফ্রেমের কথা এবং আকস্মিকভাবে তিনি কি প্রকারে ধর্ম্ম সম্পর্কিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হন।

গোলকুণ্ডার সুলতানের জ্যেষ্ঠ জামাতা শেখ সাহেব ফাদার ইফ্রেমকে বাগ-নাগরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। তিনি ফাদারকে ওখানে একটি বাড়ী ও গীর্জা তৈরী করিয়ে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁকে মসলিপত্তন পৌঁছে দেবার জন্যে দু'জন লোক ও একটি বলীবর্দ দিলেন। তিনি সেখান থেকে জাহাজ ধরে পেগু যাবেন। তাঁর উপর-ওয়ালারা তাঁকে পেগু যাবারই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পেগু যাবার কোন জাহাজ প্রস্তুত না থাকায় ইংরেজরা তাঁকে নিয়ে গেলেন মাদ্রাজ পত্তনে। সেখানে ছিল সেন্ট জর্জ নামে একটি কেল্লা ও সাধারণ ফ্যাক্টরী একটি। সেই ফ্যাক্টরীতে গোলকুণ্ডা, পেগু ও বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী হোত। ইংরেজরা ফাদারকে একটু বেশী বলে কয়ে প্ররোচিত করলেন যেন ভারতের আর কোথাও সেরকম সুখ সুবিধে নেই। তাঁরা ওখানে তাঁর জন্যে অতি চমৎকার একটি বাড়ী ও গীর্জা দিলেন তৈরী করিয়ে। কিন্তু পরে দেখা গেল ইংরেজরা স্বজাতীয়দের প্রতি যে রকম সদ্ব্যবহার করেন সেরকমটি ফাদারের সংগে করেন নি। মাদ্রাজ পত্তন ও সেন্ট টমাস নামে সহরটির মধ্যে দূরত্ব ছিল আধ লীগ মত। সেন্ট টমাস ছিল করমণ্ডল উপকূলের সমুদ্রতীরে। তার গঠন পরিকল্পনা বিশেষ উপযুক্ত নয়। জায়গাটি আগে ছিল পর্ত্তুগীজদের এক্তিয়ারভুক্ত। পূর্ব্বে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো বেশ ভালই, বিশেষ করে সূতী বস্ত্রের। অনেক ব্যবসায়ী কারিগরেরও বাস ছিল ওখানে। তাদের অনেকেই এখন মাদ্রাজ পত্তনে এসে ইংরেজদের আওতায় বাস করতে আগ্রহশীল। কারণ সেন্ট টমাসে ধর্ম্ম আচরণের বিশেষ সুবিধা হোত না। আবার ইংরেজরা ফাদার ইফ্রেমকে গীর্জা তৈরী করে দিতে বহু পর্ত্তুগীজ সেন্ট টমাস ছেড়ে চলে যান ওখানে। কারণ ফাদার সর্ব্বদাই সকলকে ধর্ম্ম কথা শোনাতেন। তাছাড়া তিনি পর্ত্তুগীজ ও স্থানীয় অধিবাসীদের সংগে ব্যবহার করতেন সমানভাবে।

ফাদার ইফ্রেমের জন্মস্থান থক্‌সেরে। তিনি হলেন প্যারিসের পার্লামেন্টের কাউন্সিলর মঁসিয়ে সটো দে বয়েজের ভ্রাতা। বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার দিকে ফাদারের ছিল বিশেষ ঝোঁক। তিনি ইংরেজী ও পর্ত্তুগীজ দু'টি ভাষায়ই অতি দ্রুত ও চমৎকার বিশুদ্ধভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। সেই সময় সেন্ট টমাস গীর্জার যাজকগণ দেখলেন যে ফাদার ইফ্রেম অতি মাত্রায় জনপ্রিয় হয়েছেন। সকলেই তাঁর সুখ্যাতিতে মুখর। আর ওখানকার ভজনালয়ের অধিকাংশ প্রার্থনাকারীরা চলে যাচ্ছেন মাদ্রাজ পত্তনে। তাতে যাজকগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ফাদারকে উচ্ছেদ করার মনস্থ করলেন। সেই উদ্দেশ্যে একটি ষড়যন্ত্রও সৃষ্টি হোল।

ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজরা কাছাকাছি প্রতিবেশী ছিলেন এদেশে। কিন্তু সদ্ভাব সম্প্রীতি বলতে কিছুই ছিল না তাঁদের মধ্যে। পরন্তু বিবাদ বিসম্বাদের পালাই চলতো। ফাদার ইফ্রেম্ কিন্তু সেই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যে চেষ্টা শুরু করলেন। ইতিমধ্যে পর্ত্তুগীজরা মতলব করেই একদিন কয়েকজন ইংরেজ নাবিকের সংগে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হলেন। ইংরেজরা ছিলেন সেন্ট টমাসের রাস্তায়। তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন অতিমাত্রায়। তখন ইংরেজ কোম্পানীর সর্ব্বাধিনায়ক ক্ষতি পূরণের সংকল্প গ্রহণ করলেন। আর অনতিবিলম্বে দুই পক্ষে যুদ্ধ হোল শুরু। দুই দেশেরই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। দু' পক্ষের ব্যবসায়ীরাই ছিলেন অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী। তাঁরা কোন রকমে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য ব্যস্ত হলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যে ফাদার ইফ্রেমের বিরুদ্ধে নানা চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছেন ব্যবসায়ীদের জানা ছিল না। তাঁদের যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা ব্যর্থ হোল। দাবী উঠলো ফাদার ইফ্রেমকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বিবাদ বিরোধ মিটিয়ে দিতে হবে। ফাদারও অবিলম্বে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। আর তিনি সেন্ট টমাসে যেতেই ধর্ম্মীয় বিচারালয়ের দশ বার জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এমন একটি রণপোতে তুলে দিলেন যেটি তখুনি গোয়ার দিকে এগিয়ে চললো।

তাঁকে হাতকড়ি ও পায়ে শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছিল বাইশ দিন। এইভাবে তাঁকে সমুদ্রেই কাটাতে হয় সেই দিনগুলি। অধিকাংশ নাবিক প্রতি রাত্রে তীরে অবতরণ করতেন। কিন্তু ফাদারকে একটিবারও তীর ভূমিতে পদক্ষেপ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। গোয়াতে পৌঁছেও তাঁরা

রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করেন যাতে অন্ধকারে তাঁকে বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। দিনমানে ফাদারকে তীরে নামাতে তাঁদের কিছুটা ভীতি ছিল। কারণ জনসাধারণ জানতে পারলে হয়ত তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। সারা ভারতেই ফাদার ছিলেন সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। এত করেও তাঁর বন্দী দশার খবর চাপা রইল না; সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। এ সংবাদ শুনে স্থানীয় ফরাসী সমাজ অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়লেন। সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হলেন ও মনোকষ্ট পেলেন কাপুসীন সন্ন্যাসী ফাদার জেনন। ইনি এক সময় ইফ্রেমের সংগী ছিলেন। তিনি তখুনি বন্ধুদের সংগে পরামর্শ করে গোয়া যাত্রার সিদ্ধান্ত করলেন। তিনিও একবার ধর্ম্ম বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

এই জাতীয় বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সমর্থন করাও যে বিপদজনক তা জেনন জানতেন। যিনি মধ্যস্থ হয়ে কিছু বলতে যান তাঁকেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সেক্ষেত্রে প্রধান যাজক বা ভাইসরয় পর্য্যন্ত কিছু বলতে সাহস পান না। এদের দুজনার উপরে অবশ্য বিচারপতির কোন ক্ষমতা আরোপের অবকাশ নেই। এঁরা বিচারালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ কিছু বললে তখুনি পর্ত্তুগালের বিচারপতিকে তা জানানো হয়। তারপর স্বয়ং রাজা ও সেখানকার প্রধান বিচারপতি হুকুম পাঠাবেন। হুকুম মাফিক এখানেও বিচার হতে পারে নতুবা প্রধান যাজক ও ভাইসরয়কে এজন্যে পর্ত্তুগালও যেতে হতে পারে।

এই সমস্ত জেনেও ফাদার জেনন সিয়ের দেলা বুলেকে সংগে নিয়ে গোয়াতে গেলেন। সিয়ের দেলা বুলে ছিলেন অতি ভদ্রলোক। তাঁরা গোয়াতে পৌঁছোলে কয়েকজন বন্ধু বললেন যে তাঁরাও যদি ইফ্রেমের সংগে বিচারাধীন হতে না চান তাহলে যেন একটিও কথা না বলেন। এরপর ফাদার জেনন দেখলেন গোয়াতে তাঁর কিছু করার নেই। তখন তিনি সিয়ের দ্য বুলেকে সুরাটে ফিরে ত নির্দ্দেশ দিয়ে নিজে সোজা চলে গেলেন মাদ্রাজপত্তনে। উদ্দেশ্য, ফাদার ইফ্রেমকে ঐভাবে পাঠিয়ে দেবার কারণ অনুসন্ধান করা। ওখানে গিয়ে তিনি সঠিক জানতে পারলেন ইফ্রেম সেন্ট টমাসে কিভাবে প্রতারিত হয়েছেন। সুতরাং ইংরেজ প্রেসিডেন্টের সংগে দেখা সাক্ষাৎ না করে তিনি কেল্লার ক্যাপ্‌টেনকে সব কথা জানালেন। তাঁরা ফাদার ইফ্রেমকে নানাভাবে কষ্ট দেবার কথা শুনে জেননকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর ফাদার জেনন গুপ্তচর নিয়োগ করে জানতে পারলেন যে সেণ্ট টমাসের গভর্ণর প্রতি শনিবারে প্রাতঃকালে সহর থেকে আধ লীগ-দূরে একটি পাহাড়ে কুমারী মেরীকে উৎসর্গিত একটি গীর্জায় যান। ফাদার জেনন সেই গীর্জায় গিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করলেন, জানালা করলেন অর্গল বদ্ধ। এই করে ফিরে এলেন কেল্লার গভর্ণরের কাছে। গভর্ণর ছিলেন আইরিশ এবং খুব শক্তিমান। তিনি ত্রিশজন সৈন্য ও জেননকে সংগে নিয়ে কেল্লা থেকে বেরোলেন প্রায় মাঝ রাতে। গীর্জাটির কাছে গিয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে রইলেন দিনের অপেক্ষায়। সেণ্ট টমাসের গভর্ণর নিয়ম মাফিক সূর্য্যোদয়ের কিছু পরেই গীর্জার দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে পাল্‌কী থেকে নামতেই নিজেকে শত্রুবেষ্টিত দেখে বিস্মিত হলেন। তারপর তাঁকে মাদ্রাজপত্তনে নিয়ে গিয়ে গীর্জার একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখা হোল। গভর্ণর এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে ফাদার জেননের বিরুদ্ধে বিশেষ রকম অভিযোগ করে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করে বললেন যে রাজা যখন সৈন্য বাহিনীর অধ্যক্ষের প্রতি তাঁর এই ব্যবহারের কথা জানতে পারবেন তখন পরিণতি কি দাঁড়াবে, তদুত্তরে জেনন কিছু উচ্চবাচ্য করেননি। শুধু বলেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাস ফাদার ইফ্রেম গোয়াতে প্রেরিত হয়ে সেখানে যে ব্যবহার পাচ্ছেন তার থেকে উত্তম ব্যবহার তিনি (গভর্ণর) মাদ্রাজ পত্তনে পাচ্ছেন। ইফ্রেম মুক্তি পেলেই তিনিও মুক্তি পাবেন। ফাদার ইফ্রেম যেভাবে গোয়ায় প্রেরিত হয়েছেন ঠিক সেইভাবেই তিনিও স্বস্থানে ফিরে যাবার অবকাশ পাবেন।

ইংরেজ প্রেসিডেণ্টের কাছেও অনেক অনুরোধ আবেদন এসেছিল গভর্ণরের মুক্তি দাবী করে। তিনি জবাব দিলেন যে গভর্ণর তাঁর আয়ত্বাধীন নন। গভর্ণরের এই অপমান ও কষ্টের মূলে যিনি সেই জেননকেও তিনি এবিষয়ে বাধ্য করতে পারেন না। তবে একটা কাজ তিনি করতে পারেন। তিনি ফাদার জেননকে বলবেন যাতে বন্দী গভর্ণর কেল্লার মধ্যে তাঁর সংগে ভোজনপর্ব্বে যোগ দিতে অনুমতি পান। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্রয়োজন হলেই গভর্ণর তাঁর কাছে আসতে পারবেন। ইংরেজ প্রেসিডেণ্ট সব কথা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারেন নি। সৈন্যবাহিনীর জনৈক ঢাকী ছিলেন জাতিতে ফরাসী। তাঁর সংগে মার্সেলিসের জনৈক ব্যবসায়ীর ছিল বন্ধুত্ব। ব্যবসায়ীর নাম রোবোলি। তাঁর সংগে ব্যবস্থা হোল

তিনি গভর্ণরকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করবেন। সমস্ত ব্যবস্থা চুক্তি স্থির হতে এক প্রভাতে ঢাকী নিয়মিত সময়ের আগেই এমন উচ্চ গ্রামে ও জোরদার করে সামরিক বাদ্য বাজনা শুরু করে দিলেন যে সেই কোলাহল মধ্যে রোবেলির সাহায্যে গভর্ণর দুর্গ প্রাচীরের একটি কোণ ধরে বাইরে নেমে গেলেন। প্রাচীর সেখানে খুব উঁচু ছিল না। ঢাকবাদকও বিশেষ তৎপরতার সংগে তাঁদের পেছনে বেরিয়ে গেলেন। তিনজনে মিলে সহরে পোঁছে গেলেন অবিলম্বে। গভর্ণরের প্রত্যাবর্ত্তনে সহর আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। গোয়াতেও নৌকোতে করে লোক পাঠিয়ে খবর দেয়া হোল। ঢাকী ও ব্যবসায়ীটি একই জাহাজে উঠে তারপর গোয়াতে পৌঁছোলেন নিজেদের স্বপক্ষে সুপারিশ পত্রসহ। গোয়াতে এমন বাড়ী ও গীর্জা ছিল না যেখান থেকে তাঁরা পুরস্কার অভিনন্দন পাননি। স্বয়ং ভাইসরয়ও তাঁদের খুব খাতির যত্ন করেন। নিজের জাহাজে তাঁদের দু' জনকে নিয়ে তিনি পর্ত্তুগাল অভিমুখে রওনা হলেন অনতিবিলম্বে। কিন্তু সেই দু'টি ফরাসীসহ ভাইসরয় সে যাত্রায় সলিল সমাধি লাভ করেন।

ডন্‌ফিলিপ্‌ দে মাসকারেগনসের মত আর কোন ভাইসরয় অত ধনবান হয়ে গোয়া ত্যাগ করেন নি। তাঁর ছিল মস্ত বড় এক প্যাকেট হীরক খণ্ড। সবগুলিই ছিল বড় আকারের। এক একটির ওজন দশ থেকে চল্লিশ ক্যারাট পর্য্যন্ত। গোয়াতে তিনি তার দু'টি খণ্ড আমাকে দেখিয়েছিলেন। তার একটি সাতান্ন ক্যারাট ওজনের, দ্বিতীয়টি সাড়ে সাতশট্টি। পাথরগুলি অতি স্বচ্ছ যেন চমৎকার জলের মত। ভারতীয় রীতিতে কেটে গঠন করা। শোনা গিয়েছিল তাঁকে জাহাজে বিষ প্রয়োগ করা হয়। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ভগবানের ন্যায় বিধান আর কি! কারণ তিনি সিংহলে গভর্ণরের পদে বসে বহু লোককে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি সব সময় নিজের সংগে অত্যন্ত উগ্র বিষ রাখতেন। প্রতিশোধ গ্রহণের পালা এলেই সেই বিষ প্রয়োগ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। এই কারণে তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়েছিল। একদিন প্রভাতে গোয়ায় তাঁর কুশপুত্তলিকা ঝোলানো দেখা গেল। এ ঘটনাটি ঘটে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন গোয়াতে ছিলুম তখন।

ইতিমধ্যে ফাদার ইফ্রেমের কারাবাসের সংবাদ ইউরোপ মহাদেশে ভয়ানক চাঞ্চল্যের সঞ্চার করলো। তাঁর ভ্রাতা মঁসিয়ে দেস্ বয়েজ পর্ত্তুগালের

রাজদূতের কাছে অভিযোগ পেশ করলেন। তিনিও অভিযোগ পেয়ে রাজাকে লিখে পাঠালেন যাতে অবশ্যই প্রথম জাহাজে ইফ্রেমের মুক্তির হুকুম তিনি পাঠান। ধর্ম্মগুরু পোপও লিখেছিলেন যে ইফ্রেমের মুক্তির ব্যবস্থা না হলে তিনি গোয়ার সমস্ত যাজকদের গীর্জা থেকে বহিষ্কৃত করবেন। কিন্তু তাতেও কোন সুফল দেখা গেল না।

সুতরাং ফাদার ইফ্রেম্‌কে তখন গোলকুণ্ডার সুলতানের শরণাপন্ন হতে হোল। ফাদারের প্রতি সুলতানের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা প্রীতি। এক সময় তো তিনি ফাদারকে বাগ-নাগরে অবস্থানের জন্যেও পীড়াপীড়ি করেছিলেন। ঐ সময় কর্ণাটের রাজার সংগে সুলতানের যুদ্ধ চলছিল। তাঁর (সুলতান) সৈন্য সামন্তরা তখন সেণ্ট টমাস দুর্গের আশে পাশেই থাকতো। অতএব তিনি সহজেই জেনেছিলেন ফাদারের সংগে পর্ত্তুগীজরা কি জাতীয় হীন আচরণ কচ্ছিলেন। তিনি তখন তাঁর সেনাপতি মীর জুমলাকে হুকুম দিলেন সহরটি অবরোধ করতে। আরও বলে দিলেন গভর্ণর যদি দু' মাসের মধ্যে ফাদারকে অব্যাহতি দানে প্রতিশ্রুত না হন, তাহলে সমস্ত পুড়িয়ে ও তরবারীর আঘাতে ধ্বংস করে দিতে হবে। এই হুকুম নামার একটি অনুলিপি গভর্ণরকেও পাঠানো হয়েছিল। এই সংবাদ শুনে সমস্ত সহর আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। নৌকোর পর নৌকো পূর্ণ করে সহরবাসীরা গোয়া যেতে লাগলো আর ভাইসরয়কে অনুরোধ জানাল ফাদার ইফ্রেমকে মুক্তি দানের জন্যে। তখন ফাদার মুক্তি পেলেন। তবে দ্বার উন্মুক্ত হলেও তিনি বাইরে এলেন না। গোয়ার ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিরা মিছিল করে তাঁকে নিতে এলে তবে আত্মপ্রকাশ করলেন। মুক্তি পেয়ে তিনি পনের দিন ছিলেন কাপুসিন ধর্ম্মাধিষ্ঠানে। আমি ফাদারকে বারবার বলতে শুনেছি যে বন্দীদশায় একটি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছেন। আর তা হোল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচারক ও তার পরামর্শ সভার প্রতিটি সভ্যের অজ্ঞতা। যখনি তাঁদের সংগে কথা হয়েছে বা তাঁরা কোন প্রশ্ন তুলেছেন, তখনি তাঁর ধারনা ও বিশ্বাস হয়েছে যে তাঁদের কেউই ধর্ম্মশাস্ত্র পড়েন নি। এছাড়া তাঁকে রাখা হয়েছিল মালতেস্‌ নামে একটি লোকের সংগে, এক কক্ষে। সেই লোকটি সাংঘাতিক রকমের শপথ করে দু'টি একটি কথা বলতেন। সারা দিনরাত্রির বেশীরভাগ সময় তামাক খেয়ে কাটাতেন। এই ব্যাপার ইফ্রেমের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়েছিল।

ধর্মীয় ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হলে তার জামা পোষাক, জিনিসপত্র সব তল্লাসী করা হয়। জিনিসগুলির বিবরণ ফর্দও থাকে। আসামীর মুক্তির দিনে আবার সব জিনিস তাকে ফেরত দেবার প্রথা। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে সোনারূপা মণিরত্নাদি থাকলে তা বিচারকের কাছে নিয়ে যেতে হয়। তিনি তা দিয়েই বিচারের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ফাদার ইফ্রেমও তল্লাসী থেকে নিস্তার পাননি। তাঁর জামার পকেটে ছিল একটি চিরুণী ও হাড়ের তৈরী দোয়াত একটি ও দু'তিনখানি রুমাল। একটি বিষয়ে তল্লাসী হয়নি। কাপুসীনদের জামার হাতের গোড়ার দিকে ছোট ছোট অন্দর-পকেট থাকে। তাঁরা ফাদারকে চার পাঁচটি কাল সীসার পেন্সিল দিয়েছিলেন রেখে দেবার জন্য। পেন্সিলগুলি কিন্তু তাঁর খুব উপকারে এসেছিল। তাঁর সেই কক্ষ-সঙ্গীটি খুব বেশী তামাক খেতেন। সেই তামাক কাগজে জড়িয়ে ওজন ও বিক্রী হোত। ফাদার ইফ্রেম সেই কাগজগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে তাতে কাল পেন্সিল দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেন। কিন্তু অবিলম্বে চোখের দৃষ্টিও তাঁর চলে গেল। দৃষ্টিশক্তি হারালেন কারাগার কক্ষের ঘোর অন্ধকারের জন্য। ঘরটিতে ছিল একটিমাত্র জানালা। তাও মাত্র এক স্কোয়ার ফুট মাপের; আর লোহাব শিক দিয়ে আবদ্ধ। কখনও কোন মোমবাতির আলোর ব্যবস্থা হয়নি। বই পড়ার একেবারেই কোন সুযোগ ছিলনা। তাঁর প্রতি ব্যবহ: ব্যবস্থা হয়েছিল বিশেষ অপরাধে অভিযুক্ত দুর্ব্বৃত্ত ধরনের লোকদের সঙ্গে যেমন হয়, তেমনটি। তাঁর গায়ের জামায় দু'বার গন্ধক লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। পেটের উপরে আবদ্ধ করে দেয়া হয় সেণ্ট এণ্ড্রুজের একটি ক্রুশকে। যা কিছু ব্যবস্থা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মত।

কুড়িমাস কারাবাস করে ফাদার পনেরদিন কাপুসিন ধর্ম্মাধিষ্ঠানে কাটিয়েছিলেন পুনরায় দৈহিক শক্তি লাভের জন্য। তারপরে তিনি গেলেন মাদ্রাজ পত্তনে। তিনি গোলকুণ্ডা হয়ে গিয়েছিলেন সেখানকার সুলতান ও তাঁর জামাতাকে বিনীত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে। তাঁরা ফাদারের মুক্তি ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল ছিলেন। সুলতান এবারে আবার তাঁকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন বাগ-নাগরে থাকার জন্যে। কিন্তু দেখা গেল তিনি মাদ্রাজ পত্তনের সন্ন্যাসী সংঘে ফিরে যেতে দৃঢ় সংকল্প। তখন তাঁরা তাঁকে পূর্ব্বকার মত একটি বলদ, দু'টি ভৃত্য এবং কিছু টাকা দিলেন তাঁর যাত্রা পথকে সুগম করার জন্যে।

অধ্যায় ষোল

কোচিনের মধ্য দিয়ে গোয়া থেকে মসলীপত্তনের রাস্তা। ওলন্দাজগণ কর্তৃক কোচিন অধিকারের বিবরণ।

পর্তুগীজরা যখন ওলন্দাজদের হাতে সিংহলের সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, তখন তাঁদের নজর পড়লো কোচিনের উপর। এই জায়গাটিতে কৃত্রিম দারুচিনি জন্মায়। এজন্যে সিংহলের দারুচিনির চাহিদা কম। ব্যবসায়ীরা দেখছেন যে ওলন্দাজগণ সিংহলের দারুচিনিকে মহার্ঘ্য করে রেখেছেন। সুতরাং তাঁরা কোচিনের দারুচিনি সস্তা দেখে তাই কেনেন। আর নানাদিকের চাহিদায় তাঁরা তা রপ্তানী করেন গোমরুণে। সেখান থেকে বিলি বিক্রয় হয় পারস্য, তার্তারী, মাস্কাভি, জর্জিয়া, মিনগ্রেলিয়া ও কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তীস্থান থেকে আগত ব্যবসায়ীদের কাছে। এ জিনিস আরও প্রচুর রপ্তানী হোত বালসারা ও বাগদাদের বণিকদের দ্বারা। তাঁরা আবার পাঠাতেন আরবদেশে। আরও নিয়ে যেতেন মেসোপটেমিয়া, আনাতোলিয়া, কন্সটান্টিনোপল্, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী এবং পোলাণ্ডের ব্যবসায়ীগণ। এইসব দেশের অধিবাসীরা দারুচিনিকে আস্ত খণ্ডরূপে বা পিষে ব্যবহার করতেন তাঁদের মাংস খাদ্যে। আর তা করতেন মাংসকে সুস্বাদু করার জন্যেই।

কোচিন অবরোধের জন্য ব্যাটাভিয়া থেকে সৈন্য এসেছিল। তারা এসে নেমেছিলেন বেপুর নামক একটি স্থানে। সেখানে তালবৃক্ষ রচিত ওলন্দাজদের একটি কেল্লা ছিল। ওটি ছিল কান্নানুর নামে একটি ছোট সহরের কাছে। এক বছর আগে জায়গাটি ওলন্দাজদের অধিকারে যায়। তখন অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা কোচিন দখল করতে পারেন নি। সৈন্যবাহিনী ওখানে নেমেই সহরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন। সহরের একদিকে ছিল একটি নদী। সৈন্যরা নদীর কাছেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ওলন্দাজরা ভে-পাইন নামে একটি জায়গায় শিবির স্থাপন করেন। বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং আবহাওয়া পরিবেশ অনুকূল দেখে তারা কয়েকটি কামান বসালেন ওখানে। দূরত্বটা বেশী থাকায় সহরবাসীরা বিশেষ ভীত ও চঞ্চল হননি। আরও লোক লস্কর সংগৃহীত

না হওয়া পর্য্যন্ত ওলন্দাজরা ওখানেই অপেক্ষমান ছিলেন। সেনাধ্যক্ষ অত্যন্ত সাহসী হলেও লোকবল উল্লেখযোগ্য ছিলনা। সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার।

কয়েকদিন পরে অ্যাম্বোয়িনার (দ্বীপ) গভর্ণর আরও দু'খানি জাহাজ নিয়ে এসে হাজির হন। তারপর জনৈক ডাচ সেনাপতি নিয়ে এলেন বহু-সংখ্যক সিংহলীকে। ওলন্দাজ সৈন্যদের চেয়ে সিংহলীরা সংখ্যায় ছিল বেশী। এদেশীয় লোকেদের নিযুক্ত না করলে ইউরোপ থেকে আগত সৈন্য দ্বারা কাজ চলতো না। সিংহলীরা পরিখা খনন ও কামান উত্তোলনে সুপটু। তবে আক্রমণাত্মক কার্য্যে একেবারেই অযোগ্য। অ্যাম্বোয়িনার লোকেরা কিন্তু সৈনিকের কাজে বিশেষ উপযুক্ত। এদের চার'শ লোককে রেখে আসা হয়েছিল ভে-পাইন নামক জায়গাতে। তারাও শেষে জাহাজে করে কোচিনের কাছে এসেই নামলো। সেজায়গাটি সেন্ট এণ্ড্রুজের নামে উৎসর্গিত গীর্জা থেকে বেশীদূরে ছিলনা।

ওখানে কিছু সংখ্যক পর্ত্তুগীজ মালোবারীদের সংগে নিয়ে অবস্থানরত ছিলেন, এই আশংকায় যে ওলন্দাজরা হয়ত ওদিকে এগিয়ে আছেন। কিন্তু তাঁরা দেখলেন যে শত্রুপক্ষ বেশ দৃঢ়তার সংগেই তীরে নামছেন। তখন দু' একটি গুলী ছুঁড়েই তাঁরা পিছু হটলেন। ওলন্দাজরাও আগে থেকে সমুদ্রতীরে কিছু পর্ত্তুগীজ.কে দেখেছিলেন; আরও কিছুদূরে সেন্টজন গীর্জাতেও কিছু সংখ্যক ছিলেন। তখন তাঁরা কয়েকজন অশ্বারোহীকে পাঠালেন পর্ত্তুগীজদের সংখ্যা কত তা জানার জন্যে। কিন্তু পর্ত্তুগীজরা গীর্জাটিতে (সেন্টজন) অগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। ওলন্দাজরাও সহরের দিকে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তারপর কিছু সময় তাঁরা সহরটিকে অবরোধ করে রাখলেন। ঐ সময়ে জনৈক বেতনভুক ফরাসী সৈন্য দেখলেন দুর্গ প্রাচীরের বাইরে একটি দড়ির মাথায় পতাকার মত কি ঝুলছে। ফরাসী সৈন্যটির কানের পাশ দিয়ে তখন গুলী ছুটে যাচ্ছিল। তিনি তা অগ্রাহ্য করে দেখতে চাইলেন জিনিসটি কি। কিন্তু যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ের সীমা ছিলনা। দেখলেন একটি নিস্তেজ শিশুদেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মা তাকে ঐভাবে রেখে গিয়েছেন যাতে শিশুটি ক্ষুধায় মৃত্যু বরণ করছে তা দেখতে না হয়। সৈন্যটি দয়াপরবশ হয়ে শিশুটিকে খাদ্য এনে খাওয়ালেন। ওদিকে ওলন্দাজ সেনাপতি ব্যাপারটা জানতে পেরে

ফরাসী সৈনিককে বললেন শিশুটিকে মেরে ফেলার অবকাশ দিতে হবে। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কিত মন্ত্রণা সভা আহুত হোল। সেখানে অত্যন্ত নিষ্ঠুর সৈন্যটিকে আক্রমণ করারও ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু পরামর্শ সমিতি শাস্তি কিছু শিথিল করে তাঁকেও দড়িতে বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছিল।

সেই দিনটিতেই প্রতিবাহিনী থেকে দশজন করে সৈন্যকে আদেশ দেয়া হোল কোচিনের রাজার গৃহে যেতে। কিন্তু তারা গিয়ে দেখলেন, গৃহ শূন্য, কেউ কোথাও নেই। এক বছর পূর্ব্বেই গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়েই ওলন্দাজরা ঐ দেশের চারজন রাজা ও ছয়শত কৃষ্ণাঙ্গ-লোককে হত্যা করেছিলেন। কারো জীবন রক্ষা পায়নি। কেবল একজন প্রবীণা রাণী তাঁদের হাতে পড়েননি। বান্‌রেজ নামে সাধারণ একজন সৈন্য তাঁকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন। সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক তৎক্ষণাৎ তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ দলপতি পদে উন্নীত করেন। একদল সৈন্যকে সেই গৃহে রাখা হয়েছিল কিন্তু রাণী সেখানে ছিলেন মাত্র ছয়দিন। কারণ তাঁরা তাঁকে উপকূল ভাগের সাধারণ রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী জামোরিণের হেফাজতে রেখে দিয়েছিলেন। ওলন্দাজরা তাঁকে (রাণী) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যদি তাঁরা কোচিন অধিকার করতে পারেন আর তিনি যদি তাঁদের (ওলন্দাজ) প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন তাহলে তাঁরা তাঁকে কান্নানুর সহরটি প্রদান করবেন।

ছয় সপ্তাহের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তার মধ্যে ওলন্দাজরা এক রাতে সহরটি বিধ্বস্ত করতে গিয়ে প্রতিহত হন এবং বহুলোক হতাহত ও বন্দীরূপে আটক হয়েছিল। এ ঘটনার মূলে কান্নানুরের গভর্ণরের ত্রুটী। তিনি পানোন্মত্ত অবস্থায় আক্রমণের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। দু'মাস পড়ে ওলন্দাজ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক আবার আক্রমণ চালাবার সংকল্প করেন। এদিকে মানুষ সংগ্রহ করতে না পেরে বে-পাইনের দিকে যারা ছিলেন তাদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রণপোত বালির চড়ায় ধাক্কা খেয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়! তার ফলে প্রচুর সৈন্য জলমগ্ন হয়েছিল। তাদের কয়েকজন সাঁতার কেটে প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে উঠলেন কোচিন উপকূলে। সকলেই বন্দী হলেন পর্ত্তুগীজদের হাতে। তবে সংখ্যায় তারা দশের বেশী ছিলেন না। সেনানায়ক কিন্তু আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন নি। শেষ পর্য্যন্ত নাবিকদের সকলকে তীরে নামিয়ে তাঁদের হাতে দিলেন ছোট ছোট

তলোয়ার, বল্লম ইত্যাদি। অবশেষে বেলা দশটায় দেড়শ আন্দাজ লোকের কয়েকটি বাহিনী নিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। এই যুদ্ধে ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ দুই পক্ষেরই প্রচুর লোক নিহত হয়েছিল। পর্ত্তুগীজরা সে আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন খুব সাহসিকতার সংগে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। পরে আরও দু'শত সৈন্য এসে পর্ত্তুগীজদের পেছনে এসে দাঁড়াল। তারা কিন্তু জাতিতে ছিল ওলন্দাজ। এর কারণ কি? পর্ত্তুগীজদের কেন তারা সাহায্য করতে এল? কারণ হোল, তুমান নামে (যাভার একটি স্থান) একটি জায়গা বেদখল হওয়ার জন্য তাদের স্বদেশীয়রা ছয় মাসের বেতন তাদের দেননি। এই নবাগত ওলন্দাজদের সহায়তা ব্যতীত সহরটি কখনই দু'মাস অধিকারে রাখা সম্ভব হোত না। বিদেশী এই সৈন্যদলে একজন সুদক্ষ শ্রেষ্ঠ এঞ্জিনিয়র ছিলেন। তিনিও স্বদেশবাসীদের কুব্যবহারের ফলে নিজদল ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন।

অবশেষে ওলন্দাজগণ সহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন কালভেটির দিক ধরে। তাঁরা প্রধান দুর্গটি অধিকার করেছিলেন। তখন পর্ত্তুগীজরা সর্ত্তাধীনে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। সহরটি তখন পুরোপুরি শত্রুর অধিকারে চলে গেল। চুক্তি অনুসারে পর্ত্তুগীজরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র নিয়ে কোচিন ছেড়ে চলে গেলেন সহরের বাইরে। সেখানে পৌঁছোতেই ওলন্দাজগণ সদলে এসে তাঁদের সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। আর তাঁদের সকলকে ওলন্দাজ সেনানায়কের পদতলে নতি স্বীকার করতে হয়। কেবলমাত্র উচ্চপর্য্যায়ের সামরিক ব্যক্তিদেরই তলোয়ার সংগে রাখার অনুমতি ছিল। ওলন্দাজ সেনাপতি সৈন্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের সহরটি লুট করার সুযোগ দেয়া হবে। কিন্তু নানা ন্যায় সংগত কারণে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। তার বদলে তিনি সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন অতিরিক্ত দেয়া হবে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সেই টাকা থেকে জনপিছু আট টাকা কম মঞ্জুর হয়েছিল। জামোরিনও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কান্নানুর সহরটির অধিকার দাবী করলেন। সেনাপতি কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সহরের সমস্ত দুর্গকে দুর্ব্বল ও লুটপাট করে যখন জামোরিনকে দেয়া হোল তখন ওখানে ছিল কেবলমাত্র কয়েকটি শূন্য দেয়াল। সেনানায়ক কাজটি যেভাবে করেছিলেন তা অত্যন্ত হীন ধরণের। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অতি

নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরোচিত স্বভাবের। একসময় তিনি সেই দুর্গে সৈন্যদের আবদ্ধ রেখেছিলেন এক নাগাড়ে আটদিন। অথচ তাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্যে কোন অর্থ কড়ির ব্যবস্থা ছিল না। তখন সৈন্যদের মধ্যে দু'জন কি করে একটি গাভীর খোঁজ পেয়ে সেটিকে হত্যা করেন। কিন্তু সে খবর অবিলম্বে তাঁর কর্ণগোচর হতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের একজনাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় জনকে ধাতুর তৈরী দস্তানা পরিয়ে রাখার নির্দ্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে পোর্সার (পোরকাদ) রাজার মধ্যস্থতায় দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তখনকার মত রেহাই পান।

পোর্সার শাসক ছিলেন সামান্য একজন রাজা। তাঁর সংগে তখন জেনারেলের সন্ধিসূত্র রচনার কাজ চলছিল। অবশেষে সন্ধির সর্ত্ত স্থির হোল। জেনারেল তখন তাঁর স্থল ও নৌবাহিনীর সমস্ত লোক লস্করকে এনে জড় করলেন। সংখ্যায় ছিল তাঁরা প্রায় ছয় হাজার। তার কয়েকদিন পরে তিনি কিছু সৈন্য পাঠালেন কান্নানুর সহর দখল করার জন্যে। বিনা বাধায় সহরবাসীরা আত্মসমর্পণ করলেন। সৈন্যরা ফিরে এলে জেনারেল কোচিনের নতুন রাজার জন্যে একটি মুকুট তৈরী করতে দিলেন। প্রাক্তন শাসক (রাজা) রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হলেন। ভাবগম্ভীর অভিষেক ক্রিয়ার জন্য একটি পবিত্র দিন স্থির হয়েছিল। সেই দিনটিতে স্বয়ং জেনারেল সিংহাসন জাতীয় একটি আসনে উপবিষ্ট হলেন। তাঁর পায়ের নীচে দু'পাশে তিনজন করে ক্যাপ্টেন। তাদের মাঝখানে জনৈক মালাবারী জলদস্যু জেনারেলের হাটুতে মাথা রেখে তাঁর হাত থেকে মুকুটটি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকলো। তারপর মুকুট গ্রহণ করে একটি ছোট রাজ্যকে যেন শ্রদ্ধা নিবেদন করলো। রাজ্যটি কোচিন সহর ও তার সংলগ্ন অঞ্চল। রাজ্যটি অতি ক্ষুদ্র। যিনি রাজা হলেন আর যিনি তাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করলেন উভয়েই সমান। এ জাতীয় ঘটনা বা দৃশ্য যে প্রীতিকর নয়—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। জনৈক ওলন্দাজ, যিনি ছিলেন একদা কোন জাহাজের রসুইকার মাত্র, যার হাত দু'টি সর্ব্বদাই তরবারীর পরিবর্ত্তে হাতাচামচ নাড়া চাড়া করতো, তিনি আজ এক হীন প্রকৃতির জলদস্যুকে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে যে জাহাজগুলি কোচিনের অধিবাসীদের নিয়ে গোয়াতে যাচ্ছিল তা সব ফিরে এল সেই হতভাগ্য বিপন্ন লোকদের কাছ থেকে জিনিসপত্র সব কেড়ে নিয়ে। স্ত্রী পুরুষ কেউ-ই বাদ পড়েনি। সকলেরই সব লুট পাঠ হয়েছিল, শ্লীলতা হানিও ঘটেছিল।

পরে জেনারেল ফিরে গেলেন ব্যাটাভিয়াতে। সেখান থেকে কোচিনে একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হলেন। তিনি এসে সহরটিকে ধূলিসাৎ করে আবার সুদৃঢ় করে গড়ে তুললেন। এই নতুন শাসনকর্ত্তা (গভর্ণর) শাসন ব্যাপারে কল্পনাতীত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। সৈন্যদের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি চলেছিল। সৈন্যদের এমনভাবে সহরের মধ্যে রেখেছিলেন যেন তারা বন্দীশালায় আবদ্ধ রয়েছেন। কোন মাদক—যেমন সুরা বা তাড়ি, কিম্বা কোন প্রকার কড়া পানীয় তাদের দেয়া হোত না। তাছাড়া পানীয় ব্যাপারে তাদের উপরে তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক ধার্য্য করেন। কোচিন যখন পর্ত্তুগীজদের অধীনে ছিল তখন একজন লোক পাঁচ ছয় সাউ (ফরাসী মুদ্রা) দ্বারা ভালভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে পারতেন। কিন্তু ওলন্দাজগণের আমলে তা দশ সাউ এর কমে নির্ব্বাহ হয়নি। এই গভর্ণর এত কঠোর ও নিষ্ঠুর ছিলেন যে সাধারণ ব্যাপারে সামান্যতম অন্যায় অপরাধের জন্যেও তিনি যে কোন লোককে সিংহলদ্বীপে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানে সেই নির্ব্বাসিত ব্যক্তিকে ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় বছর ইট তৈরী করতে হোত। কারোর হয়ত যাবজ্জীবনই ঐকাজ করে কাটাতে হোত। অনেক সময় এক বছরের জন্যে শাস্তি হয়ে সিংহলে পাঠানো হোল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার আর এ জীবনে মুক্তি হোলনা।

অধ্যায় সতের

সমুদ্রপথে অর্মাস থেকে মসলীপত্তন।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে আমি গোমরুণ থেকে রওনা হলাম মসলীপত্তন অভিমুখে। যাত্রাটি শুরু হয়েছিল গোলকুণ্ডা সুলতানের বিরাট এক জাহাজে করে। জাহাজটি প্রতি বছরই পারস্য থেকে যাত্রা করতো সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্র, ছিট কাপড়, পেন্সিল দিয়ে সুচিত্রিত কাপড় ইত্যাদি নিয়ে। পেন্সিলে নক্সা করা কাপড়গুলি ছাপানো কাপড়ের চেয়ে বেশী সুন্দর ও মূল্যবান। ভারতের রাজা মহারাজা বা কোন সুলতানের জাহাজে ওলন্দাজ কোম্পানী একজন করে কাপ্তেন ও দু'তিন জন গোলন্দাজ সৈন্য সরবরাহ করতেন। কারণ ভারতীয় ও পারসীকরা কেউই নৌচালনায় সুদক্ষ নন। আমি যে জাহাজে আরোহী ছিলাম তাতে বেশী হলে ছয় জন ওলন্দাজ ছিলেন; কিন্তু দেশীয় লোকের সংখ্যা শতাধিক। পারস্য উপসাগর অতিক্রমকালে আমরা বেশ একটি মনোরম ও অনুকূল বায়ু প্রবাহের মধ্যে দিয়ে এসেছি। কিছু ঝোড়ো হাওয়াও চলছিল। পরে দেখা গেল সমুদ্র অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও ঝটিকা সংকুল হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বাতাস ক্রমশঃ এত প্রবল হোল যে আমরা পুরোদমে চেষ্টা চালিয়েও বেশীদূর অগ্রসর হতে পারিনি। পরের দু'টি দিন বাতাসের চাপ আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। সমুদ্র যেন ক্ষিপ্ত রূপ ধারণ করেছিল। ফলে ষোল ডিগ্রীতে অর্থাৎ গোয়ার উচ্চতা তুল্য স্থানে বৃষ্টি ও বজ্র বিদ্যুৎ মিলে ঝড় তুফানকে তুললো আরও ভয়ংকর করে। এই অবস্থায় আমরা কেবল উপরকার পালটি তুলে, তাও অর্দ্ধনমিত অবস্থায় এগোতে লাগলাম। অন্য আর কোন পাল খাটানো সম্ভব হয়নি। এইভাবে আমরা মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করলাম। দূর থেকে দ্বীপগুলিকে স্পষ্ট দেখতেও পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে জাহাজের খোলে প্রচুর জলও জমে গিয়েছিল। জাহাজটি পাঁচ মাস গোমরুণের রাস্তায় আটকে পড়েছিল। সেখানে নাবিকরা যদি বিশেষ সতর্ক হয়ে জলের ঠিক উপরকার তক্তাগুলিকে ধুয়ে না দিত তাহলে সেগুলি ফেটে চিঁড়ে আরও ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যেত। ঐভাবে বেশীদিন জলের উপরে থাকায় জাহাজের নীচে ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। জল বোঝাই হতে তবে তা

ধরা পড়েছিল। এজন্যেই ওলন্দাজগণ প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় জাহাজের বাইরের পাটকে ধোয়া মোছা করেন।

আমাদের জাহাজে ঘোড়া ছিল পঞ্চান্নটি। এই অশ্বগুলি পারস্যের সম্রাট উপহার পাঠিয়েছিলেন গোলকুণ্ডার সুলতানকে। এছাড়া জাহাজে আরও উঠেছিলেন পারসীক ও আর্মেনীয় মিলে প্রায় একশ' ব্যবসায়ী। তাঁরা সকলেই ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতেন। পুরো একদিন ও একরাত্রি ধরে চললো ঘূর্ণিবাত্যার প্রবাহ; আর তা কি প্রচণ্ড গতিতে। জলের ঢেউ জাহাজের পেছন দিক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ওঠা নামা করতে লাগলো। ক্ষতি হোল এমন যে আমাদের জাহাজের পাম্পটি গেল অকেজো হয়ে। ভাগ্যক্রমে জাহাজে এমন একজন ব্যবসায়ী ছিলেন যার সংগে ছিল দুই গাঁট রুশীয় চামড়া। এছাড়া আরও চার পাঁচ জন জীনকার। চামড়া সেলাইএর রীতিনীতি এদের জানা ছিল। এরা গোটা জাহাজটি ও এতগুলি প্রাণ রক্ষার সহায়ক হলেন। চামড়া দিয়ে তারা বড় বড় বালতির মত তৈরী করলেন। চার খণ্ড চামড়া জুড়ে হোল এক একটি বাল্তি। মাস্তুলের দিক থেকে কপি কলের সাহায্যে বালতিগুলি নামিয়ে দেয়া হোল ডেকের মধ্যে বিশেষভাবে কাটা গর্ত্ত দিয়ে। সেই বালতি দিয়ে প্রচুর জল তুলে ফেলা হোল। ঐ দিনটিতেও ঝড়ের বেগ সমানই ছিল। জাহাজের উপরে তিনটি বজ্রপাত হোল। প্রথমটি পাল খাটানোর আড় কাঠের উপরে পড়ে সেটিকে দু' খণ্ড করে দিল। তারপর জাহাজের ডেকের উপরে ছুটে গিয়ে তিন ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটায়। দু' ঘণ্টা পরে আবার আর একটি বজ্রপাত। তার ফলে প্রাণ বিয়োগ হয় দু'টি লোকের। মনে হোল কেউ যেন গুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে হত্যা করছে। কিছু পরেই তৃতীয় বজ্রের পতন। পোতাধ্যক্ষ, তাঁর সংগী সহকারী এবং আমি, এই তিন জনে মিলে মাস্তুলের কাছেই ছিলুম দাঁড়িয়ে। ঐ সময় রসুইকার পোতাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন যে তিনি খাদ্য গ্রহণ করবেন কিনা। বজ্রটি সেই বাবুর্চির পেটের নীচের দিক বিদ্ধ করে ছোট একটি গর্ত্ত মত করে দিল। তাঁর মাথার চুল সব গেল উড়ে। মাথাটির চেহারা হোল ঠিক একটি শূকর ছানাকে গরম জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম। এছাড়া রসুইকারের আর কিছু ক্ষতি হয় নি। যখন তার পেটের ক্ষতস্থানে নারকেল তেল মাখানো হয় তখন সে ব্যথায় চীৎকার করে উঠেছিল। পরে অবশ্য সহ্য হয়ে গিয়েছিল।

জুন মাসের ২৪ তারিখে আমরা স্থলভাগের সন্ধান পেলাম। তারপর সেদিকে এগিয়ে আমরা পন্টি দে গেলির কাছে পৌঁছে যাই। ওটি সিংহল দ্বীপের শ্রেষ্ঠ একটি সহর। ওলন্দাজগণ পর্তুগীজদের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি দখল করে নেয়। ওখান থেকে মসলীপত্তন অবধি আমরা বেশ ভাল আবহাওয়া পেয়েছিলুম। মসলীপত্তনে পৌঁছোই আমরা ২রা জুলাই এবং তা সূর্য্যাস্তের দু' এক ঘন্টা পরে। সেখানে আমি তীরবর্ত্তী হতেই ওলন্দাজ প্রেসিডেন্ট আমার প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন। অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং ইংরেজদের কাছ থেকেও পেয়েছি অনুরূপ সদ্ব্যবহার।

১৮ কি ১৯শে জুন তারিখে সিয়ের দু দর্দিন ও আমি দু' খানি পালকী ও ছয়টি বলীবর্দ কিনে নিলাম আমাদের ভৃত্যগণকে ও মালপত্র বহন করার জন্যে। আমাদের মতলব ছিল সরাসরি গোলকুণ্ডায় যাবার। উদ্দেশ্য ছিল, সেখানকার সুলতানের কাছে একটি লম্বা মুক্তার মালা বিক্রয় করা। সবচেয়ে ছোট মুক্তাটির ওজন ছিল চৌত্রিশ ক্যারাট; আর বৃহত্তমটির ওজন পঁয়ত্রিশ ক্যারাট। ঐ সংগে আরও ছিল নানা রকম সব মণিরত্ন। তবে বেশী ছিল মরকত মণি। ওলন্দাজরা আমাদের বললেন যে তখন গোলকুণ্ডায় গিয়ে কোন লাভ হবে না। কারণ সুলতানের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি মীর জুমলা যতক্ষণ জিনিসগুলি পরখ করে না দেখবেন ততক্ষণ তিনি কোন দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বস্তু ক্রয় করবেন না। অথচ মীর জুমলা তখন রাজধানীতে অনুপস্থিত। তিনি ঐ সময়ে কর্ণাট প্রদেশের গান্ধী কোটা অবরোধে ব্যস্ত। আমরা তখন স্থির করলাম সেখানেই তাঁর কাছে যাবো।

অধ্যায় আঠারো

মসলীপত্তন থেকে কর্ণাটের একটি সহর ও সৈন্যাবাস এবং গান্ধীকোটা পর্য্যন্ত রাস্তা। মীর জুমলা ও গ্রন্থকারের মধ্যে আদান প্রদান। হাতী সম্বন্ধে আলোচনা।

মসলীপত্তন থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি ২০শে জুন সন্ধ্যার দিকে। পরদিন ২১শে তারিখে তিন লীগ রাস্তা চলার পর আমরা যাত্রা বিরতি করেছিলুম নীরুমুলু নামে একটি গ্রামে।

২২শে তারিখে ছয় লীগ রাস্তা অতিক্রান্ত হলে আমরা উয়ুরু নামে আর একটি গ্রামে পোঁছোই। সেখানে পোঁছোবার আগে একটি ভাসমান সেতুর উপর দিয়ে একটি নদী পার হতে হয়।

২৩শে ছয় ঘন্টা চলার পরে আমরা একটি শোচনীয় অবস্থার গ্রাম পটমাতায় এসে গেলাম। বৃষ্টির জন্য ওখানে আমাদের তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

২৭শে পোঁছোলাম বেজওয়াদা নামে একটি বড় গ্রামে। দেড় লীগের বেশী রাস্তা সেখানে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ রাস্তা ছিল জলমগ্ন। চার দি সেখানে কাটাতে বাধ্য হই। ওখানে একটি নদী পার হতে হয়। কিন্তু অত্যধিক বারিপাতের ফলে নদী এত স্ফীত হয়েছিল যে খেয়া মাঝিরা প্রবল স্রোতে নৌকো চালাতে রাজী হয়নি। পারস্যাধিপতি গোলকুণ্ডার সুলতানের জন্য যে অশ্বরাজি পাঠিয়েছিলেন সেগুলিকে আমরা ওখানে রেখে দিলুম। ইতিমধ্যে তাদের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছিল পঞ্চাশে।

বেজওয়াদায় থাকাকালে আমরা কয়েকটি মন্দির দেখতে যাই। জায়গাটি পুরোপুরি মন্দিরময়। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা ওখানে মন্দিরের সংখ্যা অনেকবেশী। সহরগুলির শাসনকর্ত্তা ও তাঁদের পরিবার পরিজন ব্যতীত ওখানকার বাকী অধিবাসীরা পৌত্তলিক হিন্দু। বেজওয়াদার মন্দিরটি অতি সুবৃহৎ, তবে প্রাচীর বেষ্টিত নয়। মন্দিরে বিশ ফুট উঁচু বাহান্নটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ সারির উপরে খণ্ড খণ্ড পাথরে গড়া একটি সমতল ছাদ। স্তম্ভগুলির দেহ-যষ্টি অলঙ্কৃত হয়েছে কতকগুলি কুৎসিত আকারের দৈত্য দানবের মূর্ত্তি দ্বারা। আরও নানা রকম জীবজন্তুর মূর্ত্তিও

খোদিত আছে। কতকগুলি দৈত্য দানবের আকৃতি চতুশৃঙ্গ বিশিষ্ট। আর কিছু আছে বহুপদ ও লাঙ্গুল যুক্ত। কতকগুলির জিহ্বা বাইরে ঝোলানো। অনেক মূর্ত্তির ভাবভঙ্গী ও অঙ্গ সংস্থান হাস্যকর। ছাদের পাথরেও এই জাতীয় মূর্ত্তি খোদিত। স্তম্ভরাজির ফাঁকে ফাঁকে পাদপীঠের উপরে দাঁড়ান আছে হিন্দুদের দেবমূর্ত্তির বহর। মন্দিরটি একটি প্রাঙ্গনের মধ্যভাগে অবস্থিত। স্থানটি লম্বায় বড়, চওড়া কম। চারদিকে দেয়াল ঘেরা। দেয়ালের ভেতরে বাইরে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্করণ আর তা মন্দিরের গায়ে যেমন, ঠিক সেই রকম। তাছাড়া আরও আছে ছেষট্টিটি স্তম্ভের উপরে ন্যস্ত একটি গ্যালারী বা বারান্দার মত। সেটি গোটা দেয়ালকে ঘিরে রয়েছে এবং দেখতে অনেকটা খিলানাবৃত রাস্তার মত। প্রাঙ্গনে প্রবেশ করার জন্যে আছে প্রশস্ত দ্বারপথ। তার উপরে একটির উপরে আর একটি অর্থাৎ দু'টি কুলুঙ্গি। প্রথমটি ভর করে আছে বারটি স্তম্ভে, দ্বিতীয় আটটি স্তম্ভের উপরে। মন্দিরের স্তম্ভ সারির নীচের দিকে কিছু প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর মালা উৎকীর্ণ। হিন্দু পুরোহিতরাও কচ্চিৎ কখনও তার অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারেন।

আর একটি মন্দির দেখেছিলুম একটি পাহাড়ের উপর। সেখানে ওঠার জন্যে একটি সিঁড়ি আছে একশ' তিরানব্বইটি ধাপের। প্রতিটি ধাপের উচ্চতা এক ফুট। মন্দিরটি চতুষ্কোণ আকারের। মাথায় গোলাকার শিরোভূষণ চূড়া। বেজওয়াদার মন্দিরের মত এখানেও দেয়ালের চারদিক ঘিরে মূর্ত্তি খোদিত। মধ্যস্থলে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্ত্তি রয়েছে ঠিক দেশীয় পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। মূর্ত্তিখানি প্রায় চার ফুট উঁচু। তার মাথায় ত্রিস্তর বিশিষ্ট চূড়া। তার থেকে চারটি শৃঙ্গ বাইরে বিস্তৃত। তাতে আবার একটি মানুষের মুখ খোদিত। সেটি পূবমুখো। যে সকল তীর্থযাত্রীরা ভক্তি নম্রচিত্তে এই মন্দিরে আসেন তাঁরা ওখানে প্রবেশের সময় অঞ্জলিবদ্ধ হাত দু'খানি কপালে ঠেকাতে থাকেন। যত মূর্ত্তির দিকে এগোতে থাকেন হাত দু'খানি আরও দৃঢ় বদ্ধ ক'রে বার বার 'রাম, রাম' ধ্বনি করেন। অর্থাৎ হে ভগবান, হে ভগবান,। মূর্ত্তির কাছাকাছি হলে মাথার দিকে-ঝোলানো ঘন্টাটিকে তাঁরা নেড়ে দেন। আর নানা রং দিয়ে নিজেদের মুখ ও দেহ মণ্ডিত করেন। অনেকে আবার সংগে আনেন তেল ভর্ত্তি করে শিশি বোতল। সেই তেল তাঁরা মূর্ত্তির গায়ে মাখিয়ে দেন। এছাড়া নানা

খাদ্য বস্তু যেমন, চিনি তেল ইত্যাদি দেবতাকে দান করেন অর্ঘ্যস্বরূপ। ধনী লোকেরা তার সংগে রূপাও দান করেন। দেবমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত ষাটজন পুরোহিত তাঁদের স্ত্রীপুত্রসহ জীবিকা নির্ব্বাহ করেন মন্দিরে প্রদত্ত অর্ঘ্য বস্তু ও অর্থের উপর নির্ভর করেই। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের ধারণা যে দেবমূর্ত্তিই সব গ্রহণ করেন। পুরোহিত সব জিনিসই দু'দিন প্রতিমার সামনে রাখেন। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সরিয়ে নেন। কোন যাত্রী কোন রুগ্ন পীড়িত লোকের নিরাময় উদ্দেশ্যে মন্দিরে গেলে সেই রোগীর পুত্তলিকা নিয়ে যান নিজ শক্তি অনুযায়ী সোনা, রূপা বা তামা দিয়ে তৈরী করিয়ে। সেই ধাতু তিনি দেবতাকেই অর্ঘ্যদান করেন। অর্ঘ্যদানের পরে স্তোত্র বন্দনা গান শুরু হয়।

মন্দিরের দ্বার পথের সামনেই ষোলটি স্তম্ভের উপরে একটি সমতল ছাদ। তার ঠিক ডানদিকে আর একটি ছাদ ভর করে আছে আটটি স্তম্ভ দেহে। এটি পুরোহিতের রান্না ঘর। দক্ষিণ দিকে রয়েছে পাহাড় কেটে গড়া বিরাট একটি পাটাতন মত। জায়গাটি চমৎকার সব গাছপালার মনোরম ছায়ায় ঘেরা। কাছেই আছে কয়েকটি কুঁয়ো। এই মন্দিরে দূর দূরান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীর ভিড় জমে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা দরিদ্র, পুরোহিতরা তাঁদের সাহায্য করেন ধনীদের কাছ থে' ̄ প্রাপ্ত বস্তু ও অর্থ দ্বারা। ধনীরাও ওখানে আসেন শ্রদ্ধাভক্তি সহকারেই। মন্দিরের শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন পড়ে অক্টোবর মাসে। সে সময় দেশের সব অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক এসে জড় হয় ওখানে। আমরা যখন ওখানে ছিলুম তখন একটি মহিলা তি¯দিন মন্দিরের ভিতরে কাটিয়েছেন একদম বের হননি। তাঁর প্রার্থনা ছিল স্বামী বিয়োগের পরে কি করে তিনি শিশু সন্তানদের মানুষ করবেন তার উপায় জানা। একজন পুরোহিতকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম যে ভদ্রমহিলা দেবতার কাছ থেকে কোন উত্তর পেলেন কিনা। পুরোহিত বললেন, স্ত্রীলোকটিকে দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্যে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তারপর তিনি আকাঙ্ক্ষিত উত্তর নির্দেশ পাবেন। একথা শুনে আমার মনে হোল, কিছু প্রতারণা মূলক ব্যাপার আছে। আর তা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আমি মন্দিরের মধ্যে যাবার সংকল্প করলাম। পুরোহিতরা সকলেই তখন খাদ্য গ্রহণের জন্যে চলে গিয়েছেন। একজন মাত্র ছিলেন দরজার কাছে দাঁড়ান। আমি তাঁকে কিছু দূরে ঝরণা থেকে জল আনার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম। সেই অবকাশে আমি মন্দিরের

মধ্যে চলে গেলাম। আমার সাড়া পেয়ে স্ত্রীলোকটি দ্বিগুণ জোরে কান্না শুরু করে দিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোন আলোর বালাই ছিল না। মহিলাটি কেবল উপলব্ধি করেছিলেন যে কেউ একজন ওখানে গিয়েছেন। অন্ধকার ছিল অত্যন্ত গভীর। আমিও যে দেবমূর্ত্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তা বেশ বুঝতে পাচ্ছিলাম। ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোতে দেখলাম মূর্ত্তিটির পেছনে দেয়ালে একটি ছিদ্র আছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়িতে ওটিকে খুব ভাল করে দেখে নিতে পারিনি। ইতিমধ্যে পুরোহিত ফিরে এলেন। আর আমাকে ওখানে দেখে মন্দির অপবিত্র করার জন্যে অভিশাপ দিতে লাগলেন। আমার মন্দিরে প্রবেশের কাজটা ওঁদের মতে অতি 'অপবিত্র'। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে আমরা দু'জনে বন্ধু হয়ে গেলাম। আর তা সম্ভব হয়েছিল পুরোহিতের হাতে আমি দু'টি টাকা গুঁজে দিতে। তারপর তিনি তাঁর পানের কৌটো থেকে আমাকে কিছু পান উপহার দিলেন।

বেজওয়াদা ছেড়ে যাত্রা করলুম ৩১শে তারিখে। খনি বা কোলার পর্য্যন্ত প্রবাহিত নদীটিও পার হলাম। নদীটি তখন প্রায় আধ লীগ আন্দাজ চওড়া। কারণ ওখানে তখন আট নয় দিন ধরে চলেছিল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। নদীর ওপারে গিয়ে তিন লীগ রাস্তা চলার পরে আর একটি বিরাট মন্দিরের দর্শন পেলাম আমরা। মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল সুবিশাল ও উঁচু একটি ভিতের উপরে। পনের কুড়িখানি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে তবে সেখানে ওঠা যায়। মন্দিরের মধ্যে চমৎকার একটি বৃষ মূর্ত্তি আছে। অত্যন্ত কাল রংএর পাথরে গড়া। এছাড়া বিকৃত অঙ্গ আবার যুক্ত চার পাঁচ ফুট উঁচু সব মূর্ত্তিও আছে। কতকগুলি বহুমুখ বিশিষ্ট, কতকগুলির আছে অনেকগুলি করে হাত পা। সবচেয়ে বেশী কদাকার মূর্ত্তি পূজা অর্ঘ্য পায় আবার বেশী করে।

এই মন্দির থেকে এক চতুর্থাংশ লীগ দূরে বড় একটি সহর। কিন্তু আমরা আরও তিন লীগ এগিয়ে গিয়ে ককানি নামে এক সহরে বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি করি। সহরটির কাছেই ছিল একটি মন্দির। ওখানেও আছে সুন্দর গড়নের পাঁচ ছয়টি প্রস্তর মূর্ত্তি।

১লা আগস্ট আমরা পৌছে গেলুম কোন্দবীর নামে বড় একটি সহরে। দুইসারি পরিখা দিয়ে সহরটি বেষ্টিত। পরিখার নিচের দিক খণ্ড খণ্ড পাথরে গাঁথা সহরের প্রবেশ পথের দু'পাশ সুদৃঢ় দেয়ালে আবদ্ধ। দূরে দূরে রয়েছে কিছু গোলাকার গম্বুজ। কিন্তু তার দ্বারা সহর রক্ষার কাজ বিশেষ হয় না।

সহরটি পূবদিকে একটি পাহাড পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তার পরিধি প্রায় একলীগ। সে জায়গাটিও প্রাচীর ঘেরা। প্রায় একশ' পঞ্চাশ পদক্ষেপ মত দূরে দূরে দেয়াল যেন অর্দ্ধ চন্দ্রাকার। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে তিনটি দুর্গ।

আগস্ট মাসের ২ তারিখে ছয় লীগ বাস্তা চলার পবে আমরা পৌঁছোলাম কোপ্লোরাম নামে এক গ্রামে।

তৃতীয় দিনে আট লীগ পথ অতিক্রম করে আমরা হাজিব হলাম অদ্দনকী নামে ভাবী চমৎকাব একটি সহবে। ওখানেও বড একটি মন্দির আছে। মন্দিরের সংগে প্রচুর কক্ষ। কক্ষগুলি তৈরী হয়েছে পূজারী পুরোহিতদের জন্যে। এখন ধ্বংসস্তূপমাত্র। এই মন্দিরে বিশেষ রকমের মূর্ত্তি দেখা গেল। কিন্তু অত্যন্ত বিকলাঙ্গ রূপেব। তাহলেও অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্নভাবে জনগণ পূজা অর্ঘ্য দান করেন।

৪ঠা তাবিখে আট লীগ বাস্তা পেবিয়ে আমবা আবার যাত্রা বিরতি করেছিলুম নার্নরুপাদ সহরে। সহরটির এধারে বয়েছে বড একটি নদী। কিন্তু সে সময়ে খরাব জন্যে তাতে জল ছিল সামান্য।

৫ই আবও আটলীগ ভ্রমণের পবে আমরা উপনীত হলাম কোন্দবীর। ৬ই চলেছি সাত ঘন্টা। তারপর পৌঁছে যাই দৰ্কীপল্লী গ্রামে। ৭ই তিন লীগ পথ চলে আমরা এলাম নেলোরে। সেখানে দেখলুম অনেক মন্দির। ওখান থেকে এক চতুর্থাংশ ·.।গ আন্দাজ দূরে একটি নদী পার হয়ে আরও ছয় লীগ রাস্তা চলতে হোল। তারপর পৌঁছোলাম গন্দরমে।

ঐ মাসের ৮ই তারিখে আটঘন্টা পথ চলাব পরে আমবা বিশ্রাম গ্রহণ কবি সর্ভিপেল নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। ৯ই মে চলেছিলুম আট ঘন্টা। তারপবে যাত্রা বিরতি হয় একটি উৎকৃষ্ট সহবে, নাম পুদেরু। ১০ই তারিখে চলেছিলুম এগার ঘন্টা। বিশ্রাম নিয়েছিলুম আব একটি ভাল সহবে যার নাম সুন্নপুগুন্ত।

১১ই তারিখে আমরা কালিকট থেকে আর বেশীদূব এগোতে পারিনি। এই স্থানটি সুন্নপুগুন্ত থেকে চার লীগের বেশী দূরবর্ত্তী নয়। সেই চার লীগ রাস্তা অতিক্রম করতে একবার আমাদের জলপথে. চলতে হয়েছে। আর তা ঘোড়ারজীন পর্য্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায়। আরও দু'তিন লীগ বেশী পড়তো। কালিকট একটি দুর্গ এবং করমণ্ডলবাসী ওলন্দাজদের অধীনস্থ। ওখানেই তাঁদের প্রধান বাণিজ্য কুঠী। গোলকুণ্ডা সুলতানের রাজ মধ্যে যত কুঠী আছে

তার সবগুলির তত্ত্বাবধায়ক ওখানেই থাকেন। সাধারণতঃ দুর্গটিতে দু'শত কি তার কাছাকাছি সংখ্যক সৈন্য থাকে। এছাড়া কিছু ব্যবসায়ীও আছেন। ব্যবসার হিসেব পত্র রেখেই তাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আরও কতক লোক আছেন যাঁরা চুক্তি অনুযায়ী ওলন্দাজ কোম্পানীর কাজ করে ওখানেই অবসর জীবন যাপন কচ্ছেন। সহর ও কেল্লাটির মধ্যে বিরাট একটি উন্মুক্ত প্রান্তরের ব্যবধান। এর কারণ, সহর থেকে গোলাগুলি ছুঁড়ে কেল্লার ক্ষতি করা না হয়। দুর্গ প্রাচীরের বাইরের অংশসমূহ উৎকৃষ্ট বন্দুক দ্বারা সুরক্ষিত সমুদ্র প্রায় কেল্লার প্রাচীর ঘেঁষে চলেছে। কোন উন্মুক্ত স্থান নেই কেবল একটি রাস্তা মাত্র ব্যবধান। পরদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা সহরটিতে অবস্থান করেছি। সেখানে লক্ষ্য করলুম যে ওখানকার অধিবাসীরা পানীয় জল সংগ্রহের জন্য সমুদ্রের দূরে সরে যাওয়ার অপেক্ষা করেন। তারপর তীরবর্ত্তী বালুকারাশি খুঁড়ে চলেন এবং তা যতটা সম্ভব সমুদ্রের কাছেই। অবশেষে তাঁরা টাটকা জলের সন্ধান পান।

১২ই আমরা কালিকট ছেড়ে রওনা হলুম। পরদিন বেলা প্রায় ১০টায় মাদ্রাজ পৌঁছে যাই। সেদিন আমাদের সাত আট লীগের বেশী রাস্তা চলতে হয়নি। মাদ্রাজের আর এক্রটি নাম সেন্ট জর্জ ফোর্ট। স্থানটি ইংরেজ অধিকৃত। আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম কাপুসিনদের মঠে। ফাদার ইফ্রেম ও ফাদার জেনন তখন সেখানে ছিলেন।

সেন্ট টমাস সহরে ১৫ই গিয়েছিলাম অস্টিন ফ্রায়ার ও জেসুইটদের গীর্জা দেখার জন্যে। প্রথমটিতে একটি লোহার বল্লম আছে। শোনা যায় ঐটি দ্বারাই সেন্ট টমাসকে বধ করা হয়েছিল।

মাদ্রাজ ত্যাগ করি আমরা ২২শে তারিখে সকাল বেলায়। পাঁচ লীগ দূরে একটি বড় সহরে পৌঁছোই, নাম চোলবরম্। ২৩শে চলেছি সাতলীগ রাস্তা। তারপরে পৌঁছে যাই উত্তকোটাইতে। সমস্ত দিনের যাত্রা পথটি ছিল সমতল এবং বালুকাময়। রাস্তার দু'ধারে রয়েছে কেবল বাঁশ ঝাড়ের সারি। বাঁশগুলি খুব লম্বা। ঝোপঝাড়গুলি অতি ঘন এবং কোন লোকের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয় কিন্তু ওগুলি বাঁদরে পরিপূর্ণ এবং তার সংখ্যাধিক্য বিস্ময়কর। রাস্তার একপাশের ঝোপ ঝাড়ে যে বাঁদর বংশ রয়েছে তারা ওপারের কপিকুলের শত্রুতুল্য। তার ফলে একদিকের বাঁদরগোষ্ঠী অন্যদিকে যেতে সাহস পায় না। যদি যায় তাহলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার

কোন পথ নেই। আমরা ওখানে বাঁদরদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে খুব আনন্দ পেতাম। তা করতাম এই পদ্ধতিতে।

দেশের এই অঞ্চলে একলীগ দূরে দূরে প্রাচীর ঘেরা ও ফটকে অবরুদ্ধ কিছু জায়গা আছে। আর সেখানে বেশ এক একজন উপযুক্ত প্রহরী মোতায়েন আছে। ওখানে সমস্ত যাত্রীদের পরীক্ষা করা হয় যে তাঁরা কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন। পথচারী ঐস্থানে নিরাপদে টাকাকড়ি নিয়ে যাতায়াত করতে পারেন। সেই রাস্তার অনেক অংশে চাল বিক্রীর ব্যবস্থা আছে। যারা কৌতুক উপভোগ করতে চান তাঁরা পাঁচ ছয় ঝুড়ি চাল রাস্তার উপরে রেখে দেন। এক একটি ঝুড়ির মধ্যে ব্যবধান থাকে চল্লিশ পঞ্চাশ পদক্ষেপ মত জায়গা। প্রতিটি ঝুড়ির পাশে তারা আরও রেখে দেন দু'ফুট আন্দাজ লম্বা পাঁচ ছয়টি লাঠি। তারপর নিজেরা সরে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকবেন। আর কিছু সময়ের মধ্যে দেখা যাবে কপিকুল রাস্তার দু'পাশের বাঁশ গাছের মাথা থেকে নেমে চাল পূর্ণ ঝুড়ির দিকে আসছে এগিয়ে। ঝুড়ির কাছে এগোবার আগে বাঁদরগুলি একে অপরকে ভেংচি কেটে কাটিয়ে দেবে আধঘন্টা আন্দাজ সময়। তারপর খানিক এগোবে, খানিক পিছু হটবে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে ঝগড়া যুদ্ধ করতে আগ্রহী হবে না। পরিশেষে বৃহদাকা'র স্ত্রী বাঁদরের দল, বিশেষ করে যেগুলি মহিলাদের মত শিশু ক্রোড়ে নিয়ে চলে তারা চালের ঝুড়ির কাছে এগোতে সাহস করবে। স্ত্রী বাঁদরগুলি পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশী সাহসী। স্ত্রী বাঁদরগুলি যখুনি চালের ঝুড়িতে মাথা গলাতে শুরু করবে তখুনি বিপরীত দিকে পুরুষগুলি ওদের বাধা দিতে এগিয়ে আসবে। তখন এ দলের সব বাঁদর বেরিয়ে পড়বে ; আর দু'পক্ষে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ঝুড়ির পাশে যে লাঠিগুলি রাখা হয়েছিল তা তুলে নিয়ে খুব উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে একে অপরকে প্রহারে ব্যাপৃত হয়। দুর্ব্বল বাঁদরগুলির আর বনে জঙ্গলে ফিরে যাবার সুযোগ আসে না। কারোর মাথা ভেঙ্গে যায়, কতকগুলির অঙ্গ অবয়ব হয় বিকৃত। আর বড় বড় পালের সর্দার যেগুলি তারা আশ মিটিয়ে চাল খেয়ে নেয়। নিজেদের পেট পুরো ভর্ত্তি হলে তবে স্ত্রী বাঁদরদের খাদ্যে অংশ নিতে সুযোগ দেবে।

২৪শে আমরা আগের দিনটির মত নয় লীগ রাস্তা চলেছি এবং গিয়েছিলুম নারায়ণবনম্ পর্য্যন্ত। ২৫শে তারিখে ঠিক একই রকম অঞ্চলে আট ঘন্টা

চলার পরে সন্ধ্যার সময় পৌঁছে যাই গুজলমণ্ডিয়মে। প্রতি দুই লীগ অন্তর দেখেছি ফটক ও প্রহরী।

নয় লীগ রাস্তা চলার পরে ২৬শে আমরা বিশ্রাম নিতে গেলাম কুরুভা বন্দলুতে। সেখানে মানুষ বা পশু কারোর উপযুক্ত কোন খাদ্যেরই সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং আমাদের গরুগুলির জন্যে সামান্য কাটা ঘাসের উপর নির্ভর করেই দিন কাটাতে হোল। কুরুভার প্রসিদ্ধ হোল মন্দিরের জন্য। পাশেই দেখলুম কয়েক দল সৈন্য চলেছে। কতকের হাতে অর্দ্ধ বল্লম, কারোর হাতে বন্দুক, কয়েকজনার আছে গদা। এরা চলেছিল মীর জুমলার সৈন্যবাহিনীর কোন সেনাপতির সংগে মিলিত হতে। মীর জুমলা তখন সৈন্য শিবির ফেলেছিলেন কুরুভাবন্দলুর অনতিদূরে একটি উচ্চ ভূমিতে। স্থানটি খুব মনোরম ও শীতল। প্রচুর গাছপালা ও ঝরণা আছে ওখানে। সেনাপতি কাছেই রয়েছেন জেনে আমরা তাঁর সংগে দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি তিনি তাঁর তাঁবুতে স্থানীয় জমিদারবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। তাঁরা সকলেই হিন্দু। আমরা সেনাপতিকে রূপার কারুকার্য্য খচিত একজোড়া পকেট পিস্তল উপহার দিতে তিনি জানতে চাইলেন কি উদ্দেশ্যে আমাদের এদেশে আগমন হয়েছে। তদুত্তরে আমরা বললাম, গোলকুণ্ডার সুলতানের প্রধান সেনাধ্যক্ষ মীর জুমলার সংগে দেখা সাক্ষাৎ ও কিছু ব্যবসা সংক্রান্ত কাজেই আমাদের ওখানে আগমণ। একথা শুনে তিনি আমাদের প্রতি অপরিসীম দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করলেন। তিনি ভেবেছিলেন আমরা ওলন্দাজ। আমরা ফরাসী শুনেও তিনি বুঝতে পারেন নি বাস্তবিক আমরা কোন জাতির মানুষ। আমাদের সংগে দীর্ঘ আলাপ আলোচনাও তিনি চালালেন আমাদের দেশের শাসননীতি ও সম্রাটের জাঁকজমক ঐশ্বর্য সম্বন্ধে।

ছয় সাত দিন পূর্ব্বে এঁরা পাঁচ ছয়টি হাতী শিকার করেন। তার মধ্যে তিনটি পালিয়েছে। তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে দেশীয় লোক দশ বার জন প্রাণ হারিয়েছেন। সেনাপতি নিজেও হাতীগুলিকে অনুসরণ করবেন ভেবেছিলেন। সেই ক্রীড়া-কৌতুক দেখার জন্যে ওখানে আমাদের আর বিলম্ব করা সম্ভব হয় নি। তবে সেই বিরাটাকার পশুগুলিকে কি ভাবে শিকার করা হয় সে সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম। তা হচ্ছে: প্রথমত বনজঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি রাস্তা তৈরী করে তার উপরে জায়গায় জায়গায়

গর্ত্ত খুঁড়ে তার উপরে ডালপালা কিছু রেখে অল্প স্বল্প মাটি ছড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর শিকারীরা গণ্ডগোল চীৎকার করতে থাকে, আর ঢাক পেটায়। তাদের হাতে বল্লম জাতীয় জিনিসের মাথায় কোনদাহ্য পদার্থ বাঁধা থাকে। ঢাকের শব্দ ও চীৎকার শুনে হস্তীযূথ রাস্তায় ছুটে এসে গর্ত্তগুলির মধ্যে পড়ে যায়। আর উঠতে পারে না। শিকারীরা তখন দ্রুত এসে দড়ি শিকল হাতীগুলির পেটে, পায়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। তারপর যখন দেখা যায় যে পশুগুলি পুরোপুরি আয়ত্বে এসেছে তখন বিশেষ একটা যন্ত্রের সাহায্যে ওদের টেনে তোলা হয়। এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও পাঁচটি হাতীর মধ্যে তিনটি পালিয়ে গিয়েছিল।

ওখানকার লোকেরা আমাদের যা বললেন, তা বিস্ময়কর। যে হাতীগুলি ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, তাদের মনে একটা অবিশ্বাস আশংকার ভাব জন্মায়। তার ফলে ওরা আবার বনে গিয়ে বড় বড় গাছের ডাল সব ভেঙ্গে নামায় এবং শুঁড় দিয়ে সেগুলি ধরে রাস্তার উপরে ঠুকে ঠুকে পরখ করে তবে পদক্ষেপ করে। ঐভাবে দেখে নেয় রাস্তায় কোন গর্ত্ত রয়েছে নাকি। যে শিকারীরা আমাদের এই ঘটনা বললেন, তাঁদের মনে পলাতক তিনটি হাতীকে ধরবার কোন আশা ছিল না। হাতীগুলির সেই অদ্ভুত ক্ষমতা দেখবার ইচ্ছে করলে আমাদের সব জরুরী কাজ ফেলে ওখানে আরও তিন চার দিন থাকতে হোত। সেই সেনাপতি এমন উচ্চ পর্য্যায়ের ছিলেন যে তাঁর অধীনে ছিল তিন হাজার সৈন্য। সেই বাহিনীর জন্যে আধ লীগ জায়গার ব্যবস্থা ছিল।

২৭শে তারিখে দু' ঘণ্টা পথ চলার পরে আমরা বেশ বড় একটা গ্রামে পৌঁছে দু'টি হাতী দেখতে পেলাম। খুব সম্প্রতি ঐ দু'টিকে ধরা হয়েছে। দু'টি বন্য হস্তীর এক একটিকে রাখা হয়েছিল দু'টি করে পোষমানানোর মাঝখানে বন্য হস্তীকে ঘিরে থাকতো ছয় জন লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে অর্দ্ধ বল্লমও তার মাথায় জ্বলন্ত মশাল। এরা আবার পশুগুলির সংগে কথা বলতো, খাদ্য জোগাত। চীৎকার করে তারা নিজেদের ভাষায় বলতো, "নাও, খাও।" খাদ্যের মধ্যে থাকতো ছোট এক শিশি মধু; লাল চিনি, কিছু ভাত ও সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো। বন্য হাতীরা হুকুম পালন না করলে শিকারীরা পোষা হাতীগুলিকে সংকেত করে ওদের মাথায় আঘাত করার জন্য। তারা শুঁড় দিয়ে অবাধ্য হাতীর মাথায় ও কপালে ঘা দিতে থাকে।

আঘাত পেয়ে যদি বাধা দিতে চেষ্টা করে তাহলে অন্যান্য হাতীরা নানাদিক থেকে ওদের ধাক্কা দেয়। তখন বন্য পশুগুলি হুকুম মানতে বাধ্য হয়।

হাতীর আখ্যান প্রসংগে আমি আরও কিছু বর্ণনা দেব ওদের স্বভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে। শিকারীদের হাতে পড়লে হাতী কখনও হস্তিনীর সংগে মিলিত হয় না। তাহলেও মাঝে মাঝে স্ত্রী সংগের জন্যে ব্যস্ত হয়। একদা সম্রাট শাহজাহান এক পুত্রসহ হাতীর পিঠে করে শিকারে গিয়েছিলেন। পুত্র তাঁকে ব্যজন কচ্ছিলেন। হাতীটি হঠাৎ কামোন্মত্ত হয়ে উগ্ররূপ ধারণ করলো। মাহুত কিছুতেই ওকে শান্ত করতে ও আয়ত্বে আনতে পারে নি। তখন সে সম্রাটকে জানালো যে হাতীটির উত্তেজনা শান্ত করার জন্যে তাকে যা করতে হবে তার ফলে তার দেহ হয়ত হাতীর দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। গাছপালার মধ্যে ওকে শান্ত করার কোন পথ নেই। তিনজন আরোহীর মধ্যে তার জীবনই দান করতে হবে। সম্রাট ও তদীয় পুত্রের জন্যে মাহুত স্বেচ্ছায়ই আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত। তবে সম্রাটের কাছে মাহুতের একটি মাত্র নিবেদন ছিল যে তিনি যেন ওর মৃত্যুর পরে তিনটি শিশু সন্তানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। এই বলে মাহুতটি নিজেকে হাতীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করলো। মুহূর্ত্ত মধ্যে হাতীটি মাহুতকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে তারপর পা দিয়ে মাড়িয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেললো। কিন্তু লোকটি স্থির শান্ত হয়েই রইল। এই মহৎ আত্মত্যাগের জন্যে সম্রাট সেই হতভাগ্য লোকটির পরিবারকে দু' লাখ টাকা দান করেছিলেন আর তার প্রতিটি পুত্রকে দিয়েছিলেন উন্নতির পথে এগিয়ে।

আমি আর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছিলুম। জীবন্ত হাতীর চামড়া যেমন অতিরিক্ত শক্ত থাকে, মৃত্যুর পরে কিন্তু তা নরম আঠার মত হয়ে যায়।

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলেই হাতী পাওয়া যায়। সিংহলদ্বীপেও আছে; তবে আকারে অত্যন্ত ছোট। সুমাত্রা দ্বীপের হাতীগুলি খুব সাহসী। কোচিন রাজ্য, শ্যাম এবং সুবৃহৎ তার্তার দেশের সন্নিকটে ভূটান রাজ্যের হাতীও অনুরূপভাবে সাহসী ও শক্তিশালী। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে মেলিন্দা থেকেও এই পশুর আমদানী হয়। গোয়াতে জনৈক পর্ত্তুগীজ সেনাপতির বিবরণে জানা যায় যে মেলিন্দাতে হাতীর সংখ্যা খুব বেশী। তিনি সেহান এসেছেন মোজাম্বিকের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ পেশ করার উদ্দেশ্যে। তিনি আমাকে বললেন যে উপকূলের অনেক উদ্যানে তিনি প্রচুর

হাতীর দাঁত ছড়ানো দেখেছেন। সেই উন্মুক্ত স্থানগুলির মধ্যে অন্ততঃ এমন একটি আছে যার আয়তন এক লীগেরও অধিক। তিনি আরও বললেন যে ওখানকার কৃষ্ণাঙ্গরাই হাতী শিকার করে এবং হাতীর মাংস খায়। প্রতিটি নিহত হাতীর দাঁত উপহার দিতে হয় স্থানীয় শাসনকর্ত্তাকে। হাতীগুলিকে সিংহল দ্বীপে নিয়ে যাবার সময় লম্বা সরু রাস্তা তৈরী করা হয়। গলিটির দু'পাশ আবদ্ধ থাকে। ফলে হাতী দৌড়ে বেরিয়ে যেতে পারে না।

প্রথমাংশে রাস্তাটি একটু চওড়া থাকে তারপর ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়। শেষ মাথায় একটি হস্তিনী শুয়ে থাকতে পারে এমন একটু জায়গা থাকে। যে হস্তি হস্তিনীর সংগ লাভের জন্যে উৎসুক এমনটিই সেখানে হাজির হয়। হস্তিনী পোষা হলেও তাকে শক্তপোক্ত দড়াদড়ি দিয়ে বেঁধে রাখার নিয়ম। ওর চীৎকার শুনেই হাতীর সেখানে আগমণ হয়। গলি যেখানে সরু সেখানে হাতী এসে পৌঁছোলেই আশে পাশে যে লোকগুলি লুকিয়ে ছিল তারা বেরিয়ে এসে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। অবশেষে হস্তীটি হস্তিনীর কাছে এগিয়ে গেলে আর একটি প্রতিরোধ সৃষ্টি করে ওকে এগোতে দেয়া হয় না। আর দড়িদড়া দিয়ে ওর পা ও শুঁড়কে এমন ভাবে বেঁধে ফেলা হয় যে চলার যো থাকে না। শ্যামদেশ ও পেগুতে এইরূপেই হাতী ধরা হয়। তফাৎ কেবল সেখানে স্থানীয় বাসিন্দারা কেবল হস্তিনীর পিঠে চড়েই বনে জঙ্গলে হস্তীর সন্ধানে যায়। শিকারের সন্ধান পেলে স্ত্রী হাতীকে সুবিধেজনক জায়গায় বেঁধে রেখে হাতীর জন্য ফাঁদ পাতা হয়। অনতিবিলম্বে স্ত্রী সংগলিপ্সু হাতী বন থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসবে; আর আসে হস্তিনীর চীৎকার শুনে।

হস্তিনীর বেলায় একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। যখন ওরা হাতীর সংগ লাভের জন্যে ব্যগ্র হয় তখন তৃণ ঘাস, লতাপাতা স্তূপীকৃত করে প্রায় চার পাঁচ ফুট উঁচু তৃণ শয্যামত রচনা করে। এ ব্যাপারটা আর কোন পশু প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। সেই তৃণ শয্যায় শায়িত হয়ে হস্তিনী হস্তীর জন্যে অদ্ভুত ভাবে চীৎকার করতে থাকে।

সিংহলদ্বীপের হস্তী যূথের মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। তা হচ্ছে হস্তিনীর প্রথম শাবকটিরই কেবল দাঁত থাকে। আর একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে আসাম থেকে আমদানী গজদন্তের একটি বিশেষ গুণ রয়েছে। সে দাঁত কখনও হলদে রং ধরে না। আর তা ঠিক ইউরোপীয় মহাদেশ ও পূর্ব্বভারতীয় দীপপুঞ্জের গজদন্তের মতই। এই বিশিষ্টতার জন্যেই তার কদর ও মূল্য অত্যধিক।

ব্যবসায়ীরা যখন হস্তী যূথকে কোথাও বিক্রীর উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় তখন ওদের দলবদ্ধ গতিভঙ্গী বড়ই মনোরম। সে সময়ে বয়স্ক ও কচি কাঁচাদের একসংগেই নিয়ে যাওয়া হয়। বয়স্কগুলি এগিয়ে চলে গেলে ছোট ছেলে মেয়েরা শিশু হাতীগুলির সংগে খেলা করতে করতে দৌড়ে চলে। ছেলে মেয়েরা আবার শিশু হাতীগুলিকে কিছু কিছু খাবারও দিতে থাকে। শিশু হাতীগুলি খুব আমুদে বলে ওদের যাই দেয়া হয় তাই-ই ওরা শুঁড় দিয়ে তুলে নেয়। ছোট ছেলে মেয়েরা ওদের পিঠেও উঠে বসে। ওদের খাবার সময় হলে যখন যাত্রা বিরতি হয় এবং ওরা খাবারের পাত্র দেখতে পায় তখন দ্বিগুণ দ্রুত তালে পা ফেলবে, শুঁড় তুলে আনন্দ প্রকাশ করবে। পিঠের উপর যদি ছেলের দল থাকে তবে তাদের মাটিতে ফেলে দেবে। কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি করবে না।

অনেক অনুসন্ধান করেও আমি একটি বিষয় জানতে পারিনি যে হাতী প্রকৃত কতদিন জীবিত থাকে। ওদের মাহুত ও রক্ষকও এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারেনি। কারণ এক একটি হাতী হয়ত বর্ত্তমান মাহুতের পিতা, পিতামহ ও প্রবৃদ্ধ পিতামহ দ্বারাও চালিত হয়েছে। এই হিসেবে আমার মনে হয় হস্তী যূথের কোন কোনটি প্রায় একশ' ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত ও বেঁচে থাকে।

ভারতবর্ষের সংগে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে এমন জনসম্প্রদায়ের বেশীরভাগেরই ধারনা ও অভিমত হোল যে মহান মুঘল সম্রাটদের পিলখানায় তিন চার হাজার হাতী আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাটের রাজধানী ও বাসস্থান জাহানাবাদে (দিল্লী) থাকাকালে হাতীশালার অধ্যক্ষের কাছে শুনেছি যে বাদশাহের খাসমহলে পাঁচ শতের বেশী হাতী নেই। সেই হস্তীবাহিনী রাজ পরিবারভুক্ত। এদের কাজ হোল কেরলমাত্র মহিলাগণ, তাঁদের তাবু ও মালপত্র বহন করা। কিন্তু যুদ্ধ যাত্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট হাতীর সংখ্যা হয়ত ওর চেয়ে চারগুণ বেশী বা নয়তো আর কিছু বেশী। শেষোক্ত শ্রেণীর হস্তী দলে যেটি সবচেয়ে সেরা সেটি নির্দ্দিষ্ট থাকে বাদশার জ্যৈষ্ঠপুত্রের জন্যে। সেই বিশেষ হাতীটির খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ভাতা হোল মাসে পাঁচশত টাকা। এই পরিমান টাকা আমাদের দেশের ৭৫০ লিভারের সমতুল্য। আর যে সব হাতী আছে তাদের জন্য মাসিক ভাতার হার হোল ৫০, ৩০ অথবা ২০ টাকা ; তার বেশী নয়। সে সব হাতীর মাসিক

একশ' থেকে তিন চারশ' টাকা পর্য্যন্ত, তাদের রক্ষক বা মাহুতরাও মাসে সেই অনুপাতে বেতন পান। হস্তী বাহিনীকে গ্রীষ্মকালে হাওয়া করার জন্যে দু'তিন জন লোক নিযুক্ত থাকে। হাতীর দলকে সর্ব্বদা সহরে রাখা হয় না। অধিকাংশকে প্রতিদিন সকালে ক্ষেতে মাঠে অথবা ঘন বন জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওরা গাছের ডালপালা, আখের চারা, জোয়ার বাজরা ইত্যাদি খায়। তাতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের হয় প্রভূত ক্ষতি। এর ফলে কিন্তু হস্তী রক্ষকের বেশ লাভ কারণ হাতীগুলি ঘরে যত কম খাবে রক্ষকের পকেট তত ভারি হবে।

আগস্ট মাসের ২৭শে তারিখ আমরা ছয় লীগ রাস্তা চলে অন্তরাজপেটা নামে একটি সুবৃহৎ সহরে পৌঁছে গেলুম। ২৮শে আট লীগ ভ্রমণের পরে পৌঁছে যাই উত্তুকুরে।

২৯শে তারিখে নয় ঘণ্টা পথ চলার পর পৌঁছোলাম ওয়ান্তি মিত্তায়। ভারতের সবচেয়ে বড় মন্দিরটি সেখানে অবস্থিত। ওটি তৈরী হয়েছে বড় বড় খণ্ড পাথর দিয়ে। তাতে চূড়া আছে তিনটি। অনেক অঙ্গহীন দাঁড়ান মূর্ত্তিও খোদিত আছে। মন্দিরকে ঘিরে অনেক ছোট ছোট কক্ষ আছে পুরোহিতের আবাসরূপে। প্রায় পাঁচশ হাত দূরে সুবিস্তৃত একটি সরোবর। তার তীরে আটদশ ফুট চৌকো মাপের আয়তন যুক্ত আরও অনেকগুলি মন্দির। প্রতিটি মন্দিরে যেন দৈত্য দানবের মত একটি করে মূর্ত্তি। মূর্ত্তির সেবা পূজার জন্য নিযুক্ত আছেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁর আর একটি কাজ হোল যে তাঁদের মত সংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজ ব্যতীত আর কোন লোক বা আগন্তুক যেন সেই সরোবরে স্নান না করেন বা তার জল তুলে না নিয়ে যান। যদি কেউ জল তুলে নিতে চান তাহলে তা নেবেন মাটির পাত্রে। আর সেই পাত্রটির যদি কোন প্রকারে ৬˙˙ া বিদেশীর জল পাত্রের সংগে ছোঁয়া লাগে তাহলে তখুনি দেশীয় লোকটি তাঁর পাত্রটিকে খান খান করে ভেঙ্গে ফেলবেন। ওখানকার লোকদের কাছে শুনলাম যে তাঁদের সমধর্ম্মী নয় এমন কোন আগন্তুক যদি দৈবাৎ সেই জলাশয়ে স্নান ক'রে ফেলেন তাহলে সমস্ত জলরাশিকে অবশ্যই নিষ্কাশন করে বের করতে হবে। ভিক্ষা ও সাহায্য দানে এঁরা অতি সদাশয়। সেখানে আগত কোন প্রার্থী বা অভাব গ্রস্ত লোক কখনই খালি হাতে ফিরে যাবেন না। তাদের জন্য খাদ্য পানীয় সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে।

অনেক মহিলা আছে যাঁরা রাস্তার পাশে বসে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আগুন জ্বালিয়ে রাখেন পথচারীদের তামাক ধরানোর জন্যে। যাদের সংগে হুঁকা বা ধূমপানের পাইপ ইত্যাদি থাকেনা এঁরা তাদের তাও সরবরাহ করেন। আর কয়েকজন মহিলা খিচুড়ি রান্না করেন। এই জিনিসটি তৈরী হয় চাল ডাল মিশিয়ে বা আমাদের দেশের কোন দানা শস্যের মত কিছু দ্বারা। কেউ কেউ আবার চালের সংগে শিমজাতীয় সব্‌জী সিদ্ধ করেন। ওখানকার জলে রান্না করা এই খাদ্য খেলে অতিরিক্ত গরমে যারা বাস করেন তাদেরও কখনও প্লুরিসি বা ফুস্‌ফুসের কোন ব্যারাম হয় না। এই মহিলারা একটি ব্রত উদ্‌যাপনের মানসেই পথচারীদের প্রতি এই জাতীয় দান ধ্যান ও সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তা করেন সাত আট বছর ব্যাপী। কেউ বা তার চেয়েও বেশীদিন করেন নিজের সুবিধে অনুসারে। প্রতিটি পথিককেই তারা সেই ভাত, তরকারী ইত্যাদি প্রদান করেন। রাজ পথের পাশে ও শস্য ক্ষেত্রে আর এক জাতীয় নারীর দলকে দেখা যায়। তাদের কাজ হোল ঘোড়া, বলদ ও গাভীগুলিকে দেখা শোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাঁরা ব্রত করেন বলে নিজেরা কিছু খাদ্য গ্রহণ করেন না। তবে সেই পশুগুলির মলের সংগে যদি কোন জিনিস অজীর্ণ অবস্থায় অটুটভাবে নিষ্কাশিত হয় তাহলে তারা তা খাদ্যরূপে গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলে যব, জই কিছুই মেলেনা। এরা গরু বাছুরকে খেতে দেন একপ্রকার বিশ্রী ধরণের বড় বড় মটর দানা। সেগুলিকে যাতায় পিষে অনেকটা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। বড় কঠিন সহজে ভেজে না, আবার হজম করাও শক্ত। এই মটর দানা প্রতিদিন সন্ধ্যায় গরু ও ঘোড়াকে খেতে দেয়া হয়। সকালে খাওয়ানো হয় দুই পাউণ্ড আন্দাজ কাল্‌চে বাদামী রংএর গুড়। দেখতে ঠিক মোমের মত। এই গুড়কে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের সংগে ঠেসে মিশিয়ে পরে এক পাউণ্ড ওজনের মাখনও তার সংগে দেয়ার নিয়ম। তারপর সহিসরা ঐজিনিসকে ছোট ছোট গোলাকার ঢেলা পাকিয়ে পশুগুলির গলার মধ্যে পুরে দেয়। নয়তো ওরা কিছুতেই ও জিনিস খাবেনা। খাওয়ার পরে মুখ ধুইয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হয়। মুখ কিছুতেই নাড়া চাড়া করেনা ওরা। বিশেষ দাঁত খুলতে চায়না। কারণ এই ধরণের খাদ্যের প্রতি ওদের ভীষণ বিতৃষ্ণা রয়েছে। সারাদিন ধরে মহিলারা ঘাস, আগাছা প্রভৃতি একেবারে মূল শুদ্ধ তুলে এনে পশুদের খেতে দেন। তবে কাজটা খুব

সাবধানতা নিয়ে করেন। যা কিছু মাটিতে জন্মায় তাই-ই ওদের খেতে দেয়া হয়না।

৩০শে আমরা আট লীগ পথ চলে গোল্ল পল্লী নামে একটি জায়গায় বিশ্রাম করি। নয় ঘন্টা পথ চলেছিলুম ৩১শে তারিখে। তারপর যাত্রা ভঙ্গ করি গোরিগোন্নূরে।

১লা সেপ্টেম্বর মাত্র ছয় লীগ রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছে যাই গান্ধীকোটাতে। তার মাত্র আট দিন আগে তিন মাস অবরোধের পরে নবাব সহরটিকে অধিকার করেছেন। কয়েকজন ফরাসীর সহায়তা ব্যতীত ঐ কাজ নবাব সম্পন্ন করতে পারতেন না। সেই ফরাসীরা দুর্ব্যবহারের জন্যে ওলন্দাজ কোম্পানীর চাকুরী ছেড়ে চলে আসেন। তাঁদের দলে কয়েকজন ইংরেজ, ওলন্দাজ ও দু'তিনজন ইতালীয় গোলন্দাজও ছিলেন। মুখ্যতঃ তাঁরাই স্থানটির পতনকে ত্বরান্বিত করেন। কর্ণাটিকা রাজ্যে গান্দিকোটা একটি সুদৃঢ়তম সহর। সুউচ্চ একটি পর্ব্বতে অবস্থিত। সহরে প্রবেশের একটি মাত্র পথ। সে রাস্তাটি কোথাও বিশ পঁচিশ ফুটের বেশী চওড়া নয়। কোন কোন অংশে মাত্র সাত আট ফুট প্রশস্ত। এই রাস্তার ডান পাশে বড় পর্ব্বতকে কেটে আর একটি অদ্ভুত রকমের পাহাড় তৈরী করা হয়েছে। তার নীচ দিয়ে একটি বড় নদী প্রবাহিত। পর্ব্বতটির মাথায় আছে একটি ছোট সমতল ক্ষেত্র। আয়তন চওড়ায় মাত্র এক লীগের চতুর্থাংশ ; আর লম্বায় আধ লীগ মত। ওখানে ধান ও জোয়ারের চাষ হয়। অনেকগুলি ছোট ছোট প্রস্রবনের সাহায্যে তাতে জল সিঞ্চন হয়ে থাকে। দক্ষিণ দিকের সমতল অংশের শেষ মাথায় সহরটি অবস্থিত। তার চারদিকে পাহাড়। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে দু'টি নদী। এদের দ্বারাই সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং সমতল ভাগের দিক থেকে সহরে প্রবেশের রাস্তা মাত্র একটি। সটিও বড় বড় প্রস্তর খণ্ডে নির্ম্মিত তিনটি উচ্চাঙ্গের দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। নীচের দিকে রয়েছে খণ্ড খণ্ড পাথরে বাঁধানো দুর্গ পরিখা। ফলে সেই পরিবেষ্টনী দ্বারা সহরের কেবল এক চতুর্থাংশ মাত্র সুরক্ষিত হতে পারে। আর তাও মোটামুটি সাড়ে বারশ' ফুটের মত জায়গা মাত্র। এঁদের মাত্র দু'টি লৌহ-কামান আছে। একটিতে বার পাউণ্ডের গোলা, দ্বিতীয়টিতে আট পাউণ্ড ওজনের গোলা ব্যবহার চলে। তার একটি ফটকের উপরে স্থাপিত। অপরটি বসানো রয়েছে প্রাচীরের বাইরের অংশের একটি কিনারায়।

নবাব সহরের কাছাকাছি তাঁর কামান উত্তোলনের মত উঁচু জায়গা দেখতে পান নি : ইতিমধ্যে নগররক্ষীদের হাতে তাঁর অনেক লোক লস্করের মৃত্যু ঘটে। সহরের মধ্যে যে রাজা ছিলেন তাঁকে সকলে হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বাধিক অভিজ্ঞ সেনাপতিরূপে শ্রদ্ধা সম্মান করতেন। নবাব দেখলেন যে পর্ব্বতের সুউচ্চ খাড়া অংশে কামান তুলতে না পারলে স্থানটি অধিকার করা যাবে না। তখন তিনি সেই রাজা সাহেবের অধীনে যত ফরাসী দেশীয় লোক কর্ম্মরত ছিলেন তাঁদের ডেকে প্রত্যেককে অতিরিক্ত চার মাসের বেতন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এই সর্ত্তে যে তাঁরা সুউচ্চ সেই পর্ব্বতে কামান তুলে দিলেই সেই অতিরিক্ত অর্থ দেয়া হবে। ফরাসীরা কাজটি সম্পন্ন করে প্রাপ্য টাকা পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা চারটি কামান তুলে দিয়েছিলেন। আর ফটকের উপরে স্থাপিত বিরাট কামানের উপরে এমন আঘাত হানলেন যে সেটি অকেজো হয়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা সহরের দেয়ালরাজির দু'টি অংশ ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করলেন। তখন নগর রক্ষীরা সর্ত্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে সহরের বাইরে চলে এল।

আমরা যেদিন ওখানে পোঁছোই সেদিন সমগ্র সৈন্য বাহিনী পর্ব্বতের পাদমূলে একটি সমভূমিতে জমায়েত হয়েছিল। ওখানে চমৎকার একটি নদী বয়ে চলেছে। নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যরা ওখানে বেশ সুব্যবস্থায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। জনৈক ইংরেজ গোলন্দাজ, একজন ইতালীয় ভদ্রলোক, মঁসিয়ে জর্ডিনও আমাকে ওখান দিয়ে যেতে দেখে ওরা আমাদের ফিরিঙ্গি বলে অনুমান করেন। বেলা তখন প্রায় শেষ হতে চলেছিল। তারা আমাদের অত্যন্ত বিনীতভাবে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আর রাত্রিটা তাদের সংগে কাটানোর সুযোগ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছিলেন। তাদের কাছে শুনে বুঝতে পারলুম যে ঐ সহরে বোর্জেসের ফ্লুভিয়াস মেইলি নামে জনৈক ফরাসী এঞ্জিনিয়র রয়েছেন। নবাব তাঁকে নিযুক্ত করেছেন কয়েকটি কামান নির্ম্মানের উদ্দেশ্যে। তিনি সংকল্প করেছিলেন সেই কামান সহরে স্থাপন করবেন।

পরদিন আমরা সহরে গিয়ে মেইলির বাসস্থানে গেলাম। বাটাভিয়ায় তাঁর সংগে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। তিনি নবাবকে আমাদের আগমণ সংবাদ জানালেন। নবাব তখুনি আমাদের ও সংগের পশুগুলির জন্যে খাবার দাবার পাঠিয়ে দিলেন।

তৃতীয় দিনে আমরা নবাবের সংগে দেখা করি। তিনি তাঁবু ফেলেছিলেন পাহাড়ের গায়ে খাত কেটে যেখানে রাস্তা তৈরী হয়েছে তারই কাছে সমতল ভূমিতে। আমরা তাঁকে আমাদের আগমণের কারণ জানিয়ে বললাম যে আমাদের সংগে এমন সব দুষ্প্রাপ্য জিনিস আছে যা রাজা মহারাজাদেরই ক্রয় করার মত। নবাব যতক্ষণ না ওগুলি দেখছেন, ততক্ষণ রাজা সাহেবকে তা দেখানো হবে না। নবাবকে ঐটুকু সম্মান প্রদর্শন সমীচিন মনে হয়েছিল। নবাব আমাদের সম্মানসূচক ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং পান সুপারী দিয়ে আমাদের আপ্যায়ণ করলেন। আমরা স্বস্থানে ফিরে এলাম। তিনি পরে আবার আমাদের দু' বোতল মদ পাঠিয়েছিলেন। এক বোতল 'স্যাক্' জাতীয়, আর একটিতে ছিল সিরাজী। এই জাতীয় সুরা এদেশে বিরল বস্তু।

চতুর্থ দিন আমরা আবার তাঁর সংগে দেখা করতে যাই। সংগে নিয়েছিলুম অস্বাভাবিক ওজনের কয়েকটি মুক্তা। সেগুলির যেমন ছিল ওজন, তেমনি ছিল সৌন্দর্য্য সুষমার বাহার। ওজন ছিল কমপক্ষে বাইশ ক্যারাট। প্রথমে নিজে দেখে আশে পাশে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ছিলেন তাদের হাতে দিলেন। তারপর দাম জানতে চাইলেন। আমরা মূল্য জানালে মণিমুক্তাগুলি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ও বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন।

নয় দিন পরে দশ দিনের দিন প্রাতে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। তাঁর পাশে আমাদের বসিয়ে পাঁচটি ছোট থলি ভর্ত্তি হীরকখণ্ড আনলেন। প্রতিটি থলিতে বেশ কয়েক মুঠো করে হীরক ছিল। সেগুলি টুকরো টুকরো এবং কালো রংএর আভা যুক্ত। আকারেও অতি ছোট। একটিও এক বা দেড় ক্যারাট ওজনের বেশী নয়। তবে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। দু' চারটি ছিল যার ওজন দুই ক্যারাট হতে পারে। সমস্ত হীরাগুলি আমাদের দেখিয়ে নবাব জানতে চাইলেন যে ওগুলি ফ্রা... বিক্রী হতে পারে কিনা। আমি বললুম, ঐরকম কাল আভা না থাকলে হয়ত আমাদের দেশে এর চাহিদা হোত। ঐ ধরনের কাল্‌চে হীরাকে ইউরোপে হীরা বলেই গণ্য করে না। তবে খুব সাদা ও স্বচ্ছ হলে তার চাহিদা আছে। অন্য রকমের কিছুর চাহিদা নেই। মনে হোল, গোলকুণ্ডার সুলতানের পক্ষ হয়ে তিনি যখন প্রথম এই রাজ্যটি জয়ের চেষ্টা শুরু করেন তখন ওখানে হীরক খনি আছে এমন আঁচ পেয়ে যান। তারপর বার হাজার লোক নিযুক্ত করেন জায়গাটি খননের জন্যে। এক বছর খনন চালিয়ে তাঁরা এই ক্ষুদ্র পাঁচ থলি মাত্র

সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন। নবাব দেখলেন, তাঁরা কেবল কতকগুলি বাদামী রংএর পাথরই সংগ্রহ করেছে। তা আবার সাদার চেয়ে কাল্‌চে রংএর বেশী। সুতরাং কেবল সময় নষ্টই হয়েছে। তখন তিনি লোক লস্করদের ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাদের খামারে।

১১ই সমস্ত ফরাসী গোলন্দাজরা একত্র হয়ে নবাবের শিবিরে এসে অভিযোগ করলেন যে তিনি ওদের যে চার মাসের অতিরিক্ত বেতন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করেন নি। তাঁরা আরও ভয় দেখালেন যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে তাঁরা নবাবের কাজ ছেড়ে দেবেন। এই কথা শুনে নবাব তাঁদের আশ্বাস দিলেন যে পরদিন তাঁদের প্রাপ্য অর্থ চুকিয়ে দেবেন।

তাঁরা ১২ তারিখে নবাবের কাছে এসে আবার হাজির হতে ভুলে যান নি। নবাব তিন মাসের বেতন দিয়ে বলে দিলেন যে বাকী আর এক মাসেরটা ঐ মাস কাবার হবার আগেই মিটিয়ে দেয়া হবে। টাকা হাতে পেয়ে ওলন্দাজরা এমন উল্লসিত হয়ে মেতে উঠলেন যে যুবতী নর্ত্তকীরাই বেশীর ভাগ টাকা নিয়ে নিল।

ঐদিনই নবাব মেইলির কামান নির্ম্মানের কাজ পরিদর্শনে গেলেন। সেই কামান তৈরীর জন্যে তিনি দেশের সর্ব্বত্র পিতল ধাতু সংগ্রহের জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন। তার ফলে পথের ধারে যেখানেই তারা মন্দির দেখেছে সেখান থেকেই ধাতুমূর্ত্তি লুটপাট করে এনে জড় করেছিল। এখানে একটি বিষয়ে বলা দরকার। গান্দী কোটাতেও একটি মন্দির ছিল। শোনা গেয়েছিল যে সেটি সারা ভারতে সুন্দরতম মন্দির। সেখানেও ছিল অনেক মূর্ত্তি প্রতিমা। তার কতকগুলি স্বর্ণময়, কতক রূপার। বাকীগুলির মধ্যে ছয়টি পিতলের। তিনটি মূর্ত্তি হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গীতে, তিনটি দাঁড়ান। উচ্চতায় দশ ফুট। অন্যান্য মূর্ত্তির সংগে ওগুলিকেও কাজে লাগানো হবে, স্থির হোল। কিন্তু মেইলি সাহেব কামান তৈরীর সমস্ত উপাদান জড় করে গান্দী কোটার সেই মনোরম ছয়টি মূর্ত্তিকে রাখলেন আলাদা করে। আর বাকী সব গালিয়ে ফেললেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেই মূর্ত্তি ক'টিকে বাঁচাতে পারেন নি। নবাব নানা চেষ্টার পরে মন্দিরের পূজারীদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেবার ভয় দেখালেন। তিনি মনে করেছিলেন, পুরোহিতরা বোধ হয় মূর্ত্তিগুলিকে মন্ত্রপূতঃ করে রেখেছিলেন, যার জন্যে ওগুলিকে গালিয়ে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। মেইলি কিন্তু একটির বেশী

কামান তৈরী করতে পারেন নি। আর সেটিও পরখ করার সময় ফেটে চৌচিড় হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে তিনি সমস্ত কাজ অসম্পূর্ণ রেখে কর্ম্ম বিরতি করতে বাধ্য হন। অবিলম্বে তিনি নবাবের কাজও ত্যাগ করেন।

১৪ই নবাবের কাছে আমরা বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে ও জিনিসপত্র সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানার জন্যে গেলাম। তিনি বললেন, কয়েকটি অপরাধীর বিচার কার্য্যে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। এদেশের রীতি হচ্ছে, কোন লোককে আগে জেলে বন্দী করা হয় না। অভিযুক্ত ব্যক্তির অবিলম্বে বিচার হয়ে থাকে। নির্দোষ ব্যক্তি তখনি মুক্তি পায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও অভিযোগ সম্বন্ধে যা কিছু তর্কবিতর্ক, সন্দেহ থাকে তার সমাধান তখুনি করতে হবে।

আবার ১৫ই সকালে আমরা নবাবের কাছে যাই। তখুনি তাঁর শিবিরে প্রবেশের অনুমতি এসে গেল। তাঁর পাশে ছিলেন দু'জন কর্ম্ম সচিব। নবাব দেশীয় প্রথায় খালি পায়ে বসেছিলেন। আমাদের দেশের দরজীদের মত পায়ের আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর কাগজের টুকরো রেখেছেন আটকে। কতকগুলি কাগজ ধরে আছেন বাহাতের আংগুলে। কখনও পা থেকে, কোন সময় হাতের কাগজ টেনে বের করে হুকুম দিচ্ছেন বিভিন্ন লোককে কি লিখতে হবে না হবে সে সম্বন্ধে। কর্ম্ম সচিবরা লেখা হয়ে গেলে তা পড়ে শোনান। তখন তিনি ওগুলি নিয়ে নিজের হাতে তাতে সীলমোহর করেন।

তারপর চিঠি পত্রগুলির কতক যায় পদব্রজে গমনকারী বার্ত্তাবাহকের মাধ্যমে, বাকী সব পাঠানো হয় অশ্বারোহীদের মারফতে। একটা কথা অবশ্যই জানা দরকার যে পদচারী পত্রবাহকদের দ্বারা চিঠিপত্র অশ্বারোহীদের তুলনায় দ্রুততর যাতায়াত করে। কারণ হচ্ছে, প্রতি দু' লীগ অন্তর ছোট ছোট কুটির আছে, সেখানে সর্ব্বদা লোক প্রস্তুত থাকে। এক পত্র বাহক ওখানে পৌঁছে চিঠির প্যাকেট ছুঁড়ে দেবেন ঘরের মধ্যে; আর তৎক্ষণাৎ নতুন লোক তা নিয়ে ছুটে যাবেন পরবর্ত্তী গন্তব্য স্থলে। সেখানেও ব্যবস্থা অনুরূপ। হাতে হাতে চিঠির প্যাকেট দেয়াটাকে এরা অশুভ লক্ষণ মনে করেন। নিয়ম হোল ঘরের মধ্যে কারোর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়া। তখুনি দ্বিতীয় লোক তা তুলে নেবেন।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলেই রাস্তার দু'ধারে থাকে ঘন সন্নিবিস্ট বৃক্ষ বীথিকা। যেখানে বৃক্ষসারি নেই

সেখানে দশ বার শত ফুট দূরে দূরে থাকে একটি করে প্রস্তর খণ্ডের স্তূপ। গ্রামের লোকদের মাঝে মাঝে ঐ স্তূপগুলিকে চুনকাম করে দিতে হয়। উদ্দেশ্য, পত্রবাহকরা অন্ধকার ও বর্ষামুখর রাত্রিতে যেন পথ হারিয়ে না ফেলেন।

আমরা নবাবের কাছে থাকতেই কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী এসে তাঁকে জানালেন যে কয়েকটি অপরাধীকে তাঁরা তাঁবুর দরজায় এনেছেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি জবাব দিলেন, আর তা দিলেন লিখে। কর্মসচিবদেরও সে বিষয়ে কিছু নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে অপরাধীদের ভিতরে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। তিনি তাঁদের পরীক্ষা করে অপরাধ স্বীকার করিয়ে নিলেন। ইত্যবসরে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এলেন এবং নবাবকে অত্যন্ত বিনীতভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তিনি কেবল মাথাটি নুইয়ে প্রত্যুত্তর দিলেন। নবাবের সম্মুখে আনীত অপরাধীদের একজন বলপূর্ব্বক একটি বাড়ীতে প্রবেশ করে তিনটি শিশুসহ মাকে হত্যা করেছে। তার শাস্তি বিধান হোল হাত পা সব কখানি কেটে রাজপথে ফেলে রাখা যাতে বাকী জীবনটা দুঃখ দুর্দশায় কাটে। আর একজন রাজপথে ডাকাতি করেছিল। নবাব হুকুম দিলেন তার পেটটাকে কেটে দু' ভাগ করে দিতে। আর তাকে গোবরের স্তূপে নিক্ষেপ করতে। বাকী দুটি লোকের অপরাধ কি তা আমি জানতে পারি নি। তবে দুজনেরই শিরচ্ছেদের আদেশ হয়েছিল।

তারপরে তাঁকে একটু বিশ্রাম নেবার মত অবস্থায় দেখে আমরা জানতে চাইলাম যে আমাদের প্রতি কোন নির্দ্দেশ আছে কিনা। আরও প্রশ্ন করেছিলাম, আমাদের জিনিসপত্র রাজাকে দেখানো যায় কিনা। অর্থাৎ সেগুলি রাজার উপযুক্ত হবে কিনা। তিনি জবাবে বললেন যে আমরা গোলকুণ্ডায় যেতে পারি। তিনি আমাদের হয়ে তাঁর পুত্রকে একখানি চিঠি পাঠাবেন। সে চিঠি আমরা ওখানে হাজির হবার আগেই পৌঁছে যাবে। আমাদের যাত্রা পথে সব বহন করার জন্য তিনি ষোলটি অশ্বারোহীর ব্যবস্থা করে দিলেন। রাস্তায় আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস সরবরাহ করারও আদেশ নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। অবশেষে গান্দী কোটা থেকে তের লীগ দূরে একটি নদীর কিনারায় এসে দেখি যে নবাবের ছাড়পত্র ব্যতীত কোন যাত্রী পারাপার হতে পারে না। এর কারণ সৈন্যরা যাতে দল ত্যাগ করে না যেতে পারে।

অধ্যায় উনিশ

গান্ধীকোটা থেকে গোলকুণ্ডার রাস্তা।

আমরা গান্দী কোটা ত্যাগ করি ১৬ই সকাল বেলায়। আমাদের সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বেশীর ভাগই গোলন্দাজ বাহিনীর লোক। প্রথম দিনের যাত্রাপথে এঁরা আমাদের সাহায্য করেছিলেন। ঐদিন সাত লীগ রাস্তা চলে আমরা বিশ্রাম নিয়ে ছিলুম কোট্রপিল্লীতে।

গোলন্দাজরা আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ১৭ই তারিখে। আমরা তারপর এগিয়ে চললুম ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে। ছয় লীগ দূরে একটী গ্রাম। নাম কোত্তিন। একটি প্রশস্ত নদীর ধারে গ্রামের অবস্থান। নদীটি পার হতেই ঘোড়সওয়ারগণও বিদায় নিলেন। আমরা তাঁদের কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম পান তামাক ইত্যাদি কেনার জন্য। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই তা নিতে রাজী হলেন না। ওখানকার নদী পারাপারের খেয়া নৌকাগুলি কঞ্চির তৈরী গভীর খোল বিশিষ্ট পাত্রের মত। বলদের চামড়ায় আচ্ছাদিত। নৌকোর খোলের মধ্যে কিছু খণ্ড খণ্ড জ্বালানী কাঠের মত জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়। তার উপরে এক খণ্ড পুরোনো মোটা কার্পেট মত কাপড় ছড়ানো থাকে। জিনিসপত্র ভিজে না যায় তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। গাড়ীগুলিকে দু'টি নৌকার মাঝখানে বেঁধে দেয়া হয়। ঘোড়াগুলি জলপথে সাঁতার কেটে এগিয়ে চলে। একজন লোক পেছন থেকে চাবুক মেরে ওদের চালায়। নৌকোয় বসে আর একজন লোক ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকেন। মালবাহী বলদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নদীর ধারে মালপত্র নামিয়েই পশুগুলিকে জলে নামিয়ে [illegible] হয়। ওরা তখন নিজে থেকেই সাঁতার কেটে চলে যায়। নৌকোর চার কোণে চারটি লোক দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে। দাঁড়গুলি চওড়া কাঠে তৈরী; দেখতে ঠিক শাবলের মত। মাঝি মাল্লারা যদি এক সংগে একতালে দাঁড় বৈঠা ফেলতে ও চালাতে না পারে, একজনও যদি তাল কেটে ফেলে, তাহলে নৌকো দু'তিনবার ঘুর পাক খাবে। স্রোতের টানে কখনও হয়ত যাত্রা পথের বিপরীত মুখো চলে যাবে।

১৮ই পাঁচ ঘণ্টা চলার পরে আমরা পোরাইমামিল্লাতে পৌঁছোই। ১৯
পৌঁছেছিলুম শান্তশীলাতে এবং তা নয় লীগ রাস্তা পেরিয়ে।

আরও নয় লীগ পথ চলি ২০শে তারিখে এবং বিশ্রাম নিয়েছিলুম গুড়িমিত্তাতে।

ছয় ঘণ্টা যাত্রা পথে কাটিয়ে ২১শে আমরা রাত্রি যাপন করি কুম্ভম্-এ। এটি হোল গোলকুণ্ডা রাজ্যের সীমান্তবর্তী একটি শহর। মীর জুমলা কর্ণাটিকা জয় করার পূর্ব্বে ওটি গোলকুণ্ডার অন্তর্গতই ছিল।

২২শে সাত লীগ রাস্তা চলার পরে বিশ্রাম নিয়েছিলুম বিমল্লাকোট্টাতে। আমরা মাঝামাঝি রাস্তায় প্রায় চার হাজার স্ত্রী পুরুষের এক জনসমাবেশ দেখেছিলাম। তাঁদের সংগে পাল্‌কী ছিল প্রায় কুড়িটি। প্রতিটি পাল্‌কীতে ছিল একটি করে মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি সাটিনের কাপড়ে ঢাকা। তাতে সোনার কাজ করা। আরও ছিল মখমলের উপরে সোনালী রুপালী জরির ঝালর ইত্যাদি। কতকগুলি পাল্‌কীতে বাহক ছিল চারজন করে। আবার কয়েকটিতে আট ও বার। মূর্ত্তির আকার ওজন অনুসারে বাহকের সংখ্যা কম বেশী হোত। প্রতিটি পাল্‌কীর পাশে একজন লোক ছিল হাত পাখা নিয়ে। পাখার আয়তন বা ব্যাস প্রায় পাঁচ ফুট। নানা রং বেরংএর ময়ূরের পালকে তৈরী। পাখার হাতল লম্বায় পাঁচ ছয় ফুট। হাতলটি সোনা রুপা দ্বারা অলঙ্কৃত। সে কাজ এত ভারি ধরণের যে ফরাসী ক্রাউন মুদ্রার মত। মূর্ত্তির গায়ে যাতে মাছি বসতে না পারে সেজন্যে সকলেই পাখা চালাতে আগ্রহী। মূর্ত্তির ঠিক সংগে আর এক ধরণের পাখা থাকে। সেটি পূর্ব্বোক্তটির চেয়ে বড়, আর হাতল শূন্য। ওটিকে বহন করা হয় ঠিক বন্দুকের মত করে। নানা বর্ণের পাখীর পালক দিয়ে তৈরী। তার কিনারা ধরে সোনা রুপার ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলানো। যে লোকটির হাতে পাখাটি থাকে তিনি মূর্ত্তির ঠিক পাশে পাশে থাকেন মূর্ত্তিকে ছায়া প্রদানের জন্যে। পাল্‌কীর সব আশ পাশ বন্ধ করে দিলে গরম হবে। তাই সব খোলা রেখে পাখা চালানোর ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে পাখাটিকে বেশ জোরে চালানো হয় যাতে ঘণ্টাগুলি বেজে উঠতে পারে। তাঁরা মনে করেন তাতে দেবতা আনন্দ পান। এই জনসম্প্রদায় তাঁদের মূর্ত্তি প্রতিমারাজি নিয়ে এসেছেন বুরহানপুর ও তার আশ পাশ থেকে, আর যাচ্ছেন তাঁদের প্রধান ও প্রিয় দেবতা রামচন্দ্রকে দর্শন করার জন্যে। তিনি

রয়েছেন কর্ণাটিকা রাজ্যের অন্তর্গত একটি অঞ্চলের মন্দিরে। ওখানে আসার আগে তাঁরা প্রায় ত্রিশ দিন পথ চলেছেন। সেই মন্দিরে পৌঁছোতে আরও প্রায় পনের দিন সময় লাগবে।

আমার ভৃত্যদের মধ্যে একজন ছিল বুরহানপুরের লোক। সে ঐ জাতীয় ধর্মে বিশ্বাসী। সে আমার কাছে আবেদন জানালো যাতে দেবমূর্তি-বাহী দলবলের সংগে আমি তাকে যোগ দিতে অনুমতি প্রদান করি। সে আরও জানালো যে বহুদিন আগে থেকেই তাঁর একটি ব্রত বা প্রতিজ্ঞা আছে এই তীর্থ যাত্রায় যোগদানের। তাকে ছুটী দিতে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আমি জানতুম যে ছুটী না দিলেও ঐ দলে অনেক স্বজাতি ও পরিচিত লোক দেখে সে যে করে হোক ছুটী নিয়ে চলে যাবে। যাই-ই হোক্ প্রায় দু' মাস বাদে সে আবার আমাদের কাছে ফিরে এল সুরাটে। ম'সিয়ে জর্ডিন ও আমাকে সে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সংগে এক সময় সেবা করেছিল বলে আমি তাঁকে বিনা দ্বিধায় আবার কাজে বহাল করলাম। তার তীর্থ পরিক্রমা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় সে নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছিল।

আমাকে ছেড়ে চলে যাবার ছয় দিন পরে সমস্ত যাত্রীরা এমন একটি গ্রামে যাত্রা বিরতি করার সংকল্প করেন যেখানে যেতে একটি নদী পার হওয়া দরকার। গ্রীষ্মকালে নদী র জল থাকে অতি সামান্য। ফলে খুব সহজেই পার হওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে ভারতবর্ষে বৃষ্টিধারা এত প্রবল বেগে পড়ে যে মনে হয় যেন খাড়া ধরনের বন্যা নেমেছে। আর এক ঘণ্টার কম সময় মধ্যেই ছোট নদীর জল তিন চার ফুট স্ফীত হয়ে ওঠে। সেই তীর্থ যাত্রীরাও বৃষ্টির মুখে পড়ে গেলেন। নদীর জল এত বেড়ে গেল যে সেদিন আর পার হবার কোন উপায় ছিল না। ভারতবর্ষে হিন্দু যাত্রীদের সংগে কোন খাদ্য বস্তু নেবার প্রয়োজন হয় না। একেতো তাঁরা কোন জীবন্ত জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না, তাছাড়া পথ যাত্রাকালে যে কোন গ্রামে উপস্থিত হলেই প্রচুর চাল, ডাল, ঘি মাখন, ক্ষীর, চিনি, শুকনো নরম সব রকম মিষ্টি মিঠাই পাওয়া যায়। যাত্রীদল নদীর ধারে গিয়ে জল স্ফীতি দেখে যেমন বিস্মিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন তেমনি আরও বিস্ময় বিমূঢ় হলেন সংগে কোন খাদ্য না থাকাতে। বলতে গেলে ছোট শিশুদের খেতে দেবার মতও কিছু ছিল না। এজন্যে তাঁদের মনে খুব খেদ হোল। এই রকম চরম বিপদের সময় প্রধান পুরোহিত যাত্রীদের মাঝখানে বসে

নিজেকে একটি আবরণে আবৃত করে চীৎকার করে বলতে শুরু করলেন যে যাদের কাছে খাদ্য দ্রব্য আছে তারা যেন তাঁর কাছে চলে আসেন। বাস্তবিকই খাদ্য নিয়ে লোক এসে গেল। তিনি তাঁদের প্রশ্ন করলেন কাছে কি পাত্র আছে। তারপর নিজ দেহের আবরণ তুলে বড় একটি হাতা দিয়ে সকলের প্রয়োজন মত খাদ্য বিতরণ করলেন। এইভাবে তিনি প্রায় চার হাজার লোকের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে তাঁদের আত্মাকে শান্তি ও আনন্দ দান করেছিলেন।

এই ঘটনা কেবল আমার ভৃত্যই বর্ণনা করে নি। তারপরে কয়েকবারই আমি বুরহানপুরে গিয়েছি। ওখানকার প্রধান প্রধান লোকেদের সংগে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। আমি তাঁদের কাছেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছিলুম। তারাও রাম! রাম! উচ্চারণ করে শপথ নিয়ে বললেন, ঘটনাটা সত্য। তবে আমি তা বিশ্বাস করতে বাধ্য নই।

আরও কিছু পথ অতিক্রম করে ২৪শে আমরা পৌঁছে যাই ত্রিপুরান্তকম্ নামে একটি স্থানে। ওখানে পাহাড়ের উপরে মস্ত বড় একটি মন্দির। পাহাড়ে ওঠার জন্য খণ্ড খণ্ড পাথরে তৈরী একটি ঘোরানো সিঁড়ি আছে। ছোট পাথর গুলিও দশ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া। মন্দিরে আছে অনেক দৈত্য দানবের মূর্ত্তি। বাকী মূর্ত্তির মধ্যে একখানি সোজাভাবে দাঁড়ান ভেনাসের মূর্ত্তি। তার চারিদিকে রয়েছে অনেকগুলি কামুকতাময় মূর্ত্তি। প্রতিটি মূর্ত্তি একখানি আস্ত পাথরে গঠিত। কিন্তু ভাস্কর্য্য হিসেবে অতি সাধারণ স্তরের।

আরও দু'তিনদিন দীর্ঘ পথ চলেছি। তারপর একটি প্রশস্ত নদী পার হয়েছিলুম বড় ঝুড়ির মত দেখতে একটি নৌকোতে করে। নদীটি পার হতে সাধারণতঃ দিনের অর্দ্ধেক সময় লেগে যায়। নদীতীরে গিয়ে দেখলাম না আছে কোন নৌকো, না অন্য কিছু ব্যবস্থা। দেখা গেল একটি মাত্র লোক রয়েছে। তার সংগেই দর কষাকষি করতে হোল। সে আবার দেখলো আমাদের মুদ্রা খাঁটি কিনা। জোরালো করে আগুন জ্বাললো। সেই আগুনে ফেলে টাকা গুলিকে পরীক্ষা করে নিল। সমস্ত যাত্রীদের সংগেই এই ব্যবহার বিধি। মুদ্রাগুলি আগুনে দিলে যদি কালচে ভাব ধরে তাহলে তার বদলে নতুন দিতে হবে। নতুনগুলিকেও আগুনে পুড়িয়ে লাল করবে। টাকা খাঁটি প্রমাণ হলে তবে সেই অদ্ভুত নৌকো নিয়ে আসার জন্য দলের লোকদের ডাকবে। লোকগুলি এত ধূর্ত্ত প্রকৃতির যে দূরে কোন যাত্রীকে দেখলে আগে

টাকা আদায় করে তবে নৌকোতে তুলবে। টাকা হাতে পেলে তারপর মাঝি মাল্লাদের এনে জড় করবে। নৌকোগুলি তারা কাঁধে করে বয়ে আনে। শেষে জলে ভাসিয়ে মালপত্র সহ যাত্রীদের তুলে নেয়।

এরপর তিনদিন ভ্রমণ যাত্রা করে অক্টোবর মাসের প্রথম দিনটিতে বিশ্রাম গ্রহণ করি আতেনারায়। ওখানে একটি প্রমোদ ভবন আছে। বর্ত্তমান রাজমাতা ওটি তৈরী করিয়েছিলেন। বিরাট একটি চতুষ্কোণ অঙ্গণের চারদিক ঘিরে আছে বহুসংখ্যক কক্ষ কুঠরি এবং তা যাত্রীদের সুবিধার জন্যেই।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। কর্ণাটিকা গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য যেখানেই গিয়েছি, সেখানে দেখেছি কোন চিকিৎসক নেই। কেবল রাজা মহারাজাদের জন্যই কিছু ব্যবস্থা আছে। সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সহরের কিছু সংখ্যক মহিলা বর্ষাকালে মাঠে ক্ষেতে যান গাছ গাছড়া সংগ্রহ করার জন্যে। সেইসব গাছপালা গেরস্থের রোগ ব্যাধি নিরাময়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আর একটি প্রথা দেখেছি। বড় বড় সহরে দু'চার জন লোক কোন জানা জায়গায় বসেন। আর রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা ও তাঁদের আত্মীয় পরিজনগণ সেখানে আসেন রোগ নিরাময়ের নির্দ্দেশ উপদেশ নেবার জন্যে। প্রথমে রোগীদের নাড়ী পরীক্ষা করেন। তারপর কিছু ঔষধ পত্র দেবার ব্যবস্থা থাকে। এজন্যে ছয় পেনি মূল্যও তাঁরা দাবী করেন না। চিকিৎসকগণ ঐ সময়ে মুখে মুখে কিছু আবৃত্তি উচ্চারণও করেন।

২রা অক্টোবর প্রায় চার লীগ রাস্তা অতিক্রম করে আমরা গোলকুণ্ডায় পৌঁছে যাই। ওখানে আমরা জনৈক যুবা বয়স্ক ওলন্দাজ সার্জেনের আবাসে গিয়েছিলুম। সেই ডাক্তারটি সুলতানের অধীনে কর্ম্মরত ছিলেন। বাটাভিয়ার রাষ্ট্রদূত সুলতানের বিশেষ অনুরোধে এঁকে গোলকুণ্ডায় রেখে যান। কারণ সুলতান তখন সর্ব্বদাই মাথাধরায় কষ্ট পেতেন। এজন্যে তাঁর চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে জিহ্বার নীচে চারটি জায়গা থেকে রক্ত নিষ্কাশন করতে হবে। কিন্তু ওখানে একাজ করার উপযুক্ত কোন চিকিৎসক ছিলেন না। দেশীয় লোকদের মধ্যে অস্ত্রোপচার জানা লোক নেই বললেও চলে। ওলন্দাজ সার্জেনের নাম পিটার দেলা। সুলতানের কাজে তাঁকে নিয়োগ করার আগে জেনে নেয়া হয়েছিল যে তিনি রক্ত নিষ্কাশন করতে পারেন কিনা। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, অস্ত্র চিকিৎসায় তার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতান তাঁকে জিহ্বার নিচে থেকে চারটি অংশের রক্ত নিষ্কাশন করতে নির্দ্দেশ দিলেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আট আউন্সের বেশী রক্ত যেন ক্ষরিত না হয়। সুলতানের চিকিৎসকদের এই ছিল নির্দ্দেশ। পিটার দেলা পরদিনই দরবারে এসে হাজির হলেন। তিনজন খোজা ও চারজন বৃদ্ধা রমণী এসে তাঁকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। তারপরে নিয়ে যাওয়া হোল একটি স্নানাগারে। সেখানে তাঁকে সব পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে হয়েছিল, হাত পা ভাল করে ধুয়ে নিতে হোল। শরীরে সুগন্ধি জিনিস মাখিয়ে দিলেন। তাঁর ইউরোপীয় পোষাকের বদলে তাঁকে পরতে হয়েছিল দেশীয় জামা কাপড়। তারপর তিনি চলে গেলেন সুলতানের কাছে। সেখানে ছিল চারটি ছোট ছোট সোনার পাত্র। ওখানে উপস্থিত চিকিৎসকগণ পাত্রগুলিকে ওজন করলেন। ওলন্দাজ সার্জেন সুলতানের জিহ্বার নীচে চারটি জায়গা থেকে রক্ত নিষ্কাশন করলেন এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে যে রক্ত ওজন করে দেখা গেল যে উহা ঠিক আট আউন্স, একটুও কম বেশী নয়। সেই অস্ত্রোপচারের কাজ দেখে সুলতান এত খুসী হন যে তিনি সার্জেনকে এমন তিনশ' মুদ্রা দিলেন যা প্রায় সাতশ' ক্রাউনের সমতুল্য।

যুবতী সুলতানা ও সুলতানজননী বিদেশী সার্জেনের কৃতিত্ব উপলব্ধি করে নিজেদের দেহ থেকেও রক্ত ক্ষরণ করানোর সংকল্প করলেন। আমার মনে হয় রক্ত নিষ্কাশনের প্রয়োজন যা ছিল, তার চেয়েও অধিক হয়েছিল সার্জেনকে দেখার ইচ্ছে ও কৌতূহল। তিনি ছিলেন অতি সুন্দর সুপুরুষ যুবা। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে সুলতানারা কোন বিদেশীকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাননি। তাঁদের যে জাতীয় আবাসে থাকতে হয় তাতে তাঁরা যদি বা দূরের কিছু দেখতে পান, কিন্তু তাঁদের দেখতে কেউ পাবেন না। যাই-ই হোক্, ওলন্দাজ সার্জেনকে এবারেও সেই বৃদ্ধা মহিলারাই নিয়ে গেলেন সেই কক্ষটিতে যেখানে সুলতানের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। এবারেও আগেকার মতই পোষাক পরিবর্ত্তন, ধোয়া মোছা, সুগন্ধি দ্রব্য মাখানো সব হোল। তারপরে হোল একটি পর্দা খাটানো। সেই পর্দার ফাঁক দিয়ে সুলতানা তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং রক্ত নিষ্কাশন হোল। সুলতান জননীরও ঠিক ঐভাবে রক্ত ক্ষরণ করা হয়েছিল। সুলতানা সার্জেনকে দিলেন পঞ্চাশটি মুদ্রা, আর রাজমাতা দিলেন ত্রিশটি এবং সোনালী জরির কাজকরা কিছু কাপড় চোপর।

দু'দিন পরে আমরা নবাব নন্দনের সংগে দেখা করতে যাই। কিন্তু শুনলাম সেদিন তাঁর সংগে আমাদের কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ হবে না। পরের দিনও সেই একই জবাব। অবশেষে খবর নিয়ে জানলুম যে আরও অনেকদিন অপেক্ষায় থাকতে হতে পারে। কারণ তিনি যুবা পুরুষ ও নবাবপুত্র। দরবার ছাড়া আর বিশেষ কোথাও তিনি বড় যান না। যদি যান তা হারামে যুবতীদের সংগ লাভের জন্যে। ওলন্দাজ সার্জেন যখন দেখলেন যে আমাদের কাজে বড়ই বিলম্ব ঘটছে, তখন তিনি সুলতানের মুখ্য চিকিৎসককে এ বিষয় বলার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি আবার সুলতানের মন্ত্রী সভারও ছিলেন সদস্য। তাছাড়া বাটাভিয়ার রাষ্ট্রদূতের সংগে তাঁর বিশেষ একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং সার্জেন দেলাকেও তিনি খুব খাতির সম্মান করতেন। সুতরাং এই অবকাশে প্রধান চিকিৎসক সার্জেনকে কিছু দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। বস্তুতঃই পিটার দেলা এবিষয়ে বলতেই তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। যথেষ্ট সৌজন্য শিষ্টতা প্রদর্শন করে তিনি আমাদের ওখানে উপস্থিতির কারণ জেনে নিলেন। আমাদের মুক্তারাজিও তিনি দেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। তা দেখিয়ে ছিলাম পরের দিন। তিনি জিনিসগুলি দেখে আমাদের থলেতে পুরেই সীলমোহর করালেন। কারণ সুলতানের কাছে যা হাজির করা হবে তা সীলমোহর যুক্ত থাকবে। সুলতানের পরখ করা হয়ে গেলে তাতে আবার পড়বে সরকারী সীল। এরকমটা করা হয় জাল জুয়াচুরি প্রতিরোধ করার জন্যেই। আমরা তখন সীল মোহর করা মুক্তাগুলি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তা সুলতানকে দেখাবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি আমাদের বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন বলেই ঐ ব্যবস্থা আমরা মেনে নিয়েছিলাম।

পরদিন দুপুরের আগে বেলা নয়টা নাগাদ আমরা নদীর ধারে যাই রাজা মহারাজা ও অভিজাতদের হাতীগুলিকে কি ভাবে স্নান করানো হয় তা দেখার জন্যে। হাতীগুলি পেট পর্য্যন্ত ডুবিয়ে জলে নামে, এক পাশে কাৎ হয়ে শুঁড় দিয়ে শরীরের যে অংশ জলের উপরে তাতে বারবার জল ছিটিয়ে দেয়। এইভাবে সমস্ত শরীরটা জলসিক্ত হলে সহিস এসে একখণ্ড ঝামা পাথর দিয়ে পশুটির চামড়া ঘসে ঘসে সব ময়লা তুলে ফেলে। অনেকের ধারনা হাতী একবার শুয়ে পড়লে নিজে থেকে আর উঠতে পারেনা। কিন্তু আমি দেখলাম, সে ধারনা ঠিক নয়। সহিস হাতীর গায়ে ঘসা মাজা করার সময়

ওকে পাশ ফিরতে হুকুম করলো। পশুটি তখুনি সে হুকুম তামিল করলো। এইকরে শরীরের দু'দিক পরিষ্কার হলে ওটি জল ছেড়ে উঠে এল। তারপর সমস্ত শরীরটা শুকনো হতে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ নদীর ধারেই ওরা কাটাবে। এরপর সহিস আবার আসবে একটি পাত্রে কিছু লাল ও হলদে রং নিয়ে। আর তা দিয়ে হাতীর কপাল, চোখের পাশ, বুক ও পশ্চাৎভাগ রঞ্জিত ও বিচিত্র করবে। অবশেষে পশুটির স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ করার জন্য ওর শরীরে নারকেল তেল মাখিয়ে দেয়া হবে। এই সমস্ত কাজ হয়ে গেলে সহিস হাতীর কপালে একখানি গিল্টী করা ফলক দেবেন এঁটে।

১৫ই তারিখে প্রধান চিকিৎসক আমাদের ডেকে পাঠিয়ে সুলতানের সহিযুক্ত সীলমোহর করা আমাদের সেই থলে গুলি ফিরিয়ে দিলেন। সুলতান জিনিস গুলি দেখে শুনে আবার সীলমোহর করে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধে আমরা সে সবের মূল্যও জানিয়েছিলাম। সেখানে জনৈক খোজা হাজির থেকে সব লিখে নিয়েছিলেন। তিনি আমাদের জিনিসের উচ্চমূল্য শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে আমরা গোলকুণ্ডার সুলতানের যে সকল আমির ওমরাহদের এবিষয়ে বলেছি তাঁদের এ সম্বন্ধে না আছে অভিজ্ঞতা, না আছে বিচার বুদ্ধি। সেই খোজাটি প্রতিদিন সুলতানের কাছে যত মূল্যবান জিনিস আসে তা দেখার সুযোগ পান। কাজেই তাঁর কথা শুনে আমি একটু কড়াভাবে বললাম যে তিনি হয়ত একটি যুবা ক্রীতদাসের মূল্য ভাল বুঝতে পারেন। কিন্তু মনিরত্নের মূল্যায়ণ করার শক্তি কোথায়! এই বলে আমি মুক্তা নিয়ে বাসস্থানে ফিরে চলে এলাম।

পরদিন আমরা গোলকুণ্ডা ছেড়ে রওনা হলাম সুরাটের দিকে। এই রাস্তায় উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। আর যেটুকু যা আছে তার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে একটি মাত্র কথা বলার আছে। আমরা গোলকুণ্ডা ছেড়ে প্রায় পাঁচদিন পথ চলেছি, তার দু'তিনদিন মধ্যে সুলতান জানতে পারেননি আমি সেই খোজাটিকে কি বলেছিলাম। তারপরে ব্যাপারটা শুনে চার পাঁচ জন ঘোড়সওয়ার পাঠালেন আমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু তাদের একজন আমাদের কাছে পৌঁছোবার সামান্য আগে আমরা মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করি (বাকী অশ্বারোহীরা দুই রাজ্যের সংযোগ স্থলে ছিল অপেক্ষমান)। এদেশের নিয়ম কানুন সবই আমার জানা ছিল। কাজেই আমরা বলে দিলাম ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্যেই আমাদের ফিরে

যাওয়া সম্ভব নয়। আর বিনীতভাবে সুলতানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। আমার সংগীকেও এবিষয়ে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর সমর্থন নেয়া হোল।

সুরাটে পৌঁছোবার পরে কলেরা রোগের প্রকোপে মঁসিয়ে দে জর্ডিনের মৃত্যু ঘটে। আমি আগ্রাতে গিয়ে শাহজাহানের কাছে সে ঘটনার পূর্ণ বিবরণী দেবার সংকল্প করেছিলুম। তিনি তখন মুঘল সম্রাট। কিন্তু তখুনি গুজরাটের সুবাদার ও সম্রাটের শ্যালক নবাব সায়েস্তা খান তাঁর জনৈক মুখ্য কর্ম্মচারীকে আমার কাছে পাঠালেন আমেদাবাদ থেকে। কর্ম্মচারীটি এসে বললেন যে নবাবের ধারনা আমার কাছে অসাধারণ সব মণিমুক্তা আছে বিক্রীর জন্যে। সুতরাং আমার সাক্ষাৎ পেলে তিনি খুসী হবেন। জিনিসের মূল্য তিনি বাজোচিত ভাবেই দেবেন। সিয়ের দে জর্ডিনের অসুস্থতার মধ্যে আমি নবাবের প্রেরিত সংবাদ পাই। জর্ডিনের মৃত্যুর পরে নবম দিবসে আমি নবাবেব সংগে কথা বলি। বাস্তবিকই তিনি মণিরত্নের গুণাগুণ বিশেষ নির্ভুলভাবেই বিচার করতে পারতেন। আমি তখুনি তাঁর সংগে চুক্তিবদ্ধ হলাম। আমাদের বিশেষ কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটেনি। তবে যে মুদ্রা দ্বারা তিনি মূল্য প্রদান করবেন তার ধরণ সম্বন্ধে কিছু তর্ক উঠেছিল। তিনি আমাকে সোনা ও রূপা, দু প্রকার ধাতুর মুদ্রা মধ্যে যেটি হোক গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। তিনি আবার খানিকটা আভাস দিলেন যে ঘর থেকে অত পরিমাণ রূপা বেরিয়ে যায় তা তিনি ভাল মনে করেন না। তখন আমি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা মূল্য গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। তবে সংখ্যায় তা কম হবে। আমি নবাবের ইচ্ছেই পূরণ করতে রাজী হলাম। তিনি আমাকে অতি চমৎকার সব স্বর্ণমুদ্রা ও তাল সোনা দেখালেন। এরকম সোনার বহর সুদীর্ঘকালে পৃথিবীর বুকে দেখা যায়নি। স্বর্ণ মুদ্রার তখন প্রচলিত মূল্য ছিল চৌদ্দটি রৌপ্য মুদ্রা অর্থাৎ চৌদ্দ টাকার সমান। সেক্ষেত্রে তিনি প্রস্তাব দিলেন আমাকে সাড়ে চৌদ্দ টাকা হিসাবে পাওনা মিটিয়ে দেবেন। আবার বললেন যে আমি যদি চৌদ্দ টাকা চার আনা হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে খুব ভাল হয়। কিন্তু তাতে আমার লাভের অংশ কম হওয়ার আশংকা দেখা গেল। তখন আমি তাঁকে আঁচ দিলাম যে এত বেশী পরিমাণ টাকার বেলায় প্রতিটি স্বর্ণ মুদ্রায় এক চতুর্থাংশ বাদ দেয়া সম্ভব নয়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে খুসী করার জন্যেই আমি রৌপ্য মুদ্রা চৌদ্দটি ও তার এক অষ্টাংশ প্রতিটি স্বর্ণমুদ্রার জন্যে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

অবশেষে মনে হোল যে এত মহানুভব ও জাঁকজমক সম্পন্ন নবাব ও সুলতানদের ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে যেন আর একটু উন্নত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত। আমি আমেদাবাদে থাকতে তিনি প্রতিদিন আমার বাস বাড়ীতে চারটি রুপার থলিপূর্ণ পোলাও পাঠাতেন। সংগে থাকতো আরও চমৎকার সব খাদ্যদ্রব্য। একদিন সম্রাট তাঁকে এত প্রচুর আপেল পাঠালেন যা বয়ে আনতে দশ বার জন লোকের প্রয়োজন হয়েছিল। আমেদাবাদে তা দুষ্প্রাপ্য বলে তিনি আমাকেও এত বেশী সংখ্যক পাঠালেন যার মূল্য তিন চারশ' টাকার কম নয়। এইসব বিষয় ছাড়াও তিনি আমাকে প্রচুর সম্মান সৌজন্য দেখিয়েছেন নানা ব্যাপারে এবং তা অনবরত। প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের জিনিস ও একটি তলোয়ার তিনি আমাকে উপহার দান করেন। আমাকে একটি ঘোড়া প্রদানের সংকল্প করে জানতে চেয়েছিলেন আমার কি রকমটি পছন্দ। আমি বয়স্ক ঘোড়ার পরিবর্তে একটি তেজস্বী যুবা অশ্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম। তারপর তিনি আমাকে এমন একটি ঘোড়া পাঠালেন যেটি এত বেশী লাফ ঝাঁপ দিত যে জনৈক তরুণ ওলন্দাজকে জীনচ্যুত করে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। আমি তখন ওটি সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করতে তিনি আমাকে আর একটি পাঠিয়ে দিলেন। আমি পরে দ্বিতীয়টিকেও বিক্রী করে দিয়েছিলাম।

আমেদাবাদ থেকে আমি চলে এলাম সুরাটে। ওখান থেকে আবার চলে গেলাম গোলকুণ্ডাতে। সেখান হতে গিয়েছিলাম খণির দিকে এবং তা হীরা কেনার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে আবার সুরাটে ফিরে পারস্যে যাবার সংকল্প করি।

অধ্যায় কুড়ি

সুরাট থেকে অর্মাসে প্রত্যাবর্ত্তন। ভীষণ একটি নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং কোন প্রকারে দুর্ঘটনা থেকে আত্মরক্ষা।

হীরকখণি ঘুরে সুরাটে ফিরে যাবার মুখে শুনলাম যে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তার ফলে ওলন্দাজরা তখন আর পারস্যে কোন জাহাজ পাঠাবেন না। ইংরেজদেরও সেই একই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে তাঁরা যে চারখানি জাহাজ পাঠিয়েছেন, সেগুলির প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যই তাঁরা প্রতিমুহূর্ত্তে উন্মুখ। সুতরাং দেখা গেল যে আমার অর্মাসে যাওয়ার জলপথ বন্ধ। ফলে আমাকে আগ্রা ও কান্দাহার হয়ে স্থলপথেই যেতে হবে। কিন্তু সে রাস্তা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া দুর্গম, দুরূহ তো বটেই। কান্দাহারে তখন আবার যুদ্ধও চলছিল। পারসীক ও ভারতীয় সৈন্যরা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ম্মব্যস্ত। আমার তখন প্রধান চিন্তা যে যেখানে কোন কাজকর্ম্ম নেই এমন একটি জায়গাতে আমাকে অনির্দ্দিষ্টকাল বসে কাটাতে হবে।

ঠিক সেই সময়ে ২রা জানুয়ারী বাটাভিয়া থেকে বড় বড় পাঁচখানি জাহাজ এসে পৌঁছোল সুরাটে। তা দেখে আমাদের আনন্দের সীমা রইল না। ওলন্দাজ সেনাপতির সংগে আমার বন্ধুত্ব ছিল বলে আমি নিশ্চিত বুঝলাম যে আমার প্রয়োজনীয় যা কিছু তা পেয়ে যাবো। তবে এতদিনের ভ্রমণে এরকম একটি সেনাধ্যক্ষের সাক্ষাৎ পাইনি। যাঁদের সংগে সাক্ষাৎ হোত তাঁর বেশীরভাগই বাণিজ্য কেন্দ্রের কর্ত্তাব্যক্তি। তাঁরা আমার সংগে বিশেষ সদয় ব্যবহার করেননি। সুযোগ সুবিধে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সাহায্য করেননি। আমি কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁদের নানাভাবে সহায়তা করেছি। আমি যখন খণি অঞ্চলে গিয়েছি তখন তাঁদের জন্যে ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে হীরক নিয়ে এসেছি। কোম্পানীকে না জানিয়ে সেই কাজ করতে হয়েছে। কারণ তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া বেআইনী। তাছাড়া মূল্যবান মণিরত্ন ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতাও ছিলনা। তাঁদের জন্যে যদিও সামান্য, তাহলেও তা করে আমার কোন লাভ হয়নি। পরে বরং সেজন্যে

ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন যাঁর জন্য বাটাভিয়ায় কিছু গণ্ডগোল বাঁধে এবং আমাকেও সেজন্য ভুগতে হয়েছিল। পরে আমি সে বিষয়ে বলবো।

ওলন্দাজরা যে সব জায়গায় থাকতেন আমি সেখানে গিয়ে খুব বেশী সতর্ক হয়ে চলতাম। আর তাঁদের মহিলা সম্প্রদায়কে খুসী করার জন্যে যতদূর সম্ভব করেছি। আমি পারস্য থেকে ভারতে আসার সময় সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট সুরা ও উত্তম ফল সংগে নিয়ে আসতুম। আর আমার সংগে এমন লোক থাকতেন যিনি ভারতে আগত ওলন্দাজদের চেয়ে রান্নার কাজ ভাল জানতেন। সে লোকটি খুব ভাল সুপ ও রুটী তৈরী করতে পারতেন। আমি ওলন্দাজদের তা খাইয়ে আনন্দ লাভ করতুম। এদেশের আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমি যথেষ্ট বর্ণনা দিয়েছি ওলন্দাজ মহিলারা আমাকে বলতেন যে তাঁরা এই ভোজপর্ব্বে খুব খুসী হয়েছেন। এই জাতীয় পার্টিতে আমি তাঁদের স্বামীদের সংগেই নিমন্ত্রণ করতাম।

পূর্ব্বেই বলেছি সুরাটের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন আমার বন্ধু। বাটাভিয়া থেকে আগত পাঁচটি জাহাজের একটিতে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হলেন। তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হই। কিন্তু তিনি আবার আমাকে বললেন যে ইংরেজদের মুখোমুখি হয়ে পড়লে আমার বিপদের আশংকা আছে। আর যুদ্ধকালে সেরকম ঘটনা অনিবার্য্যও বটে। আমার অন্যান্য বন্ধুরাও সেই ভারী বিপদ সম্বন্ধে চিন্তা করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাঁদের অনুরোধে আমি কান দিইনি। সুরাটে কর্ম্মহীন অলস জীবন যাপনের চেয়ে বিপদের আশংকা নিয়ে জাহাজে ওঠাই সিদ্ধান্ত করলুম এবং তা বেশ দৃঢ়তা সহকারে। সেই ওলন্দাজ জাহাজগুলি ছিল রণপোত, বাণিজ্য তরনী নয়। সেজন্যে অধ্যক্ষ হুকুম দিলেন যত দ্রুত সম্ভব তাদের তিন খানি খালি করতে। আর অতি সত্বর জাহাজ তিনটিকে পাঠিয়ে দিতে আদেশ দিলেন সেই চার খানি ইংরেজ জাহাজকে অনুসরণ করার জন্যে। তিনি জানতেন যে ইংরেজ জাহাজ ক'টি মালবোঝাই করে অবশ্যই পারস্য থেকে তখন ফিরে আসবে। আর মালবাহী জাহাজের পক্ষে অন্য জাহাজের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হবেনা। বাকী দু'খানি জাহাজ তিন চারদিন পরে যাত্রা শুরু করবে। কারণ পুরো পাঁচ খানি জাহাজের উপযুক্ত রসদ সংগ্রহ করে ঐ দু'খানিতে তুলতে কয়েকদিন সময় আবশ্যক।

আমি উঠলাম শেষোক্ত দু'খানি জাহাজের একটিতে। যাত্রা শুরু হোল ৮ই জানুয়ারী। ১২ই তারিখে দিউতে পৌঁছোবার আগে আমাদের পূর্ব্বগামী তিনখানি জাহাজকেও দেখতে পেলাম। তখুনি যুদ্ধ মন্ত্রণা সভা বসলো এই বিবেচনার জন্যে যে আমরা কোন পথে এগিয়ে ইংরেজ জাহাজের মুখোমুখি হব। সে জাহাজগুলি সম্ভবতঃ তখন পারস্যে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে তাঁরা বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারিনি। ওলন্দাজদের প্রথম তিন খানি জাহাজ দিউতে পৌঁছোবার মাত্র দু'দিন আগে ইংরেজ জাহাজের বহর দিউ বন্দর ত্যাগ করে গিয়েছে। তখন স্থির হোল যে আমাদের সিন্ধুদেশ হয়ে যাওয়া ভাল। তারপর প্রতিটি জাহাজ দিউর দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে জাহাজস্থিত প্রতিটি কামান দ্বারা গোলা বর্ষণ করে চললো সহরের দিকে তাক্ করে। সহরবাসীরা যখন বুঝলো যে আমরা ওদিকে এগোচ্ছি তখন তাঁরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। আমাদের দিকে তাঁরা মাত্র দু'বার গুলী ছুঁড়তে সাহস পেয়েছিল।

গোলাবর্ষণের পরে আমরা সিন্ধুদেশের পথে চললাম। জানুয়ারীর বিশ তারিখে আমরা সিন্ধুতে পৌঁছোলাম। আর একটি নৌকো পাঠিয়ে দেয়া হোল তীরের দিকে। ওখানে ইংরেজ ও ওলন্দাজ দুইএরই কুঠী ছিল। এই সময় আমাদের জহাজে খবর এল যে মালবাহী ইংরেজ জাহাজগুলি শীঘ্রই ওখানে এসে পৌঁছোবে, এমন আশা করা যাচ্ছে। তখন স্থির হোল যে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আমাদের জাহাজ ওখানে নোঙর করে থাকবে। যদি ঐ ক'দিনের মধ্যে ইংরেজ জাহাজগুলি এসে না পৌঁছোয় তবে আবার সমুদ্রে চলতে থাকবো এবং পারস্য পর্য্যন্ত ওদের সন্ধান করবো।

২রা ফেব্রুয়ারী ভোর হতেই আমরা কয়েকটি জাহাজের আঁচ পেলাম। কিন্তু দূরত্বের জন্য স্পষ্ট দেখতে পাইনি। আর বাতাস প্রতিকূল হওয়াতে ওদের কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয়নি। অনেকে মনে করেছিলেন ওগুলি মৎস্য শিকারের তরণী। কিন্তু ক্রমশঃ ওরা যত এগুলো ততই স্পষ্ট বোঝা গেল যে ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজ। আমাদের আক্রমণ উদ্দেশ্যেই এগিয়ে আসছে। পরে শুনেছিলাম যে কতকগুলি জেলের কাছেই ওঁরা আমাদের জাহাজের খবর পেয়েছিলেন। ওলন্দাজ জাহাজগুলি সাধারণ রণতরী ছিল বলে তাঁরা শুনেছিলেন। তাই তাঁদের আশা ছিল যে সহজেই এগুলিকে ধ্বংস করা যাবে। একথাও সত্য যে এই রকম ছোট ওলন্দাজ

পোত ইতিপূর্ব্বে তাঁরা দেখেননি। আর এগুলি মুখ্যতঃ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তৈরী নয় বলে কোন উঁচু প্রাচীর গোছেরও কিছু ছিলনা। তার ফলে বাইরে থেকে আরও ছোট দেখাত। তাহলেও জাহাজগুলি ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন।

আমাদের নৌ সেনাপতির কামান ছিল আটচল্লিশটি। বিশেষ প্রয়োজনে ষাটটি ব্যবহার করতেন। লোক লস্কর ছিল একশ' কুড়ি জন। বেলা ৯টার মুখে দেখা গেল ইংরেজরা সমস্ত জাহাজ নিয়ে এগিয়ে আসছে। তাঁরা খুব বেশী দূরে নয় দেখে আমরা আর সময় ক্ষেপ না করে নোঙর তুলে শিকল সব কেটে এগিয়ে চলার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু হাওয়ার গতি আগের মতই পুরোমাত্রায় প্রতিকূল হওয়াতে আমরা শত্রুপক্ষের দিকে এগোতে সক্ষম হইনি। ওঁরা ছিলেন বাতাসের অনুকূল গতিমুখে। সুতরাং তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দে এগোতে লাগলো। আর ওদের মধ্যে নৌধ্যক্ষ ও উপনৌধ্যক্ষ নিজেদের পোত ওলন্দাজদের বেশ কাছে এগিয়ে নিয়ে এলেন। আবার ওলন্দাজ জাহাজের পাশেই নোঙর করার উদ্দেশ্যে অসৎ বুদ্ধিও খেলিয়ে চললেন। সত্যি বলতে কি, আমাদের অধ্যক্ষ এই সংগ্রামে বিশেষ সাহস শক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। উল্টে তিনি জাহাজে উঠে অমন চমৎকার সুযোগ ছেড়ে দিয়ে, শিকল ইত্যাদি কেটে দিলেন পোতটিকে মুক্ত করার জন্যে। সমগ্র বন্দরটি এমন ভাবে আবদ্ধ ছিল যে বাইরে থেকে বোঝাও যায়নি যে জাহাজে কত সংখ্যক কামান আছে।

ইংরেজরাই প্রথমে গোলাবর্ষণ করতে শুরু করেন। আমাদের পক্ষেও তখন পুনরাক্রমণ হোল। এপক্ষের প্রত্যুত্তরও কম জোরালো হয় নি। খানিক পরে গোলাবর্ষণ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষের উপ সেনাপতি আবার বন্দুক চালালেন আমি যে জাহাজটিতে ছিলুম সেটিকে তাক্ করে। আমাদের নেতা খানিকক্ষণ সংযত থেকে গুলি চালান নি। দু' পক্ষ পাশা পাশি আসার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। আমাদের পক্ষে দশ জনের প্রাণ হানি ঘটলো। এরপরে আমরা একেবারে শত্রুর কাছে গিয়ে পড়লাম। ব্যবধান ছিল মাত্র পিস্তলের গুলী ছুঁড়বার মত। তখন আমরা দলপতিকে আমাদের সমস্ত বন্দুক দিয়ে গুলী ছুঁড়তে সাহায্য করলাম। ফলে ওদের জাহাজের একটি মাস্তুল ভেঙ্গে পড়লো। দুই পক্ষের জাহাজ কাছাকাছি হতে আমাদের সহকারী নাবিক ও আমি দু' জনে মিলে এত দুর্দান্তভাবে

কামান দাগতে শুরু করলাম যে ইংরেজ নৌধ্যক্ষের কেবিনে যে বারুদ সঞ্চিত ছিল তাতে আগুন ধরে গেল। আর ইংরেজদের মনে আশংকা হোল যে তাঁদের জাহাজটি পুরো আগুনের কবলে পড়ে যাবে। আমাদের দলপতির মনেও নানা শংকা হতে তিনি সমস্ত নাবিকদের জাহাজের মধ্যে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজরা তাদের জাহাজের আগুন নেভাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মাঝি মাল্লাদের দশ বার জন নিখোঁজ হলেন। আমাদের দলপতি এই ঘটনাটিতে খুব মর্য্যাদা লাভ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু দু' তিন দিন পরেই দেহে আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ইতিমধ্যে আমাদের আর একটি জাহাজ প্রায় ত্রিশটি কামানসহ বিরাট একটি ইংরেজ পোতকে ভয়ানকভাবে আক্রমণ করলো। সে জাহাজটি সতর্ক ছিল না। ফলে ক্ষতি হয়েছিল খুব বেশী। আমি যে জাহাজে ছিলুম সেটিও এগিয়ে গেল সেই ইংরেজ জাহাজটিকে একেবারে জলের অতলে ডুবিয়ে দেবার জন্যে। আর ওটিকে পুরোপুরি মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হোল। তখন আর ওর আত্মরক্ষার কোন উপায় রইল না। এই অবস্থায় ইংরেজ সেনাপতি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরুপায় মনে করে তখুনি শ্বেত পতাকা নিয়ে জাহাজের উপরে উঠে গেলেন শান্তি ও সহৃদয়তার জন্য। তা মঞ্জুরও হয়েছিল। ছুতোর মিস্ত্রীরা মিলে খুব জোর চেষ্টা চালিয়েছিল কামানের গোলাতে জাহাজে যে ছিদ্র হয়েছিল তা বন্ধ করার জন্য। অনেক জায়গায়ই গর্ত হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে নাবিকরা তাদের দিকে আর বেশী লক্ষ্য রাখছেন না, তখন জাহাজ মেরামতের কাজ বন্ধ করে তাঁরা সিরাজী সুরা পানে ব্যাপৃত হোল। জাহাজের খোলের মধ্যে তা বেশ কিছু পরিমাণেই ছিল। ওলন্দাজরা যতক্ষণে ঐ জাহাজের কাছে না এসেছে ততক্ষণই মাঝি মাল্লা ও মিস্ত্রীরা মিলে সুরাপানেই মত্ত ছিল।

ইতিমধ্যে ত্রিশ চল্লিশ জন ওলন্দাজ ইংরেজ জাহাজটিকে অধিকার করতে এসে পাটাতনে কাউকে দেখতে না পেয়ে নীচে নেমে গেল। সেখানে দেখলেন মাঝি মাল্লারা সকলে পান কার্য্যে মগ্ন। তখন তাঁরাও ওদের পান পর্ব্বে যোগ দিয়ে সব ভুলে বসলেন। খানিক পরেই দেখা গেল জাহাজটি অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। বিজেতা ও বিজিত সকলে একত্রে করলো সলিল সমাধি লাভ। রক্ষা পেয়েছিলেন কেবল ইংরেজ কাপ্তেন ও দু' জন ফরাসী

কাপুসিন। তাঁরা সেই বর্ব্বরদের পানোন্মত্ত দেখে সুযোগ বুঝে একটি নৌকোতে নেমে আমাদের জাহাজে এসে হাজির হলেন। আমরাও তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালাম।

আমাদের মুখ্য নাবিক তখন কাপ্তেনের দায়িত্বভার নিলেন। তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। পরদিন নৌধ্যক্ষ তাঁর জাহাজে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে সমস্ত কাপ্তেন ও নেতৃবৃন্দ সমবেত হয়েছিলেন এই শত্রু বিজয়ের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। সেই সংগে আহার পর্ব্বও সমাধা করলুম। ওখানে উপস্থিত কাপুসিন বিশপরা আমাকে বললেন যে তাঁরা আমার স্বদেশবাসী। সুতরাং আমি যে জাহাজে যাচ্ছি সেটিতে করে যেতেই তাঁদের আগ্রহ। আর নৌধ্যক্ষ যেন তাঁদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দ্দেশ দান করেন। তা মঞ্জুর হয়েছিল। সেই সন্ধ্যায়ই আমি তাঁদের সংগে করে নিয়ে এলাম। তাঁদের আরাম স্বচ্ছন্দ্যের জন্য আমি সাধ্য মত সুব্যবস্থা করতে ক্রুটী করিনি।

পারস্য থেকে ভারতবর্ষে যেসকল জাহাজ যায় তা সাধারণতঃ মদ্য ও টাকায় পূর্ণ থাকে। যে জাহাজটি ডুবে গেল সেটি আরও বেশী জিনিস ও অর্থ নিয়ে এসেছিল। এই কারণেই জাহাজটি যুদ্ধে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিল না। ওটি ডুবে যাওয়াতে অশেষ ক্ষতি হয়েছিল। ওলন্দাজদের আরও সাহস ও রসদ থাকলে হয়ত জাহাজটি বাঁচানো যেত। বাস্তবিক পক্ষে এবং সত্য বলতে কি, ওলন্দাজ নৌধ্যক্ষ ও কাপ্তেনদের অধ্যবসায়ের অভাবেই বন্দীদেরও লাভজনক জিনিস পত্র তাঁরা আয়ত্বে রাখতে পারেন নি। তাঁরা যদি জানতেন যে সেই সুযোগে তাঁরা কত লাভবান হতে পারতেন তাহলে জয় লাভের চেষ্টা আরও জোরদার হোত।

এই সংগ্রামে আমার জীবনও যথেষ্ট সংকটজনক হয়েছিল। আমার পাশেই ছিলেন এমন দু' জন ওলন্দাজ যাঁরা কামানের গুলীতে আহত হয়েছিলেন। আমার অবস্থা তখনই হয়েছিল বিষম সংকটাপন্ন। জাহাজের একটি অংশ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে পড়ে যায়। ফলে একজনার মাথা যায় কেটে; আমার কোটও ছিঁড়ে গিয়েছিল। আমার পাশের জনৈক ওলন্দাজ নিহত হলে তাঁর রক্তে আমার দেহ আপ্লুত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হলে আমরা সিন্ধুদেশের কূলে আবার নোঙর করার উদ্দেশ্যে ফিরে যাই। কিন্তু একটা প্রবল ঝড় উঠলো। সমুদ্র ক্ষিপ্ত হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। আমরা তখন

বাধ্য হয়ে পূর্ব্ব উপকূলে ছয় লীগ উঁচু জায়গায় জাহাজ নোঙর করার জন্যে এগিয়ে গেলাম। ওখানে আমাদের থাকতে হয়েছিল ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত। ঐ সময়টা আমরা কাটিয়েছি আহত ও পীড়িতদের সেবা যত্ন করেই। অনেক আহত ইংরেজ ওখানে মৃত্যু মুখে পতিত হন। অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম সিন্ধু উপকূলে। ওখানে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পানীয় জল ও খাদ্য সংগ্রহ। তাছাড়া ওখানে যে নোঙর ফেলা হয়েছিল তা তুলে নেওয়াও ছিল আর এক উদ্দেশ্য। ২৮শে তারিখ পর্য্যন্ত আমরা ওখানে কাটিয়েছি। তারপরে গোম্বরুণে পৌঁছোই ৭ই মার্চ্চ এবং তা বেশ একটা সুখকর ভ্রমণ যাত্রার পরে।

জাহাজ থেকে নেমে আমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হয়েছিল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। তিনিই আমাকে এবং আরও অনেককে বিষম বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমি অদ্যাবধি প্রতিদিনই তাকে আমার প্রাণের প্রণতি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলেছি।

দ্বিতীয় ভাগ

অধ্যায় এক

হিন্দুস্তানে সংঘটিত শেষ যুদ্ধের বিবরণ। এই যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ও দরবারের অবস্থা।

এই ইতিহাস লিখতে বসে আমি কোন মন্তব্য করবো না। আমিও দেশে থাকতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা আমি কিভাবে জানতে পারি তাও উল্লেখ করতে চাই না। পাঠকদের উপরেই সে বিষয়টি ছেড়ে দিচ্ছি। তাঁরা নিজেদের খুসী মত এ বিষয়ে নীতিগত ও রাজনৈতিক মনোভাব সৃষ্ট করে নেবেন। আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট যে আমি মুঘলদের শক্তিশালী সাম্রাজ্যের একটি নিখুঁত বর্ণনা দিচ্ছি। আর তা দিচ্ছি ওদেশে বসবাসকালে আমি যে বিবরণ লিখে রেখেছিলাম তার উপরে নির্ভর করেই। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় কোন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে এখানে স্থান দিই নি।

বিরাট সুবিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে। এর বিস্তার সিন্ধু নদীর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা থেকে গঙ্গার ওপার পর্য্যন্ত; পূবদিকে এ সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্পর্শ করেছে আরাকান রাজ্য, ত্রিপুরা ও আসামকে। পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেছে পারস্য দেশ ও উজবেকদের তার্তারী পর্য্যন্ত। দক্ষিণে রয়েছে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের সীমানা; আর উত্তরে এই সাম্রাজ্যের সীমা পোঁছে গিয়েছে ককেশাস অঞ্চল পর্য্যন্ত। তার উত্তর পূবদিকে ভুটান রাজ্য। সেখান থেকেই কস্তুরী মৃগনাভী আমদানী হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে চেগাথী বা উজবেক্গণের দেশ (সম্ভবতঃ ক্যাথে অর্থাৎ উত্তর চীন দেশ)।

ভারতবর্ষ দেশটি ও ভারতীয়দের শক্তি ও প্রতিভা সম্বন্ধে অনেকেই লিখেছেন। আমি কিন্তু এখানে আরও গুরুত্বপূর্ণ তবে স্বল্পজানিত বিষয়ের উপরেই বেশী জোর দিচ্ছি। প্রথমে আমি সাধারণভাবে মুঘল নামে পরিচিত ভারতীয় শাসকদের পরিবারবর্গের কথাই উল্লেখ করবো। গোড়াতে যাঁরা এদেশ জয় করেন তাঁরা ছিলেন শেতাঙ্গ। এদেশে জাত ভারতীয়গণ বাদামী বা জলপাইএর মত রঙ-এর মানুষ।

বর্ত্তমান মুঘল সম্রাট ঔরংজেব তিমুর বংশের একাদশ পুরুষ। শ্রেষ্ঠ বীর তিমুর লঙকে সাধারণতঃ তেমারলেন্ বলা হয়। তিমুর লঙের রাজ্য জয়

ও বিস্তার হয়েছিল চীনদেশ থেকে পোলাণ্ড পর্য্যন্ত। তিনি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী খ্যাতিমান ও শ্রেষ্ঠ সব সেনাপতিদের গৌরব মহিমাকে দিয়েছিলেন ম্লান করে।

তাঁর বংশধরগণ সমগ্র ভারত অর্থাৎ সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র অঞ্চল জয় করেছিলেন। ঐ সময় তাঁরা অনেক রাজা মহারাজাকে হত্যা করেন। আজ ঔরংজেবের রাজ্যের বিস্তার হয়েছে গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, দিল্লী, মুলতান, লাহোর, কাশ্মীর, বাংলাদেশ ও আরও নানা অঞ্চলে। আমি এখানে অন্যান্য ছোটখাট রাজা ও সামন্ত যাঁরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছেন ও তাঁকে কর দান করেন, তাঁদের কথা উল্লেখ কচ্ছি না। তিমুর লঙ্গ থেকে বর্ত্তমান শাসক ঔরংজেব পর্য্যন্ত তাঁর বংশধরগণ ও যাঁরা রাজ সিংহাসন অধিকার করেছেন তাঁদের নাম ক্রমান্বয়ে উল্লেখ কচ্ছি :

১। তিমুর লঙ্ অর্থাৎ 'খঞ্জ'। তাঁর একখানি পা ছিল লম্বায় ছোট। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁকে সমাধিস্থও করা হয় সমরকন্দে। এই স্থানটি চেগাথী বা উজবেকদের তার্তারী দেশের অন্তবর্ত্তী।

২। তিমুর লঙের পুত্র মিরাণ শাহ।

৩। মিরাণের পুত্র সুলতান মহম্মদ।

৪। মহম্মদের পুত্র সুলতান আবু সৈয়দ মীর্জা।

৫। সুলতান আবু সৈয়দের পুত্র উমর শেখ মীর্জা।

৬। উমর শেখের পুত্রই হলেন সুলতান বাবর অর্থাৎ কিনা "সাহসী রাজকুমার"। ইনিই ভারতের সর্ব্ব শক্তিমান মুঘল শাসক গোষ্ঠীর প্রথম পুরুষ। ইনি পরলোকগমন করেন ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে।

৭। হুমায়ুন অর্থাৎ 'সুখী'। ইনি বাবরের পুত্র। এঁর মৃত্যু ঘটে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে।

৮। আবদুল ফতে জালালুদ্দিন মহম্মদ। ইনি আকবর নামে সুবিদিত এবং হুমায়ুনের পুত্র। আকবর কথার অর্থ 'শক্তিমান'। তিনি রাজত্ব করেন ৫৪ বছর। পরলোক গমন করেন হিজিরা ১০১৪ সালে, খৃষ্টাব্দ ১৬০৫।

৯। সুলতান সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর বাদশাহ অর্থাৎ জগৎজয়ী। ইনি পিতা আকবরের উত্তরাধিকার লাভ করেন। আর লোকান্তরিত হন ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর পুত্র ছিলেন চারটি—জ্যৈষ্ঠ্য সুলতান খসরু, দ্বিতীয় সুলতান খুরম, তৃতীয় সুলতান পরভেজ ও কণিষ্ঠ শাহরিয়র।

১০। জাহাঙ্গীরের পুত্রদের মধ্যে সুলতান খুরম পিতার সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সুলতান শাহ বেদিন মহম্মদ নামে আগ্রার দুর্গে সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি শাহজাহান অর্থাৎ জগতের অধিপতি নামে স্বেচ্ছায় অভিহিত হন।

১১। ঔরংজেব অর্থাৎ সিংহাসনের অলংকার হলেন বর্ত্তমান মুঘল সম্রাট।

এই পুস্তকে মুদ্রিত প্রতিলিপি দ্বারা বোঝা যাবে যে কি প্রকার মুদ্রারাশি সম্রাটগণ সিংহাসনে আরোহণকালে প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন। আমি মুঘল বাদশাহদের অস্ত্রশস্ত্র ও সীলমোহরের যে বিবরণ দিয়েছি তার প্রতিলিপি মুদ্রিত থাকতো মুদ্রাতে। সবচেয়ে বড় সীলটির মাঝখানে শাহজাহানের প্রতীক চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু ঔরংজেব সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর ঐ রকম সুবৃহৎ মুদ্রা বা সীল আর তৈরী হয় নি। তাঁর আমলের বেশীর ভাগ মুদ্রাই রূপার ; সামান্য কিছু স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল।

একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে মহান মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান ও ধনসম্পদশালী। এঁরা অধীনস্থ রাজ্যের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করে সমস্ত রাজস্ব আদায় করতেন। সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বাদশাহের পক্ষ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। সংগৃহীত রাজস্বের হিসেব পেশ করতে হোত প্রদেশের (সুবা) সুবাদারগণের কাছে। তারপর সুবাদারগণ তা জমা দিতেন মুখ্য-কোষাধ্যক্ষ ও অর্থমন্ত্রীর কাছে। ভারতের এই মহান বাদশাহদের সাম্রাজ্য এত ধনসম্পদশালী, এত উর্ব্বরা ও জনসমৃদ্ধ যে এর তুল্য আর কোন সম্রাট ও সাম্রাজ্যের কথা জানা যায় না।

অধ্যায় দুই

ভারত সম্রাট শাহজাহানের পীড়া ও অনুমিত মৃত্যু। তাঁর পুত্রগণের বিদ্রোহ।

শাহজাহানের অনুমিত মৃত্যু উপলক্ষ্য করে মহান মুঘল বংশের সাম্রাজ্য মধ্যে যে বিদ্রোহ সংঘর্ষ হয়েছিল তার মধ্যে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে যা সারা পৃথিবীর জানা উচিত। এই শ্রেষ্ঠ সম্রাট চল্লিশ বছরেরও অধিক কাল রাজত্ব করেছেন। আর রাজ্য পরিচালনা ও প্রজা শাসনের চেয়েও তিনি বেশী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁর পরিবারের প্রধান পুরুষ ও সন্তানদের পিতা রূপে। তাঁর রাজত্বকালের মহিমা মর্যাদা অতি উচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। সে সময় পুলিশী প্রহরা এত কড়াকড়ি ছিল যে রাস্তায় পথচারীদের নিরাপত্তা ব্যাপারে ও চৌর্য্যাপরাধে কাউকেও কখনও অভিযুক্ত করা বা শাস্তি দেবার প্রয়োজনই হয় নি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি অনেক অবিবেচনার কাজ করেন। তারপর আবার এমন একটি কড়া ধরনের ঔষধ ব্যবহার করেন যার ফলে তাঁর শরীরে ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যু মুখে এগিয়ে যান। সেই ব্যাধির আক্রমণে তিনি দু' তিন মাস হারেমে বেগমদের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় দিনাতিপাত করেন। খুব কচ্চিৎ কখনই ঐ সময়ে লোক চক্ষুতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন; আর তাও দীর্ঘদিন পরে পরে। এই জন্যেই সকলের মনে হয়েছিল তিনি আর জীবিত নেই। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সম্রাটদের প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে জনসমক্ষে আত্ম প্রকাশ করতে হয়। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততঃ পনের দিন অন্তর একবার করতেই হবে।

শাহজাহানের ছয়টি সন্তানের চারটি পুত্র ও দু'টি কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দারাশাহ, দ্বিতীয় সুলতান শুজা, তৃতীয় ঔরংজেব অর্থাৎ বর্ত্তমান সম্রাট, আর কনিষ্ঠ মুরাদ বকস। 'দুই কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা হলেন বেগম সাহিবা, আর কনিষ্ঠার নাম রৌশেনারা বেগম। এদেশের ভাষায় এই নামগুলির এক একটি সম্মানসূচক অর্থ রয়েছে। যেমন, জ্ঞানী, সাহসী, গুণবান ইত্যাদি। আমাদের ইউরোপেও একই প্রথায় রাজা ও রাজকুমারদের নাম ও পদবী স্থির করা হয়। যেমন ন্যায়বান, বলিষ্ঠ, সদালাপী বা শিষ্টাচার সম্পন্ন ইত্যাদি। তবে পার্থক্য কেবল যে ওখানে জন্মের সংগে সংগে নামকরণ

হয় না। জীবনে এই সব গুণ ও শক্তির কিছু পরিচয় দিলে বা পাওয়া গেলে তবে নাম দেয়া হবে যাতে এই চমৎকার নামের মাধ্যমে ভাবীকালের মানুষের মনে তাঁদের স্মৃতি জাগরূক থাকে।

শাহজাহান চার পুত্রকেই সমভাবে স্নেহ করতেন। চারজনকেই তিনি চারটি গুরুত্বপূর্ণ সুবায় সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুবাগুলিকে ছোট খাট রাজ্যও বলা যেতে পারে। সম্রাট জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শাহকে নিজের কাছাকাছি দিল্লী সুবায় রেখেছিলেন। দারাশাহের উপর সিন্ধুদেশের শাসন ভারও অর্পিত হয়েছিল। সেখানে তিনি যখন অনুপস্থিত থাকতেন তখন জনৈক সহকারী শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। সুলতান শুজা বাংলা সুবার ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঔরংজেব গিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্য রাজ্যে; আর মুরাদ বক্স পেয়েছিলেন গুজরাটের শাসন ভার। শাহজাহান এইভাবে চার পুত্রকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাঁদের উচ্চাভিলাস তাতে তৃপ্ত হয়নি। আর সৎবুদ্ধি সম্পন্ন পিতা পুত্রদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্যে যা কিছু পরিকল্পনা করতেন, তা সবই তাঁরা ব্যর্থ করে দিতেন।

শাহজাহান পীড়িত, আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন হারেমে। দীর্ঘদিন জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেননি। গুজব ছড়িয়ে পড়লো তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর ধারনা হোল সকলের যে দারাশাহ পিতার মৃত্যুর ঘটনাকে গোপন রেখেছেন। আর সাম্রাজ্য অধিকারের সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজন সুসম্পন্ন কচ্ছেন। তবে একটা কথা ঠিক যে সম্রাট বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। শেষ মুহূর্ত্তের আর বিলম্ব নেই। তাই তিনি দারাশাহকে হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত ওমরাহ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমবেত করে তিনি যেন পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দারা ছিলেন সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। এ জন্যেই তিনি আরও বলেছিলেন যে আল্লার অনুগ্রহে তাঁর জীবন যদি আরও কিছুদিন রক্ষা পায় তাহলে তাঁর ইচ্ছে যে মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠপুত্রকে তিনি সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার শান্তিপূর্ণভাবে বহন করতে দেখে যাবেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্বন্ধে বাদশাহের মনে এই ইচ্ছে হওয়ার একটি ন্যায় সংগত কারণও ছিল। তিনি কিছুদিন ধরে লক্ষ্য কচ্ছিলেন দারাশাহের তুলনায় অন্যান্য পুত্রদের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা অত্যন্ত কম্।

পিতার ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা জেনে তাঁর প্রতি অতি মাত্রায় শ্রদ্ধাশীল পুত্র উত্তর দিলেন যে তিনি সম্রাটের জীবনরক্ষার জন্যে আল্লার কাছে প্রার্থনা

কচ্ছেন। তিনি আশা করেন যে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হবে। সুতরাং ভগবান সম্রাটের জীবন রক্ষা করলে তিনি কখনই সিংহাসন লাভের কথা কল্পনাও করবেন না। পরন্তু পিতার প্রজারূপে নিজেকে সর্ব্বদা সুখী ও সন্তুষ্ট মনে করবেন। বাস্তবিকই এই রাজকুমার পিতার কাছ থেকে মুহূর্ত্তের জন্যেও কোথাও যেতেন না। পীড়িত পিতাকে সর্ব্বদা সেবা করার জন্যেই তিনি কাছে থাকতেন। তিনি রাত্রিতেও সম্রাটের পালঙ্কের নীচে মেঝেতে গালিচা বিছিয়ে নিদ্রা যেতেন।

যাই হোক—শাহজাহানের মিথ্যামৃত্যু সংবাদ তাঁর অপর তিন পুত্রকে বিচলিত করে তুললো।. তাঁরা প্রত্যেকেই সরাসরি পিতার সিংহাসনে নিজ অধিকার দাবী করলেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বক্স অবিলম্বে সুরাট অধিকারের জন্যে সৈন্য পাঠালেন। সুরাট সমগ্র ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট ও কর্ম্মবহুল বন্দর। সহরটি ছিল অরক্ষিত। কোন বাধাবন্ধ ছিলনা। ছিল কেবলমাত্র কিছু ভাঙ্গা দেয়াল। তাও নানা জায়গায় উন্মুক্ত। কিন্তু যে কেল্লাটিতে ধনরত্ন ছিল তাকে রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছিল দুর্জয়ভাবে। উচ্চাভিলাসী বাদশাহ নন্দনের ছিল অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং দুর্গটি অধিকারের জন্যেই তিনি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। সাবাস খান ছিলেন রাজকুমারের খোজাদলের একজন এবং সেনাপতিও বটে। লোকটি ছিলেন খুব পরিশ্রমী ও শক্তিমান। একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ সেনানায়কের সমস্ত শক্তি ও নৈপুণ্য সহকারে তিনি সেই অবরোধ কার্য্য পরিচালনা করেন।

তিনি কিন্তু পরে দেখলেন যে সৈন্য নিয়ে ওখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। জনৈক ইউরোপীয় দ্বারা তিনি দু'টি বিস্ফোরণ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর প্রথম বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তার ফলে সহরের প্রাচীরের একটি বিরাট অংশ ধূলিসাৎ হয়েছিল। প্রাচীরের ভগ্নস্তূপে পরিখা গেল বন্ধ হয়ে। ফলে অবরুদ্ধদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হোল। কিন্তু অতিক্রত তারা সাহস সঞ্চয় করে প্রায় চল্লিশ দিন আত্মরক্ষা করেছিলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন খুব স্বল্প! ঐ সময় তাঁরা মুরাদ বক্সের সৈন্যবাহিনীর অনেক ক্ষতি সাধন করেন এবং বহু সৈন্য নিহতও হন। সেই ভয়ংকর প্রতিরোধের ফলে সাবাস খান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে দুর্গে অবস্থিত সৈন্যদের স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয় স্বজনের সন্ধান করতে থাকেন যাতে তাদের এনে

স্বপক্ষের সৈন্যদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন আক্রমণের সময়। তাছাড়া স্থানীয় সুবাদারের একটি ভাইকে পাঠালেন একটি প্রস্তাব সহ। প্রস্তাবটি হোল সুবাদার সুবাটি ছেড়ে দিলে উত্তমরূপে পুরস্কৃত হবেন। সুবাদার ছিলেন বাদশাহের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। বাদশাহের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি কোন সুনিশ্চিত সংবাদ পাননি। সুতরাং তিনি জানালেন যে শাহজাহান ব্যতীত আর কাউকে তিনি তাঁর মনিবরূপে গ্রহণ করতে অক্ষম। শাহজাহানই এই দায়িত্ব ভার তাঁকে দিয়েছেন। কাজেই এই দায়িত্ব সম্রাট ছাড়া আর কারোর হাতে দেয়া চলেনা। তবে তাঁর হুকুম পেলে ভিন্ন কথা। মুরাদ বক্সকে রাজকুমার রূপে তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সম্রাটের নির্দ্দেশ না পেলে তাঁর হাতেও এ দায়িত্ব সমর্পণ করতে তিনি অসমর্থ।

খোজা সেনাপতি সুবাদারের দৃঢ় মনোভাব দেখে বিশেষ কঠোর ভাবে ভীতি প্রদর্শন করলেন। তিনি জানালেন একদিনের মধ্যে সহরটি হাতে না পেলে তিনি তাঁদের সকলের স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করাবেন। সে হত্যার ভীতিও অবরুদ্ধদের মনে কোন প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করেনি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের সংখ্যা স্বল্পতা ও দ্বিতীয় বার বিস্ফোরণের আশংকায় সুবাদার কয়েকটি সম্মান জনক শর্ত্তে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সাবাস খানও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে কুণ্ঠিত হননি। তারপর তিনি কেল্লাস্থিত ধনরত্ন বহন করে আমেদাবাদে নিয়ে যান মুরাদের কাছে। মুরাদ সেখানে প্রজা পীড়ন করে অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন।

রাজকুমার সুরাট অধিকারের বার্ত্তা শুনেই একখানি সিংহাসন প্রস্তুত করান। অভিষেকের উপযুক্ত একটি দিন স্থির করে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে কেবল গুজরাটের অধিকর্ত্তারূপেই পরিচয় দিলেন না। সম্রাট শাহজানের সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিশ্বর বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। তিনি স্বনামে মুদ্রাও তৈরী করান এবং সমস্ত সহরে নতুন শাসকও নিযুক্ত করেন। তবে সেই সিংহাসন একটা মিথ্যা মোহের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে অতি সত্বর তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মুরাদ ছিলেন সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাজকুমার। তাঁর রাজদণ্ড ধারণের আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্যায্য। তাই পরবর্ত্তীকালে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল।

কুমার দারা শাহ সুরাট পুনরধিকারের জন্যে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু সেকাজ তাঁর পক্ষে অসাধ্য হোল। কারণ তিনি যে কেবল পীড়িত পিতার সেবায়ই

ব্যস্ত ছিলেন তা নয়। দ্বিতীয় ভ্রাতা শুজার গতিবিধির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হোত। শুজা মুরাদ অপেক্ষা ঢের বেশী শক্তিমান ছিলেন। বিঘ্ন সৃষ্টিও করতেন তিনিই বেশী। শুজা তখন লাহোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আর সমগ্র বাংলা প্রদেশ তো তাঁর হাতের মুঠোতেই ছিল। দারা শাহ কেবল এটুকুই করতে পারলেন। তিনি অতি সত্বর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোকে একটি শক্তিশালী সৈন্য বহর সহ শুজার বিরুদ্ধে পাঠালেন। সেই তরুণ কুমার খুল্লতাতকে বাধা প্রধান করে তাঁকে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত হটিয়ে দিতে সমর্থ হন। আর বাংলা সুবার সীমান্তকে আয়ত্বে এনে সুদৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করে পিতা দারা শাহের কাছে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে মুরাদ বক্স নিজেকে গুজরাটের শাসনকর্ত্তা বলে পরিচিত করে সারা ভারতে নিজ ভ্রাতাদের ধ্বংস সাধনের পরিকল্পনা প্রচার করতে শুরু করলেন। আর অনতিবিলম্বে নিজ সিংহাসন আগ্রা অথবা জাহানাবাদে প্রতিষ্ঠার কল্পনাও করেন।

ইত্যবসরে অন্যান্য ভ্রাতাদের অপেক্ষা উচ্চাভিলাসী ও ধূর্ত্ত বুদ্ধির ঔরংজেব ভ্রাতৃবৃন্দকে তাঁদের শক্তি সম্পদ প্রথম পাতে ব্যয় করার সুযোগ দিলেন। নিজের সমস্ত মতলব ইচ্ছাকে রাখলেন গোপন। সাম্রাজ্য সম্পর্কে ভান করে তিনি ভাব প্রকাশ করলেন যে এতে তাঁর কোন আসক্তি নেই। তিনি সংসার ত্যাগ করে দরবেশ অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগী সাধকের জীবন অবলম্বন করবেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদকে জানালেন যে তিনি অনুভব কচ্ছেন যে তিনি (মুরাদ) রাজত্ব করার জন্যে ব্যগ্র। কাজেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সহায়তা দান করতে তিনি প্রস্তুত। আর সাহসিকতার জন্যে সিংহাসন মুরাদেরই প্রাপ্য। সুতরাং সিংহাসন লাভে বড় প্রতিবন্ধক দারা শাহকে পরাভূত করার কাজে তিনি সৈন্য, অর্থ সম্পদ সবকিছু দিয়েই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সাহায্য করবেন। অনভিজ্ঞ তরুণ রাজকুমার নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধবৎ হয়ে, বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ঔরংজেবের প্রতি অতিমাত্রায় আস্থাবান হলেন। তাছাড়া ঔরংজেবের সৈন্যদের সংগে মিলিত হয়ে রাজধানী আগ্রা দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। দারাশাহ এগিয়ে এসে তাঁদের সম্মুখীন হলেন। যুদ্ধ হোল শুরু। মুরাদের পক্ষে সে যুদ্ধ দুর্ভাগ্যজনক হয়ে উঠলো। কিন্তু অপর দুই ভ্রাতার পক্ষে, বিশেষ করে তৃতীয় ভ্রাতার পক্ষে হোল শুভ লক্ষণযুক্ত।

জ্যেষ্ঠ কুমার সেনানায়কের কথায় কর্ণপাত না করে মনে করলেন যে দুই ভাইকে সময় না দিয়ে আক্রমণ করাই জয়ের পথ সুগম করবে।

সেনানায়কই কিন্তু ছিলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। প্রথম আক্রমণ হয়েছিল ভয়ংকর ও রক্তক্ষয়ী। মুরাদ অসীম সাহসে সিংহের মত যুদ্ধ করেও দেহে পাঁচ পাঁচটি তীরবিদ্ধ হলেন। তিনি যে হাতীটির পিঠে ছিলেন সেটিও রেহাই পায়নি। তীরবিদ্ধ হয়েছিল। দারাশাহের দিকে জয়ের সূচনা মুহূর্ত্তে ঔরংজেব সরে দাঁড়ালেন। আবার কিছু পরেই তিনি দেখলেন যে দারাশাহের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী ও সেনাপতির মৃত্যু হয়েছে; তাঁর সৈন্যদের একটি অংশ বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এই দেখে ঔরংজেব সাহস সঞ্চয় করে আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। আর দারাশাহ দেখলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে সামান্য কয়েকজন সৈন্য ও লোক লস্কর মাত্র রয়েছে। সুতরাং তিনি নিরাশ হয়ে তৎক্ষণাৎ পশ্চাদপদসরণ করে আগ্রায় ফিরে গেলেন। সম্রাট সেখানে তখন কিছুটা আরোগ্য লাভ করেছেন। তিনি পুত্রকে উপদেশ দিলেন দিল্লীর কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিতে। আগ্রায় যা ধন সম্পদ ছিল তা সত্বর অতি বিশ্বস্ত অনুচরদের সাহায্যে সংগে নিয়ে যেতে বললেন।

ঔরংজেবের জয়লাভ হোল। মুরাদ বহু রক্তপাতের ফলে শিবিরে ফিরে গেলেন। ক্ষতস্থানগুলির চিকিৎসা শুশ্রূষার প্রয়োজন ছিল। ঔরংজেবের পক্ষে জয়লাভ সহজ হয়েছিল তাঁর সংগৃহীত অপরিমেয় ধনদৌলতের জন্যেই কেবল নয়। ভারতীয়রা হোল অস্থির চিত্ত ও অকৃতজ্ঞ প্রকৃতির। সৈন্য বাহিনীতে অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক থাকে প্রচুর। দারার পক্ষে সেই রকম লোকের সংখ্যা অধিক হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সৈন্য বাহিনীর মুখ্য ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে পারস্যদেশ থেকে এদেশে পলাতক। তাঁদের কোন বংশ কুলের মর্য্যাদা নেই, হৃদয় বৃত্তি বলেও কিছু থাকে না। যখন যেখানে লাভের আশা বেশী, প্রাপ্তি অধিক হবে, তখনি তারা সেদিকে ঝুঁকে পড়েন।

আসফ খানের (নূরজাহানের ভ্রাতা, পুত্র শায়েস্তা খান। আমি পরে এ বিষয়ে বর্ণনা দেব। ইনি ভগ্নিপতি শাহজাহানের জন্যে সিংহাসনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে রাজকুমার বুলাকিকে (খসরুর পুত্র দাওয়ার বকস) প্রতারণা করেছিলেন। শায়েস্তা খান ছিলেন এই চারটি বাদশাহ নন্দনের মাতুল; এদের মা ছিলেন তাঁর সহোদরা। ইনি এই সময়ে ঔরংজেবের পক্ষে যোগ দিলেন। সংগে নিয়ে এলেন দারাশাহ ও মুরাদের দলত্যাগী বহু সংখ্যক মুখ্য কর্ম্মচারীকে। মুরাদ শেষে উপলব্ধি করলেন যে ঔরংজেবকে বিশ্বাস করা

মারাত্মক ভুল হয়েছে। আরও বুঝলেন যে ঔরংজেব সৌভাগ্যের প্রভাবে তাঁর পরিকল্পনাকে অচিরে কার্য্যকরী করতে পারবেন। ক্রমান্বয়ে মুরাদের মনে ঔরংজেব সম্বন্ধে নানা ধারণা বদ্ধমূল হতে লাগলো। তখন তিনি ঔরংজেবের কাছে সংগৃহীত অর্থ সম্পদের অর্দ্ধাংশ চেয়ে পাঠালেন যাতে তিনি গুজরাটে চলে যেতে পারেন। তদুত্তরে ঔরংজেব আশ্বাস দিয়ে বললেন যে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন লাভে সহায়তা করতে ব্যগ্র এবং এই জন্য তাঁর সংগে পরামর্শ করতে চান। মুরাদ তখন অনেকটা সুস্থ। তিনি ঔরংজেবের সংগে দেখা করতে গেলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁর শক্তি সাহসের উচ্চ প্রশংসা করে বললেন যে তিনি (মুরাদ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হওয়ার যোগ্য।

তরুণ রাজকুমার সেই মিষ্টি মধুর কথায় অভিভূত হলেন। তাঁর খোজা অনুচর সাবাস খান, যিনি তাঁর জন্যে গুজরাট রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম অঞ্চল অধিকার করেছিলেন, তিনি ঔরংজেব সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সঞ্চারের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ঔরংজেব তাঁর জন্যে একটি ফাঁদ পেতেছেন। কিন্তু মুরাদের সে কথা বুঝতে অনেক বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁর ধ্বংস সাধনের সমস্ত আয়োজন ঔরংজেব সম্পন্ন করে ফেললেন। তিনি মুরাদকে একটি ভোজ পর্ব্বে আমন্ত্রণ করলেন। মুরাদ যতই সেখানে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন, অক্ষমতা জানালেন, ঔরংজেবের পীড়াপীড়ি ততই বৃদ্ধি পেল। তরুণ কুমার শেষ পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত হলেন বটে কিন্তু তার মনে ভীতি ছিল। তিনি আশংকা করেছিলেন যে ঐদিনটিই সম্ভবতঃ তাঁর জীবনের শেষ দিন। হয়ত তাঁর জন্যে কোন মারাত্মক বিষও তৈরী থাকতে পারে। তবে সেদিনটি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল ভ্রান্ত। ঔরংজেব সেদিন তাঁর জীবন নাশের কোন চেষ্টা করেন নি। তবে তাঁকে সিংহাসনে আরোহণ ব্যাপারে সহায়তা দানের পরিবর্ত্তে তাঁকে নির্ব্বিঘ্নে গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, তাঁর দেহের ক্ষত নিরাময়ের জন্যেই এই ব্যবস্থা হোল। এইভাবে ঔরংজেব নিজের পরিকল্পনাকে সফল ও সার্থক করে তোলার পথ প্রস্তুত করলেন।

অধ্যায় তিন

শাহজাহানের বন্দী দশা, পিতার প্রতি ঔরংজেবের শাস্তি বিধান।

হুমায়ূনের পৌত্র, আকবরের পুত্র ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর ২৩ বছর অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে রাজত্ব করেছেন। প্রজাপুঞ্জ ও প্রতিবেশীরা সকলেই তাঁকে সমভাবে শ্রদ্ধাপ্রীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর পুত্রদের পক্ষে তাঁর জীবন যেন অতি দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন তাঁদের বয়স এত বেশী হয়েছিল যে তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের যেন আর সময় থাকছে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু লাহোরে একদল শক্তিশালী সৈন্যকে উত্তেজিত করে পিতাকে সিংহাসন চ্যুত করার মনস্থ করেন। সম্রাট পুত্রের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করলেন অবিলম্বে। বিরাট এক বাহিনীসহ তিনি নিজেই এগিয়ে গেলেন লাহোরের দিকে। শেষ পর্য্যন্ত অনেক আমীরওমরাহ ও অনুচরসহ খসরু বন্দী হন। কিন্তু জাহাঙ্গীর ছিলেন অতি সদাশয় প্রকৃতির স্নেহ প্রবণ বাদশাহ। পুত্রের প্রতি স্নেহাশক্তি ছিল অত্যধিক। তাই সেক্ষেত্রে ন্যায্য শাস্তি প্রাণদণ্ড হলেও পুত্রের প্রতি তা তিনি আরোপ করেন নি। কেবল তাঁর চক্ষু নষ্ট করেই ক্ষান্ত হন। আর তা .রা হয়েছিল আমি যে বর্ণনা দিয়েছি তদনুরূপ প্রথায়ই ; অর্থাৎ পারস্যে যেমন করা হোত তেমনি চোখের মধ্যে তপ্ত লৌহ শলাকা প্রবিষ্ট করে। অন্ধ পুত্রকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে সম্রাট একটি সংকল্প মনে পোষণ কচ্ছিলেন যে খসরুর জ্যেষ্ঠপুত্র বুলাকী একদিন মুঘল সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করবে।

খসরুর আরও কয়েকটি পুত্র ছিল। তাদের বয়স ছিল অতি অল্প। সুলতান খুরম যিনি পরে শাহজাহান নাম ধারণ করেন ; তিনি মনে করলেন যে জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্ররূপে সিংহাসনে তাঁর দাবী অধিক। সুতরাং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র যাতে সিংহাসন অধিকার করতে না পারেন তার জন্য বিশেষ চেষ্টা ব্যবস্থা শুরু করলেন। সেজন্যে তিনি সম্রাটের লোকান্তর পর্য্যন্তও অপেক্ষা করেন নি। কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা কারোর কাছে প্রকাশ করেন নি। বরং পিতার ইচ্ছার প্রতিই সমর্থন জানাতেন। জাহাঙ্গীর সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠপুত্রের সন্তানদের কাছে কাছে রাখতেন। শাহজাহান পিতাকে এ বিষয়েও সহায়তা সমর্থন করে তাঁর শুভেচ্ছা লাভ করে চলেছিলেন।

অবশেষে পিতার অনুমতি নিয়ে অন্ধ রাজকুমার অর্থাৎ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দাক্ষিণাত্যে তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলে নিয়ে গেলেন। তিনি সম্রাটের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কাউকে সামনে না রাখাই সমীচিন। তাছাড়া খসরুকে দাক্ষিণাত্যে পাঠালে তিনি সেখানে ঢের বেশী আরামে থাকবেন। সম্রাট খুরমের প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করেন নি। তিনি অনায়াসে সে প্রস্তাবে রাজী হলেন। তারপর সেই হতভাগ্য রাজকুমারকে খুরম হাতের মধ্যে পেয়ে তখুনি মন স্থির করে ফেললেন। তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিজেকে বিপদমুক্ত করলেন। কাজটা করেছিলেন তিনি অতি গোপনে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বাইরে যতদূর সম্ভব বিশ্বাস যোগ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। সে জঘন্য অপরাধ লোক চক্ষুতে ধরা না পড়লেও ঈশ্বরের চোখে পড়েছিল অনিবার্যভাবে। এরপর দেখা যাবে ভগবান তাঁকে সেই অপরাধের শাস্তি থেকে রেহাই দেন নি।

অন্ধকুমার খসরুর মৃত্যুর পরে সুলতান খুরম নিজেকে শাহজাহান অর্থাৎ জগতের রাজা নামে পরিচিত করলেন। আর অবিলম্বে জ্যেষ্ঠভ্রাতার আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে উদ্যোগী হলেন। সম্রাট জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু, নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের জন্যে পুত্রকে শাস্তি প্রদান আবশ্যক বিবেচনা করে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। তখন বিদ্রোহী রাজকুমার নিজের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করে কতকগুলি অপদার্থ অনুচরসহ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে গিয়ে পৌঁছোলেন বাংলাদেশে। সেখানে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করলেন পিতার সংগে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। তারপর গঙ্গা নদী পেরিয়ে রওনা হলেন লাহোর অভিমুখে। তখন স্বয়ং বাদশাহ বহু সংখ্যক শক্তিশালী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন পুত্রকে দমন করার জন্যে। কিন্তু তিনি বয়োবৃদ্ধ। তদুপরি দুই পুত্রের আচরণ ও বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি পেয়ে তিনি পথি মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং শাহজাহানের পক্ষে সিংহাসন লাভের পথ অত্যন্ত সুগম হোল। মৃত্যুর পূর্ব্বে জাহাঙ্গীর তাঁর পৌত্র বুলাকীর খেসরুর পুত্র দাওয়ার বকস) দায়িত্বভার দিয়েছিলেন সাম্রাজ্যের সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী আসফ খানের উপর। তিনিই ছিলেন তখন প্রকৃত শাসক। সম্রাট সমস্ত আমির ওমরাহদের হুকুম দিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর বুলাকিকে যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি সুলতান খুরমকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা

করলেন। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে খুরমের কোন দাবী রইল না।

তাছাড়া সম্রাট আসফ খানকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলেন যে কোন অবস্থাতেই তিনি বুলাকির প্রাণহানি ঘটতে দেবেন না। সম্রাটের হাটুর উপর হাত রেখে এই শপথ গ্রহণ করলেন আসফখান। এই জাতীয় শপথ গ্রহণ একটি ধর্ম্মীয় বন্ধন। কিন্তু সিংহাসন প্রসংগে তা মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াল। শাহজাহান ছিলেন আসফ খানের জ্যেষ্ঠ জামাতা। সুতরাং তাঁর ইচ্ছে আগ্রহ ছিল শাহজাহানের রাজত্ব লাভের দিকে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে শাহজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যার নাম আমি উল্লেখ করেছি। তাঁরা এই আসফখানের দুহিতারই সন্তান।

দরবারে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হলে সকলেই অতি মাত্রায় ব্যথিত হলেন। তৎক্ষণাৎ আমির ওমরাহগণ সম্রাটের শেষ ইচ্ছানুসারে তরুণ সুলতান বুলাকিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে উদ্যত হলেন। এই তরুণ কুমারের দু'টি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। ওবা সম্ভবত ছিলো আকবর পুত্র শাহদানিয়েল সন্তান। কিন্তু তাহলে সম্পর্কে ভাই হয় না, খুল্লাতাত হয়)। সেই দু'টি কুমার জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়েই খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁদের জীবিকা ও ''বনের অবলম্বন। এই দু'টি ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় প্রকৃতির। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে আসফ খানের কুমতলব রয়েছে এই নব নির্ব্বাচিত রাজার বিরুদ্ধে। তারা বুলাকিকে এবিষয়ে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু তার ফলে সেই দুই কুমার হ''লেন প্রাণ আর বুলাকি হারিয়েছিলেন রাজত্ব। তারুণ্যের অনভিজ্ঞতাবশঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দু'টি কুমার তাকে যা বলেছিলেন তার সত্যতা জানার জন্যে তিনি সে বিষয়ে আসফ খানকে প্রশ্ন করলেন। অর্থাৎ তিনি খুল্লাতাত খুরমকে সিংহাসন দান করতে আগ্রহী কিনা।

আসফখান সত্য গোপন করে যাঁরা সেই সংবাদ তাঁকে দিয়েছিলেন তাদের নিন্দা করলেন। অধিকন্তু তিনি বুলাকিকে বললেন যে তিনি তাকে সিংহাসনে বসিয়ে শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও তাঁর প্রতি আজীবন অনুগত থাকবেন। আসফ খানের প্রকৃত মনোভাব কিন্তু জামাতা শাহজাহানের সিংহাসন লাভের দিকেই ছিল। জামাতা সম্বন্ধে আগ্রহ তাঁর সৎ বিচার বুদ্ধিকে করলো পরাভূত। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত হলে রাজ্যে বিঘ্ন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি

হতে পারে এই আশংকায় তিনি সেই খৃষ্টধর্মী দু'টি কুমারকে আয়ত্বে এনে তাদের হত্যা করালেন। তিনি ছিলেন একাধারে সামরিক বাহিনী ও সাম্রাজ্য শাসনের দিকে সর্ব্বাধিনায়ক। কাজেই শাহজাহানের সমর্থনে সকলকে প্রভাবিত করা তাঁর পক্ষে কিছু কঠিন হয় নি। আর সকলের মনের সন্দেহ দূর করার জন্যেই তিনি প্রচার করলেন শাহজাহান মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তাছাড়া তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে পিতা জাহাঙ্গীরের পাশেই সমাধিস্থ করা হবে। এজন্যে তাঁর (শাহজাহান) মৃতদেহ আগ্রায় আনীত হবে। আসফ খানের প্রতারণামূলক ফন্দী বেশ সুনিপুণভাবে কার্য্যকরী হোল।

নব নির্ব্বাচিত বাদশাহ বুলাকিকে শাহজাহানের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ আসফ খান নিজেই দিয়েছিলেন। তরুণ বাদশাহকে তিনি বাদশাহী ভব্যতা ও নিয়মকানুন সম্বন্ধে নানা নির্দ্দেশ উপদেশ দিয়ে বললেন যে শাহজাহানের মৃতদেহ আগ্রারদিকে এগিয়ে এলে শ্রদ্ধাসম্মান প্রদর্শনের জন্যে এগিয়ে যেতে হবে। আর যেতে হবে শবাধার যখন আগ্রা থেকে দু'তিন মাইল দূরে এসে পৌঁছোবে, তখন। এই জাতীয় সম্মান প্রদর্শন মুঘলবংশীয় রাজা বাদশাদের অবশ্য করণীয়। তাছাড়া শাহজাহান হলেন নতুন বাদশাহের খুল্লতাত ও বিগত সম্রাটের পুত্র।

ওদিকে আসফ খানের ব্যবস্থানুযায়ী শাহজাহান আত্মগোপন করে এগিয়ে এলেন। আগ্রার কাছাকাছি এসে তিনি উপযুক্ত নিঃশ্বাস নিতে পারেন এমন অবস্থার মধ্যে আশ্রয় নিলেন একটি শবাধারে। শবাধারটি একটি তাবুর মধ্যে রেখে আনা হোল। সমস্ত মুখ্য কর্ম্মচারী ও মন্ত্রীবর্গ আসফ খানের নির্দ্দেশে যেন শবাধারকে সম্মান দেখাতে এলেন। নতুন বাদশাহ আগ্রা থেকে এলেন আসফখানের সংগে। এই করে পরিকল্পিত সময় হোল আসন্ন। শবাধারের আবরণও হোল উন্মোচিত। শাহজাহান তখন বেরিয়ে এসে সামরিক বাহিনীর সামনে দাঁড়ালেন। সমস্ত সেনাপতি ও উচ্চ কর্ম্মচারীরা তৎক্ষণাৎ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে কুর্নিশ করলেন। আর সংগে সংগে সম্রাটরূপে শাহজাহানের নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো। এইরূপে মুঘল সাম্রাজ্য শাহজাহানের করায়ত্ব হতে কোন বাধা বিঘ্ন রইল না।

তরুণ কুমার বুলাকি এই অবস্থা দেখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তখন পলায়ন ব্যতীত তাঁর সম্মুখে আর দ্বিতীয় কোন পথ বা পন্থা ছিল না। তাঁর

আশে পাশে নিজের বলতে কেউ ছিলেন না; সকলেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। শাহজাহানও তাঁকে অনুসরণ করার চিন্তা চেষ্টা করেননি। ঐ ঘটনার পরে তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতে নানাস্থানে ফকিরের মত ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটিয়েছেন। অবশেষে এই জাতীয় যাযাবর জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে তিনি পারস্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে শাহ সাফাবী তাঁকে অতি সাদরে ও মর্য্যাদাপূর্ণভাবে আপ্যায়ণ করেছিলেন। পারস্য সম্রাট তাঁকে একজন রাজার উপযুক্ত ভাতা প্রদানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি যখন পারস্যে গিয়েছিলুম তখনও দেখেছি যে তিনি পারস্যাধিপতির আনুকূল্য ও সম্মান যত্ন ভোগ করে চলেছেন। তাঁর সংগে আলাপ পরিচয় এবং পান ভোজনের সুযোগও আমার হয়েছিল।

শাহজাহান এইভাবে সিংহাসন অধিকার করে ন্যায্য রাজার পক্ষ থেকে বিঘ্ন বিশৃঙ্খলাকারী সকলকেই হত্যা করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর রাজত্বের প্রথমাংশ নিষ্ঠুর ক্রিয়া কলাপেই চিহ্নিত হয়েছিল। তাঁর ফলে তাঁর জীবনের অনেকখানিই যেন কলঙ্ককালিমা লিপ্ত। রাজত্বের শেষভাগ হয়েছিল অত্যন্ত অশান্তিজনক। সিংহাসনের ন্যায্য দাবী ছিল যাঁর, তাঁকে বঞ্চিত করে তিনি যেমন সম্রাট হয়ে বসেছিলেন, তেমনি নিজের জীবদ্দশাতেই পুত্র ঔরংজেব কর্তৃক নিজেও হয়েছিলেন রাজ্যচ্যুত। পুত্র তাঁকে আগ্রা দুর্গে রেখেছিলেন বন্দী করে। ঘটনাটি সংক্ষেপে এইরূপ :

দারাশাহ দুই ভাই ঔরংজেব ও মুরাদ বক্সের সংগে সামুগড়ের যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। আবার অতি অন্যায় ভাবে মুখ্য রাজকর্মচারীরাও তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। সেই গোলমাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে যেটুকু সম্ভব বাদশাহী ধনসম্পদ নিয়ে তিনিও চলে গেলেন লাহোর সুবায়। সম্রাট তাঁর বিজয়ী পুত্রদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও রাজ্য অধিকারের চেষ্টা এবং তাঁর প্রাণ নাশেরও যে পরিকল্পনা তা ব্যর্থ করার জন্যে আগ্রা দুর্গের মধ্যেই রইলেন। তিনি আরও দেখতে চেয়েছিলেন যে পুত্রদের ঔদ্ধত্য আরও কত সীমাহীন হতে পারে। পূর্ব্বে বর্ণিত অবস্থায়ই ঔরংজেব মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে আগ্রাতে প্রবেশ করলেন। আর ভাবটি দেখালেন যেন বাস্তবিকই শাহজাহান মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন। তিনি আগ্রাতে কেন এলেন তার কারণ বলেছিলেন যে রাজধানী সম্রাটের মৃত্যুতে জনৈক ওমরাহের অধীনে রয়েছে। সুতরাং তার তত্ত্বাবধানের জন্যই তাঁর উপস্থিতি আবশ্যক।

ঔরংজেব যতই পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করছিলেন সম্রাট ততই প্রজাদের জানাবার জন্যে ব্যগ্র হলেন যে তিনি জীবিত। অবশেষে তিনি উপলব্ধি করলেন যে ঔরংজেবকে প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তাঁর এই পুত্রের যেমন অদম্য শক্তি তেমনি তাঁর ভাগ্যও বিশেষ অনুকূল।

ঐ সময় আগ্রার সমস্ত কুয়ো জলাশয়ের জল শুকিয়ে যায়। সম্রাট তখন বাধ্য হয়ে ছোট একটি খিড়কির দরজার সাহায্যে নদী থেকে জল আনিয়ে কাজ চালাতেন। কিন্তু তাও ঔরংজেবের চোখ এড়ায়নি। সম্রাট তাঁর প্রধান গৃহাধ্যক্ষ ফজল খানকে পাঠিয়ে ঔরংজেবকে বললেন যে তিনি তখনও জীবিত রয়েছেন এবং পুত্রের এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত। ফজল খানের মারফতে সম্রাট পুত্রকে আরও বললেন যে পিতার হুকুমে তাঁর দাক্ষিণাত্য সুবায় নিজের রাজ্যে যেন তিনি ফিরে যান। তিনি যেন আগ্রাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন। এখনও যদি তিনি পিতার প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করেন তাহলে অতীতে যা অন্যায় করেছেন তা পিতা সব ক্ষমা করবেন। ঔরংজেব তখনও নিজ ধ্যান ধারণায় অবিচল থেকে ফজল খানকে বললেন যে তিনি সুনিশ্চিত ভাবে জানেন যে পিতা আর ইহলোকে নেই। সুতরাং সিংহাসন লাভের চেষ্টা তাঁর পক্ষে অতি সুসংগত কাজ। অন্যান্য ভ্রাতাদের ন্যায় সিংহাসনে তাঁরও দাবী সমান। বরং তাঁর দাবী যতটা স্বাভাবিক ও ন্যায্য অন্যান্য ভ্রাতাদের ততটা নয়। সেজন্যেই তিনি সিংহাসনের যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। পিতা যদি জীবিতই থাকেন তাহলে তাঁর প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করেন। পিতা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কাজ করার সামান্যতম ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা তাঁর নেই। তবে পিতা যে জীবিত তার সত্যতা উপলব্ধির জন্যে তাঁকে দর্শন করে, তাঁর পাদস্পর্শ করতে চান। তারপর তিনি নিজ শাসন ক্ষেত্রে ফিরে যাবেন এবং পিতার হুকুমেই তিনি চলবেন।

ফজল খান এই উত্তর সম্রাটের কাছে নিয়ে এলেন। তিনি পুত্রের সংগে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আর ফজল খানকে পাঠিয়ে দিলেন ঔরংজেবকে অভ্যর্থনা করে আনয়নের জন্যে। পিতার চেয়ে পুত্র ছিলেন অনেক বেশী ধূর্ত। তিনি ফজল খানকে বললেন যে যতক্ষণ দুর্গ মধ্যে কর্ম্মরত সৈন্যদের সরিয়ে তাঁর নিজের সৈন্য মোতায়েন করা না হবে ততক্ষণ তাঁর পক্ষে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। বাদশাহ নন্দন বেশ যুক্তিপূর্ণ ভাবেই ভীতি গ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন পূর্ব্ব প্রথামত ওখানে প্রবেশ

করলেই বন্দী হবেন। সম্রাট পুত্রের সিদ্ধান্ত শুনে অনন্যোপায় হয়ে সৈন্যদের অপসারণে রাজী হলেন। শাহজাহানের সৈন্যরা কেল্লাত্যাগ করে বেরিয়ে গেল; আর ঔরংজেব তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদের পরিচালনায় নিজ সৈন্য সহ দুর্গে প্রবেশ করলেন। তিনি মহম্মদের উপরে আরও ভার দিলেন সম্রাটকে বন্দী অবস্থায় রাখার। আর ক্রমশঃই পিতার সংগে সাক্ষাতের দিন পিছিয়ে দিয়ে চললেন। কারণ দেখালেন যে একটি বিশেষ শুভ সময়ের জন্যেই তিনি অপেক্ষা কচ্ছেন। একটি শুভ মুহূর্ত্তেই তিনি পিতার চরণ বন্দনা করবেন। কিন্তু তাঁর জ্যোতির্বিদ সেরকম একটি শুভ সময়ের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন না। তাই তিনি আগ্রা থেকে দু'তিন লীগ দূরে গ্রামাঞ্চলে চলে গেলেন। প্রজাবর্গ তাতে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কারণ তাঁরা বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা কচ্ছিলেন সেই শুভ মুহূর্ত্তটির জন্যে যখন পিতা পুত্রের সাক্ষাৎ হয়ে দ্বন্দবিরোধের অবসান ঘটবে।

ঔরংজেবের আসলে পিতার সংগে দেখা করার কোন ইচ্ছেই ছিল না। পরন্তু তিনি আরও অদ্ভুত সব পরিকল্পনা করলেন। পিতার ব্যক্তিগত সব খরচ পত্রকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। দারাশাহ দ্রুত পলায়নের সময় ধনদৌলত যা সংগে নিয়ে গেছেন তা দখল করার চেষ্টায়ও রত হলেন। তাছাড়া ভগ্নী বেগম সাহেবাকেও কেল্লা মধ্যে বন্দিনী করে রাখলেন যাতে তিনি তাঁর প্রিয় পিতার সংগেই দিনগুলি কাটাতে পারেন। পিতার স্নেহানুকূল্যে বেগম সাহেবা যে সকল ধনসম্পদ লাভ করেছিলেন তাও সব ঔরংজেবের হস্তগত হোল।

নিজ পুত্রের হাতে এই লাঞ্ছনা হোল সম্রাটের। ক্রুদ্ধ সম্রাট অনেক চেষ্টা করলেন পলায়নের জন্যে। তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত কিছু সংখ্যক প্রহরীকে তিনি হত্যাও করলেন। তারপর ঔরংজেব আরও কড়া পাহাড়ার ব্যবস্থা করলেন। একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেল যে সেই সময় মহিমান্বিত সম্রাটকে সাহায্য করতে একটি অনুচর ভৃত্যও এগিয়ে আসেনি। সমগ্র প্রজাপুঞ্জ তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁরা যেন নবোদিত সূর্য্যস্বরূপ ঔরংজেবকেই নিজেদের রাজা বলে গ্রহণ করলেন। শাহজাহান জীবিত থেকেও তাঁদের মন থেকে তো বটেই, স্মৃতি থেকেও যেন একেবারে বিলীন হয়ে গেলেন। প্রজাদের মধ্যে কারোর মনে যদি বা সম্রাটের এই দুর্ভাগ্য দেখে বেদনা ব্যথার সঞ্চার হয়েছিল তিনিও ভয়ে আতঙ্কে নীরব থাকতে বাধ্য

হয়েছিলেন। প্রজারা ঐ সময় এমন একজন সম্রাটকে এমন ঘৃণ্যভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন, স্মৃতি থেকেও মুছে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন, যিনি একদা প্রজাপালন করেছেন ঠিক পিতার মত। তিনি এমন কোমল মধুর ব্যবহার করেছেন যা সাধারণতঃ রাজা বাদশাহদের মধ্যে দেখা যায় না। আমীর ওমরাহরা কর্ত্তব্যচ্যুত হলে যদি বা তাঁদের প্রতি কঠোর হতেন, কিন্তু সাধারণ প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল যথেষ্ট। প্রজারাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রীতি প্রদর্শন করতেন সর্ব্বদা। তাহলেও সেই ঘোর বিপদে সংকটে তাঁরা সম্রাটের প্রতি আর কোন শ্রদ্ধা ভালবাসার লক্ষণ দেখালেন না। এইভাবে মহান এক মুঘল সম্রাট তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন শোচনীয় এক বন্দী দশার মধ্যে।

আমি যেবারে শেষে ভারত ভ্রমণে যাই সেই বছরে অর্থাৎ ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি আগ্রা দুর্গে লোকান্তরিত হন। তিনি যে জাহানাবাদ নগরী নির্ম্মাণের কাজ শুরু করেছিলেন তখনও তার কাজ অসমাপ্ত। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ স্থানটি তিনি আর একবার দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ করতে ঔরংজেবের অনুমতি লাভের প্রয়োজন ছিল। কারণ তিনি তো তাঁর হাতেই ছিলেন বন্দী। ঔরংজেব পিতাকে জাহানাবাদে যাওয়া এবং যতদিন খুসী সেখানে থাকার অনুমতি দিতে নারাজ হননি। তবে সেখানেও থাকতে হবে বন্দী অবস্থায়। আর যেতে হবে জল পথে, নৌকোতে করে ছোট্ট সুন্দর অলঙ্কৃত ও সুচিত্রিত একখানি নৌকোতে করে যমুনাতীরে জাহানাবাদের প্রাসাদে তিনি যেতে পারবেন। ঔরংজেবের মনে ভয় ছিল যে পিতাকে হাতীতে চড়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি প্রজাপুঞ্জের সংগে সাক্ষাতের সুযোগ পাবেন। তার ফলে তিনি স্বপক্ষে জনমত গঠন করে পুনরায় সিংহাসন দখল করতে পারেন। শাহজাহান পুত্রের কঠোর নীতির মূল কারণ উপলব্ধি করে জাহানাবাদ যাত্রা বাতিল করে দিলেন।

এই ব্যাপারটিতে সম্রাট এত বেশী ব্যথিত ও পীড়িত হলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন হোল। সেই সংবাদ ঔরংজেবের কর্ণগোচর হতেই তিনি আগ্রায় ছুটে এলেন। প্রথমেই সম্রাটের সমস্ত ধনরত্ন করলেন হস্তগত। তাঁর জীবিত অবস্থায় তিনি তা কখনও স্পর্শ করেননি। বেগম সাহিবারও প্রচুর মূল্যবান মণিরত্ন ছিল। ভগ্নীকে কেল্লার বন্দিনী করার সময় তিনি তা গ্রহণ করেননি। শুধু তাঁর সোনার কণ্ঠাভরণ নিয়েছিলেন। মণিরত্নের ব্যাপারে ঔরংজেব

কিছুটা নীতি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। পিতা পুত্রের সম্পর্ক বিচার করে বেগম সাহিবার মনে এবিষয়ে নানা আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত বোধহয় ভগ্নীর অর্থ সম্পদ গ্রহণ করা সমীচিন মনে করেননি। তিনি ভগ্নীকে জাহানাবাদে দিলেন পাঠিয়ে। আমি বাংলাদেশ থেকে ফিরে যখন আগ্রায় যাই তখন দেখেছিলুম বেগম সাহিবা হাতীতে চড়ে আগ্রা ত্যাগ করে চলেছেন জাহানাবাদের দিকে। কিছুদিনের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়লো-যে বাদশাহ নন্দিনীর মৃত্যু হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর লোকের ধারনা জন্মাল যে বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাঁর জীবনাবসান ঘটানো হয়েছে। এখন দেখা যাক দারাশাহের অবস্থা কি দাঁড়াল। আর হতভাগ্য শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের ফলাফলই বা কি হোল!

অধ্যায় চার

দারাশাহের সিন্ধু ও গুজরাটে পলায়ন। তাঁর সংগে ঔরংজেবের দ্বিতীয় বার যুদ্ধ; তাঁর বন্দীদশা ও মৃত্যু।

পিতার নির্দ্দেশে দারাশাহ অতি দ্রুত আগ্রা দুর্গের ধনরত্ন থেকে কিছু নিয়ে লাহোর রাজ্যে চলে গেলেন। তাঁর আশা ছিল যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আবার সৈন্য বাহিনী গঠন করে ঔরংজেবকে আক্রমণ করতে পারবেন। তাঁর অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচরগণ সেই দুর্দ্দিনেও সর্ব্বদা তাঁর সংগে ছিলেন। আর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান শিকো রাজা রূপের সংগে তাঁর রাজ্যে গিয়েছিলেন সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাঁর সংগে নিয়েছিলেন পাঁচ লক্ষ টাকা, যা আমাদের লিভার মুদ্রায় সাত লক্ষ, পাঁচ হাজারের সমান। এই অর্থ সংগে নেবার উদ্দেশ্য দ্রুত সৈন্য সংগ্রহ করা। কিন্তু অত অধিক পরিমাণ অর্থ রাজা রূপের মনের গতিকে ভিন্ন পথে চালিয়ে নিয়ে গেল। তিনি একটি ঘৃণ্য উপায়ে ষড়যন্ত্র করে সেই অর্থ সব হস্তগত করলেন। তখন সুলেমান শিকোর ভয় হোল যে রাজা হয়ত তাঁকে বন্দী করার চেষ্টাও করতে পারেন। তাই তিনি তখুনি শ্রীনগরে রাজা নকৃতিরাণীর আশ্রয়ে চলে গেলেন। ইনিও হীনতম একটি চক্রান্ত করে কয়েক দিনের মধ্যেই সুলেমানকে ঔরংজেবের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

রাজা রূপের চক্রান্ত বুঝতে দারাশাহের বিলম্ব হোল না। আর বন্ধুরাও সকলে যখন একে একে তাঁকে ত্যাগ করে ঔরংজেবের দিকেই চলে গেলেন তখন তিনি লাহোর ত্যাগ করে সিন্ধু রাজ্যে যাবার উদ্যোগ করলেন। লাহোর কেল্লা ত্যাগ করার আগে তিনি হুকুম দিলেন খাজাঞ্চীখানায় যত সোনা রূপা মণিরত্ন আছে তা সব নদী পথে নৌকো করে বকসারে পাঠিয়ে দিতে। এই স্থানটি সিন্ধু নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। দারাশাহ ওখানে একটি কেল্লা অধিকার করেছিলেন। ছয় হাজার সৈন্যসহ জনৈক বিশ্বস্ত খোজাকে তিনি ওখানে ধন সম্পদের আরক্ষক ও স্থানীয় শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করলেন। তাছাড়া আক্রমণ অভিযান প্রতিরোধ করার মত সবরকম সুব্যবস্থা করে তিনি সিন্ধু প্রদেশে ফিরে গেলেন। সিন্ধুদেশে তিনি অনেক বড় বড় কামান রেখেছিলেন। তারপর তিনি গেলেন কচ্ছ রাজ্যে। সেখানকার রাজাও তাঁকে নানা

রকম চমৎকার সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনটিই কার্য্যকারী হয় নি।

তারপর তিনি গেলেন গুজরাট প্রদেশে। গুজরাট বাসীরা তাঁকে শাহজাহানের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ও বাদশাহ রূপে গভীর শ্রদ্ধা প্রীতি সহকারে অভ্যর্থনা জানালেন। সমস্ত সহরে, বিশেষত সুরাটে তিনি আদেশ জারী করলেন। সুরাটে নিযুক্ত করলেন একজন সুবাদার। কিন্তু কেল্লাধিপতি ছিলেন জনৈক রাজা। তিনি মুরাদ বক্‌সের দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে দারাশাহের কাছে নতি স্বীকার করা সম্ভব হয় নি। পরন্তু মুরাদ ব্যতীত আর কারোর হাতে তিনি কেল্লার দায়িত্ব ভার দিতে অক্ষমতা জানালেন। তাঁর দৃঢ় সংকল্প দেখে তাঁকে বলা হোল যে তিনি যেন কেল্লা মধ্যে শান্তিতে বাস করেন। সহরের শাসনকার্য্যে যেন কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন।

ইতিমধ্যে আমেদাবাদে দারাশাহ সংবাদ পেলেন যে সমগ্র ভারত মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা যশোবন্ত সিংহ ঔরংজেবের পক্ষ ত্যাগ করে তাঁর কাছে আসতে আগ্রহশীল। এমন কি রাজা সাহেব দারাকে তাঁর সৈন্য-সহ এগিয়ে যেতেও আমন্ত্রণ জানালেন। দারাশাহ যখন আমেদাবাদে যান তখন তাঁর সংগে ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য ছিল না। তিনি রাজার প্রতিশ্রুতিতে আস্থাবান হয়ে আজমীরে গেলেন। ঐ স্থানটিই উভয়ের সাক্ষাতের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু যশোবন্ত সিংহ আরও শক্তিমান রাজা জয় সিংহের প্রভাবে নির্দিষ্ট সময়ে আজমীরে গেলেন না। জয় সিংহ ছিলেন পুরোমাত্রায় ঔরংজেবের প্রতি বিশ্বস্ত। যশোবন্ত সিংহ এমন শেষ মুহূর্ত্তে আজমীরে গেলেন যখন সেই হতভাগ্য বাদশাহ নন্দনকে প্রতারণা করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। দুই ভ্রাতার (দারা ও ঔরংজেব) সৈন্য বাহিনী মুখোমুখি হোল। যুদ্ধ চলেছিল তিন দিন। যুদ্ধকালেই যশোবন্ত সিংহ সুস্পষ্ট প্রতারণার ভঙ্গীতে গিয়ে যোগ দিলেন ঔরংজেবের পক্ষে। তা দেখে দারার সৈন্যরা শক্তি সাহস হারিয়ে পলায়নের পথ অবলম্বন করলো। দুই পক্ষেই প্রচুর রক্ত ক্ষয় হোল। ঔরংজেবের শ্বশুর শাহনওয়াজ খান যুদ্ধ ক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন। দুই পক্ষে নিহতের সংখ্যা ছিল আট কি নয় হাজার। আহতের সংখ্যা গণনা করা হয় নি। তার সংখ্যা আরও বেশী।

দারাশাহ তখন নিঃসম্বল। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ভাগ্য বিড়ম্বনার কবলে পড়ে ব্যর্থ। তখন শত্রুর হাতে পড়তে না হয় এই উদ্দেশ্যে তিনি বেগমগণ,

সন্তান সন্ততি সব ও কতক বিশ্বস্ত অনুচর সহ এক শোচনীয় অবস্থায় পলায়নের পথ অবলম্বন করলেন। তিনি যখন আমেদাবাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন তখন এক বেগমের পায়ে একটি দুষ্ট ব্রণ হয়। সেই সময় ফরাসী দেশীয় চিকিৎসক ম`সিয়ে বর্ণিয়ে ঐ পথ ধরে আগ্রা যাচ্ছিলেন মহান মুঘল সম্রাটের দরবার দর্শনের উদ্দেশ্যে। তিনি বেগমের রোগ নিরাময়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ম`সিয়ে বর্ণিয়ে সারা বিশ্বে সুপরিচিত হয়েছিলেন। তার কারণ যেমন তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা, তেমনি তাঁর মনোরম ভ্রমণ বৃত্তান্ত। নিকটেই একজন ইউরোপীয় চিকিৎসক রয়েছেন জেনে দারাশাহ তৎক্ষণাৎ তাঁকে আহ্বান জানালেন। ম`সিয়ে বার্ণিয়ে তখন সুলতানের তাঁবুতে এসে বেগমকে পরীক্ষা করে অতি দ্রুত রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করলেন। হতভাগ্য বাদশাহ নন্দন ম`সিয়ে বার্ণিয়ের কৃতিত্ব দেখে খুসী হয়ে বেশ জোর দিয়েই বলেছিলেন যে তাঁকে কর্ম্ম ব্যাপৃত করবেন। তিনিও হয়ত মুঘল রাজকুমারের অধীনে কর্ম ভার গ্রহণ করতেন। কিন্তু সেই রাত্রেই দারাশাহ সংবাদ পেলেন যে আমেদাবাদে নিযুক্ত সুবাদার তাঁর সেনাধ্যক্ষকে ওখানে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। পরন্ত তিনি ঔরংজেবের পক্ষই সমর্থন কচ্ছেন। এই অবস্থায় দারাশাহকে দ্রুত রাত্রির অন্ধকারে সিন্ধুর পথে অগ্রসর হতে হয়। কারণ তিনি আরও নতুন কিছু চক্রান্তের আশংকা করলেন। তাছাড়া সেই শোচনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন পথ ও পন্থা তিনি দেখতে পান নি।

দারাশাহ সিন্ধুতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল পারস্যে চলে যাবেন। সেখানে দ্বিতীয় শাহ আব্বাস তাঁর জন্যে নানা সুব্যবস্থা করে অপেক্ষমান ছিলেন। অর্থ ও সৈন্য দুই দিয়েই মুঘল রাজকুমারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। কিন্তু দারাশাহ সমুদ্র পথে যাত্রা করতে সাহস পেলেন না এই ভেবে যে হয়ত সেই অনিশ্চিতের পথে যাত্রা তাঁর জন্যে আরও কিছু বিপদ বিপর্য্যয়ের আয়োজন করে রেখেছে। তিনি মনে করলেন স্থল পথে গেলে তাঁর বেগমদের ও সন্তানগণের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকবে। যাই হোক্ তিনি যেন নিজেকেই নিজে প্রতারণা করলেন। পথিমধ্যে ঘটলো আর একটি শোচনীয় ঘটনা। তিনি যখন পাঠানদের রাজ্য মধ্য দিয়ে কান্দাহারের দিকে এগিয়ে যান তখন জুইনখান নামে এক আঞ্চলিক দলপতির হাতে ঘৃণ্যভাবে প্রতারিত হন। এই সর্দ্দারটি কিন্তু একদিন দারার পিতা

শাহজাহানের অধীনে কর্ম্মরত ছিলেন। গুরুতর এক অপরাধে সম্রাট তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। আর সে দণ্ডব্যবস্থা ছিল হাতীর পদতলে পিষ্ট হওয়া। কিন্তু দারার মধ্যস্থতায়ই তখন জুইন খানের প্রাণ রক্ষা হয়। দারার ক্লেশ কষ্ট বাড়ানোর জন্যে তিনি জুইন খানের গৃহে পৌঁছোনোর আগেই তাঁকে একটি দুঃসংবাদ দেয়া হোল পদব্রজে আগত জনৈক দূতের মারফতে। সংবাদঃ দাবার অতি প্রিয় এক বেগমের মৃত্যু হয়েছে। দারাশাহের দুর্দিনে সেই বেগম সর্ব্বদা তাঁর সংগে সংগে থাকতেন। তিনি আরও শুনলেন যে বেগমের মৃত্যু ঘটেছে অত্যন্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় তৃষ্ণার প্রকোপে। তাঁর তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে সেখানে এক বিন্দু জলেরও সন্ধান পাওয়া যায় নি। একথা শুনে রাজকুমার এত শোকবিহ্বল হয়ে পড়লেন যে তিনি মৃতবৎ মাটিতে পড়ে গেলেন। অবশেষে সংগীদের চেষ্টা যত্নে সংগা লাভ করে তিনি গায়েব জামা পোষাক সব ছিডে ফেললেন। প্রাচ্য দেশে এটা এক প্রাচীন প্রথা। ডেভিডও তাঁব পুত্র অব্‌সলোমের মৃত্যু সংবাদ শুনে এই রকমটিই করেছিলেন।

এই হতভাগ্য রাজকুমার তাঁর দুর্ভাগ্য ও বিপদের দিনে সাধারণতঃ অবিচল থাকতেন। কিন্তু এই শোক সংবাদ তাঁকে একেবারে আচ্ছন্ন ও বিহ্বল করে তুললো। আত্মীয় বন্ধুদের সমস্ত সান্ত্বনা সহৃদয়তা বিফল হোল। গভীর শোকের উপযুক্ত পোষাক পরিধান করলেন তিনি। সাস্ ও পাগড়ীর পরিবর্ত্তে তিনি মস্তক আবৃত করলেন একখণ্ড মোটা কাপড়ে। এই জাতীয় শোচনীয় পোষাকে তিনি বিশ্বাসঘাতক জুইন খানের গৃহে আশ্রয় নিলেন। সেখানে একটি তাঁবুতে তিনি বিশ্রামরত অবস্থায় আবার নতুন এক দুঃখ শোকের কবলে পড়লেন। কারণ জুইন খান দারার শিশুবৎ দ্বিতীয় পুত্র শেফার শিকোকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সেই বালক তাঁর ধনুক নিয়ে বিশ্বাসঘাতককে অত্যন্ত সাহসেব সংগে প্রতিরোধ করেন এবং তিনটি লোককে ভূপাতিত করেন। তবে শেষ পর্য্যন্ত বালক একাকী বহু সংখ্যক শত্রুকে রোধ করতে পারেন নি। শত্রুরা দরজা আগলে বালকের সাহায্যের জন্যে অন্য কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয় নি। শত্রুদের গোলমাল শুনে দারাশাহ জেগে উঠলেন। দেখলেন, তাঁর শিশু পুত্রকে পিঠ মোড়া বেঁধে নিয়ে এসেছে। তখনও হতভাগ্য পিতা তাঁর গৃহকর্ত্তার কুচক্রান্ত সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। কিন্তু তাহলেও তিনি কুচক্রী

জুইন খানকে এই কথাগুলি বলে ফেললেন, তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি বললেন, "শেষ কর, শেষ কর। অকৃতজ্ঞ ও ঘৃণ্য অধম তুমি, যে কাজ শুরু করেছ তা সমাপ্ত কর। ঔরংজেবের দুর্মতির কোপে আজ আমি বলি স্বরূপ। কিন্তু মনে রেখ, তোমার জীবন রক্ষার বিনিময়ে আজ আমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চলেছি। আরও মনে রেখ, মুঘলবংশীয় কোন রাজ কুমারকে কেউ কোনদিন হাত পিঠে মুড়ে বাঁধেনি।"

জুইন খান একথা শুনে একটু বিচলিত হলেন। আর শিশু কুমারকে বন্ধন মুক্ত করতে আদেশ দিলেন। দারাশাহ ও তদীয় পুত্রের জন্যে সাধারণ রক্ষীর মাত্র ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তখুনি আবার রাজা যশোবন্ত সিংহ ও আবদুল্লা খানের কাছে জরুরী বার্ত্তা পাঠালেন যে তিনি দারাশাহ ও তাঁর অনুচরবর্গকে বন্দী করেছেন। তাঁরাও সংবাদটি পেয়ে অতি দ্রুত এগিয়ে এলেন রাজকুমারকে পুরোপুরি আয়ত্বে নেবার জন্যে। ইতিমধ্যে জুইন খান দারার অধিকাংশ ধন সম্পদ অধিকার করে ফেললেন। আর তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের উপরে করলেন অকথ্য অত্যাচার এবং তা অতি বর্ব্বরোচিতভাবে।

রাজা ও আবদুল্লা ওখানে পৌঁছে দারাশাহ ও তাঁর পুত্রকে বসালেন একটি হাতীর পিঠে। বেগমদের ও অন্যান্য শিশু সন্তানগণকে আর একটি হাতীতে চাপিয়ে সমস্ত সরঞ্জামসহ তাঁরা এগিয়ে চললেন একেবারে স্বতন্ত্রভাবে ও ভিন্ন পথে। তাঁরা জাহানাবাদে পৌঁছোলেন ৯ই সেপ্টেম্বর। সেই দৃশ্য দেখতে ছুটে এল সমস্ত প্রজাপুঞ্জ। যে রাজ কুমারকে তাঁরা সম্রাটরূপে পেতে চান তাঁকে দর্শন করার জন্যেই তাঁরা এলেন। ঔরংজেব হুকুম দিলেন দারাকে সমস্ত বড় বড় রাস্তা ও জাহানাবাদের বাজার ঘুরিয়ে আনা হোক যাতে তাঁর বন্দীদশা সম্বন্ধে কারোর মনে কোন সন্দেহ না থাকে। ঔরংজেবের ভাবটি দেখা গেল যে তিনি যেন ভ্রাতার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশেষ গৌরবান্বিত হয়েছেন।

বন্দী ভ্রাতার জন্যে ঔরংজেব অসীরগড় দুর্গে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। সমবেত জনতা প্রকৃত ব্যাপারটা জানতেন। দারাই যে সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাও তাঁদের জানা ছিল এবং তাঁকেই তাঁরা সিংহাসনে সমাসীন দেখতেও চান। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার সাহস কারোরই হয় নি। তবে এমন একদল উদার প্রকৃতির সৈন্য ছিলেন যাঁরা এই কুমারের অধীনে কর্ম্মরত থাকাকালে অনেক সাহায্য সদ্ব্যবহার

পেয়েছেন। তাঁদের মনে হোল যে ঐ সময় তাঁকে কিছু সাহায্য করার চেষ্টা করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ নেয়া উচিত। বন্দী রাজকুমারকে মুক্ত করা তাঁদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তাই তাঁরা বিশ্বাসঘাতক জুইন খানের উপরে আক্রমণ চালালেন। জুইন খান সাময়িকভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেও কিছু পরেই তিনি তাঁর জঘন্য অপরাধের প্রকৃত শাস্তি লাভ করলেন। স্বদেশে ফিরে যাবার পথে একটি বন ভূমির মধ্যে তিনি শত্রু হস্তে প্রাণ হারান।

যাই হোক্—ঔরংজেব ছিলেন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ও অসাধারণ কপটাচারী। তিনি সেই ঘটনাকে এমন ভাবে প্রচার করলেন যে তিনি দারাকে বন্দী করার আদেশ আদৌ প্রদান করেন নি। কেবল বলেছিলেন যে তিনি যেন সাম্রাজ্যের সীমা ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু দারা দেশ ত্যাগ করতে রাজী হন নি। আর জুইন খান তাঁর অনুমতি ব্যতীতই অন্যায় ভাবে রাজকুমারকে বন্দী করেছেন। তাছাড়া বাদশাহ তনয়ের সম্মান রক্ষার পরিবর্ত্তে নির্লজ্জভাবে দারার পুত্র শেফর শিকোকে পিঠ মোড়া বেঁধে রেখেছিলেন। সুতরাং এই গুরুতর অপরাধ স্বয়ং বাদশাহের বিরুদ্ধেই করা হয়েছে। অপরাধীদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। সে শাস্তি অবশ্য কিছুটা হয়েছিল জুইন খান ও তাঁর সংগীদের মৃত্যুর মাধ্যমে। জনসমাজে ঔরংজেব যা প্রচার করলেন তা নিছক প্রতারণামূলক। বাস্তবিকই যদি রাজ রক্ত ধারার প্রতি এতটুকু সম্মান বোধ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি মমত্ববোধ থাকতো তাহলে তিনি ঐ সময়েই তাঁর শিরচ্ছেদের হুকুম দিতেন না। তাঁর সেই নির্ম্মম নির্দ্দেশ নিম্নোক্তভাবে তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হয়েছিল।

দারাশাহ রক্ষী পরিবৃত হয়ে তাঁর জন্যে নির্দ্দিষ্ট বন্দীশালায় যাওয়ার পথে একটি মনোরম জায়গায় পৌঁছোলেন। তখন মনে হোল তাঁর চোখে ঘুম নেমে এসেছে। যে তাঁবুতে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হবে তা তখন প্রস্তুত। তাঁর আহার পর্ব্ব শেষ হতে ভৃত্য সৈফ খান তাঁকে মৃত্যু দণ্ডের আদেশ এনে দিল। দারাশাহ কিন্তু তাকে দেখে স্বাগত জানিয়ে বলে উঠেছিলেন যে অতি বিশ্বস্ত জনৈক অনুচরকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। সৈফ খান তদুত্তরে বলে উঠলেন যে-হ্যাঁ, একথা সত্য যে সে পূর্ব্বে তাঁর অধীনে কর্ম্মরত ছিল, কিন্তু উপস্থিত সে ঔরংজেবের ভৃত্য। বর্ত্তমান প্রভু তাকে হুকুম দিয়েছেন জ্যেষ্ঠ কুমারের (দারা) মস্তকসহ ফিরে যেতে হবে। দারা বলে

উঠলেন, "আমাকে তাহলে মৃত্যু বরণ করতে হবে?" সৈফ খান উত্তর দিলেন, "সম্রাটের এই হুকুম। আমি তাই পালন করতে এসেছি।"

শেফার শেকো ঐ তাঁবুতেই পাশের একটি কক্ষে নিদ্রান্বিত ছিলেন। কথাবার্তা ও গোলমাল শুনে সে জেগে উঠলো। কিছু অস্ত্রও টেনে নিতে চেষ্টা করেছিল সে। পিতাকে সাহায্য করাই ছিল তার অদম্য চেষ্টা। কিন্তু সৈফ খানের সংগীদের প্রতিরোধে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। দারাশাহেরও যে বাধা দেবার ইচ্ছে হয় নি, তা নয়। কিন্তু সে চেষ্টাও হয়েছিল বৃথা। তখন তিনি প্রার্থনার জন্যেই কিছু সময় ভিক্ষা করলেন। তা মঞ্জুরও হয়েছিল। ইতিমধ্যে শেফার শিকোকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হোল। তাকে নানাভাবে আনন্দ দানের চেষ্টা চললো একদিকে; আর অন্যদিকে দারাশাহের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হোল। সৈফ খান সেই ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে চলে গেলেন ঔরংজেবের কাছে। ঔরংজেব মনে করলেন ভ্রাতার রক্ত ধারায় তাঁর সিংহাসনের ভিত্তি হবে সুদৃঢ়। এই ভয়ংকর পৈশাচিক ঘটনার পরে শোকাচ্ছন্ন শেফার শিকোকে গোয়ালিয়র দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয় খুল্লতাত মুরাদ বক্সের সংগে অবস্থানের জন্যে। আর দারাশাহের বেগমগণ ও কন্যাদের আবাস নির্দ্দিষ্ট হোল ঔরংজেবের হারেমে। ঔরংজেব তখন মুঘল সিংহাসনে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে অন্যান্য ভ্রাতাদের হত্যা করার চিন্তায় মগ্ন। সুলতান সুজা তখন বাংলা সুবায়। তিনি সেখানে ব্যস্ত ছিলেন সৈন্য সংগ্রহ করে পিতাকে মুক্ত করার চিন্তায়। কেন না সম্রাট তখনও জীবিত এবং আগ্রা দুর্গে বন্দীদশায় চলেছেন কাটিয়ে দিন।

অধ্যায় পাঁচ

ঔরংজেব কি প্রকারে সিংহাসন লাভ করে সম্রাট হন। সুলতান শুজার পলায়ন।

ঔরংজেব পিতা শাহজাহান ও ভ্রাতা মুরাদ বক্সকে বন্দী করলেন। সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিরচ্ছেদ করলেন। তারপর নিজেকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করা তাঁর পক্ষে আর দুরূহ হয় নি। তাঁর সৌভাগ্যও তখন অনুকূল হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সমস্ত আমির ওমরাহরা তাঁকে সমর্থন জানালেন। রাজ্যভার গ্রহণের যে উৎসব তার প্রধান অঙ্গ সিংহাসনে সমাসীন হওয়া। তাতে বিশেষ সময়ও ব্যয়িত হয় না। প্রখ্যাত তৈমুর লঙের আমল থেকে শাহজাহান পর্য্যন্ত সকলের একই ধরা বাঁধা নিয়মে সিংহাসন আরোহণ পর্ব্ব সম্পন্ন হয়েছে। সিংহাসনটিও ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মনোরম ও মূল্যবান। সিংহাসনে আরোহণের ঘটনাটি মুখ্য কাজীর দ্বারা সর্ব্বাগ্রে ঘোষিত হবে, এই ছিল চিরাগত প্রথা। এই বিষয়ে ঔরংজেবকে প্রথমেই একটি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রধান কাজী প্রত্যক্ষভাবেই ব্যাপারটিতে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন যে মহম্মদ প্রবর্ত্তিত আইনে ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তিনি ঔরংজেবের পিতা বর্ত্তমান সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁকে বাদশাহ পদে অভিষিক্ত করতে পারেন না। অধিকন্তু সিংহাসনের প্রলোভনে সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকেও তিনি হত্যা করিয়েছেন। কাজীর সেই তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদের ফলে ঔরংজেব অত্যন্ত বিপন্ন হলেন। তিনি তখন সমস্ত আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের এনে জড় করলেন নিজের ন্যায় পরায়ণতা প্রমাণের জন্যে।

তাঁদের তিনি বললেন তাঁর পিতা বার্দ্ধক্য ও শারীরিক অসুস্থতা ও অক্ষমতার জন্যে শাসনকার্য্যে অপটু হয়ে পড়েছেন। আর তাঁর ভ্রাতা দারাশাহ যাঁর তিনি প্রাণনাশ করিয়েছেন, তিনি তো আইনকানুন মানতে রাজী ছিলেন না। পরন্তু তিনি মদ্য পান করতেন এবং বিধর্ম্মীদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। এই যুক্তিগুলির সংগে ভয়ভীতি মিশ্রিত হয়ে মন্ত্রীসভা তাঁকেই সম্রাট বলে স্বীকার করে নিলেন। তা সত্ত্বেও মুখ্য কাজী তাঁর আদর্শে অবিচল থেকে আপত্তি জানিয়েই চললেন। সুতরাং তাঁকে রাজ্যের শান্তিভঙ্গকারীরূপে কাজীর পদ থেকে বরখাস্ত করা হোল। তাঁর স্থলা-

ভিষিক্ত হলেন নতুন আইন সম্বন্ধে অতি উৎসাহী আর একজন কাজী। আর ঔরংজেবের সিংহাসনে আরোহণের কাজটি সম্পন্ন হোল অতি সত্বর এবং সেই মুহূর্তেই বলা চলে। নবনির্বাচিত কাজীকে ঔরংজেব তৎক্ষণাৎ স্থায়ী-ভাবে বহাল করলেন। তিনি সম্রাট বলে ঘোষিত হয়েছিলেন ২০শে অক্টোবর, ১৬৬০ (উক্ত তারিখটি নির্ভুল নয়। তিনি নিজেকে সম্রাটরূপে প্রথম ঘোষণা করেন ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। তবে তিনি ঐ বছরেই মুদ্রায় স্বনাম মুদ্রিত করেন নি বা রাজ মুকুটও ধারণ করেন নি। এই জন্যেই তারিখটি সম্বন্ধে দ্বিমত)। ঔরংজেব সম্রাট পদে অভিষিক্ত হন একটি মসজিদে। সেখানেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত আমির ওমরাহ ও অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনও করেন সেখানে। জাহানাবাদে সেদিন বিশেষ একটা আনন্দ উল্লাসের প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। অভিষেকের জন্যে সাম্রাজ্যব্যাপী উৎসব আনন্দ হোক এই হুকুম প্রেরিত হয়েছিল। সেই হুকুম মাফিক আনন্দ উৎসব বিশেষ জাঁকালো ভাবেই প্রতিপালিত হয় এবং তা চলেছিল দীর্ঘ দিন ধরে।

যতদিন ভ্রাতা শুজা বাংলাদেশে সৈন্যবাহিনী গঠনে ব্যাপৃত ছিলেন এবং শাহজাহানের মুক্তি সাধনের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, ততদিন ঔরংজেব তাঁর সাম্রাজ্য ও সিংহাসন—কোনটিকেই নিরাপদ মনে করতে পারেননি। তিনি মনে করলেন যে তাঁর সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। তাই তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদের নেতৃত্বে উপযুক্ত এক সৈন্য বাহিনী পাঠালেন শুজার বিরুদ্ধে। ঐ বাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত হোল পারস্য থেকে আগত জনৈক শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা মীর জুমলা। জুমলা যাঁদের অধীনে কর্ম্মরত হতেন তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত হলে নিজ সাহস শক্তি ও কর্ম্মকুশলতার জন্যে ভাবীকালের মানুষের কাছে গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারতেন। কিন্তু প্রতারণা করা ছিল তাঁর স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার। তিনি প্রথমে প্রতারণা করেন গোলকুণ্ডার সুলতানকে। অথচ সেখানেই তাঁর সৌভাগ্যের সৌধ রচিত হয়। তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করেন শাহজাহানের সংগে। আর তাঁর সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই মীর জুমলা এত উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। সারা ভারতবর্ষে আর কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর মত শক্তি সম্পদের অধিকারী বড় একটা হতে পারেননি।

সৈন্যবাহিনীও তাঁকে যেমন ভয় পেত, তেমনি আবার শ্রদ্ধা করতো এবং ভালও বাসত। এদেশীয় প্রথায়ও যুদ্ধ কৌশল জানতেন তিনি অতি

নিখুঁত রূপে। ঐ সময়ে তিনি শাহজাহানকে ত্যাগ করে এসে যোগ দিলেন ঔংরজেবের পক্ষে। কিন্তু সুলতান শুজা যদি সেই সাহসী ও উপযুক্ত সেনা নায়ককে হাতে রাখতে পারতেন তাহলে ঔরংজেবকে ঘায়েল করতে কোন অসুবিধা হোতনা। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত জয় লাভই হোত। দু'পক্ষ যুদ্ধ হোল অনেকবার। জয়লক্ষ্মী এক একবার এপক্ষে ও আবার সেপক্ষে অনুগ্রহ প্রদর্শন করে চললেন।

সুলতান মহম্মদ তখন সেনাপতির পরামর্শে এবং নিজেও দেখলেন যে যুদ্ধ বড় বেশী দিন চলছে, তাই যুদ্ধ রীতি পরিবর্ত্তনের সংকল্প করলেন। তাছাড়া সৈন্যবলের সংগে চতুরতার নীতি মিশ্রিত করলেন দ্রুত শুজাকে নিঃশেষ করার জন্যে। মহম্মদ গোপনে খুল্লতাতের সেনানায়কের সংগে যোগাযোগ করলেন। তাঁকে অতি চমৎকার সব পুরস্কার ও নানা প্রতিশ্রুতি দান করলেন। বিশেষ জোরালোভাবেই তাদের উপর চাপ দিলেন যাতে তারা ঔরংজেবের পক্ষ সমর্থন করেন। পিতাকে তিনি ইসলাম ধর্ম্মের একটি স্তম্ভ স্বরূপ ও তার প্রকৃত রক্ষক বলে অভিহিত করলেন। এইভাবে মহম্মদ শুজার পক্ষীয় সমস্ত প্রধান সেনানায়ক ও সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের হাত করলেন। তাদের যথেষ্ট উপহার উপঢৌকন দিয়ে তাদের সহায়তা লাভের ইঙ্গিতও লাভ করলেন।

এই ব্যাপারটি শুজার পক্ষে মারাত্মক আঘাত। তা সহ্য করার মত শক্তিও তাঁর ছিল না। তাঁর সংগী অনুচরগণ সকলেই ছিলেন বেতনভুক কর্ম্মী। যারা তাঁর বিশেষ সহায়ক ছিলেন তারাও উপলব্ধি করলেন যে এই বাদশাহ তনয়ের আর বেশী কিছু আসা ভরসা নেই। তাঁর অর্থ সম্পদ ও সব নিঃশেষের মুখে। সুতরাং ঔরংজেবের পক্ষ সমর্থনই তাঁরা সুবিধাজনক মনে করলেন। কারণ তারা দেখলেন যে প্রতিপদেই ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না। আর সমস্ত অর্থ সম্পদের অধিকারও তাঁর হাতেই। সুতরাং তাঁর পক্ষে শুজার সমগ্র সৈন্য বাহিনীকে ঘুষ দিয়ে প্ররোচিত করাও কিছু কঠিন ছিল না। ওদিকে শেষ যুদ্ধটির সময় দেখা গেল যে সকলেই শুজাকে ত্যাগ করে গিয়েছে। তিনি তখন স্ত্রী পুত্রাদি সহ পলায়নের পথ গ্রহণ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পন্থা খুঁজে পেলেন না। তাঁর অনুচর সংগীদের কেউই তাঁকে অনুসরণ করেননি বা সংগে যান নি। অথচ তারা এতদিন তাঁর অধীনেই ছিল কর্ম্মরত। পরন্তু নীচাশয়ের মত তারা শুজার পলায়নের পরেই তাঁর

শিবির তাঁবু ভেঙ্গে চুড়ে সব লুঠ করতে শুরু করলো। মীর জুমলা তাদের এই হীন কাজের সুযোগ দিয়েছিলেন তাদের প্রতারণামূলক কর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ। শুজা পরিবারবর্গসহ কয়েকটি নৌকায় আরোহণ করলেন। গঙ্গানদী পার হয়ে কিছুদিন পরে তিনি পৌঁছোলেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্ত্তী আরাকান রাজ্যে। সেখানে গিয়ে একটু হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর ঔরংজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদ ও দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর খবরাখবর ও কর্ম্মপ্রণালী জানারও চেষ্টা করেছিলেন। সুলেমান শিকো তখনও ঔরংজেবকে প্রতিহত করার চেষ্টায় ছিলেন ব্যস্ত।

অধ্যায় ছয়

ঔরংজেব তনয় সুলতান মহম্মদ ও দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর বন্দীদশা।

ঔরংজেব ছিলেন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু তাহলেও একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতিসহ একটি শক্তিশালী সৈন্যবহরের ভার স্বীয় পুত্রের উপর দিয়ে তিনিও প্রতারিত হন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে সেই সেনানায়ক ইতিপূর্ব্বে দু'জন সুলতানকে প্রতারিত করেছেন। সুতরাং ঔরংজেবও সেই রকম ব্যবহার পেতে পারেন এমন আশংকা করা উচিত ছিল। তিনি নানা অন্যায় অপরাধ করে সিংহাসন লাভ করেছেন, পিতাকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দী অবস্থায় রেখেছেন। এক ভ্রাতাকে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয় জন পলায়নের পথ বেছে নিয়েছেন। কাজেই তিনি সর্ব্বদাই ভীতিগ্রস্ত ছিলেন পাছে বিধাতা তাঁর নিজ পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করেন পিতামহের পক্ষ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ঔরংজেব সংবাদ পেলেন সুলতান মহম্মদ অতি-অস্বাভাবিক রকমে চিন্তান্বিত ও বিষন্ন হয়ে পড়েছেন। তখন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হোল যে মহম্মদ পিতাকে ধ্বংস করার কথাই চিন্তা কচ্ছেন। এই বিশ্বাসের ফলে তিনি মীর জুমলার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন। তিনি মীর জুমলাকে স্পষ্ট ভাবেই লিখলেন যে তিনি জানতে পেরেছেন যে সুলতান মহম্মদ গোপনে তার খুল্লতাত শুজার সংগে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। সুতরাং এখন উচিত হচ্ছে তাকে বন্দী করে দরবারে প্রেরণ করা। ঘটনাচক্রে চিঠিখানি মহম্মদের রক্ষীদের হাতে পড়ে যায়। তারা চিঠিখানি নিয়ে তরুণ কুমারের হাতে দেয়। রাজকুমার মানুষটি ছিলেন বিবেচক প্রকৃতির। তিনি ব্যাপারটা মীর জুমলার কাছে গোপন রাখলেন। কারণ তাঁর ভয় হোল যে হয়ত মীর জুমলা পিতার কাছ থেকে সুনির্দ্দিষ্ট হুকুম কিছু পেয়েছেন। আর তা হয়ত তাঁর জীবন সম্বন্ধেই। তখন তিনি গঙ্গা নদী পেরিয়ে শুজার পক্ষে আশ্রয় নেবারই সংকল্প করলেন। তাঁর আশা ছিল পিতার চেয়ে অধিক দয়া-দাক্ষিণ্য তিনি সেখানে পাবেন। তাই তিনি মাছ ধরার ভান করে অতি দ্রুত গঙ্গার কিছু নৌকা প্রস্তুত করালেন। আর অধীনস্থ কিছু উচ্চকর্ম্মচারী সহ নদীর ওপারে শুজার শিবিরে চলে গেলেন।

শুজা তখন আরাকান রাজের আশ্রয়ে যাবার কথা চিন্তা কচ্ছিলেন। কিছু সৈন্য সংগ্রহের অবকাশও তিনি পান। সুলতান মহম্মদ পিতৃব্যের কাছে পৌঁছে তাঁর পদতলে আনত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্যে। তিনি আরও বললেন যে সেই অস্ত্র ধারণের কাজে পিতা তাঁকে বলপূর্ব্বকই বাধ্য করেন। পিতা যে অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করেছেন তাও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু শুজার মনে হোল তাঁর শিবিরে মহম্মদের আগমন ঔরংজেবেরই একটি প্রবঞ্চনামূলক কৌশল আর কি! তিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন গোপনে তাঁর অবস্থা জেনে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা, অসুবিধা ইত্যাদির খবর নেবার জন্যেই। কিন্তু শুজা ছিলেন একজন সৎ ও উদার প্রকৃতির সুলতান। ভ্রাতুষ্পুত্রকে পদতলে দেখে তিনি তখুনি তাকে বুকে তুলে নিলেন। পিতার কবল থেকে তাকে রক্ষা করবেন, এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন তিনি। কয়েকদিন পরে উভয়ে মিলিত হয়ে গঙ্গা পার হলেন। দীর্ঘ একটা ঘোরানো রাস্তা তৈরী করে শত্রু সৈন্যদের চমকিত করে দিলেন। শত্রুরা কিন্তু তাদের আবির্ভাবের আশা করেনি আদৌ। শুজার পক্ষ থেকে আক্রমণ হোল প্রচণ্ড। বহু শত্রু সৈন্য নিহতও হয়েছিল। তারপর দেখলেন যে প্রতিপক্ষ হঠাৎ আক্রমণের ধাক্কা সামলে আরও সৈন্য সমাবেশ করেছে। তখন তাঁরা আক্রমণ যা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আবার গঙ্গা পার হয়ে ওপারে চলে গেলেন। কারণ ভয় হয়েছিল যে হয়ত অগুণতি সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়বেন। তখন আর ইচ্ছেমত রণক্ষেত্র ত্যাগ করা সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে মীর জুমলা ঔরংজেবকে পুত্রের পলায়ন সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই সংবাদে তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেও মীরকে তা জানতে দেন নি। কারণ তাঁর আশংকা হয়েছিল যে সেনানায়কও হয়ত ঠিক সেই প্রবঞ্চনার পথই অবলম্বন করবেন। তাঁর পিতা শাহজাহান ও গোলকুণ্ডার সুলতানের বিরুদ্ধেও তো মীর জুমলা এই পন্থাই গ্রহণ করেন। ঔরংজেব মীর জুমলাকে লিখে পাঠালেন যে তিনি তাঁর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছেন। তিনিই আবার মহম্মদকে কর্ত্তব্যের পথে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। মহম্মদ তখনও তরুণ। তিনি যা করেছেন তা তারুণ্যের উত্তেজনা বশতঃই করেছেন। ঐ বয়সে মানুষ পরিবর্ত্তন প্রিয় হয়, বৈচিত্র্যের প্রতি অনুরাগ জন্মে। মীর জুমলার প্রতি ঔরংজেবের এইরূপে অতি মাত্রায় আস্থা

প্রকাশের ফলে তিনি শুজার কবল থেকে মহম্মদকে মুক্ত করে আনার জন্যে সমস্ত রকম চেষ্টা চালালেন।

তিনি তরুণ রাজকুমারকে বললেন যে তাঁর পিতা সদিচ্ছাই পোষণ কচ্ছেন। আর শুজার কাছে চলে যাবার ব্যাপারটাকে তিনি যদি অন্য ভাবে কাজে লাগাতে পারেন তাহলে তাঁর পিতা তাঁকে খোলা মনে হাত বাড়িয়ে টেনে নেবেন। পুত্রকে এমন কিছু করতে হবে যা ঔরংজেবের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে। মহম্মদ যদি এই নীতি অবলম্বন করে চলেন, তাহলে পিতার স্নেহাধিক্য লাভ করবেন, জীবন তাঁর পিতার আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসায় ধন্য হবে। তরুণ কুমার এইকথা শুনে সহজেই প্রভাবিত হলেন। যে ভাবে তিনি শুজার শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, ঠিক সেই প্রকারে আবার ফিরে চলে এলেন পিতাব কাছে। মীর জুমলা খুব সম্মান সহকারে ও আনন্দ প্রকাশ কবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। আর মহম্মদকে বললেন, পিতার সংগে দেখা হলেই তিনি যেন বলেন যে শুজার ওখানে যাবার কারণ হোল তাঁর সৈন্য শক্তি ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া। সেনাপতি আরও উপদেশ দিলেন অতি দ্রুত তিনি যেন পিতার সংগে দেখা করেন। আর কি কি কাজ এযাবৎ করেছেন তার বিবরণ দিয়ে পুরস্কার লাভ করতেও নির্দ্দেশ দেয়া হোল। ঔরংজেবেরও আদেশ ছিল পুত্রকে সত্বর তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার। সুতরাং ইচ্ছায় হোক বা হুকুমের চাপে হোক মহম্মদ জাহানাবাদের দিকে বওনা হলেন। মীর জুমলার ব্যবস্থানুযায়ী রক্ষীদলসহ মহম্মদ সেখানে পৌঁছে গেলেন। রক্ষী দলের নেতা সম্রাটকে পুত্রের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিলেন। বাদশাহের নির্দ্দেশে তাঁর জন্যে প্রাসাদের বাইরে একটি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হোল। সম্রাট কিন্তু পুত্রকে তাঁর সংগে দেখা করে হস্ত চুম্বন করার অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে দিলেন পুত্রকে যেন জানানো হয় যে তিনি অসুস্থ। তারপর মহম্মদকে যতদিন গোয়ালিয়র দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়নি ততদিন সেই বাসগৃহই তাঁর পক্ষে বন্দীশালায় পরিণত হয়েছিল। ছিন্নমুণ্ড হতভাগ্য দারাশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান শিকোর অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল এবারে তা দেখা যাক্।

পূর্ব্বেও বলা হয়েছে যে সুলতান সুলেমান শিকো রাজা রূপের হাতে প্রতারিত হয়ে শ্রীনগরে স্থানীয় শাসক নকৃতি রাণীর আশ্রয়ে বাস কচ্ছিলেন। এই মুঘল রাজকুমার সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত হতভাগ্য ছিলেন।

ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে বন্য জীবন যাপন করতে হয় যাতে ঔরংজেবের হাতে পড়ে না যান। সমস্ত সৈন্যশক্তি দিয়েও ঔরংজেব তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেননি। নকৃতি রাণী সুলেমানকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে ঔরংজেবকে তাঁর অনিষ্ট করতে দেয়ার চেয়ে তিনি নিজ রাজ্য হারাতে প্রস্তুত। এই প্রতিজ্ঞা এমন একটি অনুষ্ঠান সহকারে ও নিয়ম কানুনে বেঁধে করা হোত যে তা বিশেষভাবে পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য হয়ে উঠতো। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে রাজা মধ্যে প্রবহমান একটি নদীতে গিয়ে রাজা স্নান করলেন। নিজদেহ ও আত্মাকে পবিত্র করার জন্যে। তারপর সুলেমান শিকোর সংগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে তাঁকে তিনি কোনদিন ত্যাগ করবেন না। দেবতারা হলেন সাক্ষী। সুতরাং তরুণ রাজকুমারের তাঁকে সন্দেহ করার কোন অবকাশ রইল না। এই ঘটনার পর সুলেমান সংগীদের নিয়ে আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করলেন। অনুচরবর্গও তাঁকে আনন্দ দানেই নিবিষ্ট হয়ে রইলেন। আর তিনি তো তা উপভোগ করে চললেন পরিপূর্ণরূপে ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

এদিকে ঔরংজেব তাঁর সৈন্যদের হুকুম দিলেন শ্রীনগরে পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। উদ্দেশ্য, রাজা নকৃতিরাণীকে বাধ্য করার চেষ্টা যাতে তিনি সুলেমানকে তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি ঔরংজেব প্রেরিত এক লক্ষ সৈন্যের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করলেন এক হাজার সৈন্য দ্বারা তাঁর রাজ্য সীমান্তের সরু ও দুর্দম রাস্তা রক্ষা করে। ঔরংজেবের এই চেষ্টা বিফল হলে তিনি চাতুরী ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিলেন।

প্রথমে তিনি চেষ্টা করলেন রাজার সংগে মৈত্রীবন্ধন করার। কিন্তু তা বৃথা। রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি। তাছাড়া তাঁর পুরোহিত বললেন, ঔরংজেব শীঘ্রই সাম্রাজ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। আর সুলেমান শিকোই হবেন সম্রাট। তাতে রাজা যুবা মুঘলকুমারকে আরও দাক্ষিণ্য প্রদর্শনে উৎসাহিত হলেন।

ঔরংজেবের সৈন্যবাহিনী রাজার রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করতে অসমর্থ হলে তিনি যুদ্ধ করে দারাশাহের পুত্রকে আয়ত্তে আনবেন, এমন চেষ্টায় নিরত হলেন। তিনি নিজ প্রজাদের রাজার প্রজাপুঞ্জের সংগে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে নিষেধ করে দিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা পর্ব্বত বেষ্টিত একটি রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে উঠলো। প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভাব

অসুবিধায় দেশবাসী সুলেমান শিকোকে আশ্রয় দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো। তারা প্রকাশ্যেই বললেন যে তাতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পুরোহিত সম্প্রদায়ও নিজেদের পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যৎ বাণী সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁদের তখন মনে হোল যে বিষয়টি অন্যভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। অবশেষে তাঁরা হতভাগ্য রাজকুমারকে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে দেবারই আয়োজন শুরু করলেন।

তাঁরা কি করলেন? দারাশাহকে প্রতারিত করেছিলেন যে যশোবন্ত সিংহ, যাঁর কথা আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করেছি, তাঁকে গোপনে নকৃতিরাণীব কাছে পাঠানো হোল। তিনি রাজা নকৃতিরাণীকে উপদেশ দিলেন তাঁর নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যে ঔরংজেবের পক্ষ সমর্থন করে তাঁর ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁরই হাতে ছেড়ে দিতে। যশোবন্ত সিংহের উপদেশ শুনে রাজা গুরুতরভাবে বিব্রত ও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি একদিন "রাম রাম" উচ্চারণ করে পবিত্র প্রতিজ্ঞার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন যে সুলেমান শিকোকে রক্ষা করবেন এবং তা করবেন নিজের জীবন ও রাজ্যকে তুচ্ছ বিবেচনা করে। কিন্তু অন্যদিকে তিনি আবার ভয় পেলেন যে রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহ বিপ্লব সংঘটিত হলে রাজ্যটিই হয়ত হারাতে হবে।

তিনি বিহ্বল হয়ে ব্রাহ্মণদের সংগে পরামর্শে বসলেন। তাঁরা বললেন, রাজা তাঁর ধর্ম্ম বিশ্বাস ও প্রজাদের রক্ষা করতে বাধ্য। কিন্তু ঔরংজেব আক্রমণ করলে দুই-ই নষ্ট হবে। কারণ আক্রমণকারী হলেন মুসলমান। সুতরাং মুঘলকুমারকে আশ্রয় দানের চেয়ে নিজ রাজ্য ও প্রজার জীবন রক্ষাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তাছাড়া এই মুঘল কুমার কোনদিনই তাঁর কোন উপকারে আসবেন না। এই জল্পনা কল্পনার কথা কিন্তু সুলেমান শিকোর অজানাই ছিল। বিপদ যখন আসন্ন ও নিশ্চিত তিনি তখনও পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে চলেছিলেন। রাজা নকতিরাণী নিজের সম্মান ও বিবেককে রক্ষার জন্যে যশোবন্ত সিংহের দূতকে বলে দিলেন তিনি মুঘল কুমারকে প্রতারিত করতে অক্ষম। তবে ঔরংজেব কুমারকে বন্দী করতে পারেন। তাতে রাজার খ্যাতি নষ্ট হবে না। সুলেমান শিকোর অভ্যাস ছিল পার্ব্বত্য অঞ্চলের বিশেষ কয়েকটি জায়গায় শিকার করার। শিকার যাত্রার সংগী অনুচর নিতেন খুব স্বল্প সংখ্যক। কাজেই যশোবন্ত সিংহ কিছু সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে সেখান থেকে বন্দী করে নিয়ে ঔরংজেবের হাতে দিতে পারেন।

এই বার্তা পেয়ে যশোবন্ত সিংহ অনতিবিলম্বে তাঁর পুত্রকে নির্দেশ দিলেন সেই পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলার জন্যে। কাজেই একদিন সুলেমান শিকো নির্দিষ্ট স্থানে শিকার যাত্রার কালে একদল শক্তিশালী লোকের দ্বারা আক্রান্ত হন। তিনি তক্ষুনি প্রতারণামূলক ফন্দীটি বুঝতে পারলেন। অনুচরবর্গসহ আত্মরক্ষারও চেষ্টা করলেন। সংগীরা সকলেই ওখানে নিহত হলেন। রাজকুমার অত্যন্ত সাহসের সংগে আত্মরক্ষা করলেন এবং নয় জন আক্রমণকারীকে হত্যাও করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বহু সংখ্যক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভূপাতিত হলেন এবং বন্দী হয়ে জাহানাবাদে প্রেরিত হলেন। তাঁকে ঔরংজেবের সামনে হাজির করা হলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তা স্বয়ং সম্রাটই করেছিলেন যে তিনি কি রকম অনুভব কচ্ছেন। রাজকুমার তদুত্তরে বললেন, "আপনার বন্দীরূপে বেশী আর কি আশা করবো? আমার পিতা যে ব্যবহার পেয়ে গেছেন তার চেয়ে অন্য প্রকার কিছু আশা করা যায় না।"

বাদশাই উত্তর দিলেন যে তাঁর ভয় পাবার কিছু নেই। তিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না। বন্দী করে রাখাই উদ্দেশ্য। অতঃপর ঔরংজেব জানতে চাইলেন যে তিনি যে ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন তার কি হোল। তদুত্তরে কুমার জানালেন তার একাংশ ব্যয়িত হয়েছে সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাঁকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে। আর সৌভাগ্য অনুকূল হলেই তা সম্ভব হোত। বাকী কিছু অর্থ রাজারূপের হাতে রয়েছে। তাঁর অর্থ লোলুপতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তো সর্ব্বজন বিদিত। আরও কিছু অর্থ সম্পদ রাজা নকৃতি রাণী হীন চক্রান্ত করে তাঁকে ধরিয়ে দেবার সময় হস্তগত করেছে। কিন্তু তিনি পবিত্র এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর সম্মান রক্ষার জন্যে।

ঔরংজেব তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রের শক্তি সাহস দেখে বস্তুতঃই বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। কিন্তু হলে কি হবে! তাঁর উগ্র উচ্চাভিলাস সমস্ত ন্যায় বিচার ও আবেগ অনুভূতিকে দিল নিঃশেষ করে। কোন বিবেক বিবেচনার বালাই রইল না। পরন্তু নিজ সিংহাসনকে নিরাপদ করার জন্যে তিনি পুত্র মহম্মদ ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান শিকো উভয়কেই গোয়ালিয়র দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে ভ্রাতা মুরাদ বক্স এবং অন্যান্য রাজা ও সুলতানগণ বন্দী জীবন যাপন করে চলেছেন। এঁরা দু'জনও তাঁদের সংগে দিন কাটাবেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী।

সুলতান শুজা তখনও জীবিত। তবে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটছিল তাঁর। তা হলেও তো তিনিই তখন ঔরংজেবের একমাত্র পথের কাঁটা! সে কাঁটা তুলে যিনি বাদশাহকে চিন্তামুক্ত করেন তিনি হলেন আরাকানের রাজা। এই রাজার কাছেই শুজা আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে ওখানে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই তখন তিনি মক্কায় তীর্থ যাত্রা করার সংকল্প করলেন। আর সেখান থেকে পারস্যে গিয়ে সম্রাটের আশ্রয় নেবেন—এই ছিল তাঁর মতলব। তিনি আরও মনে করেছিলেন যে সেই উদ্দেশ্যে তিনি আরাকান রাজ বা পেগুর রাজার কাছ থেকে একখানি জাহাজ পেয়ে যাবেন মক্কা পর্য্যন্ত পৌঁছোনোর জন্যে। কিন্তু শুজার জানা ছিল না যে দু'জন রাজার কারোরই বিশাল সমুদ্রবক্ষে চলার মত কোন বড় জাহাজ ছিল না। তাঁদের ছিল কেবল মাত্র লম্বা সরু আকারের অলঙ্করণযুক্ত ছোট ছোট নৌকা। সেগুলি তাঁদের দেশের নদী পথেই চলতে পারে। ফলে সুলতান শুজা আরাকান রাজের কাছেই থাকতে বাধ্য হলেন।

আরাকানের রাজা ছিলেন পৌত্তলিক। শুজা নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তাঁর এক কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর সে ইচ্ছা রাজা পূরণ করলেন। সেই বিবাহের ফল একটি পুত্র সন্তান, এর ফলে তো শ্বশুর জামাতার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হওয়ার কথা। কিন্তু তা হোল না। বরং শীঘ্রই তা বিবাদ বিসম্বাদের সম্পর্কে দাঁড়াল। কারণ ইতিমধ্যে ঐ দেশের কিছু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শুজার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তাঁরা রাজার মনে এই সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি করেন যে তাঁর কন্যার সংগে শুজার বিয়ের ফলে যে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে তার অনুকূলে হয়ত সিংহাসনের প্রতি জামাতার দৃষ্টি পড়বে। কালক্রমে রাজা সিংহাসনচ্যুত হবেন। আরাকান রাজ্যে অনেক মুসলমান বাসিন্দাও ছিলেন। সুতরাং রাজার মনে আরও সন্দেহ জন্মাল যে ধর্ম্ম বিষয়ে অত্যুৎসাহের ফলে মুসলমান প্রজারা হয়ত শুজার পক্ষই অবলম্বন করবেন। আর আরাকানের সিংহাসনে শুজার অধিকার হবে তাঁর ভ্রাতা ঔরংজেবের আগ্রায় আধিপত্যের পাল্টা জবাব স্বরূপ। এই সন্দেহ আশঙ্কা কিন্তু একেবারে অমূলক ছিল না। শুজার হাতে তখনও ছিল প্রচুর মনিরত্ন ও স্বর্ণমুদ্রা। তা দিয়ে তিনি অনায়াসে আরাকানী মুসলমানদের মন জয় করতে পারতেন। এছাড়া বাংলাদেশে

ছেড়ে আসার সময় তাঁর সংগে প্রায় দুশ' লোক লস্কর এসেছিল। কাজেই তিনি বেশ একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়ে ফেললেন। কিন্তু সে কাজটি আবার যুগপৎ সাহসের ও হতাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠলো।

তিনি একটি দিন ঠিক করলেন, যেদিন স্বপক্ষের লোকদের নিয়ে বলপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজপরিবারের সকলকে হত্যা করবেন। আর নিজেকে আরাকানের রাজা বলে ঘোষণা করবেন। কিন্তু একদিন আগে কি প্রকারে তা রাজার কানে গেল। তখন পুত্রসহ শুজার পলায়ণ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। তাঁদের আশা ছিল গোপনে পেগুতে চলে যাবেন। কিন্তু পেগুতে যাবার পথ ছিল উঁচু দুর্গম ও পর্ব্বত সংকুল এবং গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। সেই বনভূমিতে ছিল আবার প্রচুর বাঘ সিংহের আবাস। রাস্তা বলতে কিছুই ছিল না। সুতরাং পলায়ণের চেষ্টা ব্যর্থ হোল। অধিকন্তু শত্রুরা এমন ব্যবস্থা করে ফেললো যে পালিয়ে যাবার সময়ও হয় নি। শুজার পুত্র সুলতান বঙ্গ সকলের পেছনে ছিলেন যাতে শত্রুদের প্রতিহত করে পিতা ও পরিবার বর্গকে পলায়নের সুযোগ দেয়া যায়। প্রথম আক্রমণ তিনি খুব সাহসের সংগেই প্রতিরোধ করেন। কিন্তু শেষে বহুলোকের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে যান। দু'টি কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মাতা ও ভগ্নীগণসহ শত্রুর হাতে ধরা পড়ে গেলেন। পরিবার শুদ্ধ সকলের স্থান হোল বন্দীশালায়। প্রথমে তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হয়। তারপর কিছু দিন যেতে রাজা বঙ্গর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করার ফলে বন্দীদের প্রতি কিছুটা, সদয় ব্যবহার করেছিলেন। স্বাধীনতাও কিছু মঞ্জুর হয়েছিল। এই সুযোগ সুবিধা হয়ত তাঁরা দীর্ঘ দিনই ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু তরুণ মুঘল-কুমারের ধৈর্য্যহীনতার ফলে তা আর সম্ভব হয় নি। কারণ তিনি অতি উৎসাহ বশে ও উচ্চাভিলাষের প্রভাবে আবার রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই ঘটনা তাঁদের সকলকেই টেনে নিয়ে গেল ধ্বংসের পথে। চক্রান্ত হোল ব্যর্থ। রাজার ক্রোধের সীমা রইল না। তিনি হুকুম দিলেন যে সমগ্র পরিবারটিকে সমূলে ধ্বংস করা হোক। রাজা যে তরুণী মুঘল কুমারীকে বিবাহ করেছিলেন তিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা। তাকেও রেহাই দেয়া হবে না, এই ছিল রাজাদেশ।

এখন সুলতান শুজার অবস্থাটা কি দাঁড়াল তা দেখা যাক্। পলায়নপর ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সকলের অগ্রবর্ত্তী। তাঁর ভাগ্য বিপর্য্যয়

সম্বন্ধে নানা কথাই শোনা গেল। কোনটি যে সত্য তা বলা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যাই যত শোনা যাক্ না কেন, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে তিনি জীবিত নেই। হয়ত তাঁর পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্যদের হাতে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন, নয়তো ঐ অঞ্চলের বনভূমিতে ব্যাঘ্র বা সিংহের নখর দন্তে তাঁর দেহ হয়েছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন।

ছয় বছর ধরে যে বিখ্যাত যুদ্ধ চলেছিল সে সম্বন্ধে আমি যতটা জানতে পেরেছি—এই হোল তার বিবরণ। এ সম্বন্ধে সুরাট, আগ্রা, জাহানাবাদ অথবা বঙ্গদেশে যা শুনেছি সবই এক প্রকার; কোন অমিল নেই। আর অন্য কোন প্রকার তথ্যও কিছু জানা যায় নি। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মুখ্য ঘটনাবলী যাঁরা দেখেছেন ও জেনেছেন তাঁদের কাছেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা শোনা। কিছু কিছু ঘটনা আমি নিজেও দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। এখন দেখা যাক, ঔরংজেবের রাজত্বে প্রারম্ভিক কার্য্যাবলী ও ঘটনা কি। আর তাঁর পিতা শাহজাহানের ভাগ্য দশাও কি হয়েছিল—তাও আলোচনা করা যাক্।

অধ্যায় সাত

ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম পর্য্যায়। তাঁর পিতা শাহজাহানের পরলোক গমন।

ভ্রাতা দারাশাহকে নিঃশেষ করেই ঔরংজেব সিংহাসন অধিকার করেন, একথা আমি পঞ্চাম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এখন সেই সিংহাসনে আরোহণ কালে উৎসব পর্ব্বের পূর্ব্বেকার কিছু ঘটনার বিশদ বিবরণ দান করবো। আর তা উল্লেখ করার মতই উপযুক্ত বিষয়। ঘটনাটি ঘটার কয়েকদিন পূর্ব্বে সাহস করে তিনি পিতা শাহজাহানকে শ্রদ্ধা প্রণতি পাঠালেন। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে পিতা তাতে সন্তুষ্ট হবেন না। পিতার কাছে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে কয়েকদিন পরেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে চান। সুতরাং পিতা যেন তাঁকে কিছু মণিরত্ন পাঠিয়ে দেন যাতে সিংহাসন আরোহণকালে তিনি ব্যবহার ও ধারণ করতে পারেন ও তাঁর মহান পূর্ব্ব পুরুষদের মতই গৌরব মহিমা মণ্ডিত হয়ে প্রজাপুঞ্জের সমক্ষে হতে পারেন আবির্ভূত। ঔরংজেবের এই আবদার ইচ্ছে শুনে শাহজাহান একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যে পুত্রের হাতে তিনি বন্দী, তাঁর এ দাবী ও অনুরোধ অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি এত ক্রোধান্বিত হলেন যে কয়েকদিন উন্মাদের মত কাটিয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হলেন। ক্রোধের মাত্রা এমন হয়েছিল যে তিনি অনবরত একটি হামান দিস্তা চাইতেন। আর বলতেন সমস্ত মহামূল্যবান মণিমুক্তা তিনি চূর্ণ করে দেবেন যাতে সেসব কোনদিন ঔরংজেবের হাতে না যেতে পারে। তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম সাহিবা, যিনি পিতার সংগ কখনও ত্যাগ করেন নি, তিনি পিতার পদতলে পড়ে মণিরত্ন নষ্ট করা থেকে তাঁকে বিরত করলেন। পিতা পুত্রীর সম্পর্ক অতি মধুর থাকায় তাঁর উপরে কন্যার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। পিতাকে তিনিই শান্ত করলেন। তাঁর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, সম্পদরাশি নিজের হাতে রাখা। ঔরংজেবের সংগে ভগিনীর ছিল চির শত্রুতা। অতএব ঔরংজেবের সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁর শিরস্ত্রাণে মাত্র একটি মণি বিরাজ কচ্ছিল। দ্বিতীয় আর কিছু ছিল না। ইচ্ছে করলে যে তিনি আরও মণিরত্ন ধারণ করতে পারতেন না, তাও নয়। পিতার কাছ থেকে সম্পদরাশি হস্তগত করতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি তা নিজ অধিকারে রাখতে পারেন। আমার

পারস্য দেশের বিবরণ প্রসংগে আমি বলেছি যে ঔরংজেবের টুপিটিকে প্রকৃত মুকুট বলা যায় না। আর সিংহাসনে আরোহণের সে উৎসবকেও প্রকৃত অভিষেক বলে অভিহিত করা চলে না।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঔরংজেব আর কখনও গমের রুটি, মাছ বা মাংস কিছুই খান নি। তিনি জীবন রক্ষা করেছেন যবের রুটি, তরিতরকারী ও কিছু মিষ্ট দ্রব্য খেয়ে। কোন কড়া পানীয় বা মাদক তিনি গ্রহণ করতেন না। এ যেন স্বয়ংকৃত নানা অন্যায় ও পাপের জন্যে কৃচ্ছতা সাধনের সংকল্প। কিন্তু রাজত্ব করার উচ্চাভিলাস ও আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রবল। জীবিত-কালে সিংহাসন ত্যাগ করবেন, এমন কথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

ঔরংজেব সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, এই সংবাদ সমগ্র এশিয়াতে প্রচারিত হলে বিভিন্ন সময়ে জাহানাবাদে নানা দেশের রাষ্ট্রদূতগণের আগমণ হয়েছিল তাঁদের রাজাবাদশাহদের পক্ষ থেকে নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্যে। তাছাড়া তাঁরা ঔরংজেবকে সাহায্য দানের ইচ্ছে প্রকাশ করে বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। প্রথম আসেন উজবেক ও তাতারগণ। তারপরে এলেন মক্কার শেরিফ, ওমান বা আরবের রাজা, বসোরার সুলতান ও ইথিয়োপিয়ার দূত। ওলন্দাজরা সুরাট কারখানার সেনাধ্যক্ষ এম্. আদ্রিকানকে পাঠিয়েছিলেন ঔরংজেবের দরবারে। সেই ওলন্দাজ দূত বিশেষ সদ্ব্যবহার লাভ করেন। ইউরোপীয় জাতির প্রতি মুঘল দরবারের স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি দরবারে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। ভারতবর্ষের রাজাবাদশাহরা মনে করতেন যে এইভাবে বিদেশীদের আগমন ও দরবারে অবস্থানের ফলে নিজেদের সম্মান মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রদূতগণ সকলেই স্ব স্ব দেশের রীতি প্রথানুযায়ী মুঘল সম্রাটকে উপহার উপঢৌকন দান করেন। তাঁদের আনীত দ্রব্য সামগ্রী সবই দুষ্প্রাপ্য জিনিসের মধ্যে পড়ে। আর এই সম্রাট তো সমগ্র এশিয়াতেই নিজ সুখ্যাতি প্রচারের জন্য উন্মুখ ছিলেন। কাজেই তিনি রাষ্ট্রদূতরা যাতে পরম পরিতুষ্ট হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন তার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করেছিলেন।

শাহজাহানের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে ঔরংজেব পারস্যে একটি দূত পাঠান। সেদেশে দূতটিকে প্রথমে অভ্যর্থনা করা হয় বিশেষ সমারোহ সহকারে। সে বিবরণ আমি আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রথম ভাগে দিয়েছি।

দূতটি সেখানে পৌঁছোবার পরে প্রথম এক মাস চলেছিল খুব ভোজ পর্ব্ব ও শিকার যাত্রা। আর প্রতি রাত্রে বাজী পোড়ানো হোত। মহান মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে যে দিন তিনি পারস্যাধিপতিকে উপঢৌকন প্রদান করেন, সেদিন সম্রাট অতি চমৎকার পোষাকে সজ্জিত হয়ে সিংহাসনে বসেন। মুঘল দূতের প্রদত্ত সব জিনিস গ্রহণ করেও তিনি অবজ্ঞাভরে বিলিয়ে দিলেন প্রাসাদের কর্ম্মীদের মধ্যে। নিজের জন্যে রাখলেন কেবল ৬০ ক্যারাটের একটি হীরক। কয়েকদিন পর তিনি দূতকে ডেকে পাঠালেন। কিছু কথাবার্ত্তার পর প্রশ্ন করলেন যে তিনি (দূত) 'সুন্নী' কিনা, অর্থাৎ তুর্কী মুসলমানদের একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত কিনা। সুন্নী কথাটির অর্থ আমি অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি। মুঘল দূত এমন চতুরভাবে উত্তর দিলেন যাতে খলিফা আলীর বিরুদ্ধাচরণ না হয়। এই খলিফাকে পারসীকরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। সম্রাট তারপর দূতের নাম জানতে চাইলেন। দূত বললেন সম্রাট শাহজাহান তাঁকে নাম দিয়েছেন বাওভাক (?) খান, মানে উদার চেতা মানুষ। তাছাড়া তিনি আরও জানালেন যে শাহজাহানের কাছ থেকে তিনি প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করেছেন, দরবারে একটি উচ্চপদ প্রদান করে সম্মানিত করেছেন ইত্যাদি। এই কথা শুনেই পারস্যাধিপতি অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, "তাহলে তুমি একটি দুর্ব্বৃত্ত! যে সম্রাটের কাছ থেকে তুমি প্রচুর অনুগ্রহ লাভ করেছ, তাঁর বিপদের দিনে তাঁকে ত্যাগ করে এমন এক উৎপীড়ক অত্যাচারীর সেবায় নিযুক্ত হয়েছ যিনি পিতাকে রেখেছেন বন্দী করে, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের করেছেন নিধন। এ কেমন কথা? সেই লোক আবার রাজকীয় উপাধি ধারণ করে নিজেকে পরিচিত কচ্ছেন আলমগীর ও ঔরংশাহ নামে। এ যেন এমন এক সম্রাট যিনি নিজের হাতের মুঠোতে সারা বিশ্বকে ধরে ফেলেছেন আর কি। অথচ এখন পর্য্যন্ত সামান্য একটু স্থানও জয় করতে পারেন নি। যা যেটুকু করেছেন তা সবই [illegible], হত্যা, বঞ্চনা ও প্রতারণা দ্বারা।"

পারস্যাধিপতি আরও বললেন, "তুমিও কি তাঁদের একজন নও যাঁরা ঔরংজেবকে অত রক্ত ক্ষয় করতে, ভ্রাতৃ হন্তা হতে ও পিতাকে অবরুদ্ধ রাখতে সহায়তা করেছেন? তুমিও তো এই করেই সেই ক্রুর সম্রাটের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্মান ও সুখ সুবিধা লাভ করেছ। সুতরাং তুমি দাড়ি রাখার যোগ্য নও।" এই কথা বলেই সম্রাট তখুনি হুকুম দিলেন মুঘল

দূতের দাড়ি কামিয়ে দেয়া হোক। ওদেশে এইভাবে শাস্তিস্বরূপ দাড়ি উৎপাটন অত্যন্ত অপমানজনক। মুঘল দূত ঐরূপ ব্যবহারের আশংকা করেন নি কখনও। তখুনি আবার সম্রাটের হুকুম হোল তাঁকে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে। তাঁর সংগে পারস্যাধিপতি মুঘল সম্রাট ঔরংজেবকে উপহার পাঠালেন দেড়শ'টি চমৎকার অশ্ব, সোনালী রূপালী কারুকার্য্য খচিত কিছু গালিচা, সোনালী কিংখাব বস্ত্র কয়েকটি, কিছু সংখ্যক মূল্যবান সাস্‌ এবং আরও সুন্দর সব কাপড় চোপর। ঔরংজেব প্রেরিত উপঢৌকনের চেয়ে পারস্যাধিপতির উপহাররাজি ছিল ঢের বেশী মূল্যবান। মুঘল সম্রাট প্রদত্ত জিনিস পত্রের মূল্য ছিল প্রায় বিশ লাখ টাকার কাছাকাছি (মূল গ্রন্থে টাকা না লিভার মুদ্রা তার উল্লেখ নেই)।

মুঘল সম্রাট ছিলেন আগ্রায়। বাওভাক খান আগ্রায় ফিরে এলেন। পারস্য রাজ তাঁকে কিভাবে অপমান করেছেন তা সম্রাটকে জানালেন। ঔরংজেব তো রেগে খুন। তিনি রোষভরেই হুকুম দিলেন পারস্য থেকে প্রেরিত অশ্বের একশ'টিকে সহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হোক; আর বাকীগুলি থাকবে নানা রাস্তার মোড়ে। সারা সহরব্যাপী আরও ঘোষণা করলেন যে আলী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা "নগীস" অর্থাৎ অশুচি অবস্থায়ই যেন ঐ ঘোড়াগুলির পিঠে চড়েন। ওগুলি যে সম্রাটের কাছ থেকে এসেছে তিনি বাস্তবিকভাবে কোন আইন কানুন মানেন না। এছাড়া তাঁর সংগে এদেশের কোন যোগ সংযোগ নেই। তারপর মুঘল সম্রাট আবার সেই দেড়শ' ঘোড়াকেই হত্যা করার নির্দ্দেশ দিলেন। উপঢৌকনের বাকী জিনিসপত্র সব পুড়িয়ে ছাই করা হোল। অবশেষে শুরু করলেন পারস্যাধিপতির উদ্দেশ্যে অজস্র গালি বর্ষণ। তাঁর ধারণা হয়েছিল পারস্য সম্রাট তাঁকেও সাংঘাতিক রকমে অপমান করেছেন।

এরপর আগ্রা দুর্গে শাহজাহান লোকান্তরিত হন ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের অবসান মুখে (ডিসেম্বর)। ঔরংজেবের সামনে আর কোন বাধা বিঘ্ন রইল না। মনের অশান্তি দূর হোল, দিবারাত্র উৎপীড়ন চালাবার মত কোন উপলক্ষ্যও থাকলো না। রাজ্য পরিচালনার অবাধ সুখে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। অনতিবিলম্বে ভগিনী বেগম সাহিবাকেও স্বপক্ষে নিয়ে এলেন তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পদ ও ক্ষমতা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে। তাঁকে সুলতানা বেগম উপাধি দান করা হোল। বস্তুতঃই তাঁর মধ্যে এমন গুণ ও ক্ষমতা ছিল যে তিনি

প্রয়োজন হলে সাম্রাজ্য শাসনও করতে পারতেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে পিতা ও ভ্রাতারা তাঁর উপর আস্থা রাখলে ও পরামর্শ গ্রহণ করলে হয়ত ঔরংজেবের পক্ষে সিংহাসন অধিকার করা সম্ভব হোত না। অবস্থা একেবারে ভিন্ন রূপ ধারণ করতো। আর এক ভগ্নী রৌশনারা বেগম সর্ব্বদাই ঔরংজেবের পক্ষ সমর্থন করেছেন। তিনি ঔরংজেবকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখে সোনা রূপা অনেক সংগ্রহ করে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ভগিনীর সেই সহায়তার জন্যে ভ্রাতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি সম্রাট হয়ে তাঁকে শাহ বেগম উপাধিতে মণ্ডিত করবেন এবং একটি সিংহাসনে বসাবেন। ঔরংজেব সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ভাই ভগিনীর মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি ছিল। কিন্তু আমি শেষবার যখন জাহানাবাদে যাই তখন শুনলাম ভ্রাতা ভগ্নীর সেই সৌহাদ্য অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তাঁদের সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার কারণ যা শুনেছিলাম তা হচ্ছে যে বাদশাহ নন্দিনী তার গৃহে জনৈক সুদর্শন যুবা পুরুষকে প্রবেশের অধিকার দিয়েছিলেন। পনের দিন অন্তে রাজকুমারী সেই লোকটি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে তাঁর হাত থেকে যখন রেহাই পেতে চান তখন ব্যাপারটা আর গোপন থাকে নি। তা সম্রাটের কর্ণগোচর হয়ে গেল। সুলতানা বেগম কলঙ্ক ও ভৎর্সনার ভয়ে নিজেই গিয়ে ব্যাপারটা সম্রাটকে জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে লোকটি হারেমে প্রবেশ করেছিল, এমন কি তাঁর খাস কক্ষেও। তাঁর বিশ্বাস, নিশ্চয়ই চুরির উদ্দেশ্যে বা তাঁকে হত্যা করার জন্যেই সে গিয়েছিল। এ রকম ঘটনা তো পূর্ব্বে কখনও ঘটে নি। সম্রাটের হারেমের অধিবাসিনীদের নিরাপত্তা কখনও বিঘ্নিত হয় নি। সুতরাং সম্রাটের উচিত রাত্রে প্রহরারত সমস্ত খোজা প্রহরীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা। এই কথা শুনে ঔরংজেব তখুনি কিছু সংখ্যক খোজাকে সংগে নিয়ে সেইস্থানে গেলেন। সেই চরম মুহূর্ত্তে বেচারা যুবক দিশেহারা হয়ে প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়ে নীচে প্রবহমানা নদীতে পড়লো ঝাঁপিয়ে। চতুর্দ্দিক থেকে জনতা এসে ভীড় জমালো লোকটিকে ধরার জন্যে। সম্রাট বললেন যুবকটির প্রতি কোন দুর্ব্যবহার না করে তাকে মুখ্য কাজীর কাছে নিয়ে যাওয়া হোক। তারপর অবশ্য ব্যাপারটি সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায় নি। ঘটনাটি শুনে এও মনে হোল যে নারী ও বালিকাদের যেখানে যেভাবে অবরুদ্ধ রাখা হয় সেখানেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে ?

অধ্যায় আট

মহান মুঘল সম্রাটের ওজন গ্রহণের পুণ্য পর্ব ও তার আয়োজন। রাজ সিংহাসন দরবারের ঐশ্বর্য মহিমা।

সম্রাটের সংগে আমার যা কিছু কাজ ছিল, যার বিবরণ আমি প্রথম ভাগে দিয়েছি তা সব শেষ হোল। কাজেই ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের উদ্যোগ করি। কিন্তু তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে আমি যেন তাঁর আয়োজিত উৎসব পর্ব্ব না দেখে রওনা না হই। উৎসবের দিনটি ছিল খুব কাছেই। তিনি আবার তখন সমস্ত মণিরত্ন আমাকে দেখাবার হুকুম দিলেন। আমি তাঁর ইচ্ছে অনুরোধকে সম্মানিত করতে বাধ্য হলাম। কারণ তিনি আমাকে যে খাতির সম্মান করেছেন তাতে আমার পক্ষে তাঁর কোন প্রস্তাব উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং সেই জাঁকালো উৎসবের দর্শক গোষ্ঠীতেও আমি স্থান নিলাম। উৎসব শুরু হয়েছিল ৪ঠা নভেম্বর, চলেছিল পাঁচ দিন ধরে। প্রথা হোল, প্রতি বছর সম্রাটের জন্মদিনে তাঁর দেহের ওজন গ্রহণ করা হবে। আগের বছরের চেয়ে পরের বছরে যদি ওজন বেশী হোত তাহলে আনন্দ উল্লাসের সীমা থাকতো না। ওজন গ্রহণের সময় সম্রাট সব চেয়ে মূল্যবান সিংহাসনটিতে বসেন। সেটির কথা আমি এখুনি বলবো। তিনি সিংহাসনে সমাসীন হলে রাজ্যের সমস্ত অভিজাত ব্যক্তিরা এসে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে উপহার প্রদান করবেন। রাজকর্ম্মচারীদের পুরনারীরাও উপহার পাঠিয়ে থাকেন। তারপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উপঢৌকন দান করেন সমস্ত সুবাদার ও খ্যাতিমান ব্যক্তিরা। এইদিনে সম্রাট হীরা মুক্তা, চুণী পান্না, সোনা রূপা এবং মূল্যবান গালিচা, সোনা রূপার কিংখাব, নানা বস্ত্র সম্ভার, হাতী, ঘোড়া, উট ইত্যাদি যা উপহার পান তার মূল্য দাঁড়ায় ত্রিশ লক্ষ লিভার মুদ্রার চেয়েও বেশী।

উৎসবটি চলেছিল পাঁচ দিন। কিন্তু তার আয়োজন শুরু হয় প্রায় দু' মাস পূর্ব্বে। সেবারে শুরু হয়েছিল ৭ই সেপ্টেম্বর। এই প্রসংগে পাঠকদের এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ অধ্যায় জাহানাবাদ প্রাসাদের-

বর্ণনাটি স্মরণ করতে অনুরোধ জানাই। প্রথম পাতে কাজ হোল, প্রাসাদের বিরাট দু'টি অঙ্গনকে আবৃত করা হয় মধ্য কেন্দ্র থেকে সভাকক্ষ পর্য্যন্ত। কক্ষটির তিন দিকই উন্মুক্ত। বিরাট প্রশস্ত স্থানটিকে যে চন্দ্রাতপ দ্বারা আবৃত করা হয় তা লাল মখমলে তৈরী, স্বর্ণ খচিত কারুকার্য্য মণ্ডিত। জিনিসটা এত ভারী যে জাহাজের মাস্তুলের মত খুঁটি দরকার হয় বহন করার জন্যে। খুঁটিগুলি উচ্চতায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত। প্রথম চত্বরের চাঁদোয়ার জন্যে খুঁটির সংখ্যা আটত্রিশটি। সভাগৃহের কাছে যে খুঁটিগুলি তা ডুকাট মুদ্রার মত ভারি মোটা সোনার পাতে মোড়া। বাকীগুলি মোড়া থাকে ঐ ধরনেরই মোটা রূপার পাতে। যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় তা নানা বর্ণের সুতায় তৈরী। কতক দড়ি মোটা শিকলের মত।

প্রথম অঙ্গটি, আমি অন্যত্রও বলেছি যে টানাবারান্দা ও ছোট ছোট কক্ষ সারিতে বেষ্টিত। ওমরাহরা যখন কর্ম্মরত ও অশ্বারূঢ় থাকেন তখন এই কক্ষগুলি হয় তাঁদের বাসস্থান। এখানে বলা প্রয়োজন যে প্রতিটি ওমরাহকে এক এক সপ্তাহে পালা করে প্রহরারত থাকতে হয়। তাঁদের দরবারেও যেমন কাজ থাকে, তেমনি প্রাসাদেও নানা কর্ত্তব্য আছে। সম্রাট যখন তাঁবুতে বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকেন তখন তাঁর নিজস্ব বাহিনীর হস্তী যূথ ব্যতীত অশ্ব বাহিনীর দায়িত্বও ওমরাহের। ইনি যখন এক সপ্তাহ কর্ত্তব্যরত থাকেন তখন বাদশাহী রন্ধনশালা থেকে তাঁর খাদ্য দ্রব্য আসে। খাবার আসছে দেখেই তিনি পরপর তিন বার প্রণিপাত করেন ভূমি স্পর্শ করে, কখনও আবার মস্তক আভূমি নত করে। প্রণামকালে তিনি আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন বাদশাহের সুস্বাস্থ্যের জন্যে ও তিনি যাতে সুদীর্ঘ জীবন ও শত্রুদের পরাস্ত করার শক্তি লাভ করেন তার জন্যে। ওমরাহরা সকলেই রাজ্যের অভিজাত ও সুলতান বংশের সন্তান। সম্রাটের জন্যে কাজ করাকে তাঁরা বিশেষ সম্মানজনক মনে করেন। অশ্বারূঢ় অবস্থায় এবং অবসর সময়ে— সর্ব্বদাই এঁরা উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করেন। নিজেদের হাতী, ঘোড়া, উট সব কিছুকেই সজ্জিত করেন চূড়ান্তভাবে। কতকগুলি উটের পিঠে আবার ছোট ছোট কামানসহ লোক থাকে। প্রয়োজন মত তা কাজে লাগ্যানো যেতে পারে। এক একজন ওমরাহের কমপক্ষে দু' হাজার অশ্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। আর তিনি যদি রাজবংশীয় বা সুলতান বংশজাত হনে তাহলে অশ্বের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় হাজার।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে মহান মুঘল বাদশার সাতখানি অতি চমৎকার সিংহাসন আছে। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ হীরক খচিত। বাকী সব অলঙ্কৃত হয়েছে চুনী, মরকত মণি ও মুক্তাবলীর দ্বারা।

প্রথম দরবার কক্ষে যে সিংহাসনটি সেটি আমাদের ক্যাম্পের খাটের মত অর্থাৎ প্রায় ছয় ফুট লম্বা ও চার ফুট পাশে। অত্যন্ত ভারি এবং বিশ পঁচিশ ফুট উঁচু চারটি পায়ার উপরে বসানো। আড়াআড়ি চারটি লম্বা দণ্ড মত জিনিসের উপরে সিংহাসনের ভিত্তি স্থাপিত। ভিতের চার দিকে বারটি স্তম্ভ। এসব স্তম্ভ তিন দিকে চন্দ্রাতপ বা ছাদকে ধরে রেখেছে। দরবারের দিকে কোন স্তম্ভ নেই। সিংহাসনের পায়া ও নীচের আলম্বন দণ্ড-সমূহ যা আঠার ইঞ্চিরও বেশী দীর্ঘ তা সব স্বর্ণময় কারুকার্য্য মণ্ডিত। তার মাঝে মাঝে বসানো আছে অনেক হীরা, চুনী ও মরকত মণির বহর। প্রতিটি লম্বা দণ্ডের মাঝখানে বড় আকারের একটি বাদখশানী চুনী। তার চারদিকে ঘিরে রয়েছে চারটি করে মরকত মণি। সব মিলে ক্রুশের মত একটি নক্সা সৃষ্টি হয়েছে। দণ্ডগুলির লম্বা অংশে একদিক থেকে আর একদিক পরপর রয়েছে অনুরূপ ধরনের ক্রুশ নক্সা। ঐ নক্সাগুলির একটিতে চুনী রত্নকে ঘিরে মরকত মণি আর অন্যটিতে মরকত মণিকে বেষ্টন করে আছে চারটি বাদখশানী চুনী। চুনী রত্ন ও মরকত মণির ফাঁকে ফাঁকে বসানো আছে হীরক খণ্ড। হীরকের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির ওজন দশ বার ক্যারাটের বেশী নয়। সব পাথরই খুব জমকালো, কিন্তু অত্যন্ত চ্যাপ্টা ধরনের। কতক অংশে সোনার মধ্যে মুক্তা বসানো। সিংহাসনের লম্বা দিকের একটিতে চার ধাপ যুক্ত একটি সিঁড়ি। সিংহাসনে উঠে বসার জন্যেই সিঁড়ির প্রয়োজন। আসনটিতে তিনটি তাকিয়া ধরনের বালিশ আছে। একটি থাকে বাদশার পিঠের দিকে। সেটি বেশ বড় ও গোলাল ধরণের। বাকী দু'টি চ্যাপ্টা আকারের। সিংহাসন থেকে ঝুলে আছে একটি তলোয়ার, গদা একটি, গোলাকার ঢাল, ধনুক, তীর ও তূণ। এই সকল অস্ত্র শস্ত্র, তাকিয়া বালিশ, সিঁড়ির ধাপ সব নানা মণি রত্ন ও প্রস্তরে অলঙ্কৃত। সেই অলঙ্করণ করা হয়েছে সিংহাসনের মূল গড়নের সংগে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে।

শ্রেষ্ঠ সিংহাসনের বড় বড় বাদখশানী চুনীগুলি আমি গুণে দেখেছিলাম। সংখ্যায় একশ' আটটি। সবচেয়ে ছোটগুলির ওজন প্রায় একশ' ক্যারাট।

আবার এমন কতকগুলি আছে যা স্পষ্টতঃ দুশ' বা ততোধিক ক্যারাট ওজনের। মরকত মণিগুলি বিচিত্র ও চমৎকার সব বর্ণালির। তবে খুঁতও আছে কিছু। সবচেয়ে বড়টি ষাট ক্যারাটের; ছোটটি ত্রিশ। সংখ্যা গুণে দেখলাম। তা প্রায় একশ' ষোল। সুতরাং চুনীর চেয়ে তার সংখ্যা বেশী।

চন্দ্রাতপের অভ্যন্তর ভাগ হীরা মুক্তায় আবৃত। চার দিকে মুক্তার ঝালর। চাঁদোয়ার মাথার আকৃতি চৌকোগম্বুজের মত। তার উপরে দেখা যাবে উন্নত পুচ্ছের একটি ময়ূর। পুচ্ছটি তৈরী হয়েছে নীল স্যাফায়ার ও অন্যান্য রকম সব রঙীন পাথরে। পাখীর শরীর সোনার; তার উপর মূল্যবান মণিরত্ন খচিত। বুকের কাছে বড় একটি চুনী। ওখান থেকে ঝুলছে নাশপাতির মত আকারের পঞ্চাশ ক্যারাটের কি তার কাছাকাছি ওজনের মুক্তা। রঙ খানিকটা হল্‌দে আভাযুক্ত। ময়ূরটির দুই পাশেই ঠিক অতটা উঁচু এবং বেশ বড় পুষ্প স্তবক রয়েছে একটি করে। তাতে নানা রকমের ফুল আছে, আর তা সোনার এবং মূল্যবান সব রত্ন খচিত। দরবারের বিপরীত দিকে সিংহাসনের পাশে একটি রত্ন দেখা যায়। সেটি আশী থেকে নব্বুই ক্যারাটের একটি হীরক খণ্ড। তাতে ঘিরে আছে প্রচুর চুনী ও মরকত মণির বহর। সিংহাসনে বসে সম্রাট ওটিকে পুরোই দেখতে পান। আমার মতে সেই অভিনব ও জাঁকালো সিংহাসনখানির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হোল চন্দ্রাতপকে ধরে আছে যে বারটি স্তম্ভ তা। ওগুলি সম্পূর্ণ বেষ্টিত রয়েছে অতি চমৎকার মুক্তার সারি দিয়ে। মুক্তাগুলি বেশ গোলাল ও অদ্ভুত বর্ণাভাসময়। প্রতিটি ওজনে ছয় থেকে দশ ক্যারাট। সিংহাসনের দু' পাশে চার ফুট আন্দাজ দূরে দু'টি ছাতা বসানো। তার বাঁট সাত কি আট ফুট লম্বা। বাট দু'টি অলঙ্কৃত হয়েছে হীরা, মুক্তা ও চুনী দ্বারা। ছাতা দু'টি লাল মখমলের তৈরী। গায়ে কারুকার্য্য। চারদিকে মুক্তার ঝালর।

এই যে বিখ্যাত সিংহাসনের কথা আমি বর্ণনা দিলুম এটির নির্ম্মাণ শুরু হয়েছিল তৈমুর লঙের সময়। আর শেষ করেছেন সম্রাট শাহজাহান। বাদশাহী মণি রত্নের হিসেব রক্ষকরা আমাকে বলেছেন, ওটি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে একশ' সাত হাজার লক্ষ টাকা। আমাদের দেশীয় (ফ্রান্স) মুদ্রায় তা দাঁড়ায় একশ' ষাট লক্ষ পাঁচ হাজার লিভার।

মহনীয় রূপের এই সিংহাসনটির পেছনে আর একটি ছোট সিংহাসন আছে। তার আকৃতি স্নানের জলাধারের মত। বাদামী গড়নের এই আসনটি লম্বায় প্রায় সাত ফুট, পাশে পাঁচ ফুট। তার বাইরের পাটে হীরা মুক্তার প্রচুর অলঙ্করণ। মাথায় কিন্তু চন্দ্রাতপ নেই।

প্রথম অংগনের ডান দিকে একটি তাঁবু। বাদশাহের ব্যক্তিগত উৎসবের দিনে সহরের মুখ্য নর্ত্তক নর্ত্তকী ও গায়কগণ ওখানে এসে সমবেত হন। সম্রাট সিংহাসনে বসলে তাঁরা নৃত্য গীত পরিবেশন করেন। বাঁদিকেও একটি তাঁবু। সেখানে হাজির থাকেন সেনাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীগণ, রক্ষী বাহিনীর মুখ্য ব্যক্তিরা ও প্রাসাদের কর্ম্মীরা।

রাজা সিংহাসনে সমাসীন থাকতে দু' দিকে পনেরটি করে ত্রিশটি লাগাম শুদ্ধ অশ্ব থাকে দাঁড়ান। প্রতিটি অশ্বের তদারকে থাকে দু'টি করে লোক। লাগামগুলি খুব সরু। ওগুলির অনেক অংশে হীরা চুণী, মরকত মণি ও মুক্তা খচিত। কতকগুলিতে দেখা যায় কেবল স্বর্ণমুদ্রা বসানো। প্রতিটি অশ্বের মাথায় দুই কানের মাঝখানে চমৎকার এক গুচ্ছ পালক। পিঠের উপরে ছোট্ট একটি আসন। সেটি পুরোপুরি সোনার কারুকার্য্যযুক্ত। ঘোড়াগুলির গলা থেকে চমৎকার একটি করে রত্ন ঝোলানো। তা কখনও হীরা, কখনও চুনী বা মরকত মণি। ঘোড়াগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যের যেগুলি তার দাম তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার একু (ecus)। কতকগুলির মূল্য বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ দশ হাজার একু। সাত আট বছর বয়স্ক কিশোর রাজকুমার চড়েন ছোট ঘোড়ায়। সেটি উচ্চতায় বড় একটি শিকারী কুকুরের চেয়ে বেশী নয়। তবে ঘোড়াটি বেশ শক্ত সমর্থ।

বাদশাহ সিংহাসনে বসার আধ কি জোর এক ঘন্টা পরে যুদ্ধ পটু, শক্তিমান ও অতি মাত্রায় সাহসী হস্তী যূথের সাতটিকে তাঁর সামনে হাজির করা হয় পরিদর্শনের জন্যে। একটি হাতী হাওদা নিয়ে প্রস্তুত থাকে। সম্রাট ইচ্ছে হলেই আরোহণ করতে পারেন। ঘোড়াগুলি কিংখাবের সাজ পাটেও গলায় সোনা রূপার শিকলে সজ্জিত থাকে। চারটি হাতী সম্রাটের পতাকাদি বহন করে। পতাকাগুলি ছোট দণ্ডের সংগে আবদ্ধ করে একটি লোক ধরে থাকে। হাতীগুলিকে এক একটি করে সম্রাটের সামনে চল্লিশ পঞ্চাশ পদক্ষেপের দূরত্ব মধ্যে আনা হয়। সম্রাটের সামনে এসে হাতীগুলি তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুড় তিন বার করে উপরে তুলে ও

নীচে নামিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানায়। প্রতিবারেই পশুগুলি চীৎকার করে ধ্বনি তোলে। তারপর রাজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ায়। তখন মাহুত ওদের গায়ের সমস্ত সাজ পাট তুলে ধরেন যাতে বাদশাহ পশুগুলির স্বাস্থ্য শরীরের অবস্থা দেখতে পান ; ওদের ভাল করে খাওয়ান দাওয়ান ও যত্ন করা হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করেন। প্রতিটি হাতীর গায়ে রেশমী সূতার দড়ি জড়ানো থাকে। তাতে বোঝা যায় আগের বছর থেকে ওদের দেহ পুষ্ট না ক্ষীণ হয়েছে। হস্তী যূথের মধ্যে বাদশাহের অতি প্রিয় যেটি সেটি দেখতেও যেমন বড়, স্বভাবেও তেমনি ভয়ংকর। প্রতি মাসে তার ব্যয় বাবদ অর্থ মঞ্জুরী আছে পাঁচশ' টাকা। অতি উত্তম খাদ্য ও যথেষ্ট চিনি ওকে খেতে দেয়া হয়। পানীয় হিসেবে সুরাসারের বরাদ্দ আছে। আমি এই বিবরনীর অন্যত্র বাদশাহের পীলখানার হাতীর সংখ্যা কত তা বলেছি। এখন এই প্রসংগে সামান্য আর একটু বলা হোল। বাদশাহ হাতীর পিঠে আরোহণ করলে ওমরাহরা ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে অনুগমন করেন। আবার তিনি অশ্বারূঢ় হলে তাঁরা চলেন পদব্রজে।

হস্তী যূথ পরিদর্শনের পর সম্রাট সভাগৃহ ত্যাগ করে হারেমে যান তিন চার জন খোজা সহ। সেই বাদামী গড়নের সিংহাসনটির পেছনে যে ছোট দরজা আছে, সেখান দিয়ে তিনি হারেমে প্রবেশ করেন।

আরও পাঁচখানি সিংহাসন স্থাপিত আছে অন্য আর একটি চত্বরের চমৎকার একটি সভাকক্ষে। সেই সিংহাসনগুলি কেবল হীরক মণ্ডিত। কোন রঙীন পাথর বা রত্ন খচিত নয়। আমি তার বিশদ বর্ণনা দিতে আর চাই না। পাঠকদের কাছে বিরক্তিকর হতে পারে। একটি বিষয় আমি উপলব্ধি করতে পারি যে কারোর চোখের সামনে সর্ব্বদা কোন সুন্দর মনোরম জিনিস থাকলে তাও সময় সময় বিরক্তিজনক ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। পাঁচটি সিংহাসনকে এমনভাবে সাজিয়ে বসানো হয়েছে যে একটি ক্রশের মত নক্সা হয়ে উঠেছে। চারখানি দিয়ে ক্রশটি হয়েছে, বাকীটি রয়েছে মাঝখানে। তবে মধ্যবর্ত্তীটিকে আর দু'টির কাছাকাছি এমনভাবে রাখা হয়েছে যে জনসমাবেশ থেকে দূরেই পড়েছে।

আধ ঘণ্টা খানেক হারেমে থেকে বাদশাহ আবার বেরিয়ে আসেন সেই খোজাদের সংগে। এসে বসেন পাঁচটি সিংহাসনের কেন্দ্রস্থলের আসনটিতে। পাঁচ দিনের উৎসবে একদিন আনা হয় হাতীগুলিকে, একদিন উটের বহরকে।

এছাড়া দরবারের সমস্ত আমির ওমরাহ ও উচ্চ কর্ম্মচারীগণ সমবেত হন সম্রাটকে নিয়ম মাফিক উপহার উপঢৌকন প্রদান করে শ্রদ্ধা প্রণতি জ্ঞাপন করার জন্যে। সমস্ত অনুষ্ঠানই অত্যন্ত জাকাঁলো ভাবের। এমন পরিবেশ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় যা প্রাচ্য দেশের শ্রেষ্ঠতম সম্রাট মুঘল বাদশাহেরই উপযুক্ত। এই সম্রাটের শক্তি সম্পদ ইউরোপ খণ্ডে ফ্রান্সের রাজারই মত। তবে ইউরোপীয়দের মত সাহসী ও চতুর মানব গোষ্ঠীর সংগে যুদ্ধ প্রসংগে হয়ত তা তুলনীয় নয়।

অধ্যায় নয়

মহান মুঘল সম্রাটের দরবার সম্বন্ধে খুঁটি নাটি বিবরণ।

মুঘল সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি ঔরংজেব সিংহাসন অধিকার করেছেন পিতাকে বন্দী করে ও ভ্রাতাদের বঞ্চিত করে। কিন্তু জীবন কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ। এ সম্বন্ধে আমি আগেও কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি। এখন দেখছি তিনি কঠিন কৃচ্ছ্রতা সাধন কচ্ছেন কিছু খাদ্য গ্রহণ না করে। কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বালাই নেই তাঁর জীবনে। তিনি কিছু আনাজ তরকারী ও সামান্য মিষ্টদ্রব্য খেয়ে দিনাতিপাত করেন। ক্রমশঃই তিনি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন। এর কারণ অনাহারে দিন যাপন। যে বছরে ভারতবর্ষে বিরাট ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছিল (১৬৬৫) আমি তখন ওখানে ছিলাম। ঔরংজেব তখন কেবল মাত্র সামান্য একটু জলপান করতেন; আর খেতেন অল্প কিছু জোয়ারের রুটি। তার ফলে এত স্বাস্থ্যহানি ঘটেছিল যে তিনি প্রায় মৃত্যু মুখীন হয়েছিলেন। তিনি শয়ন করতেন মেঝেতে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছিয়ে। সেই সময় থেকে তাঁর স্বাস্থ্য আর ভাল থাকেনি। (শোনা যায় এই সম্রাট একসময় নিজ হাতে টুপি সেলাই করে তার বিক্রয় লব্ধ অর্থেই জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। তাছাড়া নিজের দৈনন্দিন রুটির যোগার করার জন্যে তিনি নিজ হাতে কোরাণের অংশ সমূহ লিখে বিক্রী করতেন। চাউন, ভয়েজেস্, আমস্টার্ডাম এডিশন)।

আমার মনে পড়ে তিনটি উপলক্ষ্যে আমি তাঁকে মদ্যপান করতে দেখেছি। তাঁকে তা দেয়া হয়েছিল বড় একটি পাথুরে স্ফটিক পাত্রে। পাত্রটি আনা হয় হীরা, চুনী ও মরকত মণি খচিত একখানি রেকাব বা সান্‌কির উপরে বসিয়ে। পানপাত্রের গড়নটি গোলাল, খুব মসৃণ। ঢাক্‌নাটি সোনার। রেকাবীর মতই কারুকার্য্য মণ্ডিত। নিয়ম হচ্ছে, বাদশাহের ভোজনের সময় বেগমগণ ও খোজারা ব্যতীত আর কেউ উপস্থিত থাকবেন না। খুব কচ্ছিৎ তিনি কোন প্রজার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কোন সুলতান বা নিকট আত্মীয় কারোর গৃহেই যান না। আমার ভ্রমণ যাত্রার শেষ পর্য্যায়ে দেখেছি সম্রাটের প্রধান উজির ও বেগমের দিক থেকে খুল্লতাত জাফর খান তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁর নবনির্ম্মিত আবাস পরিদর্শনের জন্যে। জাফর

খানের পক্ষে সম্রাটের আগমন অপেক্ষা বড় সম্মান আর কিছু ছিল না। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন নানা মণিরত্ন, হাতী ঘোড়া ও উটের বহর এবং আরও সব জিনিস যার মূল্য দাঁড়িয়েছিল সাত লক্ষ টাকা। আমাদের দেশীয় মুদ্রায় উপহার মূল্য হয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লিভার। জাফর খানের এই বেগম হলেন সমগ্র ভারত ভূখণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা উদার প্রকৃতির মহিমময়ী নারী। তিনি একা যা ব্যয় করেন তা বাদশাহের সমস্ত বেগম ও কন্যাদের ব্যয় ভার অপেক্ষা অধিক। যদিও তাঁর স্বামীই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্যের অধিনায়ক তাহলেও তাঁর বদান্যতার জন্যে পরিবারটি সর্ব্বদাই থাকে ঋণগ্রস্ত। এই মহিলা সম্রাটের সম্মানার্থে বিরাট এক ভোজপর্ব্বেরও আয়োজন করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। সম্রাট কিন্তু জাফর খানের গৃহে খাদ্য গ্রহণ করতে অসম্মত হয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন। নিরুপায় হয়ে সেই সুলতানা বাদশাহের জন্যে আয়োজিত খাদ্য সম্ভার তাঁর পশ্চাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রাসাদে। বাদশাহের সেই খাদ্য বস্তু এত ভাল ও সুস্বাদু লেগেছিল যে তা বহন করে যে খোজাটি এসেছিল তাকে তিনি পাঁচশ' টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন; আর পাকশালার কর্ম্মীদের দিলেন তার দ্বিগুণ অর্থ।

পাল্‌কীতে করে বাদশাহ যখন মসজিদে যান তখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে একজন তাঁকে অনুগমন করেন অশ্বারোহণ করে; অন্যান্য রাজপুত্রগণ ও প্রাসাদের উচ্চ কর্ম্মচারীরা খালি পায়ে হেঁটে। স্বজাতীয়রা রাজার জন্যে অপেক্ষমান থাকেন মসজিদের সিঁড়ির একেবারে উপরের ধাপটিতে। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন তাঁরা তাঁর সামনে এগিয়ে চলেন প্রাসাদের ফটক পর্য্যন্ত। বাদশাহের সম্মুখভাগে আটটি হাতী সার বেঁধে চলতে থাকে। চারটির পিঠে থাকে দু'টি করে লোক। একজন হাতীকে চালনা করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোট একটি বল্লমের সংগে একটি পতাকা বহন করে। বাকী চারটি হাতী বহন করে নিয়ে চলে সিংহাসন জাতীয় আসন পীঠ। আসনগুলির একটি চৌকো, একটি গোলাকার, তৃতীয় খানার মাথায় আবরণ; আর চতুর্থটি নানারকম কাঁচ দিয়ে পুরোপুরি আবৃত। সম্রাট যখন বাইরে যান তখন তাঁর দেহ রক্ষীর সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচশ' কি ছয়শ'। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকে এক প্রকার হাত-বল্লম জাতীয় অস্ত্র। বল্লমগুলির লোহার ফলকে আড়াআড়ি ভাবে দু'টি হাউই বাজী থাকে। তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে বল্লম গুলিকে পাঁচশ' গজ দূরে চালিয়ে নেয়া যায়। বাদশাহের পেছনে থাকে আরও তিন

চারশ' লোক। তাঁদের হাতে থাকে সেকেলে ধরণের বন্দুক। এরা একটু ভীরু ধরণের। বন্দুক চালনায়ও তত পটু নয়। সাধারণ পর্য্যায়েরও একদল অশ্বারোহী সৈন্য থাকে। ইউরোপের একশ' সৈন্যের পক্ষে এই জাতীয় একহাজার সৈন্যকে ঘায়েল করা কিছু কঠিন নয়। তবে এদের মত মিতাচারী জীবনের সংগে খাপ-খাইয়ে চলা তাদের (ইউরোপের) পক্ষে সম্ভব নয়। এদেশের অশ্বারোহী ও পদাতিক—উভয় সৈন্যরাই জীবন রক্ষা করে অল্প কিছু আটা জল ও গুড় একত্রে মেখে লাড্ডুর মত করে তাই খেয়ে। সন্ধ্যার দিকে প্রয়োজন মত খিচুড়ি রান্না করে খায়। খিচুড়ি তৈরী হয় চাল ডাল একত্রে নুন সহযোগে সিদ্ধ করে। খিচুড়ি খাবার আগে এরা নিজেদের আংগুল গুলিকে ঘির মধ্যে ডুবিয়ে নেয়। এই হচ্ছে উভয় প্রকার সৈন্য ও গরীব লোকদের সাধারণ খাদ্য।

এই প্রসংগে আরও উল্লেখযোগ্য হোল আমাদের দেশের সৈন্যরা ভারতীয়দের মত সারাদিন সূর্য্যের এই খর তাপে দিন কাটাতে পারবে না। আরও বলার মত হোল যে কৃষকদের একমাত্র পরিচ্ছদ হচ্ছে একখণ্ড কাপড় যার দ্বারা কেবল মাত্র লজ্জাই নিবারণ করা চলে। এই সম্প্রদায়ের জনসমাজ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। এদের হাতে কিছু অর্থ কড়ি আছে এমন কথা সুবাদারের কানে গেলে তিনি আইনতঃ বা বল পূর্ব্বক সব কেড়ে নেবেন। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশকেই মনে হবে যেন মরুভূমি। কারণ সেখান থেকে কৃষককুল সুবাদারদের অত্যাচার পীড়নে অন্যত্র পালিয়ে চলে গেছে। শাসকগোষ্ঠী মুসলমান। তাঁরা হতভাগ্য পৌত্তলিকদের নানাভাবে অভিযুক্ত করেন। যদি তাঁরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহলে উপরওয়ালার অনুমতি অনুসারে তাদের আর কাজকর্ম্ম খাটাখাটুনি করতে হয় না। তারা হয় সৈন্যদলে যোগ দেবেন, না হয় তো ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন। ফকির হলেন এমন ধরনের লোক যাঁরা সংসার ত্যাগ করে এই জীবন গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও দানের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। বস্তুতঃ এঁদের খুব সৎ ও সুবুদ্ধি সম্পন্ন বলা যায় না। শোনা যায় ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে ফকির আছে আট লক্ষ; আর হিন্দুদের মধ্যে ঐ জাতীয় সংসার ত্যাগীর সংখ্যা একলক্ষ বিশ হাজারের মত। এদের কথা আমি পরে বলবো।

সম্রাট পনের দিনের মধ্যে একবার শিকারে যান। যাওয়ার পথে এবং শিকারকালেও তিনি হস্তী পৃষ্ঠেই থাকেন। শিকারের লক্ষ্য পশুগুলিকে

তাড়িয়ে এনে জড় করা হয় সম্রাটের হাতীকে বেষ্টিত একদল বন্দুক ধারী শিকারীর আওতার মধ্যে। সেই পশুদলে সাধারণতঃ থাকে সিংহ, বাঘ, হরিণ, দ্রুতগামী মৃগ। বন্য শূকর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য যে উচ্চ পর্য্যায়ের কোন মুসলমান ঐ পশুটিকে চোখে দেখতেও নারাজ। শিকার করে ফেরার সময় বাদশাহ পাল্‌কীতে চড়ে আসেন। দেহরক্ষী ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি ঠিক মসজিদে যাবার সময় যেমনটি হয়, তেমনিই। তফাৎ হোল, শিকারের সময় তাঁর সামনে দু'তিনশ' অশ্বারোহী থাকে কিছুটা এলোমেলোভাবে।

রাজবংশসম্ভূতা নারী, তিনি বাদশাহের বেগম, কন্যা, ভগিনী যাই হোন না কেন, কখনও প্রাসাদ ত্যাগ করে বেরোবেন না। তাঁরা বাইরে যান কেবলমাত্র হাওয়া পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এবং তা কয়েকদিনের জন্যেই। হয়ত কখনও কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সংগে দেখা করতেও এঁরা যান। যেমন জাফর খানের স্ত্রী হলেন সেই রকম সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অন্যতম। তিনি হলেন সম্রাটের পিসিমা। এই জাতীয় দেখা সাক্ষাৎও বাদশাহের অনুমতি সাপেক্ষ। পারস্যদেশের মত এদেশে সে নিয়ম নয় যে রাজ পরিবারের নারীরা কেবল রাত্রিতেই বেরোবেন। আর সংগে থাকবে বহু সংখ্যক খোজা যারা রাস্তায় সমাগত লোকদের হটিয়ে দেবে। কিন্তু মুঘল পরিবারের নিয়ম হচ্ছে মহিলারা সাধারণতঃ সকালের দিকে বেলা ৯ টায় বেরোবেন। সংগে থাকে মাত্র তিনচার জন খোজা ও দশবারটি দাসী যারা বেগমদের খাস পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত থাকে। মুঘল হারেমের মহিলাবৃন্দ পাল্‌কিতে করে যাতায়াত করেন। পাল্‌কিগুলি কারুকার্য্যময় নক্সাকাটা কাপড়ে আবৃত থাকে। প্রতিটি পাল্‌কীর পেছনে একজন লোক বসার উপযুক্ত ছোট একটি গাড়ী চলতে থাকে। গাড়ীটি টেনে নেয় দু'টি লোক। গাড়ীর চাকার ব্যাস এক ফুটের বেশী নয়। এই ছোট গাড়ী সংগে রাখার কারণ হচ্ছে বেগমরা যখন আত্মীয় স্বজনের গৃহে যান তখন পাল্‌কী বাহকরা সে গৃহের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারে না। ফটকের বাইরে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। বেগম তখন পাল্‌কী থেকে নেমে ছোট গাড়ীতে ওঠেন; আর দাসীরা গাড়ীটিকে চালিয়ে নিয়ে যান সেই গৃহের অন্দর মহলে। আমি অন্যত্রও বলেছি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহে মহিলাদের কক্ষ থাকে কেন্দ্রস্থলে। সাধারণতঃ দু'টি তিনটি অংগন চত্বর অতিক্রম করে এবং দু'একটি বাগানও হয়ত পেরিয়ে তবে মহিলা মহলে পৌঁছোনো যাবে।

রাজকুমারীদের দরবারের কোন উচ্চ কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সংগে বিবাহ হলে তাঁরাই স্বামীদের পরিচালনা করেন। স্ত্রীদের ইচ্ছানুযায়ী স্বামীরা না চললে, নির্দ্দেশ মত কাজ না করলে যে কোন সময় তা বাদশাহের কাছে অভিযোগ হিসেবে পেশ করা হয়। বাদশাহ এমনভাবে প্রভাবিত হন যে তাতে উক্ত কর্ম্মচারীদের ক্ষতিও হতে পারে। অনেক সময় তাঁরা কর্ম্মচ্যুত হন। সম্রাটের প্রথম পুত্রই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তিনি যদি দাসীর গর্ভজাতও হন তাহলেও সে প্রথার পরিবর্ত্তন হয় না। হারেমের বেগমবৃন্দ এই জাতীয় সংবাদ পেলে সেই ভাবী সন্তানকে মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হন। আমি পাটনায় থাকা কালে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খানের শল্য চিকিৎসক, যিনি খাঁটি পর্ত্তুগীজ ছিলেন না, তিনি আমাকে বলেছিলেন, খান সাহেবের বেগম একমাসে তাঁর হারেমের আটজন মহিলার গর্ভস্থিত সন্তানের জীবননাশ করিয়েছিলেন। কারণ তাঁর নিজ সন্তান ব্যতীত আর কারোর সন্তানকে বাঁচবার সুযোগ দেবার মতলব ছিল না।

অধ্যায় দশ

মহান মুঘল সম্রাট কর্তৃক গ্রন্থকারকে তাঁর সমস্ত মণিরত্ন প্রদর্শনের হুকুম প্রদান।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর আমি প্রাসাদে গিয়েছিলুম সম্রাটের কাছে বিদায় গ্রহণের জন্যে। কিন্তু তিনি ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে তাঁর মণিরত্নাদি না দেখে আমি যেন স্থান ত্যাগ না করি। তাছাড়া তাঁর উৎসব পর্ব্বের ঐশ্বর্য্য মহিমাও দেখতে হবে (এখানে একটু অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বেই উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন)।

সেই বিশেষ প্রাতঃকালের পরদিন সম্রাটের পাঁচ ছয় জন উচ্চ কর্ম্মচারী ও নবাব জাফর খানের পক্ষ থেকে আরও কয়েকজন লোক এসে আমাকে বললেন যে তাঁরা সম্রাটের কাছ থেকে এসেছেন। আমি দরবারে পৌঁছোতেই বাদশাহের মণিরত্নের দু'জন আরক্ষক, যাঁদের কথা আমি অন্যত্র বলেছি, তাঁরা আমাকে বাদশাহের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁকে সাধারণভাবে অভিবাদন জানানোর পালা শেষ হোল। লোক দু'টি আমাকে নিয়ে গেলেন ছোট একটি কক্ষে। বাদশাহ যে দরবার গৃহে বসেছিলেন এই কক্ষটি ছিল তারই এক প্রান্তে। বাদশাহ সেখান থেকে আমাদের দেখতে পেতেন। ঐ কক্ষটিতে আমার দেখা হোল বাদশাহী রত্নাগারের প্রধান অধ্যক্ষ আকিল খানের সংগে। তিনি আমাকে দেখেই সম্রাটের চারজন খোজাকে হুকুম দিলেন মণিরত্ন সম্ভার নিয়ে আসার জন্যে। তারা রত্নরাজি নিয়ে এল সোনার পাতে মোড়া দু'টি বড় বড় কাঠের বাক্সে করে। ও দু'টি আবৃত ছিল ঐ উদ্দেশ্যেই তৈরী দু'খণ্ড কাপড় দিয়ে। একটির ঢাকনা লাল মখমলের। আর একটি সবুজ মখমলের উপরে সোনালী জরির কাজ করা। বাক্স খুলে জিনিসগুলিকে তিন তিনবার গুণে দেখা হোল। তিনজন লিপিকার ওখানে হাজির থেকে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন। ভারতীয়রা সব কাজই করেন অতি যত্ন, সতর্কতা ও ধৈর্য্য সহকারে। তাঁরা যদি দেখেন যে কেউ তরি ঘড়ি করে যা তা ভাবে কিছু করে যাচ্ছেন, তাহলে বড় রেগে যান। মুখে কিছু বলবেন না। যিনি দ্রুত তাচ্ছিল্যভাবে কাজ কচ্ছেন তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন, আর এমনভাবে হাসবেন, মনে হবে যেন কোন পাগলের দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

আকিল খান প্রথম যে রত্নটি আমার হাতে দিয়েছিলেন সেটি বেশ বড় একটি গোলাকার ও গোলাপী আভাযুক্ত একটি হীরক। ওটির একটা দিক একটু উঁচু গড়নের। আবার নীচের দিকের কিনারায় সামান্য একটু চিড় ও ভেতরে ছোট একটি ছিদ্র মত আছে। তার বর্ণাভা অতি মনোরম। ওজন তিন শত, সাড়ে তিনশ' রতি অর্থাৎ আমাদের ক্যারাটে হয় দুশ' আশী। এক রতি হচ্ছে ক্যারাটের ⅞ ভাগ। মীরজুমলা, যিনি তাঁর মনিব গোলকুণ্ডার সুলতানকে প্রতারণা করে চলে আসেন, তিনি শাহজানের পক্ষে এসে যোগদান করে এটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তখন এটি মসৃণ ছিল না। ওজন ছিল মূলতঃ নয়শ' রতি বা সাতশ' সাড়ে সাতাশী ক্যারাট। তাছাড়া ওর গায়ে তখন অনেক ফুটো-ফাটাও ছিল।

এই রকম রত্ন ইউরোপে নানা রকম কাজে লাগানো হয়। তার থেকে বেশ উত্তম ধরণের কিছু খণ্ড বের করে নেয়া হোত। ওজনেও বেশী দাঁড়াত। কারণ অতটা চেঁছে ছুলে ফেলা হোত না। এখানেও ওটিকে কাটা ছেড়ার ভার দেয়া হয়েছিল জনৈক ভিনিশীয় মণিকার সিয়ের হোরতেন শিয়ো বোর্জিয়োর উপর। এই কাজের জন্যে তিনি খুব লোকসানে পড়েন। কারণ পাথরটি কাটবার সময় তিনি ওটিকে নষ্ট করেছেন বলে তিরস্কৃত হন। ওজনে ঘাটতি হয়েছিল। কাজের মজুরী তো পেলেনই না। পরন্তু বাদশাহ তাঁকে জরিমানা করেছিলেন দশ হাজার টাকা। তাঁর সংগে আরও বেশী টাকা থাকলে হয়ত অর্থ দণ্ডের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত। সেই মণিকারের ব্যবসা বুদ্ধি প্রখর হলে তিনি রত্নটির ক্ষতি না করেও বেশ বড় একটি খণ্ড ওটা থেকে বের করে নিতে পারতেন। মূল পাথরটিকে এত ঘসা-মাজা করারও প্রয়োজন হোত না। আসলে তিনি খুব উচ্চ পর্য্যায়ের হীরক-জহুরী নন।

সেই চমৎকার পাথরটিকে ভালভাবে দেখে শুনে আমি ওটি আকিল খানের হাতে ফিরিয়ে দিলুম। তিনি আমাকে আর একটি পাথর দেখালেন নাশপাতির মত আকারের। ভারি সুন্দর গড়ন সেটির। চমৎকার বর্ণাভাস ময়। আর দেখলাম তিনখানি টেবিল হীরক। দু'টি বেশ স্বচ্ছ। তৃতীয়টিতে রয়েছে ছোট ছোট কাল দাগ। প্রতিটি ওজনে পঞ্চান্ন থেকে ষাট রতি। নাশপাতির মত যেটি তার ওজন সাড়ে বাষট্টি রতি। এরপর তিনি দেখালেন বারখানি হীরক খচিত একটি অলংকার। প্রতিটি হীরা পনের থেকে ষোল

রতি ওজনের এবং সবকটি গোলাপী। সেগুলোর মাঝখানে হরতনের মত আকারের ও চমৎকার বর্ণাভাযুক্ত একটি হীরক। কিন্তু তাতে ছোট তিনটি ফুটো আছে। ওজন প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ রতি।

আরও একটি অলঙ্কার দেখলাম। সেটি সতেরখানি হীরা সমন্বিত। সবচেয়ে বড়টির ওজন সাত আট রতির বেশী নয়। মাঝেরটি কিছু বড়, ওজন প্রায় বার রতি। প্রতিটি পাথরেরই রঙ্ অতি উচ্চ পর্য্যায়ের, খুব স্বচ্ছ ও গড়ন অত্যন্ত সুন্দর। এ রকম সুন্দর জিনিস আর কখনও দেখি নি।

দু'টি চমৎকার মুক্তা, নাশপাতির মত গড়ন। একটির ওজন প্রায় সত্তর রতি। ওটির দু'পাশ একটু চাপা ও চ্যাপ্টা মত। বর্ণাভা অতি মনোরম; আকারও উত্তম।

মুক্তার একটি বোতাম। ওজন সম্ভবতঃ পঞ্চান্ন থেকে ষাট রতি। গড়ন, জেল্লা সবই উচ্চাঙ্গের।

আর একটি দেখলাম নিখুঁত রূপের গোলাল মুক্তা। একপাশ একটু চাপা। ওজন ছাপ্পান্ন রতি। আমার মতে ওজন ঠিকই। পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আব্বাস মুঘল সম্রাটকে এটি পাঠিয়েছিলেন উপহার স্বরূপ।

আরও তিনটি গোলাকৃতি মুক্তা দেখা গেল। প্রতিটি ওজনে পঁচিশ থেকে আঠাশ রতি কি তার কাছাকাছি। বর্ণাভা হলদে মত।

নিখুঁত রূপের আরও গোলাল মুক্তা। ওজনে সাড়ে ছত্রিশ রতি। একেবারে ধবধবে সাদা। সব দিকে নিখুঁত। বর্ত্তমান মুঘল সম্রাট এই একটি মাত্র রত্নই নিজে ক্রয় করেন এবং তা সৌন্দর্য্য সুষমার জন্যেই। আর বাকী সব তিনি পেয়েছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শাহের কাছ থেকে। অর্থাৎ দারার মুণ্ডচ্ছেদের পর তিনি তা আত্মসাৎ করেন অথবা সিংহাসনে আরোহণের পর উপহার হিসেবে হাতে আসে। আমি ইতিপূর্ব্বেও মন্তব্য করেছি যে এই সম্রাটের মণিরত্নের প্রতি কোন শ্রদ্ধা আকর্ষণ নেই। তাঁর একমাত্র গর্ব্বের বিষয়—তিনি ইসলাম ধর্ম্ম সম্পর্কে অতি মাত্রায় উৎসাহী।

আকিল খান আমার হাতে আরও দু'টি মুক্তা দিয়েছিলেন। (তিনি সব জিনিসই আমাকে খুব স্বচ্ছন্দে দেখবার সুযোগ দান করেন)। মুক্তা দু'টি নিখুঁতভাবে গোলাল ও মসৃণ। প্রতিটি ওজনে সোয়া পঁচিশ রতি। একটি সামান্য হলদে আভার। দ্বিতীয়টি অতি উজ্জ্বল দীপ্তিময়। এত বেশী সুন্দর যে ওরকমটি বড় দেখা যায় না। আমি অন্য এক জায়গায় বলেছি এবং

তা অতি সত্য যে আরবের যে অধিপতি পর্তুগীজদের কাছ থেকে মাসকাট দখল করেছিলেন, তাঁর কাছে এমন একটি মুক্তা ছিল যেটি পৃথিবীর সমস্ত মুক্তাবলীকে সৌন্দর্য্যে হার মানিয়েছে। কারণ সেটি এত নিখুঁতভাবে গোলাল, আর শ্বেত শুভ্র ও উজ্জ্বল যে দেখলে মনে হয় পুরোপুরি স্বচ্ছ, ভেতরে কোন কাঠিন্য নেই। কিন্তু ওজন মাত্র চৌদ্দ ক্যারাট। এশিয়াখণ্ডে এমন শাসক সম্রাট নেই যিনি আরবের অধিপতিকে সেটি বিক্রী করতে অনুরোধ জানান নি।

দু'টি মালা বা হার ছিল। একটি হোল মুক্তা ও নানা আকারের চুনী দিয়ে তৈরী। চুনীগুলিও মুক্তার মত ফুঁড়ে সূতো দিয়ে গাঁথা। দ্বিতীয়টি মুক্তা ও মরকত মণির। মণিগুলি বিদ্ধ করা ও গোলাকার। মুক্তা সবই গোলাকৃতি এবং নানা প্রকার বর্ণাভাযুক্ত। ওজনে প্রতিটি দশ থেকে বার রতি। চুনীর মালাটির মাঝখানে আছে বড় একটি মরকত মণি। সেটি 'ওল্ড রক্' পর্য্যায়ের। চার সমকোণে কাটা ও রঙ অতি চমৎকার। কিন্তু অনেক ফুটো ফাটা রয়েছে গায়ে। ওজন প্রায় ত্রিশ রতি। মরকত মণির হারটির মাঝে আছে প্রাচ্যদেশীয় একটি পদ্মরাগ মণি। ওজনে প্রায় চল্লিশ রতি। সৌন্দর্য্য সুষমায় নিখুঁত।

বাদখশানী একটি চুনী কাবুচনী পদ্ধতিতে কাটা। অতি স্বচ্ছ ও চমৎকার রঙের। শেষ প্রান্তে বিদ্ধ করা। ওজনে সতের মিসৃকাল। ছয় মিসৃকাল এক আউন্সের সমান।

আরও একটি কাবুচনী চুনী চমৎকার নিখুঁত রঙের। তবে সামান্য খুঁত ছিল। শেষ প্রান্তে বিদ্ধ করা। ওজনে বার মিসৃকাল।

প্রাচ্যদেশীয় একটি পোখরাজ ছিল অতি উত্তম বর্ণের। ওজনে ছয় মিসৃকাল। কিন্তু একদিকে সামান্য রকমের ছোট একটি সাদা দাগ আছে।

এই হচ্ছে মহান মুঘল সম্রাটের মণিরত্ন যা তিনি আমাকে দেখবার সুযোগ দিয়েছিলেন বিশেষ অনুগ্রহ সহকারে। আর কোন ফরাসী জাতির মানুষকে এই জাতীয় সৌজন্য প্রদর্শন করেন নি। সব জিনিসই আমি হাতে ধরে পরখ করে দেখেছি। যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলাম এই কারণে যাতে আমি পাঠকদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমার বর্ণনা অতি সত্য ও বাস্তব। আর তা সিংহাসনের বর্ণনার মতই নিখুঁত। সিংহাসনটি পর্য্যবেক্ষণ করায়ও আমি প্রচুর সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম।

অধ্যায় এগার

শায়েস্তাখান গ্রন্থকারকে যে নিস্ক্রমণ পত্র দান করেন তার চুক্তিসমূহ। চিঠিপত্রের উত্তর প্রত্যুত্তর। চিঠিপত্রে দেশীয় রীতিনীতির প্রতিফলন।

আমি এখন ছাড়পত্র প্রসংগে আসছি। আমাকে তা দিয়েছিলেন নবাব শায়েস্তা খান। এই প্রসংগে আমি তাঁকে যে চিঠিপত্র লিখেছিলাম এবং তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন তা সব উল্লেখ কচ্ছি। পাঠকবর্গ জানতে পারবেন ভারতীয়দের মধ্যে চিঠি লেখার রীতি পদ্ধতি কি ছিল। বাদশাহের কাছ থেকেও আমি একটি ছাড়পত্র পেয়েছিলাম। সম্রাট সেটি আমাকে মঞ্জুর করেছিলেন তাঁর মাতুল (মাতা মমতাজ বেগমের ভ্রাতা) জাফর খানের মাধ্যমে। সেটি পাঠ করে আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিই। কারণ ওটি আমার মনের মত ভাষায় লেখা হয় নি। আমার ইচ্ছে ছিল তাতে কোন বাধা নিষেধ থাকবে না। পারস্যাধিপতির কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলাম এখানেও ঠিক সে রকমটি পাওয়ার আশা করেছিলাম। অর্থাৎ যাতে আমাকে যাতায়াতের পথে কোন শুল্ক দিতে না হয়। আর তা কিছু বিক্রী করি কি না করি। কিন্তু মুঘল অধিপতি যে ছাড়পত্র দিলেন তা ছিল নিয়মে আবদ্ধ। যে কোন জিনিস বিক্রয়কালে আমাকে আমদানী শুল্ক দিতে হবে। জাফর খান যদিও আমাকে বললেন যে বাদশাহ প্রদত্ত সমস্ত ছাড়পত্রের মধ্যে এটি সর্ব্বাপেক্ষা সৌজন্যপূর্ণ, আর নিয়মানুসারে তা ভিন্ন রকম হতে পারে না, তাহলেও আমি ওটি গ্রহণ করতে সম্মত হই নি। পরন্তু শায়েস্তা খান প্রদত্ত যে ছাড়পত্রটি নিয়ে আমি কয়েক বছর ধরে ভ্রমণ কচ্ছি, সেটিতেই সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করলাম। আমার পক্ষে সেটিই যথেষ্ট ছিল। কারণ বাদশাহ প্রদত্ত ছাড়পত্রের মত ওটিও মূল্যবান বিবেচিত হোত। কখনও হয়ত বা বেশী। তবে একথা ঠিক সম্রাটের কাছে আমি যা বিক্রী করছি তার জন্যে আমাকে কোন শুল্ক দিতে হয় নি। বিশেষ মহানুভবতাই প্রকাশ পেয়েছে সে ব্যাপারে।

মুঘল অধিপতির মাতুল শায়েস্তা খানের কাছে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে গ্রন্থকারের লিখিত পত্রের অনুলিপি।

আমি ফরাসী জাতির মানুষ জীন ব্যাপটিষ্ট তাভেরনিয়ে। আপনার সেবকদের মধ্যে আমিও সামান্য একজন। আপনার সুখ সৌভাগ্য ও মহত্ত্বের জন্যে আমিও পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। আজ আপনার দয়ানুগ্রহের কাছে আমি একটি অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ। তাঁর আত্মীয় হিসেবে আপনিই তাঁর সাম্রাজ্য কচ্ছেন শাসন সংরক্ষণ। বাদশাহ তাঁর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আপনার উপরেই সমর্পণ করেছেন। সুলতানদের মধ্যে আপনি অপরাজেয় শায়েস্তা খান। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।

কয়েক বছর পূর্ব্বে আপনি ছিলেন গুজরাটের সুবাদার এবং বাস করতেন আমেদাবাদে। তখন আমার অবকাশ হয়েছিল আপনাকে কয়েকটি বড় মুক্তা ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য জিনিষ দেখাবার যা আপনার ধনাগারেরেই উপযুক্ত। জিনিসগুলির মূল্য আমি তৎক্ষণাৎ পেয়েছিলাম। আর আপনি তা বিশেষ উদারতা সহকারেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ সময় আপনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ইউরোপে ফিরে গিয়ে আরও দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করে আপনার জন্যে যেন নিয়ে আসি। সেকাজ আমি করেছি পাঁচ ছয় বছর ধরে। ঐ সময় আমি সমস্ত ইউরোপ পরিভ্রমণ করে যেখানে যা সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য দেখেছি তাই সংগ্রহ করেছি। আর তা সবই আপনার যোগ্য। আমি পারস্যাধিপতির দরবারে এসে জানতে পারলাম যে ভারতবর্ষে যুদ্ধ চলছে। আমি তখন সেই জিনিসপত্র আমার জনৈক সংগীর মারফতে মসলীপত্তনের পথে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কয়েক দিন আগে আমি সুরাটে পৌঁছে খবর পেলাম সমস্ত জিনিস নিরাপদে পৌঁছে গিয়েছে।

আপনি যদি উক্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তুসমূহ ক্রয় করতে ইচ্ছুক হন এবং দেখতে চান তাহলে আমি আপনার কাছে এমন একটি অনুমতি পত্রের আবেদন করবো যার সাহায্যে আমি আপনার কাছে পৌঁছোতে পারবো এবং রাস্তায় আমার কোন অসুবিধা কষ্ট হবে না। আর আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ওখানে আমার যাবার প্রয়োজন নেই তাহলে আমি অন্য কোথাও চলে যাব। যাই হোক্, আমি আপনার হুকুম নির্দ্দেশের জন্যে সুরাটে অপেক্ষা করবো। আর ঈশ্বরের কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবো তিনি যেন সর্ব্বদা আপনাকে সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্পদের মধ্যে রাখেন।

উপরোক্ত চিঠিখানির জবাবে শায়েস্তা খান গ্রন্থকারকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার অনূদিত রূপ।

মহিমাময় ঈশ্বর—

সৌভাগ্যশালী, ধর্ম্মপ্রাণ ফরাসী দেশীয় মঁসিয়ে তাভেরনিয়ে, আমার প্রিয় বন্ধু, আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার চিঠি আমার হাতে পৌঁছেচে। তাতে আমি জানলাম আপনি সুরাটে ফিরেছেন, আর আমার নির্দ্দেশমত জিনিসপত্র এনেছেন। আপনার চিঠি বিশেষ যত্ন সহকারে বিবেচনা করে দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। সুতরাং, এই পত্রপ্রাপ্তির পর আপনার আনীত জিনিসপত্র সহ এখানে আসার ব্যবস্থা করবেন। একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন, আমি আপনাকে সর্ব্ববিধ সৌজন্য প্রদর্শন করবো। তাছাড়া আপনি আমার কাছে সর্ব্বতোভাবে সম্ভাব্য সাহায্য লাভের আশা করতে পারেন। আমি আপনার আকাঙ্ক্ষিত একটি ছাড়পত্র পাঠাচ্ছি। তার সাহায্যে আপনি দ্রুত এখানে চলে আসতে পারবেন। আমি আপনার পত্রে বর্ণিত জিনিস দেখবার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র। আপনি সত্বর এখানে এলেই উত্তম। আর অধিক কি লিখবো?

১১ই চৌবল; ইসলামী সন ১০৬৯। নিম্নোক্ত পংক্তিসমূহ শায়েস্তা খান স্বহস্তে লিখেছিলেন—

আমার প্রিয়তম ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি একজন। আপনার অনুরোধ আমাব কাছে পৌঁছেচে। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনি কথা রেখেছেন, প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন, এজন্যে ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত করুন। সত্বর আমার এখানে চলে আসুন। আর নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনি আমার কাছে সব রকম আনন্দ, তৃপ্তি ও লাভজনক ব্যবহার পাবেন।

এরপর গোলাকৃতি একটি সীলমোহর সহ লেখা হয়েছিল…

সুলতানদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও বিজয়ী সম্রাট ঔরংজেবের সেবক।

শায়েস্তা খান প্রদত্ত ছাড়পত্রের অনুবাদ।

সুরাট বন্দর ও জাহানাবাদ দরবারের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের আমদানী রপ্তানী ও শুল্ক বিভাগের সমস্ত রাজপ্রতিনিধি ও কর্ম্মচারীবৃন্দ, ছোট বড় সব রাস্তা-ঘাটের অধিকর্ত্তাগণ।

ফরাসী দেশীয় মসিয়ে তাভেরনিয়ে অতি সম্মানিত ব্যক্তি ও আমাদের সকলের অতি প্রিয়পাত্র এবং আমার পরিবারভুক্ত একজন কর্ম্মী। তিনি সুরাট বন্দর থেকে আমার কাছে আসছেন। তাঁর সংগে পথিমধ্যে যারই

দেখা হোক না কেন, কোন কারণেই যেন তাঁর ভ্রমণ যাত্রা ব্যাহত না হয়। পরন্তু নির্বিঘ্নে তাঁর পথযাত্রা অতিবাহিত করার সুযোগ যেন তিনি পান। তিনি যেন স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে আমার কাছে পৌঁছোতে পারেন। উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ এলাকায় তাঁর সংগে থেকে যাত্রাকে সুগম করে দেবেন। এ বিষয় আমি আপনাদের উপরে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ কচ্ছি। এর অন্যথা যেন না হয়।

১১ই চৌবল, মহম্মদী সন ১০৬৯। গ্রন্থকারকে লেখা শায়েস্তা খানের দ্বিতীয় পত্রের অনুবাদ—

এঞ্জিনিয়রদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও সৎ প্রকৃতির মনুষ্যকুলের শিরোমণি ফরাসী দেশীয় মঁসিয়ে তাভেরনিয়ে, জেনে রাখুন, আমি আপনাকে আমার প্রিয়তম পাত্রদের একজন ও অতিশয় আদরণীয় মনে করি। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে লিখেছিলুম জাহানাবাদে আসতে এবং আমার জন্যে আনীত দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগে আনারও অনুরোধ করেছিলাম। বাদশাহের দয়ানুগ্রহে উপস্থিত আমি দাক্ষিণাত্য রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি ও সুবাদার নিযুক্ত হয়েছি। সম্রাটের হুকুম পেয়েই আমি ২৫শে চৌবল তারিখে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করবো। সুতরাং আপনাকে আর জাহানাবাদে যেতে হবে না। আপনি বরং যত শীঘ্র সম্ভব বুরহানপুরের দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি সেখানে দু'মাস কি তার কাছাকাছি সময় মধ্যে পৌঁছে যাব। আশাকরি আমার ইচ্ছানুসারেই কাজ করবেন।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই দ্বিতীয় পত্রের উত্তর ঃ

আপনার মহত্ব ও শ্রীসম্পদ এবং আপনার ব্যক্তিগত মঙ্গলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, ফরাসী দেশীয় সেই জীন ব্যাপ্‌টিষ্ট তাভেরনিয়ে—ইত্যাদি ঠিক প্রথম পত্রেরই অনুরূপ।

মহামান্য আপনি আমার মত দীন সেবকের উপযুক্ত যে নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন তা আমি পেয়েছি। সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবাব সাহেবকে প্রণতি জানাচ্ছি আপনার জনৈক দূতের মারফতে আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনাকে একথা জানিয়ে কৃতার্থ হয়েছি যে বর্ষাকাল অন্তে আমি জাহানাবাদে গিয়ে আপনার সংগে দেখা করতে ত্রুটি করবো না। আপনি আমাকে এখনি বুরহানপুরে যাবার নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন। আমি অবশ্যই আপনার হুকুম তামিল করবো। আপনার জন্যে আনীত দুষ্প্রাপ্য বস্তু সম্ভারও নিয়ে যাব। ১০ই হুজে লিখিত॥

গ্রন্থকারকে লিখিত শায়েস্তাখানের তৃতীয় পত্র।

আমার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রিয়তম ফরাসী দেশীয় মঁসিয়ে তাভেরনিয়ে, আপনি জেনে রাখুন যে আমার স্মৃতিতে আপনি সদা জাগরুক। আমার দূতের মারফতে আপনি যে চিঠি আমাকে পাঠিয়েছেন তা আমি পেয়েছি এবং অক্ষরে অক্ষরে পড়েছি। আপনি লিখেছিলেন যে বর্ষা ও খারাপ রাস্তার জন্যে আপনার আসা সম্ভব হয়নি। সুতরাং শীতের শেষে আপনি আমার সংগে দেখা করতে আসবেন। এখন বৃষ্টির অবসান হয়েছে। কাজেই আমি আশা কচ্ছি পঁচিশ ছাব্বিশ দিনের মধ্যে ঔরংগাবাদ পৌঁছে যাব। এই-চিঠি পেয়ে আপনি অবিলম্বে আমার সংগে দেখা করবেন। আশা করি এর অন্যথা হবে না।

শক্কর মাসের ৫ই তারিখে লিখিত অর্থাৎ ঔরংজেবের রাজত্বের প্রথম বর্ষে।

এরপরে নবাব স্বহস্তে লিখেছিলেন—প্রিয়বন্ধু, আমি যা লিখছি তদনুসারে কাজ করতে ত্রুটী করবেন না।

এই তৃতীয় পত্রের উত্তরে গ্রন্থকার লিখেছিলেন : হে মহামান্য, আপনার সেবকদের মধ্যে অতি দীনহীন আমি ফরাসী দেশীয় জীন ব্যাপটিষ্ট তাভেরনিয়ে—আপনার সুখ সমৃদ্ধির জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই। আপনি সম্রাটের সৈন্য বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারী। আপনার মাধ্যমেই বাদশাহের অনুগ্রহ বিতারিত হয়। আ .নার উপাধি খেতাব বিশেষ সম্মানজনক ও শ্রদ্ধাপ্লুত। আপনি বাদশাহের নিকট আত্মীয়। তাঁর রাজ্য সুবার আপনি মুখ্য শাসক। আপনার সংগেই সম্রাট সমস্ত গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ করেন এবং আপনি তাঁর শ্রেষ্ঠ নির্ভরস্থল। আপনি সুলতান শিরোমণি।

আপনার অনুগ্রহভাজন হয়ে আমি এই আবেদন পেশ কচ্ছি। আপনার হুকুম মান্য করে আমি এদেশে পৌঁছে আপনার অনুগ্রহের উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করে আছি। আমি যখন মনে কচ্ছি যে আপনার প্রচুর অনুগ্রহের ধারা আমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে তখন আমি সুরাটের সুবাদার মীর্জা আরবের খপ্পরে পড়ে যাই। আপনার নির্দ্দেশ পেয়ে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিতে যাই যাতে আমি দ্রুত আপনার কাছে গিয়ে অভিবাদন জানাতে পারি। তিনি তদুত্তরে বললেন, তিনি আমার সম্বন্ধে সম্রাটকে লিখেছেন। সুতরাং তাঁর জবাব না এলে তিনি আমাকে বিদায় গ্রহণের অনুমতি দিতে অক্ষম। আমি তাঁকে জানালাম যে আমার সংগে কিছু নেই। তাছাড়া আমি এই বন্দরে পৌঁছোলে আমার সংগে এমন কিছু ছিল না যা শুল্ক বিভাগের অনুমতি

সাপেক্ষ। আমি বিস্মিত হলাম যে তিনি আমার সম্পর্কে সম্রাটকে জানিয়েছেন। আমার সমস্ত যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে তিনি স্বমতে দৃঢ় হয়ে রয়েছেন এবং আমাকে সুরাট ত্যাগের অনুমতি দান ব্যাপারে অক্ষমতা জানাচ্ছেন। এখন সবকিছু আপনার উপরে নির্ভর কচ্ছে। আমারও কর্ত্তব্য আপনার নির্দ্দেশ মেনে চলা। মীর্জা আরবের মত লোকেরও সাধ্য নেই যে আপনার ইচ্ছা নির্দ্দেশের উপরে কর্ত্তৃত্ব চালিয়ে এই জাতীয় বাধা সৃষ্টি করেন।

তাছাড়া আমি পূর্ব্বে যেমন আপনাকে লিখেছিলাম তদনুরূপ আমার জিনিসপত্র সংগে না থাকায় সুরাটে আমার এই বিলম্ব বিশেষ ক্ষতিকর হবে আমার পক্ষে। আর আপনার পক্ষেও হবে অপ্রীতিকর। তদুপরি এই ঘটনার ফলে ব্যবসায়ীরা আর এই বন্দরে আসতে আগ্রহী হবেন না। তাতে এই রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি যে আমার জিনিসপত্র আপনাকে না দেখিয়ে যদি অন্য কাউকে দেখাতে হয় তার চেয়ে সব পুড়িয়ে ফেলবো, না হয় সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দেবো—এই মনস্থ করেছি। আমি ভরসা করি, আপনার ন্যায় মহামান্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমাকে এই বিপদ বিঘ্ন থেকে অতি সত্বর মুক্ত করবেন। আমি অতি দ্রুত গিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। আমি আরও আশা করি যে আমি যে পরিমাণ অনুগ্রহ আপনার কাছে লাভ করছি তার কথা যখন ফ্রান্সে পৌঁছোবে তখন ও দেশের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এদেশে ব্যবসা চালাতে বিশেষ আগ্রহী হবেন। তার ফলে ফ্রান্সের দুষ্প্রাপ্য ও মহামূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী সম্বন্ধে ভারতবর্ষ জানতে পারবে। আর তখুনি এদেশে এযাবৎ যা কিছু দেখা গিয়েছে তাকে হীনপ্রভ মনে হবে। একথা আপনাকে জানানো উপযুক্ত বিবেচনা করেই আমি এই চিঠি লিখলাম।

তারিখ : সুরাট, রবি ও আউল মাসের ২৫শে।

এই সমস্ত চিঠিপত্র ও জবাবগুলি দ্বারা বোঝা যাবে যে আমি কেন প্রায় ছ' মাস সুরাটে বিলম্ব করেছিলুম। অবশেষে নবাবের কাছ থেকে একটি জরুরী হুকুম এল স্থানীয় সুবাদারের কাছে যাতে তিনি আমাকে বিদায় অনুমতি দান করেন। নতুবা তাঁকে সেই উচ্চপদের মায়া ত্যাগ করতে হোত। সুরাটের শাসক সেই ব্যর্থতার ফলে এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে আমি বিদায় গ্রহণ করতে গেলে তিনি একটিবারও আমার দিকে তাকানো প্রয়োজন মনে করেন নি। আমিও সেজন্যে কিছু মনে করিনি।

এরপর আমি সংবাদ পেলাম নবাব ঔরংগাবাদ থেকে চলে গিয়েছেন। আরও জানা গেল যে তিনি সৈন্য বাহিনীসহ দাক্ষিণাত্যে রয়েছেন। সেখানে তিনি রাজা শিবাজীর অধীনস্থ শোলাপুর নামে একটি সহর অবরোধে ব্যস্ত। আমি সব জিনিসপত্র তাঁর জন্যেই এনেছিলাম। আর তা সব তাঁর কাছেই বিক্রী করলাম। যতদিন আমি তাঁর ওখানে ছিলাম ততদিন আমার নিজের ও ঘোড়াগুলির জন্যে খাদ্যের কোন অভাব হয়নি। তাঁর লোক লস্কর প্রতিদিন আমার জন্যে চার থালি মাংস ও দু'থালি ফল মিষ্টি এনে দিত। বেশীর ভাগ খেত আমার ভৃত্য ও সংগীরা। আমি তাঁবুতে বসে খাওয়ার অবকাশ খুব কমই পেতাম।

নবাব তাঁর সৈন্য বাহিনীর পাঁচ ছয় জন রাজা বা পৌত্তলিক রাজকুমারদের হুকুম দিয়েছেন যে তাঁরা যেন তাঁদের রীতি পদ্ধতি মাফিক আমাদের আদর আপ্যায়ন করেন। কিন্তু তাঁদের খাদ্য তালিকাভুক্ত ভাত ও ব্যঞ্জনাদিতে এত লঙ্কা,,আদা ও অন্যান্য মশলা থাকতো যে আমার পক্ষে তা খাওয়া একেবারেই সম্ভব হোত না। ফলে সে সব খাদ্য পড়ে থাকতো। আমি ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ফিরে আসতাস।

ঐ সময় নবাব একটি খনির উপর গোলাবর্ষণ করেন। তাতে শোলাপুরের বাসিন্দারা এত ভীতিগ্রস্ত হন যে তাঁরা সন্ধি করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। যে সৈন্যদল সহরটি বিধ্বস্ত করে লুট-পাটের আশায় ছিল তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো। লুঠতরাজের ফলে লাভবান হওয়ার আশা হোল ব্যর্থ। আমার যাত্রার দিনে নবাব আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি তাঁকে বললাম যে একটি বিঘ্নিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। দু'পক্ষের সৈন্য সম্পর্কেই আমার যথেষ্ট ভীতি আছে। সুতরাং আমার প্রাপ্য অর্থ আমাকে দৌলতাবাদে দিতে অনুরোধ জানালাম। তিনি আগ্রহ সহকারেই তা মঞ্জুর করলেন। আর এমন একটি হুকুমপত্র দান করলেন যার দ্বারা আমি সেখানে পৌঁছোবার পরের দিনই টাকা পেয়ে গেলাম। যে খাজাঞ্চী আমাকে টাকা হিসেব করে দিলেন তাঁর কাছে শুনলাম যে চারদিন পূর্ব্বে একটি জরুরী সংবাদে তিনি আমাকে টাকা দেবার নির্দ্দেশ পেয়েছিলেন। নবাব আমাকে অতি দ্রুত টাকা দেবার জন্যে হুকুম পাঠিয়েছিলেন। তাতে বোঝা যায় যে ভারতীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে কত নিয়মনিষ্ঠ। ধার-দেনা তাঁরা কত দ্রুত মিটিয়ে দেন তাও জানা গেল।

অধ্যায় বার

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে উৎপন্ন জিনিসপত্র। গোলকুণ্ডা, বিজাপুর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য।

আমার মনে হয় যাঁরা ইতিপূর্ব্বে মহান মুঘল সাম্রাজ্যের বিবরণী লিখেছেন তাঁরা ওখান থেকে বিদেশে যে সকল পণ্যাদি আমদানী হয় সে সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দান করতে উদ্যোগী হননি। আমি এই কাজটি করতে চাই। আর তা করবো বিভিন্ন ভ্রমণ যাত্রা পর্য্যায়ে নানা দেশে দীর্ঘদিন কাটিয়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করছি, তার উপর নির্ভর করে। আশাকরি পাঠকরা সন্দেহাতীতভাবে এবং আনন্দের সংগে আমার এই অনুসন্ধান গবেষণার ফলশ্রুতিকে গ্রহণ করবেন। আমি এই কাজটি বিশেষ সতর্কতার সংগেই করবো। পাঠক যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগে যুক্ত হন এবং তিনি যদি নানা অঞ্চলের মানব সমাজের উপযোগী শিল্প-বাণিজ্য ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আগ্রহী হন তাহলে তিনি অধিকতর আনন্দ লাভ করবেন।

একটি বিষয় এখানে স্মরণযোগ্য যে আমি প্রথম খণ্ডের সূচনাতে ভারতবর্ষের জিনিসপত্রের ওজন ও মাপজোপ সম্বন্ধে কি মন্তব্য করেছি। সেখানে আমি 'মণ' ও 'সের'-এর কথা উল্লেখ করেছি। এখন 'কিউবিট' বা 'হাত' সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে।

যে সকল জিনিস গজ-ফিতা দিয়ে মাপ করা যায় তা সবই কিলবিট বা একহাত ধরেও হিসেব করা চলে। তারও আবার নানা ধরণ আছে। ইউরোপেও নানা প্রকার স্কেল বা গজ-ফিতার প্রচলন আছে। এখানে তা চব্বিশ 'তসু'তে বিভক্ত। ভারতে উৎপন্ন অধিকাংশ জিনিস সুরাটে নিয়ে গিয়ে সরবহাহ করা হয়। সেখানে এক কিউবিটের এক-চতুর্থাংশকে মার্জিনে ধরে নেয়ার প্রথা। আর তা ছয় তসুতে ভাগ করা থাকে।

জিনিসপত্রের মধ্যে যা সবচেয়ে মূল্যবান তাদের কথা উল্লেখ করেই দ্রব্য তালিকা রচনা করবো। হীরা ও রঙীন পাথরসমূহের কথাই অধিক উল্লিখিত হবে। এই বিষয়টি অংশতঃ খুব ব্যাপক এবং আমার বিবরনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব এই বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা দানই সমীচিন। এই অধ্যায়ে স্থান পাবে কেবলমাত্র রেশমী কাপড়, সূতীবস্ত্র, সূতো,

মশলাপাতি ও ওষুধপত্র। এই সকল জিনিসও আছে নানা প্রকারের। ভারত থেকে সংগৃহীত সমুদয় পণ্য দ্রব্যের ধরণ ধারণ এই দেখেই বোঝা যায়।

॥ রেশমী বস্ত্র ॥

বাংলা সুবার কাশিমবাজার থেকে প্রতি বছর প্রায় বাইশ হাজার 'বেল্' রেশমী কাপড় আমদানী হয়। প্রতিটি বেল্-এর ওজন একশত 'লিভর্'। এক লিভর্ ষোল আউন্সের সমান। বাইশ হাজার বেলের মোট ওজন ২,২০০,০০০ লিভর্। ওলন্দাজরা জাপান ও হল্যাণ্ডের জন্যে সাধারণতঃ ছয় থেকে সাত হাজার বেল্ রেশমী কাপড় সংগ্রহ করেন। অবশ্য তাঁরা আরও বেশী সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হন। কিন্তু তর্তোরী ও মুঘল সাম্রাজ্যের ব্যবসায়ীরা তাতে আপত্তি করেন। কারণ তাঁরাও ওলন্দাজগণের সমান ওজনের জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসা চালান। বাকী উদ্বৃত্ত অংশ দেশের লোকের হেফাজতে রাখা হয় তাদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে এবং নির্মাতাদের জন্যে। সমুদয় রেশম গুজরাটে নিয়ে জড় করা হয়। তার বড় একটি অংশ চলে যায় আমেদাবাদ ও সুরাটে। সেখানে রেশমের কাপড় তৈরী হয়।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে রেশম ও সোনালী জরির গালিচা, সিল্কের অপরাপর জিনিস, সোনারূপার জরি এবং আরও সব রেশমী দ্রব্য সুরাটেই তৈরী হয়। পশমী গালিচা তৈরী হয় ফতেপুরে। জায়গাটি আগ্রার বার ক্রোশ দূরে।

দ্বিতীয়তঃ, সোনালী ও রূপালী বর্ডারযুক্ত সাটিন, নানা বর্ণময় ডোরাকাটা আরও কত কাপড় ও অন্যান্য যাবতীয় জামা পোষাক সমস্ত তৈরী হয় সুরাটে। জিনিসগুলি ঠিক 'তাফেতা'র মত।

তৃতীয়তঃ, পাতোলা—রেশমী সূতায় তৈরী। ভারী নরম, সারা গায়ে নানা রঙের ফুলকারী নকসার কাজ। তৈরী হয় আমেদাবাদে। এক একখণ্ড পাতোলার দাম আট থেকে চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত। ওলন্দাজদের লাভজনক ব্যবসার মধ্যে এই জিনিসটির মুখ্য স্থান। তাঁরা ওলন্দাজ কোম্পানীর কোন লোককে ব্যক্তিগতভাবে এই জিনিসটির ব্যবসা চালাতে অনুমতি প্রদান করেন না। এই জিনিসটি আমদানী হয় ফিলিপাইন, বোর্ণিও, জাভা সুমাত্রা এবং আশেপাশের অন্যান্য দেশ সমূহে।

মোটা রেশমী কাপড় সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার যে প্যালেস্টাইন ব্যতীত আর কোন জায়গায় তা স্বাভাবিকভাবে সাদা হয় না। অ্যালেপ্পি ও ত্রিপোলীর ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত সামান্য কিছু সংগ্রহ করতে অসুবিধা বোধ করেন। পারস্য ও সিসিলি থেকে যে প্রকার মোটা সিল্ক আসে, কাশিমবাজারের রেশমী কাপড়ও তদনুরূপ হলদে রঙের। তবে কাশিমবাজারের অধিবাসীরা জানেন যে বিশেষ একটি গাছ পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে একপ্রকার গাদ তৈরী করলে তা দ্বারা কাপড়কে সাদা করা যায়। সেই গাছকে বলা হয় আদমের 'ফিগ্' গাছ।[১] তা দ্বারা উক্ত সিল্ককে প্যালেস্টাইনের সিল্কের মত সাদা করে তোলা যায়। ওলন্দাজরা রেশমী কাপড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ করেন। আর তা নিয়ে যান কাশিমবাজার থেকে গঙ্গা পর্য্যন্ত প্রবাহিত একটি খাল দিয়ে। খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩ ক্রোশ। তারপর হুগলী নদীতে যেতে হলে আরও সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। সেখানে পৌঁছোলে তবে জাহাজে মাল চড়ানো সম্ভব হবে।

॥ সূতী বস্ত্র ॥

ছাপানো কাপড়ের প্রথম নমুনা, তার নাম ছিট্ কাপড়।

ছাপানো ছিট কাপড়ের আর একটি নাম 'কলমদার' অর্থাৎ তুলি দিয়ে রঞ্জিত। তৈরী হয় গোলকুণ্ডা রাজ্যে, বিশেষ করে মসলীপত্তনের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে। কিন্তু উৎপাদনের মাত্রা এত স্বল্প যে একজন ব্যবসায়ী যদি সমস্ত সূতী বস্ত্রের কারিগরদের এনে কাজে বসিয়ে দেন তাহলেও তিন বেলের বেশী কাপড় তৈরী করা কঠিন হয়ে ওঠে। মহান মুঘল সম্রাটদের সাম্রাজ্যমধ্যে যে ছিট্ কাপড় তৈরী হয় তা ছাপানো। তার সৌন্দর্য্য নানা পর্য্যায়ের। কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও মুদ্রন, দু'দিকেই তা সমান। লাহোরের কাপড় সবচেয়ে মোটা। দামেও সস্তা। সেই কাপড়ের বিশটি খণ্ড পর্য্যন্ত এক প্যাকেটে

(১) পর্তুগীজ ভাষায় কলার রূপান্তর হয়েছে আদমের ফিগ্ নামে। মুসলমানদের বিশ্বাস যে কলাগাছের পাতা দিয়েই আদম ও ইভ তাদের প্রথম দেহাবরণ তৈরী করেন। আর সেই গাছ ছিল স্বর্গের উদ্যানে। এই কারণেই উক্ত নামটি হয়েছে। কলাগাছের ছাই ঠিক আলুর ছাই-এর মত। তার মধ্যে পটাশ ও সোডা সল্ট দুই-ই আছে। কিছু পরিমাণ ফসফোরিক এসিড ও ম্যাগনেশিয়া আছে বলেও জানা যায়।

বিক্রী হয়। দাম ষোল থেকে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত। সিরোঞ্জের ছিট্ কাপড়ের এক বাণ্ডিল বিশ থেকে ষাট টাকা মূল্যে বিক্রী হয়।

আমি যে ছিট কাপড়ের কথা বলবো তা সব ছাপানো। তা দিয়ে বেড-কভার তৈরী হয়। তাছাড়া আরও তৈরী হয় টেবিল কভার, দেশীয় রীতিতে বালিশের ওয়ার, পকেট রুমাল ও বিশেষভাবে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ব্লাউস ও ওয়েস্ট কোট। পারস্য দেশেই তা তৈরী হয় বেশী।

উজ্জ্বল রঙের ছিট্ কাপড় পাওয়া যায় বুরহানপুরে। তা রুমালের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বর্ত্তমানে যারা নস্যি টানেন তারাই এই কাপড়ের রুমাল বেশী ব্যবহার করেন। এক প্রকার উড়নিও তৈরী হয় এই কাপড়ে। সারা এশিয়ার মহিলারা মাথায় ও গলায় তা জড়িয়ে ব্যবহার করেন।

বাফ্‌তা নামে যে সূতী কাপড় তাকে যদি লাল, নীল বা কালো রঙ্ করতে হয় তাহলে তাকে সাদা অবস্থায় আগ্রা ও আমেদাবাদে নিয়ে যেতে হবে। কারণ এই দু'টি জায়গা নীল তৈরীর কারখানার সন্নিকটে। নীল জিনিসটি রঙ তৈরীর কাজেই ব্যবহৃত হয়। এক এক খণ্ড বফ্‌তার দাম দুই থেকে ত্রিশ, চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত। তবে দামের তারতম্য হয় কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও দু' প্রান্তে সোনালী কাজের মাত্রানুসারে। কোন কোন কাপড়ের বর্ডারেও সোনালী রঙ থাকে। ভারতীয়রা জানেন যে এক প্রকার বিশেষ জলে এই কাপড় ধুলে ঠিক ঢেউ খেলানো মিহি কাপড়ের মত হয়ে যায়। তার দাম সবচেয়ে বেশী।

এই জাতীয় সূতী কাপড় এক একটি খণ্ড দুই থেকে বার টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। আমদানী হয়ে যায় মালিন্দা উপকূলে। মোজাম্বিকের গভর্ণর কৃত ব্যবসা বাণিজ্যের মুখ্য অংশ জুড়ে আছে এই কাপড়। তারা এই জিনিস বিক্রী করেন কাফ্রীদের কাছে। কাফ্রীরা তা বয়ে নিয়ে যায় আবিসিনিয়া ও সেবা রাজ্যে। তথাকার জনসমাজ সাবান ব্যবহার করেন না। কেবল মাত্র জলে ধুয়েই কাপড় জামা ব্যবহার করেন।

এই কাপড়ের মধ্যে যেগুলির মূল্য বার টাকা এবং তারও বেশী তা চালান হয়ে যায় ফিলিপাইন, বোর্ণিয়ো, জাভা সুমাত্রা এবং আরও সব দ্বীপময় দেশে। দ্বীপপুঞ্জের নারী সমাজ এই কাপড়ের একটি খণ্ডকে কেটে এক অংশ দিয়ে তৈরী করেন একটি পেটিকোট বা ঘাঘ্‌রা। আর বাকী অংশকে কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত জড়িয়ে রাখেন।

॥ সাদা সূতী বস্ত্র ॥

সাদা সূতী কাপড়ের কিছু অংশ উৎপন্ন হয় আগ্রা ও লাহোর অঞ্চলে। কিছু হয় বাংলাদেশে। আর বাকী সব হয় বরোদা, ব্রোচ, নবসারী ও অন্যান্য স্থানে। সব জায়গাতেই বড় বড় খোলা জায়গায় কাপড় সাদা করার বন্দোবস্ত আছে। আশে পাশে প্রচুর লেবুর ফলন হয় বলেই ওখানে কাপড় সাদা করার ব্যবস্থা হয়েছে। কারণ সূতী বস্ত্রকে উত্তমরূপে সাদা করে তুলতে প্রচুর লেবুর রস ছিটিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়।

আগ্রা, লাহোর ও বাংলা সুবার সূতী বস্ত্র বিক্রী হয় প্যাকেটে বেঁধে। এক একটি প্যাকেটের মূল্য ষোল টাকা থেকে তিনশত, চারশত কি তারও বেশী হয়। প্যাকেট তৈরী হয় ব্যবসায়ীদের নির্দেশানুসারে।

নবসারী ও ব্রোচের মোটা কাপড় একুশ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সাদা ধোলাই কাপড় হলে তা থাকে বিশ কিউবিট মাপের। বরোদার মোটা কাপড়ও বিশ হাত লম্বা। সাদা ধোলাই কাপড় হয় ১৯½ হাত।

এই তিনটি সহরে উৎপন্ন সূতী কাপড় বা বাপ্তা যাই হোক্—তা দুই রকমের। বহরেও তা দুই প্রকার। আমি যে ধরনের কাপড়ের কথা বলছি তা বহরে ছোট। প্রতিটি বস্ত্র বিক্রী হয় দুই থেকে ছয় মামুদী মুদ্রা মূল্যে।

চওড়া বাপ্তার মাপ ১¾ হাত। লম্বায় তা বিশ হাত। সাধারণতঃ তা বিক্রী হয় পাঁচ থেকে বারো মামুদী মুদ্রায়। কিন্তু স্থানীয় বণিকরা তাকে আরও প্রশস্ত ও সূক্ষ্মতর করে তুলতে পারেন। তার এক একটি খণ্ড পাঁচশত মামুদী মুদ্রা দরে বিক্রী হয়। আমার অবস্থানকালে আমি দেখেছি যে ঐ জাতীয় দু' খণ্ড কাপড়ের প্রতিটি বিক্রী হয়েছে এক হাজার মামুদী মুদ্রা মূল্যে। একটি নিলেন জনৈক ইংরেজ, আর দ্বিতীয়টি কিনলেন একজন ওলন্দাজ। প্রতিটির দৈর্ঘ্য ছিল আঠাশ কিউবিট। পারস্যের রাষ্ট্রদূত ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য সমাধা করে যখন দেশে ফিরে গেলেন তখন তিনি অস্ট্রিচের ডিমের মত আকারের একটি নারিকেল উপহার দিয়েছিলেন দ্বিতীয় শাহ সাভাবীকে। ওটি ছিল মূল্যবান প্রস্তর মণ্ডিত। সেটি খুলে দেখা গেল যে ওর মধ্যে রয়েছে ষাট কিউবিট লম্বা কাপড়ের একটি পাগড়ী। এমন মিহি মসলীনে তা তৈরী ছিল যে হাতে নিয়েও সহজে বোঝা যেত না যে জিনিসটি বস্তুতঃ কি। একবার ভ্রমণ অন্তে আমারও ইচ্ছে হয়েছিল যে ঐ ধরণের এক আউন্স আন্দাজ সূতা নিয়ে আসব। এক লিভর ওজনের সেই সূতার দাম ছয়

শত মামুদী মুদ্রা। আমাদের দেশের পরলোকগতা বিধবা রানী ও রাজ-পরিবারের অপরাপর মহিলারা সেই সূতার সূক্ষ্মতা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই সূক্ষ্মতার মাত্রা এমন যে আসল জিনিসটাই মানুষের নজরে পড়ে না।

॥ তুলাজাত সূতার কথা ॥

কাঁচা তুলা ও তৈরী সূতা দুই-ই আসে বুরহানপুর ও আগ্রা থেকে। কাঁচা তুলা কখনও ইউরোপে চালান যায় না। কারণ তার বোঝা ভারি হয়। দামও বেশী পাওয়া যায় না। তা রপ্তানী হয়ে যায় কেবল মাত্র লোহিত সাগর অঞ্চলে, থর্মাস ও চসোয়াতে। কখনও হয়ত সুন্দা দ্বীপপুঞ্জে এবং ফিলিপাইনেও যায়। তৈরী সূতা প্রসংগে বলা যায় যে ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী তা প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানী করে। তবে তা খুব উৎকৃষ্ট নয়। যে জাতীয় সূতা ইউরোপে প্রেরিত হয় তার এক এক মন ওজনের দাম হয় পনের থেকে পঞ্চাশ মামুদী মুদ্রা। এই ধরণের সূতার ব্যবহার হয় বাতির পলিতা ও মোজা তৈরীর জন্যে। আর রেশমী জিনিস বয়নের জন্যেও তা ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে অতি মিহি সূক্ষ্ম সূতার প্রয়োজন হয় না বললেও চলে।

॥ নীলের চাষ ও ব্যবসা ॥

মহান মুঘল সাম্রাজ্যের নানাস্থানেই নীলের চাষ হয়। স্থান ভেদে তার ধরণ পর্য্যায়ও স্বতন্ত্র। গুণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে মূল্য মানেরও তারতম্য আছে।

প্রথমতঃ কিছু নীল উৎপন্ন হয় বিয়ানা, ইন্দোর ও খুর্জাতে। আগ্রা থেকে খুর্জার দূরত্ব দু' এক দিনের যাত্রা পথ। ওখানকার নীলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুরাট থেকে আট দিন যাত্রা পথের ব্যবধানে এবং আমেদাবাদের দুই লীগ দূরে সারকেজ নামক একটি গ্রামেও নীল উৎপন্ন হয়। সেখানে খণ্ড খণ্ড আকারের নীল পাওয়া যায়। অনুরূপ এবং প্রায় সমমূল্যের নীল পাওয়া যায় গোলকুণ্ডা রাজ্য মধ্যে। বিয়াল্লিশ সেরে হয় সুরাটী এক মণ। লিভরে হিসেব করলে দাঁড়ায় ৩৪½ লিভর্। তা বিক্রী হয় পনের থেকে বিশ টাকায়। শেষোক্ত পর্য্যায়ের কিছু নীল ব্রোচেও জন্মায়। আগ্রার সন্নিকটে যা উৎপন্ন হয় তাকে অর্দ্ধগোলাকৃতি করে তৈরী করার প্রথা। আমি পূর্ব্বেও বলেছি

যে এই নীল সর্ব্বোত্তম। তা বিক্রী হয় মণ দরে। ওখানে ষাট সেরে এক মণ। তা ৫১ৡ লিভরের সমতুল্য। দাম সাধারণতঃ ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। বুরহানপুরের ছত্রিশ লীগ দূরে সুরাটের রাস্তায় বড় একটি গ্রাম আছে। নাম রাওয়াত। তার আশে পাশে আছে আরও ছোট ছোট গ্রাম। সেখানেও নীলের চাষ হয়। সেখানকার অধিবাসীরা বছরে মোটামুটি লক্ষাধিক টাকারও বেশী মূল্যের নীল বিক্রী করেন।

পরিশেষে বলতে হয় বাংলাদেশের নীলের কথা ওলন্দাজ কোম্পানী তা মসলীপত্তনে নিয়ে যায়। আগ্রায় জাত নীলের তুলনায় বুরহানপুর ও আমেদাবাদের নীল শতকরা ত্রিশ ভাগ সস্তা।

নীল তৈরী হয় গাছ থেকে। প্রতি বছর বৃষ্টির পরে গাছ পোঁতা হয়। দেখতে ঠিক শনের মত। বছরে তিনবার সেই গাছ কাটার প্রথা। চারাগুলি দুই তিন ফুট লম্বা হলেই প্রথম কাটার পালা আসে। জমি থেকে ছয় ইঞ্চি উপরে কাটবার নিয়ম। প্রথমবারে সংগৃহীত পাতা পরবর্ত্তী সংগ্রহের তুলনায় নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। দ্বিতীয় দফায় সংগ্রহের মাত্রাও কম। প্রথমবারের তুলনায় তা দশ বার শতাংশ হ্রাস পায়। তৃতীয়বারে ত্রিশ শতাংশে নেমে যায়। নীলের কাঁই টুকরো করে ভাঙ্গলে তার রঙ দেখে গুণাগুন বোঝা যায়। প্রথম উৎপাদনে যে রঙ বেরোয় তা বেগুনে নীল। এই রঙটি অপরাপর রঙ অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। তৃতীয়টির চেয়ে দ্বিতীয় ফলন বেশী সমুজ্জ্বল। এই গুণগত প্রভেদ জিনিসটির মূল্যমানেও যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। তাছাড়া ভারতীয়রা ওজন ও উৎকর্ষ ব্যাপারেও এদিক সেদিক করে। সে বিষয়ে আমি অন্যত্র আলোচনা করবো।

নীলের চারা কেটে ভারতীয়রা খণ্ড খণ্ড চূন দিয়ে তৈরী একটি পুকুরে ফেলে রাখেন। সেই চূন এত শক্ত যে দেখে মনে হবে যেন এক একখণ্ড শ্বেত পাথর। সেই প্রস্তরবৎ চূন দিয়ে পুকুরটি বাঁধানো থাকে। তার আয়তন ৮০ থেকে ১০০ পদক্ষেপ মত ব্যাসের। জলাশয়টির অর্দ্ধেক আন্দাজ জলপূর্ণ করে তার মধ্যে নীলের গাছ কেটে এনে জমা করা হয়। গাছ পাতাগুলিকে জলের সংগে মিশিয়ে প্রতিদিন নাড়াচাড়া করার নিয়ম। পাতাগুলি যতদিনে (ডাঁটার কোন মূল্য নেই) মিশে এঁটেল মাটির মত না হচ্ছে ততদিনই নাড়া-চাড়ার কাজ চলবে। মিশে গেলে কিছুদিন একভাবে জমা রাখতে হয়। অবশেষে যখন দেখা যাবে যে সমস্ত জিনিসটা তলায় গিয়ে থিতিয়ে

জমাট বেঁধেছে ; আর উপরে জলরাশি বেশ স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে তখন জলাধারটির চারদিকে যে গর্ত্ত আছে তার মুখ খুলে দিতে হবে যাতে জল সব বেরিয়ে যেতে পারে। জল বেরিয়ে গেলে সমস্ত কাঁই বা মণ্ড ঝুড়িতে তুলে খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর দেখা যাবে প্রতিটি ঝুড়ির পাশে একটি করে লোক বসে আছে। আর সেই কাঁই হাতে নিয়ে আধখানা মুরগীর ডিমের আকারে খণ্ড খণ্ড কেকের মত তৈরী কচ্ছে। সেই টুকরোগুলির নীচের অংশ সমতল, উপরের দিকটা সরু আকারের বা ছুঁচলো। আমেদাবাদের নীল একটি ছোট কেকের মত করে তৈরী হয়। গড়নটা একটু চ্যাপ্টা ধরনের। একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এশিয়া থেকে ইউরোপে প্রেরিত হয় যে নীল তার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে ব্যবসায়ীরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। সম্পূর্ণরূপে ধূলাবালি মুক্ত করে তবে ইউরোপে বিক্রী করা হয়। সেখানে রঙ প্রস্তুতের জন্যে তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নীল প্যাক করা ও জাহাজে তোলার সময় মালবহনকারীদের অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়। তখন তারা নিজেদের সমস্ত মুখখানিকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ আবৃত করে নেয়। কোন জায়গায় সামান্যতম ফাঁক ফুটো না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক। কেবল চোখ দু'টির জায়গায় ছোট একটি ফাঁকা থাকে কাজের সময় জিনিসপত্র দেখার জন্যে যারা নীল বহন করে আনেন, হিসেবপত্র রাখেন ও মাল তোলার কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করেন তাদের প্রতি ঘন্টায় ঘণ্টায় দুধ খেতে হয়। এর কারণ নীলের সূক্ষ্ম কুপ্রভাব থেকে আত্মরক্ষা। আট দশ দিন এক নাগাড়ে কাজ করলে তা প্রতিরোধ করাও সম্ভব হয় না। কিছুদিন যেতেই তাদের সর্দি শ্লেষার সংগে নীল রঙ নির্গত হতে থাকে। আমি দুই দুইবার দেখেছি যে নীল এদিক ওদিক সরিয়ে নেবার সময় তার কাছাকাছি জায়গায় যদি একটি ডিমকে সারাদিন রাখা যায় তাহলে পরে সেটিকে ভাঙলে দেখা যাবে তার অভ্যন্তর ভাগ নীল রঙের হয়ে গিয়েছে। নীল চূর্ণ এমন ভয়ংকর রূপের তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী।

যারা ঝুড়ি থেকে নীলের মণ্ডা তুলে খণ্ড খণ্ড আকারে তা তৈরী করে তাদের হাতে তেল মেখে নেবার নিয়ম। খণ্ড নীল রোদে শুকোতে হয়। ব্যবসায়ীরা নীল কেনার সময় সর্ব্বদাই একটু আগুনে পুড়িয়ে দেখেন তার মধ্যে ধুলা বালি মেশানো আছে নাকি। কারণ, যে কৃষক শ্রেণীর মানুষ ঝুড়ি থেকে কাঁই বের করে নীলের খণ্ড তৈরী করে তারা অনবরত তেলের

মধ্যে যেমন আংগুল ডুবিয়ে নেয়, তেমনি আবার বালির মধ্যেও আংগুল রাখতে হয়। সুতরাং আংগুলের বালি খণ্ড নীলের গায়ে লেগে ওজনে ভারি হবার সম্ভাবনা থাকে। নীল আগুনে পুড়লে একেবারে কয়লার মত হয়ে যায়। তবে বালির অংশ বড় একটা চলে যায় না। গভর্ণরগণ নানা প্রকার চেষ্টা করেন প্রতারণা বন্ধ করার জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু প্রতারণামূলক কাজ চলতেই থাকে।

॥ শোরা বা যবক্ষার প্রসঙ্গ ॥

প্রচুর পরিমাণে শোরা পাওয়া যায় আগ্রা ও পাটনাতে। শেষোক্ত স্থানটি বাংলা সুবার সন্নিকটে। শোধিত শোরার দাম অশোধিত অপেক্ষা তিন গুণ বেশী। ওলন্দাজরা ছাপরাতে শোরার একটি ডিপো প্রতিষ্ঠা করেছেন। জায়গাটি পাটনার চৌদ্দ লীগ উত্তরে। শোরা ওখানে শোধন করে নদী পথে তা হুগলীতে প্রেরিত হয়। হল্যাণ্ড দেশ বয়লার আমদানী করেন শোরা শোধনের জন্যে। শোধনক্ষম লোক নিযুক্ত করে ব্যবসার উপযুক্ত পরিমাণ শোরা শোধিত করার ব্যবস্থা ওলন্দাজরা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে সফল হননি। এদেশের লোকেরা দেখলো যে শোরা শোধন করে সমুদয় লাভের অংশ ওলন্দাজরা পেয়ে যান। তখন তাঁরা (ভারতীয়) ঠিক করলেন যে শোধনের জন্যে অপরিহার্য্য তরল পদার্থটি তারা আর সরবরাহ করবেন না। সেই বস্তুটি ব্যতীত শোরাকে শ্বেত শুভ্র করা সম্ভব নয়। আর তা যদি উপযুক্তভাবে সাদা ও স্বচ্ছ না হয় তাহলে তার কোন মূল্য নেই। এক মণ শোরার মূল্য সাত মামুদী মুদ্রা।

॥ মশলার কথা ॥

আমাদের সুপরিচিত বিভিন্ন ধরনের মশলা হোল—এলাচি, আদা, লঙ্কা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও দারুচিনি। আমার মতে এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হোল এলাচি ও আদা। এলাচি জন্মায় বিজাপুর রাজ্যে। আদার ফলন অনেক জায়গাতেই হয়। বাকি সব মশলা দেশের বাইরে আমদানী হয় সুরাটে। সেই মশলাপাতি ওখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের একটা প্রধান অংগ।

মশলার মধ্যে এলাচির স্থান সকলের উপরে। তবে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। আমি ইতিপূর্ব্বেও বলেছি যে এর ফলন সর্ব্বত্রই যৎসামান্য। কাজেই কেবল

মাত্র এশিয়ার ধনী ও অভিজাতদের খাদ্যেই তার ব্যবহার দেখা যায়। পাঁচশত লিভর ওজনের এলাচি বিক্রী হয় একশত থেকে একশত দশ রিয়েল মুদ্রা মূল্যে।

আদা প্রচুর জন্মায় আমেদাবাদে। এশিয়ার আর কোন স্থানে এত আদার ফলন হয় না। একটি বিষয় নির্দ্ধারণ অত্যন্ত কঠিন যে কি পরিমাণ শুকনো আদা বিদেশে রপ্তানী যায়।

লঙ্কা বা মরিচ দুই প্রকার। ছোট ও খুব বড়। নামই ওদের ছোট ও বড় লঙ্কা। বড়গুলি আমদানী হয় মুখ্যতঃ মালাবার, তুতিকোরিণ ও কালিকট থেকে। কিছু পরিমাণ আসে বিজাপুর থেকে; তা বিক্রী হয় রাজাপুরে। এই জায়গাটি অতি ছোট এবং বিজাপুর রাজ্যেরই অংশ। ওলন্দাজরা স্থানটিকে ক্রয় করেছে মালাবারীদের কাছ থেকে। তারা এজন্যে কোন নগদ অর্থ প্রদান করেন নি। তৎপরিবর্ত্তে নানারকম পণ্যদ্রব্য দিয়ে থাকেন। যেমন, সুতা, আফিং, সিঁদূর ও পারদ। বড় সাইজের লঙ্কা ইউরোপেও চালান হয়ে যায়। ছোট মরিচ আসে বনতম্, কোচিন ও পূর্ব্বাঞ্চলীয় নানা জায়গা থেকে। এই জিনিসটি এশিয়ার বাইরে বিক্রয় করা হয় না। ওখানেই তা অতি মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ মুসলমানদের খাদ্যে। বড় লঙ্কার তুলনায় এক পাউণ্ড ওজনের ক্ষুদ লঙ্কায় দানা থাকে দ্বিগুণ সংখ্যক। পোলাও-এর মধ্যে তা অল্প কিছু পড়লেই দানা ঢের বেশী দেখা যায়। তবে বড় লঙ্কায় ঝাল বেশী।

সুরাটে আমদানী একমণ ছোট লঙ্কা কয়েক বছর তের চৌদ্দ মামুদী মূল্যে বিক্রীত হয়েছে। আমি দেখেছি ইংরেজরা এই দামে কিনে তা চালান দিতেন থর্মাস, বসোরা ও লোহিত সাগর অঞ্চলে। ওলন্দাজগণ বড় লঙ্কা সংগ্রহ করেন মালাবার উপকূলে। পাঁচশত লিভর ওজনের লঙ্কার জন্যে তাঁরা দাম পান মাত্র আটত্রিশ রিয়েল। কিন্তু এর বিনিময়ে তাঁরা যা পণ্য নিয়ে যান তাতে লাভ হয় পুরো একশত ভাগ।

টাকার সমতুল্য দরে এই জিনিস ক্রয় করতে হলে আঠাশ কি ত্রিশ রিয়েল নগদ দিতে হয়। এই প্রথায় কিনলে ওলন্দাজী রীতির তুলনায় ঢের বেশী দাম পড়ে। মহান মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় লঙ্কা সংগ্রহ করা যায় একমাত্র গুজরাট প্রদেশে। তার প্রতি মণের বিক্রয় মূল্য বার থেকে পনের মামুদী। ওর এক একটি গাছের দাম চার মামুদী মুদ্রা।

জায়ফল, মৈত্রী, লবঙ্গ ও দারুচিনির ব্যবসা ওলন্দাজদের হাতে আবদ্ধ। প্রথম তিনটি আসে মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ থেকে। আর চতুর্থটি অর্থাৎ দারুচিনি পাওয়া যায় সিংহল দ্বীপে।

জায়ফল সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ব্যাপার জানা যায়। তার ফলনের জন্যে গাছ পুঁতে দেয়া বা চাষের প্রয়োজন নেই। অনেকের মুখেই একথা শুনেছি। তারা বহু বছর সেই সব ওদেশে বসবাস করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তারা নিশ্চিত করে বলেছেন যে ফলগুলি পাকার সময় হলে কতকগুলি বিশেষ পাখী দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে দক্ষিণ দিকে চলে আসে। ওরা এসে ফলগুলিকে গিলে খায়। কিন্তু হজম করতে না পেরে আবার ওগুলিকে উগলে দেয়। ফলের গায়ে চট্‌চটে একটা শক্ত খোলা আছে। মাটিতে পড়ে থাকলে ওদের শিকড় গজায় এবং নতুন গাছ জন্মায়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পুঁতলে চারা উঠবে না। এই প্রসংগে স্বর্গের পাখীর কথা উল্লেখ করতে ইচ্ছে হয়। যে পাখীরা জায়-ফলের খুব ভক্ত তারা তার ফলন কালে প্রচুর সংখ্যক এসে জড় হয় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার জন্যে। ওরা আসে যেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মদিরা সংগ্রহের মত আনন্দ বিহারে। ফলগুলি অত্যন্ত উত্তেজক। এই ফল গলধঃকরণের ফলে শরীরে এমন প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয় যে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে ওরা প্রাণ হারায়। আর তখুনি ঐ অঞ্চলের একজাতীয় পিঁপড়ে পোকা এসে ওদের পাগুলিকে খেয়ে ফেলে। এইজন্যেই প্রবাদ আছে যে স্বর্গের পাখীর পা কখনও দেখা যায় না। তবে এদের সম্বন্ধে সর্ব্বদা একথা খাটে না। কারণ আমি তিন চারটি এমন মৃত পাখী দেখেছি যাদের পায়ে পিঁপড়েরা কিছু করতে পারিনি।

কন্‌টুর নামে জনৈক ফরাসী বণিক থ্যালেপ্পি থেকে এই জাতীয় পা-ওয়ালা একটি পাখী পাঠিয়েছিলেন রাজা চতুর্দশ লুইকে। পাখীটি বাস্তবিকই অত্যন্ত সুন্দর ছিল। দেখে রাজা খুব প্রশংসা করেছিলেন।

এত করেও ওলন্দাজরা একটি বিষয়ে কিছু করে উঠতে পারেননি। সেলিবিসের মাক্কাসারে লবঙ্গ পাওয়া যায়। সেখানে ওলন্দাজগণের মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীতই লবঙ্গের ব্যবসা চলে। দ্বীপবাসীরা লবঙ্গের জন্মস্থান থেকেই ডাচ কোম্পানীর কাপ্তেন ও সৈনিকদের কাছে এ জিনিস গোপনে ক্রয় করেন। বিনিময়ে ওরা গ্রহণ করে চাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র। তাদের প্রতি এমন ব্যবহার চলে যে এইভাবে খাদ্য সংগ্রহ করতে না

পারলে তাদের পক্ষে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ওখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজরাই হাতে নেবার চেষ্টা করেন অনবরত। তাঁদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয় যে ওলন্দাজদের বাণিজ্য নষ্ট করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁরা মাক্কাসারে লবঙ্গ কেনেন। তারপর তা ওলন্দাজদের সমুদয় ব্যবসাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আর অত্যন্ত সস্তা দরে তা বাজারে ছাড়েন, এমন কি ঘাটতি দিয়েও বিক্রি করেন। এইভাবে ইংরেজরা ওলন্দাজদের লবঙ্গের কারবারকে একেবারে ধ্বংসের মুখে নিয়ে চলেছেন।

ভারতবর্ষে একটি রীতি আছে যে কোন ব্যবসায়ী একটি জিনিসের দর দাম একবার ধার্য্য করলে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা সারা বছর ধরে তা মেনে চলবে।

ওলন্দাজগণ মাক্কাসারে একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করেছিলেন। সেখানে একদিকে তাঁদের কর্মচারীরা লবঙ্গের দাম যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দেন, আর অন্যদিকে দ্বীপের রাজা ঐ জিনিসটি বাজারের সকলের জন্যে ছেড়ে দেন। তখন ওলন্দাজরা রাজাকে নানাপ্রকার উপহার উপঢৌকন প্রদান করে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন যাতে তিনি দামটা উচ্চস্তরেই রাখেন। শেষ পর্য্যন্ত দাম চড়াই থেকে যায়। ইংরেজ বা পর্তুগীজ কেউ-ই তখনকার সেই শোচনীয় অবস্থায় উক্ত নীতি পদ্ধতিকে পরিবর্ত্তন করতে পারেননি।

মাক্কাসারের বাসিন্দাদের হাতে লবঙ্গ থাকলে তারা অন্যান্য জিনিসের বিনিময়ে তা বিক্রী করেন। :নেক সময় কচ্ছপের খোলের বদলে লবঙ্গ বিক্রী হয়। মুঘল সাম্রাজ্য ও ইউরোপে এই জিনিসটির (খোল) খুব চাহিদা। কচ্ছপের খোলকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সময় কিছু স্বর্ণরেণুর ব্যবহার হয়। আর তা বিক্রীর সময় দ্বীপের কোন লে:কসান হয় না; বরং শতকরা ছয় সাত ভাগ লাভ হয়; কেননা সোনা ব্যবহারের নিয়ম থাকলেও রাজা তাতে যথেষ্ট ভেজাল প্রয়োগ করেন।

বান্দা দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপ আছে ছয়টি। ওখানে জায়ফল জন্মায় প্রচুর। গ্রেনাপুই দ্বীপের আয়তন ছয় লীগ। সীমান্তে একটি পাহাড় আছে। সেখান থেকে প্রচুর অগ্নি নির্গত হয়। দম্‌নি দ্বীপেও বড় আকারের প্রচুর জায়ফল জন্মায়। তার আবিষ্কারক অ্যাবেল তাসমান নামে জনৈক ওলন্দাজ কমাণ্ডার। ঘটনাটি ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দের।

সুরাটে ওলন্দাজদের কাছে আমি লবঙ্গ ও জায়ফল কয়েক বছর যে দামে বিক্রী হতে দেখেছি তা এইরূপ : সুরাটে চল্লিশ সেরে একমণ। একমণ লবঙ্গ

বিক্রী হোত একশত সাড়ে তিন মামুদীতে। একমণ জৈত্রীর মূল্য একশত সাড়ে সাতান্ন মামুদী। জায়ফল একমণের দাম ছিল একশত সাড়ে ছাপান্ন মামুদী মুদ্রা।

বর্ত্তমানে দারুচিনি আমদানী হয় সিংহল দ্বীপ থেকে। দারুচিনির গাছ অনেকটা আমাদের উইলো গাছের মত। তিন পরত বাকল থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টি তুলে নেবার প্রথা। দ্বিতীয়টি মশলা হিসেবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তৃতীয় পরতে হাত দেয়া হয় না। সেখানে ছুরি চালালে গাছ মরে যায়। এই বাকল তোলা বিশেষ কৌশলের কাজ। স্থানীয় লোকেরা তরুণ বয়সেই তা শিখে নেয়। সাধারণের চেয়ে দারুচিনির জন্যে ওলন্দাজদের মূল্য দিতে হয় অধিক। সিংহলের রাজাকে আবার রাজধানীর নামানুসারে ক্যাণ্ডির রাজাও বলা হয়। তিনি ওলন্দাজগণকে ভয়ংকর শত্রু মনে করেন। কারণ তাঁরা তাঁর সংগে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। আমি অন্যত্রও বলেছি যে তিনি প্রতি বছরই ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য, দারুচিনি সংগ্রহকারী ওলন্দাজদের ভীতিগ্রস্ত করা। এই কারণে যত লোক দারুচিনি সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়, তত সংখ্যক অর্থাৎ পনের ষোল শত লোক নিযুক্ত থাকে তাদের রক্ষা করার জন্যে। বছরের বাকী সময় সেই সকল শ্রমিকদের ভরণপোষণের দায়িত্বও বহন করতে হয় কর্ত্তৃপক্ষকে। তদুপরি দ্বীপের বিভিন্ন অংশে বাণিজ্য রক্ষার জন্যে নিয়োজিত সৈন্যদের ব্যয় নির্ব্বাহ তো আছেই। এই সকল ব্যয় সংকুলনের জন্যে দারুচিনির দামও বেড়ে যায়।

পর্ত্তুগীজদের আমলে অবস্থা এমন ছিল না। এই জাতীয় ব্যয় বাহুল্যের সমস্যা দেখা দেয় নি তখন। সমস্তটাই তাদের লাভের অংকে জমা হোত। দারুচিনির গাছে জলপাই-এর মত ফল ধরে। কিন্তু তা খাবার যোগ্য নয়। পর্ত্তুগীজরা সেই প্রচুর পরিমাণে সংহগ্র করেন। ফলের বোঁটায় যে সূক্ষ্ম ডাঁটা আছে তা শুদ্ধ তাকে বড় কড়াইতে করে জলে সিদ্ধ করা হয়। জল সবটা শুকিয়ে গেলে এবং সিদ্ধ জিনিসটা ঠাণ্ডা হলে দেখা যাবে যে তার উপরের দিকটা ঠিক মোমের মত সাদা হয়েছে। আর কড়াইটির মধ্যে কাঁইএর মত তলানি জমেছে। সেই জমাট বাঁধা তলানি হোল কর্পূর। তা দিয়ে দীপ শিখার মত বাতি তৈরী হয়। মঠ মন্দিরের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে সেই বাতি জ্বালানোর প্রথা। তা জ্বালিয়ে দিলেই সমস্ত পূজা

প্রার্থনার স্থান দারুচিনির গন্ধে ভরপূর হয়ে ওঠে। লিসবনে রাজার গীর্জায় জ্বালানোর জন্যে অনবরত তা প্রেরিত হয়।

পর্তুগীজরা পূর্ব্বে কোচিনের আশে পাশে যে সমস্ত স্থানে দারুচিনি সংগ্রহ করতেন তা স্থানীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু ওলন্দাজগণ কোচিন ও সিংহল উপকূলে দারুচিনির চাষ যুক্ত স্থানসমূহ অধিকার করতে তাঁরা দেখলেন যে তাঁদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া ঐসব জায়গায় দারুচিনি সিংহলের মত উত্তম নয়, আবার দামেও সস্তা। এই দেখে তাঁরা অন্যান্য জায়গার সমস্ত দারুচিনির গাছ ধ্বংস করে দিলেন। এখন সিংহল ছাড়া আর কোথাও এ জিনিস জন্মায় না। আর এই জায়গাটি পুরোপুরি প্রায় তাঁদেরই হাতে। এই উপকূল ভাগ একদা পর্তুগীজদের হাতেই ছিল। তখন ইংরেজরা তাঁদের কাছেই দারুচিনি কিনতেন। এক মনের দাম পড়তো পঞ্চাশ মামুদী মুদ্রা।

॥ লাক্ষা, চিনি, আফিং, তামাক ও কফি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ॥

অধিকাংশ আঁটালো লাক্ষা আসে পেগু থেকে। বাংলাদেশেও কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে শেষোক্ত স্থানে দাম কিছু বেশী। বাঙ্গালীরা লাক্ষা দিয়ে অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল রঙ তৈরী করেন। সেই রঙ দিয়ে সূতী কাপড়কে চমৎকার রঞ্জিত ও চিত্রিত করা হয়। ওলন্দাজরা লাক্ষা কিনে পারস্যে পাঠান। সেখানেও তা রঙ তৈরীর কাজেই ব্যবহৃত হয়। রঙের নির্য্যাস বের করা হলে তলানি যা পড়ে তাদ্বারা কুঁদে কুঁদে তৈরী পুতুল খেলনাকে রঞ্জিত ও সজ্জিত করা হয়। জনসাধারণ এই পুতুল খুব ভালবাসে। এছাড়া তা দিয়ে আঁটালো মোমও তৈরী করা চলে। যে কাজেই ব্যবহার করা হোক, পছন্দমত রঙ তার সংগে মিশিয়ে নেয়া হয়। পেগুর লাক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা অথচ উৎকর্ষে তা অন্যান্য দেশে উৎপন্ন লাক্ষার সমতুল্য। এই লাক্ষা এত সস্তা হওয়ার মূলে কিন্তু পিঁপড়ে ও পোকা। ওরা ওখানে এই জিনিস মাটিতে স্তূপাকারে তৈরী করে। অনেক সময় স্তূপ অতি মাত্রায় বড় হয়। ধূলা মাটি মিশে যায় তার সংগে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের যে সকল স্থানে লাক্ষা পাওয়া যায় সে সব জায়গা অনুর্ব্বর এবং ঘাস ও গুল্মাদিতে আকীর্ণ। সেখানে গাছের ডালের গোড়াকে বেষ্টন করে পিঁপড়ে পোকারা

লালা নিঃসৃত করে তা জমাট বদ্ধ করে। তার ফলে বেশ পরিষ্কার থাকে। অতএব দামও বেশী হয়।

পেগুর অধিবাসীরা এই জিনিসকে রঙ হিসেবে ব্যবহার করেন না। তাঁরা বাংলাদেশ ও মসলীপত্তন থেকে রঙীন কাপড় সংগ্রহ করেন। বস্তুতঃ তারা এমন কৃষ্টি সংস্কৃতি বর্জিত মানুষ যে কোন শিল্প কাজই জানেন না। সুরাটে এমন কিছু সংখ্যক মহিলা আছেন যারা লাক্ষার রঙ নিষ্কাশনের পর তার দ্বারা গালা তৈরী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। যেমন খুসী রঙ করে স্পেনীয় মোমের ন্যায় কাঠির মত করে তৈরী করেন। ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানী বছরে প্রায় দেড়শত বাক্স এই জিনিস রপ্তানী করেন। কাঠির মত আকারের গালার দাম বেশী নয়। তাতে বেশ খানিকটা ধূপ মেশানো থাকে।

চিনি বা গুড় বেশীর ভাগ রপ্তানী করে বাংলাদেশ। হুগলী, পাটনা, ঢাকা এবং আরও অন্যান্য জায়গাতে এ জিনিসের ব্যবসা খুব জোরদার। ভারতে আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় আমি বাংলা সুবার একেবারে অভ্যন্তরে, এমনকি পার্শ্ববর্ত্তী দেশের সীমানা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। সেখানে প্রাচীন লোকদের মুখে যা শুনেছি তা এখানে উল্লেখযোগ্য। শুনেছি যে চিনি বা গুড়কে ত্রিশ বছর জমা রাখলে তা বিষাক্ত হয়ে যায়। ঐ জাতীয় বিষক্রিয়া আর কোন জিনিসে হয় না। পরিস্রুত চিনি তৈরী হয় আমেদাবাদে। ওখানকার লোক পরিস্রুত করার পদ্ধতি জানেন। তাকে বলা হয় রয়াল চিনি। মোচার মত এক একটি চিনির প্যাকেটের ওজন আট থেকে দশ লিভর।

আফিং জন্মায় বুরহানপুরে। সুরাট ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী এই স্থানটি উত্তম ব্যবসাকেন্দ্র। ওলন্দাজরা ওখানে গিয়ে আফিং সংগ্রহ করেন। লঙ্কার সংগে তার বিনিময় চলে।

বুরহানপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচুর তামাক জন্মায়। কয়েক বছরের কথা জানি যে তখন এত অধিক পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়েছিল যে চাষীরা তা মজুত রাখতে পারে নি। সমগ্র ফসলের প্রায় আধা-আধি নষ্ট হতে দিয়েছিল।

পারস্য বা ভারতের* কোথাও কফি জন্মায় না। অনেক ভারতীয়

* তাভেরনিয়ে এই বিবরণী লেখার দুই শতাব্দী পরে দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে কফির চাষ শুরু হয়।

জাহাজকে এই জিনিস বোঝাই করে মক্কা থেকে আসতে দেখেছি। তাহলেও আমি আফিমকে ওষুধপত্রের মধ্যেই স্থান দিলাম। অর্মাস ও বসোরাতেই এর মুখ্য ব্যবসাকেন্দ্র। মক্কা থেকে আগত জাহাজে ওলন্দাজরা যতটা সম্ভব এই জিনিস বোঝাই করে আনার চেষ্টা করেন। কারণ তার চাহিদা খুব বেশী। অর্মাস রপ্তানী করে পারস্যে; তার্তারীতেও কিছু যায়। বসোরা থেকে যায় চাল্‌দিতে ও আরবে। তারপর ইউক্রেটিসের পথ ধরে যায় মেসোপটেমিয়া ও অন্যান্য তুর্কী প্রদেশে। ভারতবর্ষে কিন্তু এর ব্যবহার বেশী দেখিনি। আরবী ভাষায় কফি কথাটির অর্থ সুরা। মোর্চা থেকে মক্কা যাবার রাস্তায় আট দিন চলার পর একটি জায়গায় শিমের মত একটি ফসল দেখতে পাওয়া যায়। এই জিনিসটিকে প্রথম জনসমাজে পরিচিত করেন জনৈক দরবেশ। নাম তাঁর শেখ সৈয়দ আলী। এই ঘটনা প্রায় একশত বিশ বছর আগের। কারণ তৎপূর্ব্বেকার কোন গ্রন্থকারই এ বিষয়ে কোথাও উল্লেখ করেন নি।

অন্যত্র প্রেরণের জন্যে আগ্রার ব্যবসায়ীরা সুরাটে যত মালপত্র প্রেরণ করেন তার বিনিময় বিল হয় শতকরা পাঁচ শতাংশ। জিনিসপত্রের ধরণ ও পর্য্যায় অনুসারে প্যাকিং, বহন ও শুল্ক ইত্যাদি ধরেই শেষ পর্য্যন্ত শতকরা পনের থেকে বিশ ভাগও ধার্য্য হয়।

সোনা রূপা, তাল অথবা মুদ্রা যাই-ই হোক না কেন, সুরাটে এলেই শতকরা দুই ভাগ শুল্ক দিতে হয়।

ব্যবসায়ীরাও যতদূর সম্ভব সেই মাশুল দানের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে চলতে চান। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে দ্বিগুণ দিয়ে তবে ছাড়া পাওয়া যাবে। রাজা রাজরাগণ সমস্ত জিনিসই তখন বাজেয়াপ্ত করতে চান। তবে বিচারকরা তার বিপরীত কাজ করেন। তাঁরা বলেন, মহম্মদের নির্দ্দেশ ও নিষেধ রয়েছে যে সমস্ত শুল্ক ও টাকার কোন সুদ গ্রহণ করবে না। আমি আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম খণ্ডে শুল্কনীতি, টাকা পয়সা, সোনা রূপার মুদ্রা, ওজন মাপ যা কিছুর ভারতীয় প্রথা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছি।

অধ্যায় তের

কারিগরগণ কত প্রকারে প্রতারণা করতে পারেন। শ্রমিক, দালাল অথবা ক্রেতাদের ধূর্ত্ততা ও বঞ্চনারীতি।

রেশমী ও সূতী বস্ত্র, সূতা ও নীলের কারবারে কত রকম দুর্নীতি চলে তা আমি বণিকদের মঙ্গলের জন্যে অকপটভাবেই বর্ণনা করবো। পূর্ব্ববর্তী অধ্যায় সমূহের মতই তা হবে। মশলা ও ওষুধের ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।

। রেশমী কাপড়ে প্রতারণা ।

রেশমী কাপড় লম্বা, চওড়া ও উৎকর্ষে স্বতন্ত্র। দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ নিয়ে বোঝা যায়। উৎকর্ষ নির্ভর করে বয়নের কাজ সমভাবে হয়েছে কি না, ওজন সব দিকে সমান হোল কি না, আর রেশমের টানার মধ্যে সূতা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে না কি, এই সকল বিষয়ের উপরে। ভারতীয়রা এই পদ্ধতিতে উৎকর্ষতা যাচাই করেন।

ভারতবর্ষে রূপার গিল্টী হয় না। তার ফলে ডোরা কাটা কাপড়ে খাঁটি সোনার তার বসানো হয়। এইজন্যেই সূতার সংখ্যা গণনার প্রথা আছে। কেন না প্রয়োজন মত সংখ্যা দেয়া হয় কি না তা দেখা দরকার। রূপার ডোরা কাটা কাপড়ের প্রসংগেও এই একই কথা। তাফেতা সম্পর্কে কেবল দেখতে হয় যে বয়নের কাজ সমভাবে সূক্ষ্ম হয়েছে কি না। আরও দেখা দরকার যে ওজন বৃদ্ধির জন্যে অন্য কোন জিনিস মিশিয়ে দেখা হয়েছে না কি। এই সকল বিষয় পরীক্ষা হয়ে গেলে প্রতিটি কাপড়কে আলাদাভাবে ওজন করে দেখতে হবে যে ওজনে ঠিক আছে কি না।

আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে আমেদাবাদে নানা প্রকার রেশমী কাপড়, যেমন, সোনা ও রেশম মিশিয়ে, রূপা ও রেশমে এবং অবিমিশ্র রেশমে কাপড় তৈরী হয় প্রচুর পরিমাণে। সোনা, রূপা ও রেশম দিয়ে গালিচাও তৈরী হয়। তবে এখনকার কার্পেটের রঙ পারস্যজাত গালিচার মত দীর্ঘ স্থায়ী হয় না। তাহলেও কারুকলার দিকে দুই-ই সমান সুন্দর ও উৎকৃষ্ট। কার্পেটের সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য্য, পরিমাপ, সোনা ও রূপার কাজের উৎকর্ষ বিচার করেন দালালগণ।

তারাই মত প্রকাশ করবেন যে তা ভাল ও জমকালো কি না। কাপড় ও কার্পেট—দুই জিনিসের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সোনা রূপার কারুকার্য্য যুক্ত হলে তা থেকে সুতা টেনে বের করে দেখার নিয়ম। জিনিস খাঁটি কি না তা জানার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

॥ সুতীবস্ত্র, বিশেষতঃ সাদা কাপড়ে প্রতারণা ॥

মিহি ও মোটা যাবতীয় সূতী কাপড় ডাচ কোম্পানী অর্ডার দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে তৈরী করান। তারপর বেল্ হিসেবে তা মজুত করা হয় সুরাটের গুদামে। অক্টোবর নভেম্বর মাসে তা দালালদের হাতে যায়।

যা কিছু প্রবঞ্চনা প্রতারণা চলে তা হয় কাপড়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও সূক্ষ্মতা ব্যাপারে। একটি বেলে কাপড় থাকে দু'শতখানি। প্রতিটি বেলে পাঁচ ছয় থেকে দশখানি পর্য্যন্ত এমন কাপড় পাওয়া যাবে যা নমুনা নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত জিনিসের ন্যায় উৎকৃষ্ট নয়। দৈর্ঘ্য প্রস্থেও কম। প্রতিটি কাপড় আলাদা করে না দেখলে তা ধরা কঠিন। মোটা কি মিহি তা চোখে দেখে ও হাতে ধরে বোঝা যায়। কিন্তু লম্বা চওড়ায় ঠিক আছে কি না তা মেপে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। ভারতবর্ষে এ ব্যাপারে আরও সূক্ষ্ম হিসেব চলে। তা হচ্ছে সূতার সংখ্যা হিসেব করা। তা প্রস্থের দিকেই হতে পারে। সংখ্যা সঠিক ধরতে না পারলে কাপড় মোটা ও মিহি দুই-ই হতে পারে। আবার পাশে কম হওয়ারও বিশেষ আশংকা থাকে। পার্থক্য প্রভেদ এক এক সময় এত ক্ষীণ যে চোখে দেখে তা বোঝা সম্ভব নয়। তখন সূতার নাল গুনতি করা ছাড়া দ্বিতীয় কিছু পন্থা নেই। তাহলেও অনেক কাপড়ে এই জাতীয় ঘটনার ফলে দরদামেরও পার্থক্য হয়ে যায়। এই রকম কিছু জানা গেলে কাপড়ের দামও কমে যায়। যারা কাপড়কে সাদা করার ভার গ্রহণ করেন তারা লেবুর খরচ বাবদ কিছু বেশী লাভ রাখতে চায়। কিন্তু তাহলেও পাথরে আছড়ে দিয়ে কাপড় কাচার ফলে মিহি সূতার জিনিস অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তার উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয়রা কিছু উত্তম ও দামী কাপড় তৈরী করলেই তার দুই প্রান্তে সোনালী ও রূপালী জরি বসিয়ে দেন। কাপড় যত মিহি হবে জরি তত বেশী বসানো হবে। তার ফলে জরির মূল্য গোটা কাপড়টির সমান হয়ে ওঠে। এজন্যে ফ্রান্সে রপ্তানীর জন্যে তৈরী কাপড় সমন্ধে

পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দান করা হয় যাতে জরি বসানো না হয়। ভারতীয়রা জামা-পোষাকে সোনা রূপার সূতা বসান সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও অলঙ্করণের জন্যে। ফ্রান্সে তার কোন মূল্য ও কদর নেই। কিন্তু পোল্যাণ্ড ও মস্কোর জন্যে যে কাপড় তৈরী হয় তাতে ভারতীয় ধরণে সোনা রূপার কাজ থাকা চাই। পোলিশ ও রুশীয়রা সোনালী রুপালী কাজ করা কাপড় খুব বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের জন্যে তৈরী কাপড় প্রসংগে আরও লক্ষ্য রাখতে হয় যে জরি যেন কালো বা বিবর্ণ হয়ে না যায়। জরি বিবর্ণ হয়ে গেলে সে কাপড় তারা আর কখনও কিনবেন না।

কাপড় নীল দিয়ে রঙ করার সময় বেগুণী বা কালো যাই-ই করা হোক না কেন, খেয়াল রাখতে হবে যে প্রতিটি কাপড়ের বর্ডারে জরি বসবে ; আর তা যেন কখনও বিবর্ণ হয়ে না যায়। ভাঁজ করার সময় কাপড়ে যেন চাপ না পড়ে, তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় বয়নশিল্পীরা বা রঞ্জকগণ কাপড়কে নরম করার জন্য এত বেশী চাপ দেয় বা পিটিয়ে নেয় যে পরে খুললে দেখা যাবে যে ভাঁজে ভাঁজে তা ফেটে গিয়েছে।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ভারতবর্ষে প্রতিটি কাপড়ের শেষ কিনারায় একটি করে সীলমোহর ও সোনালী পাত দিয়ে আরব দেশীয় রীতিতে এমন ফুলের ছাপ দেয় যে কাপড়টির সারাটা বহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে তৈরী কাপড়ে ফুলের নক্সার ছাপ দিতে বারণ করা হয়। ছাপ দিতে যা খরচ পড়ে তা কাপড়ের মোট মূল্য থেকে বাদ পড়ে। তবে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, এশিয়ার যে কোন অঞ্চল ও আমেরিকার বিশেষ কোন অংশের জন্যে তৈরী কাপড়ের প্রতিটি খণ্ডেই ফুলকারী ছাপ পড়বে। আর সেই ছাপড় পুরোপুরি পড়া চাই। নতুবা তা বিক্রী করা কঠিন হবে।

রঙীন ও ছাপানো কাপড় প্রসংগে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে তা কিছু মোটা কাপড়েই করা হয়। বর্ষাকাল শেষ হওয়ার আগে কাপড় রাঙানোর কাজ শেষ করা দরকার। কারণ এই কাজে যেখানকার জল ব্যবহৃত হয় তা বর্ষা অন্তে খারাপ হয়ে ওঠে। আর সেই উৎকৃষ্ট জলের সাহায্যে যত বেশী রঙ্ চড়ানো যায় বা ব্লক দিয়ে ছাপানো চলে রঙ্ তত উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

ছাপানো ও তুলির কাজ করা কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা অতি সহজ। দালাল যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে তুলিকা অংকিত ও পরিচ্ছন্ন কারুকার্য্য মণ্ডিত অন্য প্রকার কাপড়ের মধ্যে সৌন্দর্যের তারতম্য সহজেই

নির্ণয় করতে পারেন। তবে এই সব কাপড়ের সূক্ষ্মতা ও অন্যান্য গুণাগুণ সম্পর্কে এই বলা যায় যে সাদা কাপড়ের তুলনায় এর বিচার করা বিশেষ দুরূহ কাজ। সুতরাং এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

॥ সুতায় ভেজাল ॥

যাবতীয় সূতা তৈরী হয় গুজরাটে। আর তা সর্ব্বাগ্রে এনে মজুত করা হয়ে থাকে সুরাটের স্টোরে। সূতার উৎকর্ষ ও ওজন দুই ব্যাপারেই প্রবঞ্চনা চলে। ওজনে ঘাটতি করা যায় দুই প্রকারে। প্রথমতঃ স্যাঁতসেতে জায়গায় জমা রেখে এবং সূতার ফেটির ফাঁকে ফাঁকে অন্য জিনিস কিছু ভরে দিয়ে। তাতে ওজন বেড়ে যায়। দ্বিতীয় পন্থায় ওজন সঠিক গ্রহণ করা হয় না। দালাল, কারিগর ও ব্যবসায়ীকে বিশ্বাস করে যখন মাল গ্রহণ করা হয় তখন এই ওজনের ফাঁকি চলে।

উৎকর্ষের দিকে প্রতারণা চলে প্রতিমণ সূতার তিন চারটি করে নিকৃষ্ট সূতার ফেটি চালিয়ে দিয়ে। সূতার গাঁটের উপরের দিকে থাকবে অতি উৎকৃষ্ট জিনিস। সূতা যখন প্রচুর সরবরাহ হয় তখনই এই পদ্ধতিতে প্রতারণা চালিয়ে যথেষ্ট লাভ হয়। সূতা আছে নানা ধরণের। তার মধ্যে এক প্রকার সূতা একমণ ফরাসী একশত ক মুদ্রায় বিক্রী হয়। সূতার ব্যাপারে এই দুটি প্রতারণা রীতি ওলন্দাজ কোম্পানীর উপরে আরোপিত হয় অত্যধিক। সেজন্যে ওঁরাই তার প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কমাণ্ডার ও তাঁর সচিবের সামনে সূতা ওজন করতে হবে। সতর্কভাবে তা পরখ করা হবে। প্রতিটি ফেটি ধরে ধরে দেখবেন যাতে ওজন ও উৎকর্ষ কোন দিকেই বঞ্চনা হলে তা চোখ না এড়ায়। এই পরীক্ষার কাজ শেষ হলে ভাইস কমাণ্ডার ও তাঁর অধীনে পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কাপড়ের এক একটি বেল-এর গায়েতে ওজন ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে মন্তব্য লিখে দেবেন। অবশেষে বস্তাগুলি হল্যাণ্ডে পৌঁছোলে তা খুলে যদি বিবরণ অনুযায়ী মাল ঠিকমত পাওয়া না যায় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

॥ নীলের কারবারে প্রতারণা ॥

আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা দিয়েছি যে ভারতের নীলচাষীরা ঝুড়ি থেকে কাই তুলে নীলের খণ্ড খণ্ড কেক তৈরী করেন এবং সেই সময় আংগুলে তেল মাখান। সেই খণ্ড নীলকে রৌদ্রে শুকোবার নিয়ম। যারা ব্যবসায়ীদের

-ঠকাতে চায় তারা নীলের টুকরোকে বালির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে শুকোবার ব্যবস্থা করেন। কারণ কিছু না কিছু বালি ওদের গায়ে লেগে থাকবেই এবং তাতে ওজনে বাড়বে। অনেক সময় কাই-এর গাদাকে স্যাঁতসেতে জায়গায় জমা রাখে, তাতে ভিজে ভারী হয়। স্থানীয় গভর্ণর সেই প্রতারণার কথা জানতে পারলে অতি উচ্চহারে জরিমানা ধার্য্য করেন। যে সকল কম্যাণ্ডার ও দালাল এই ব্যবসাতে বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁরা অতি সহজেই বঞ্চনা ধরতে পারেন। নীলের কিছু খণ্ডকে আগুনে পোড়ালেও তা ধরা যায়। আগুনে ফেলে দিলেই নীলের কেক-এর গায়ে বালুকণাগুলি ভেসে উঠবে এবং কারোর নজর এড়াতে পারবে না।

ভারতীয় দালালদের সম্পর্কে আমার আরও কিছু কৌতূহলকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার আছে। সাধারণতঃ এই দালালগণ তাদের পরিবারের মুখ্য কর্ত্তা। তারা পরিবার পরিজনদের জন্যেই যাবতীয় বিষয় সম্পত্তিকে ট্রাস্ট করে রাখেন। উদ্দেশ্য, সম্পত্তি দ্বারা আরও কিছু আয় করা। যারা বয়সে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ তাদের উপরই ট্রাস্টের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অবকাশে তারাও স্বজাতি, সমাজ ও সমগোত্রীয় লোকদের জন্য কিছু লাভজনক ব্যবসার সুযোগ করে নিতে পারেন। এদের হাতেই মালপত্র রক্ষণ ও টাকা পয়সা ব্যবসাতে খাটানোর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। এদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক রাত্রে খাদ্য গ্রহণ করেন না। ব্যবসাকেন্দ্রের কাজ শেষ করে প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে তারা কিছু মিঠাই খান এবং এক গ্লাস জল পান করেন। দালালদের গৃহে তখন তাদের স্বজাতীয় প্রবীণতম ব্যক্তিরা এসে সমবেত হন। দালাল সেই সময় তাদের সারা দিনের ব্যবসা পত্রের হিসেব নিকেশ উপস্থিত করেন। অতঃপর সকলে মিলে ভবিষ্যৎ কর্ম্ম পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা ও উপদেশ নির্দেশ দান চলে। তখন এই কথাও আলোচনা হয় যে সম্ভব হলে অপরকে বঞ্চনা করবে, কিন্তু নিজে বঞ্চিত হবে না।

অধ্যায় চৌদ্দ

ইস্ট ইণ্ডিয়াতে নতুন ব্যবসায়ী কোম্পানী গঠনের রীতি পদ্ধতি।

কোন দেশ যদি ইস্ট ইণ্ডিয়াতে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চান তাহলে সর্ব্বাগ্রে তাকে এমন একটি উত্তম স্থান সংগ্রহ করতে হবে যেখানে জাহাজ মেরামত করা যেতে পারে এবং যখন সমুদ্রে জাহাজ চলাচল সম্ভব নয় তখন সেখানে জাহাজ রাখা চলতে পারে। উত্তম পোতাশ্রয়ের অভাবেই ইংরেজ কোম্পানী যথাযোগ্য উন্নতি করতে পারেনি। কারণ মেরামত না করে দু'বছর কোন জলযানকে রাখা যায় না। উই ও অন্যান্য পোকায় তা নষ্ট করবেই।

ইউরোপ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়াতে যাতায়াতের রাস্তা সুদীর্ঘ। সুতরাং যাতায়াতের সময় জল ও খাদ্য সংগ্রহের জন্যে উত্তমাশা অন্তরীপে কোম্পানীর কিছু স্থানাধিকার অত্যাবশ্যক। ফেরার পথে জাহাজ মালপত্রে বোঝাই থাকে বলে গোড়ার দিকে বেশী দিনের উপযোগী জল নেয়া সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে ওলন্দাজরা কেল্লা তৈরী করে অন্যান্য দেশকে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাঁরা কেল্লা নির্ম্মাণ করেছেন অন্তরীপে। আর ইংরেজরা করেছেন সেন্টহেলেনাতে। অথচ আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ও ইউরোপের সমস্ত জাতির পারস্পরিক সাধারণ অনুমোদনে এই দু'টি বিশ্রামস্থল সমগ্র জগতবাসীর জন্যে দীর্ঘকাল ধরে সমভাবে উন্মুক্ত। যাই হোক্ অন্তরীপের কাছে এখনও এমন অনেক নদীর মোহনা আছে যেখানে আর একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করা যায়। তবে ডফিন দ্বীপে (মাদাগাস্কারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে) কিছু করার চেয়ে অন্তরীপের খড়ি মোহনায় কিছু করা ঢের ভাল। ডফিনে কোন ভাল ব্যবসা চালু নেই। সেখানে কেবল গরু বাছুর ক্রয় বিক্রয় হয় চামড়ার জন্যে। আর সেই ব্যবসা এত নগণ্য যে কোন কোম্পানী তার উপর নির্ভর করলে অবশ্যই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। ফরাসীরা কিন্তু নিজেদের লাভ লোকসানের কথা চিন্তা না করেই সেকাজে ব্যাপৃত হয়েছেন।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করার মূল কারণ আমার কিছু অনুমান ও একটি ঘটনা। ঘটনাটি হচ্ছে যে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে দু'খানি পর্ত্তুগীজ জাহাজ লিসবন ছেড়ে ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছিল। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল অন্তরীপে

জল নেবেন। কিন্তু তাদের আবহাওয়া ও জলের গতি নির্ণয় করার পদ্ধতি নির্ভুল না হওয়াতে, আর সমুদ্র অতি মাত্রায় উচ্ছ্বসিত থাকার ফলে তারা পশ্চিম দিকে আবার কুড়ি লীগ দূরবর্ত্তী এক উপসাগরে প্রবেশ করেন। সেখানে গিয়ে তারা একটি নদীর সন্ধান পান। তার জল ছিল অতি উত্তম। আর স্থানীয় নিগ্রোরা তাদের এনে দিয়েছিল নানা রকম জলজ পাখী, মাছ ও মাংস। জাহাজ দু'টি ওখানে পনের দিন কাটিয়েছিল। স্থানটি ত্যাগ করার সময় তারা ওখানকার দু'টি বাসিন্দাকে সংগে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য তাদের গোয়াতে নিয়ে যাবেন এবং পর্ত্তুগীজ ভাষা শিক্ষা দেবেন। তার পেছনেও যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা ওদের কাছ খবর জানা যাবে যে কি ধরনের ব্যবসা সেখানে চলতে পারে। সুরাটের ডাচ কম্যাণ্ডার আমাকে অনুরোধ করলেন গোয়াতে গিয়ে জানার জন্যে যে পর্ত্তুগীজরা সেই দু'টি নিগ্রোর কাছে কি খবরাখবর জানতে পারলেন। কিন্তু গোয়াস্থিত কেল্লার তত্ত্বাবধায়ক সেন্ট আমন্দ নামে জনৈক ফরাসী এঞ্জিনিয়র আমাকে বললেন যে তাঁরা ওদের এক অক্ষরও পর্ত্তুগীজ ভাষা শেখাতে পারেন নি। কেবল অনুমান করতে পেরেছেন যে ওদেশের মানুষ মাত্র দু'টি জিনিস জানে। একটি তিমি মাছের চর্ব্বির মোম ও হাতীর দাঁত। তাসত্ত্বেও পর্ত্তুগীজদের বিশ্বাস ছিল যে তারা যদি দেশটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারেন এবং কিছু ব্যবসা চালানো সম্ভব হয় তাহলে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু পর্ত্তুগালে বিপ্লব ও স্পেনের সংগে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে তারা সেই কাজে আর অগ্রসর হতে পারেননি। আর উপকূলভাগকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হয়নি। তবে তাদের ইচ্ছে ও আশা এই যে, ওলন্দাজদের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত না হয়েও তারা জায়গাটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পাবেন। তাতে ওলন্দাজদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক হবে না।

আরও একটি বিষয়ের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। কোম্পানীকে সুরাটের কাছে এমন একটি পোতাশ্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেখানে জাহাজ তোলা ও মেরামতের কাজ চলতে পারে। পোতাশ্রয়ের আরও বেশী প্রয়োজন এই কারণে যে বর্ষার জন্যে অনেক সময় জাহাজের পুনরায় যাত্রা বিলম্বিত হয়। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে জাহাজ যখন সমুদ্রে তীব্র বেগ ও উচ্ছ্বাস সহ্য করে এগোতে পারে না, তখন মুঘলরা সুরাটের কেল্লার ক্ষতির আশঙ্কায় কোন বিদেশী জাহাজকে নদীতে প্রবেশ করতে অনুমতি দান করেন না। কিন্তু

খালি জাহাজ বিধ্বংসী ঝড়ের মুখে পড়লে তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয়। সেই ঝোড়ো আবহাওয়া চলে প্রায় পাঁচ মাস।

এখন কোম্পানীর জাহাজকে ভিড়িয়ে রাখার উপযোগী একমাত্র স্থান হোল দিউ সহর। স্থানটি পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত। এর অবস্থান নানাদিকে সুবিধাজনক। সহরটিতে গৃহাবাস আছে প্রায় চারশত। ওখানে প্রচুর লোকের বাসস্থান হতে পারে। জাহাজের নাবিক খালাসীরা প্রবাস জীবনে প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র ওখানে পেয়ে যাবেন। স্থানটি গুজরাটের উপকূলে। আর ঠিক ক্যাম্বে উপসাগরের মুখে এবং তার দক্ষিণ পূর্ব্বদিক ছুঁয়ে রয়েছে। আকারে এটি গোলাকৃতি। অর্দ্ধেক আন্দাজ আয়তন সমুদ্র বেষ্টিত। কোন উঁচু জায়গা বা পাহাড় নেই। অভ্যন্তরভাগে কিছু এগিয়ে পর্তুগীজরা কয়েকটি কেল্লা তৈরী করেছেন। তা অতি সহজেই গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। উৎকৃষ্ট জল পাওয়া যায় এমন অনেক কূপ আছে ওখানে। নদীও আছে একটি। সহরের কাছেই সেটি নদীতে মিলিত হয়েছে। এর জল সুরাট ও সুওয়ালির জল থেকে উত্তম। জাহাজের আশ্রয়স্থল হিসেবেও জায়গাটি অত্যন্ত সুবিধাজনক।

পর্তুগীজরা ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন ক'রে দিউতেই একটি নৌবহর রেখেছিলেন। তার মধ্যে ছিল হাল্‌কা নৌকা, দুই মাস্তুলের ছোট জাহাজ এবং আরও অন্যান্য প্রকার জলযান। এই নৌবলের সাহায্যেই পর্তুগীজরা দীর্ঘকাল উক্ত অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রকৃত অধিপতি হয়েছিলেন। বিষয়টি বর্ণনার যোগ্য। দিউর গভর্ণরের ছাড়পত্র ব্যতীত অন্য কেহ সেখানে ব্যবসা চালাতে পারতেন না। গোয়ার ভাইসরয় প্রদত্ত বিশেষ অধিকারেই তিনি সে কাজ করতেন। ছাড়পত্র মঞ্জুর করে যে অর্থ আয় হোত তা দ্বারাই নৌবহর ও সৈন্যদের ব্যয় নির্ব্বাহ করতেন। তখন তিনি নিজের জন্যে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না।

এজন্যে ওখানে কর্ম্মরত ব্যক্তিটি যথেষ্ট লাভবান হতেন। পর্তুগীজরা বর্তমানে সে শক্তি হারিয়ে বসেছেন। মুঘল সাম্রাজ্য ও বিজাপুর রাজ্যে তাঁরা যে টাকাকড়ির আদান প্রদান করেন তার জন্যে এবং মালপত্র আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারেও তাদের কোন শুল্ক প্রদান করতে হয় না।

বর্ষাকাল অন্তে হাওয়া বাতাস সর্ব্বদা উত্তর অথবা উত্তর পূর্ব মুখো চলতে থাকে। তখন হালকা নৌকোতে করে তিন চারটি জোয়ার ভাঁটার মধ্যে

দিয়ে দিউ থেকে সুরাটে যাওয়া যায়। কিন্তু বড় জাহাজ ছাড়লে গোটা উপকূলভাগ ঘুরে যেতে হবে।

পায়ে হেঁটে যাবার ব্যবস্থা অন্যরূপ। গোগা নামে একটি ছোট গ্রাম থেকে বেরিয়ে উপসাগরের শেষ সীমানা হয়ে দিউ থেকে সুরাটে যাওয়া যায় চার পাঁচ দিনে। তবে আবহাওয়া অনুকূল না হলে যাওয়া সম্ভব নয় এবং গেলেও সাত আট দিন সময় দরকার। কারণ তখন উপসাগরের সবটা অতিক্রম করে যেতে হবে।

সহরটির সীমানার বাইরে আর কোনও জমি জায়গা এর এক্তিয়ারভুক্ত নয়। তবে রাজা অথবা গভর্ণরের সংগে ব্যবস্থা করে সহরের বাসিন্দাদের প্রয়োজনে আরও স্থান সংগ্রহ করা কঠিন নয়। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের জমি অনুর্ব্বর। চারদিকের জনসমাজ সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে দরিদ্রতম। বনজঙ্গলে আছে প্রচুর গরু মহিষ। সমস্ত জায়গা জুড়েই বন। তার ফলে সামান্যতম মূল্যে একটি গরু বা মহিষ কিনতে পারা যায়। ইংরেজ ও ওলন্দাজগণ গরু মহিষগুলিকে ব্যবহার করেন তাঁদের লোকলস্করদের খাদ্য হিসেবে। সুওয়ালীতে বিশ্রামরত জাহাজের রসদও এখান থেকে সংগৃহীত হয়।

একটি বিষয় এখানে ব্যক্ত করা সংগত যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে মহিষের মাংস খেলে অনেক সময় আমাশয় রোগের আক্রমণ হয়। নাবিক ও মাঝি মাল্লাদের পক্ষে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু গোমাংশে কখনও কোন অসুখ বিসুখ হয় না।

যিনি প্রদেশ শাসন করেন তিনি বরাবর গবর্ণর বা সুবাদার উপাধি ব্যবহার করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এই প্রথা। এঁরা হলেন প্রদেশ সমূহের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। এঁদের বংশধরগণই কেবল সুবাদার উপাধি গ্রহণ করতে পারেন। সুবাদার পর্তুগীজদের সংগে সদ্ব্যবহারই করেন। কারণ পর্তুগীজরা প্রতিবেশীরূপে থাকার ফলে দানা শস্য, চাল, আনাজ তরকারী বিক্রী হয়ে প্রচুর শুল্ক আসে তাঁর হাতে। এই কারণে ফরাসীদের সংগেও তাঁর ব্যবহার উত্তম।

এই জাতীয় পরিবেশ পরিস্থিতি হোল কোম্পানীর ব্যবসা চালনার দৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল যে এমন দু'টি লোককে কাজে নিযুক্ত করতে হবে যারা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও ন্যায়-পরায়ণতায় হবেন বিশেষ সুযোগ্য। এঁদের নিয়োগ ব্যাপারে টাকাকড়ি

সম্বন্ধে ব্যয় সংক্ষেপের কোন প্রশ্ন নেই। এঁরা কোম্পানীর কাজেই বহাল হবেন। এঁদের একজন কম্যাণ্ডার বা কম্যাণ্ডাণ্ট, ডাচরা যেমন আখ্যা দেবেন, তেমন উপাধি হবে। তাঁকে পরামর্শদান ও সাহায্য করার জন্যে কয়েকজন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতি থাকে। আর দ্বিতীয় হলেন দালাল ও ব্যবসার অফিস পরিচালক। তিনি হবেন স্থানীয় লোক। তিনি হিন্দু হবেন। মুসলমান হলে চলবে না। কারণ তিনি যাদের নিয়ে কাজ করবেন তারা সকলেই হিন্দু। সর্বোপরি সৎ ব্যবহার ও ন্যায়পরায়ণতা হোল প্রধান জিনিস যার দ্বারা গোড়াতেই সকলের মনে বিশ্বাস সঞ্চার করা যায়। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা স্বাধীন দালাল তাঁদেরও এই গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। এঁরাও প্রদেশের মুখ্য দালালের নির্দেশেই কাজ করেন ; প্রতি সুবাতে সংযোগ রক্ষাকারীদের জন্যে একটি করে দপ্তর বা অফিস আছে।

এই দু'টি কর্ম্মচারীর মধ্যে বুদ্ধির প্রখরতা অত্যাবশ্যক। জিনিসপত্রে ভেজাল ধরার জন্যেই বুদ্ধির কৌশল ও প্রখরতা থাকা প্রয়োজন। আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে এই সমস্যাটি সৃষ্টি হয় কারিগর ও ব্যবসায়ীদের দুষ্প্রবৃত্তি এবং উপ-দালালদের পরোক্ষ সহায়তার ফলে। ভেজাল মেশানোর ফলে কোম্পানীর হয় প্রভূত ক্ষতি। আর সেই অবকাশে স্বাধীন দালালরা কোন কোন সময় শতকরা দশ বার ভাগ লাভ করেন। উপরন্তু যদি কম্যাণ্ডার ও মুখ্য দালালের এ বিষয়ে পরোক্ষ সম্মতি থাকে তাহলে কোম্পানীর পক্ষে সেই প্রতারণা এড়ানো অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে ওঠে। তবে এঁরা দু'জন যদি সৎপ্রকৃতির লোক হন, তাহলে স্বাধীন দালালের স্থলে অন্য লোক নিয়োগ করে কিছু প্রতিকার করা যেতে পারে।

কোম্পানীর সংগে এই উচ্চ কর্ম্মচারীরা যে জাতীয় অবিশ্বাসের কাজ করেন তা এইরূপ : একখানি জাহাজ বন্দরে ভিড়লে কোম্পানীর চিঠিপত্র এবং ওখানে মাল বোঝাই করার বিল ইত্যাদি দিতে হয় এমন এক ব্যক্তির হাতে যিনি বিশেষ কোন দেশের প্রতিভূ হিসেবে বন্দর ও তীরভূমির দায়িত্ব নিয়ে ওখানে কর্ম্মরত আছেন। কম্যাণ্ডার তখন তাঁর পরামর্শদাতাদের এনে জড় করেন এবং দালালকেও ডেকে পাঠান। তারপর মাল বোঝাই করার যে বিল তার একটি কপি তাঁকে দেয়া হয়।

দালাল তখন এমন দু'তিনজন ব্যবসায়ীর সংগে যোগাযোগ করেন যাদের পাইকারী ভাবে জিনিস কেনার অভ্যাস আছে। কম্যাণ্ডার ও দালালের

মধ্যে যদি তখন লভ্যাংশ ব্যাপারে কোন যোগসাজস থাকে তাহলে দালাল বিক্রয় ব্যাপারকে ত্বরান্বিত না করে বরং বণিকদের গোপনে বলবেন যে তারা যেন বেশ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে থাকেন এবং বিশেষ একটা মূল্য উত্থাপন করেন।

কম্যাণ্ডার তখন সেই দালাল ও দু'তিনজন ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠান। তারা এলে পরামর্শদাতাদের সামনেই তিনি প্রশ্ন করবেন যে জাহাজে তোলার জন্যে যে মালপত্রের কথা বিলসমূহে উল্লিখিত আছে তার জন্যে তারা কি মূল্য দিতে প্রস্তুত। ব্যবসায়ীরা যদি বিশেষ কোন দরদাম উল্লেখ করে সে বিষয়ে দৃঢ় মত পোষণ করেন তাহলে কম্যাণ্ডার সেই ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারটিকে পনের দিন কি তার কিছু কম বেশী স্থগিত রেখে দেবেন। বিক্রীর ব্যাপারে নানা ভিন্নতর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীরা পুনঃ পুনঃ তাঁর কাছে আসেন জিনিসপত্র দেখার জন্যে। তিনি আবার ওদিকে কাউন্সিলের সংগে পরামর্শ করেন যাতে জিনিস না দেখিয়ে চলে। তিনি তা করেন নিজের স্বার্থে। তারপর অবশ্য ব্যবসায়ীদের প্রস্তাবিত মূল্যেই তিনি জিনিস বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেন।

এই দু'টি অফিসারের সামনে প্রলোভনও যথেষ্ট। তার কারণ হচ্ছে তাঁদের যথেষ্ট ক্ষমতা এবং পৌনঃপুনিক অবাধ সুযোগ। তাছাড়া উপর-ওয়ালাদের অনুপস্থিতির ফলে তাঁদের কাছে আসল ঘটনা গোপনে রাখার সহজ পন্থাও বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও কোম্পানী এই দু'টি ব্যক্তিকে বহাল করেন বিশেষ সতর্কতা সহকারে। আর ডাচ কম্যাণ্ডার ও দালালদের পাইকারীভাবে দ্রুত জিনিস বিক্রয়ের ব্যাপারে ছলছুতোর প্রবৃত্তিকে দমন করে বিলম্বিত প্রথার ক্ষতিপূরণ করারও যথেষ্ট ব্যবস্থা করেন।

ওলন্দাজরা আর একটি অন্যায় করেন। মুঘল সাম্রাজ্য থেকে তাঁরা যে জিনিসপত্র রপ্তানী করতে চান তার জন্যে উচ্চ কর্মচারীরা বছরের পর বছর টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে তবে জিনিসের অর্ডার পেশ করেন। তা করেন কিন্তু বাটাভিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী। অগ্রিম জমার অংক কখনও বার থেকে পনের শতাংশে দাঁড়ায়। তার ফলে মাল বোঝাই জাহাজ নির্দ্দিষ্ট বন্দরে গিয়ে পৌঁছোলেই পাইকাররা দালালদের কাছে যে মূল্য ধরে প্রস্তাব দেবেন সেই দরেই বিক্রী করতে বাধ্য হন। এই প্রকারে বিক্রী করতে বাধ্য হবার হেতু হোল জাহাজে চাপানো মালপত্রের অর্ডার দেবার সময় যে অগ্রিম টাকাকড়ি দেয়া হয়েছে তা সত্বর উসুল করা। তা ছাড়া আগামী বছরের

ব্যবসার জন্যে জিনিস সংগ্রহ করতে আবার অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে, সেও একটা কারণ।

এই প্রথাতে কম্যাণ্ডার ও তাদের দালালগণের সংগে ব্যবসায়ীদের একটা বোঝাপড়ার সুযোগ হয়। আর সেই সুযোগে ব্যবসায়ীরা কিছু লাভও করে নেন। তাতে ক্রয় বিক্রয়ে প্রেরণা আসে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত লাভের ফলে কোম্পানীর লভ্যাংশের হার হ্রাস পায়। স্পষ্টতঃ যে পরিমাণ লাভ দেখা যায় তা আবার ব্যয়িত হয় ধার দেনার সুদ দিতে। সেই বিষয়েও পরে আলোচনা করা যাবে। কম্যাণ্ডার ও দালাল সুদের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে একমত হলে তা সময় সময় যেমন ইচ্ছে কমবেশী বাড়িয়ে দেন। ফরাসী জাহাজ ওলন্দাজদের মত একই মালপত্র যখন বহন করে তখন তারা অতিরিক্ত টাকা সংগে রাখেন বিভিন্ন প্রদেশের কারুকৃৎদের অগ্রিম দেবার জন্যে। আগামী বছরে যে সকল জিনিসের চাহিদা হবে তার মোট মূল্যের কতকাংশ এইভাবে মিটিয়ে দেয়া হয়।

কোম্পানী এই জাতীয় অগ্রিম টাকার ব্যাপারে শতকরা বার কি পনের টাকার মত চড়া সুদ দিতে রাজী নয়। কিন্তু ওলন্দাজরা তদনুরূপই দিতে প্রস্তুত। তারা শ্রেষ্ঠ জিনিস নেবেন, আর উচ্চতম মূল্যও দেবেন। আবার নগদ টাকা পাওয়া যায় বলে সমস্ত কারিগররাই বিশেষ আগ্রহ সহকারে কাজ করেন।

জাহাজ বন্দরে নোঙর করার মুখেই মালপত্র তুলে রাখার জায়গা প্রস্তুত রাখার নিয়ম। কারণ তাড়াতাড়ি মাল তোলার কাজ শেষ করতে পারলে ভাল সময় ও উত্তম আবহাওয়াতে আবার ফিরে যাওয়া যাবে। কোন অবস্থাতেই কোম্পানী কম দামে স্থানীয় পাইকার ব্যবসায়ীদের কাছে জিনিস বিক্রী করতে উৎসাহ বোধ করেন না। এই ব্যবসায়ীরা ব্যবসা পত্রের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতেই রাখেন। এই অবস্থা দেখে কোম্পানীর দালালগণ বিদেশী বণিকদের অপেক্ষায় থাকেন। তাঁরা আসেন কোম্পানীর মালপত্তর নিয়ে যাবার জন্যে। না হয়তো নিজেরা স্বাধীনভাবে বিক্রী করতে পারবেন এমন জায়গায় রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে মাল সংগ্রহ করবেন।

আর একটি বিষয়ঃ ভারতবর্ষে মুদ্রা অপেক্ষা সোনারূপার তাল নেয়া লাভজনক। কারণ সোনারূপার উৎকর্ষের দিক বিচার করেই মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। তা ছাড়া ওখানে মুদ্রা নির্ম্মাণের খরচ বাদ দিয়ে তার সোনা রূপার মূল্য ধার্য্য হয়।

দালাল যদি বিশ্বস্ত না হন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের বন্দরে অবস্থিত টাকশালের অধিকর্তার সংগে যদি ভাব জমিয়ে নিতে পারেন, আর সোনা-রূপার তাল ও মুদ্রা যাই-ই হোক না কেন তাকে যদি নিম্ন পর্য্যায়ের স্তরে নিয়ে মূল্যায়ণ করাতে পারেন তাহলে কম্যাণ্ডার ও তাঁর পরামর্শ সমিতিকে বলতে পারবেন যে টাকশালের পরীক্ষণে এর মূল্যমান এই-ই স্থির হয়েছে।

তবে কম্যাণ্ডার যদি ন্যায়বান ও বুদ্ধিমান হন তাহলে এই প্রতারণা বন্ধ করা খুব কঠিন নয়। তিনি যদি স্থানীয় একজন সোনারূপা শোধন-কারকে নিয়োগ করতে পারেন তাহলে অনেক সুবিধা। তিনি সঠিকভাবে ধাতুর গুণাগুণ নির্ণয় করতে পারবেন। এই রকম লোক সংগ্রহ করা কঠিন নয়। তিনি কমাণ্ডারের সামনে বসেই এই কাজ করবেন।

এই রকম ব্যবস্থা করেছিলেন ডাচ কোম্পানীর পক্ষে সিয়ের ওয়েকেন্‌টন। তিনি স্বনামে কাশিমবাজারে একটি ফ্যাক্টরী চালাতেন। প্রতি বছর তিনি সেখানে ছয় থেকে সাত হাজার বেল রেশমী কাপড় সংগ্রহ করতেন। তিনি এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দালাল টাকশালের অধ্যক্ষের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাঁকে সোনারূপার মূল্য নির্দ্ধারণে দেড় কি দুই শতাংশ হারে বঞ্চনা করেছেন। সেই রূপা ও সোনা তাঁর কাছে এসেছিল জাপান থেকে। তাল ও মুদ্রা যাই হোক না কেন, কোম্পানীকে বেশ মোটা অংকেই ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

টাকশালের কর্ত্তার সংগে আলাপ জমিয়ে দালাল যেমন প্রতারণার পথ প্রশস্ত করেন, তেমনি যে লোকটি সোনারূপার তাল ও মুদ্রা বা রেণু ওজন করেন তার সহায়তাও বঞ্চনার কাজ চালান অতি মাত্রায় ভারি বাটখারা ব্যবহার করে।

কম্যাণ্ডার তাঁর কাউন্সিলের সাহায্যে এই দুর্নীতিও সহজেই প্রতিরোধ করতে পারেন যদি ওজন গ্রহণের কাজটি নিজের সামনে করার ব্যবস্থা করেন। আর ওজনটি হবে তাঁর কাছে সীলমোহরাঙ্কিত যে বাটখারা থাকে তার মাধ্যমে।

আলোচ্য কোম্পানীর বানিজ্য বিষয়ে এবং ফ্যাক্টরীর নিয়ম বিধি সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল :

নিয়ম আছে যে কম্যাণ্ডারের অধীনে কার্য্যরত ব্যবসায়ী, উপ-ব্যবসায়ী, করনিক, উপ-করণিক, দালাল ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও নিজেদের স্বার্থে

ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যবসা বানিজ্যে লিপ্ত হতে পারবেন না। কারণ এঁদের সংগে সমস্ত কারিগর শিল্পীর আলাপ পরিচয় থাকে এবং অন্যান্য ফ্যাক্টারীর সংগে পত্রালাপে ও খবরাখবরে যোগ সংযোগ থাকার ফলে পণ্যদ্রব্যাদি সম্বন্ধেও যাবতীয় সংবাদ জানা থাকে। আরও জানা থাকে যে আগামী বছরে কোন কোন জিনিস বাজারে ভাল কাটতি হবে। সুতরাং নিজেদের দায়িত্বে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে তা কিনে কোম্পানীর জাহাজে করেই মালপত্র যথাস্থানে পাঠাবেন। যাঁরা সংবাদ সরবরাহ করেন তাঁরাও তা থেকে কিছু লাভ করতে পারবেন।

কম্যাণ্ডারেরও এবিষয়ে কিছু স্বার্থ থাকে। কাজেই তিনি এই ধরণের ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্পর্কে অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকেন, নয়তো অতিমাত্রায় শৈথিল্যবশতঃ অনুমতিও প্রদান করেন। এর একটি কারণ কর্ম্মচারীদের স্বল্প বেতন। এবিষয়ে জাহাজের কাপ্তেনও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কারণ তিনিও গোপনে মালপত্র তোলা ও নামানোর সুযোগ দিয়ে কিছু সুখ সুবিধা গ্রহণের অবকাশ পান। এই সকল কর্ম্মচারীদের বিশেষ কিছু মূলধন থাকে না। তারা জাহাজ ফিরে আসার সংগে সংগেই জিনিসের দামপত্র আদায়ের জন্যে ব্যগ্র হন। তার ফলে তারা তাদের সহযোগীদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন বাজারের দর থেকে আট দশ শতাংশ কম দামে জিনিস বিক্রী করতে। তা অনায়াসেই করা যায়। এই প্রসংগে আরও অনেক আলোচনার যোগ্য বিষয় আছে। এরা সুরাট বা গোমরুন কোথাও রপ্তানী শুল্ক প্রদান করেন না। এই ধরণের বঞ্চনা দ্বারা এরা প্রায় শতকরা ছাব্বিশ ভাগ লাভ করেন। তার ফলে কোম্পানীর বিশেষতঃ বিদেশী বণিকদের ক্ষতি হয় যথেষ্ট পরিমাণে।

ওলন্দাজদের ভুলেই এই সকল বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল। তা অনুভব করতেও অনেক সময় কেটে যায়। তাঁদের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছিল তা কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় পরে উপলব্ধি হয়েছিল।

শেষ পর্য্যন্ত কমাণ্ডার সবই জানতে পারতেন। কোম্পানীর জাহাজ মাল তোলার সময় কুঠির কর্ম্মচারীরা কতটা লাভ করেন তা তাঁর অজানা ছিলনা। সেই জিনিসপত্র অর্মাস, বসোরা মোর্চা বা অন্য যেখানেই যাক না কেন, কর্ম্মচারীদের কার্য্যকলাপ একই ছিল। লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী দেশ মোর্চা সম্পর্কে নিয়ম এই যে সেখানে যারা ব্যবসা করেন তারা এক বেল

কাপড় আমদানী শুল্ক ব্যতীতই নিতে পারেন। কাজেই সেই বস্তাটি দেখা যাবে অন্যগুলির তুলনায় পাঁচ ছয় গুণ বড়। দশবার জন লোকের পক্ষেও বহন করা কঠিন হয়ে ওঠে।

কোন কোন জাহাজে ষাট হাজার টাকা মূল্যের মালও তোলা হয়। কম্যাণ্ডার ও দালাল সমভাবাপন্ন হলে অনেক সময় তাঁরা তৃতীয় আর কোন লোককেও এবিষয়ে সহযোগী করে নেন। কোন সময় হয়ত আধাআধি অংশেই লাভের পর্য্যায়ে ওঠে। সর্ব্বোপরি একটি নিয়ম রয়েছে যে কম্যাণ্ডার ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের অতি বিশ্বস্ত দাসদাসীদের কিছু পুরস্কার বকৃশীস না দিলে জাহাজ জেটি ছেড়ে যাত্রা করতে পারে না। এরা একজন ছয় বেল পর্য্যন্ত কাপড় জাহাজে তোলার অনুমতি লাভ করে আবার কেউ হয়ত আট বেল, দশ বেলও তোলার সুযোগ পায়। মালের মূল্য অনুসারে মাশুল দানের প্রথা। কোন ব্যবসায়ী যদি কখনও অতি উচ্চ মূল্যের অর্থাৎ বিশ বাজার টাকার এক বেল জিনিস পাঠালেন তখন সাধ্যমত উচ্চতম হারে মাসুল দিতে কার্পন্য করেন না। তবে হয়ত কিছু অংশ কমানোর চেষ্টা করেন। মাল তোলার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগেই যাহোক ব্যবস্থা করে নিতে হয়। কর্ত্তা বা কর্ত্রীর কাছ থেকে এরা এ বিষয়ে ঢালাও অর্ডার লাভ করে।

জাহাজের খাজাঞ্চীও এবিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পশ্চাদপদ নন। তবে মুখ্য ব্যবসায়ী ও উপ-ব্যবসায়ী এই ধরণের সামান্য লাভের হিসেবকে উপেক্ষাই করেন। তাঁরা নিজেদের জিনিসপত্র জাহাজে তোলার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আর একটি কৌশল আছে। যখন কোন ব্যবসায়ী মূল্যবান জিনিস যেমন, দাক্ষিণাত্যের টুপি ও বুরহানপুরের উড়নি পাঠান তখন মাল খালাসের জায়গাতে স্থানীয় শাসকদের চড়া শুল্ক দিতে হয়। দাক্ষিণাত্যের টুপির দাম অনেক সময় অত্যন্ত বেশী হয়। আর উড়নি দিয়ে পারস্য, কন্সট্যান্টিনোপল এবং এশিয়া ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলের মহিলারা বোরখা তৈরী করেন। মাল জাহাজে তোলা হলেই ব্যবসায়ীদের সংগে পরিচিত খাজাঞ্চী ও কাপ্তেন প্রতিটি বস্তার গায়ে কোম্পানীর চিহ্ন অঙ্কিত করেন। তারপর কোম্পানীর মালের সংগেই তাও মজুত করা হয়। অবশেষে রাত্রিতে গোপনে ব্যবসায়ীর হাতে তা প্রদান করার ব্যবস্থা থাকে।

এই ব্যক্তিরা আরও কিছু অতিরিক্ত চাতুরী করার সুযোগ গ্রহণ করেন। ব্যবসায়ীর সংগে কম্যাণ্ডারের বন্ধুত্ব থাকলে ব্যবস্থা হয় যে তিনি এমন ভাব প্রকাশ করবেন যে কোম্পানীর কাছ থেকেই তিনি এই মালপত্র কিনেছেন। তখন আর অতিরিক্ত শুল্ক দেবার প্রশ্ন ওঠে না। অন্যান্যরা কোম্পানীর মাল কিনে যেমন শতকরা দুই অংশ দান করেন এরাও তদনুরূপ দিয়ে মাল নামিয়ে নেবেন।

এই অনিয়ম দুর্নীতির প্রতিবিধান নিম্নোক্ত উপায়ে করা চলে। প্রয়োজন হচ্ছে প্রধান ফ্যাক্টরীতে রাজার নামে তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ শুল্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা। কোম্পানীর জেনারেলের সংগে তাঁর কোন বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক থাকবে না। জেনারেল কেবল তাঁর কাজকর্ম্মের উপরে নজর রাখবেন যেমনটি অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে হয়ে থাকে।

এই পদে কাজ করার জন্যে একটি সম্ভ্রান্তলোক আবশ্যক। তাঁকে খুব সতর্ক ও দৃঢ়চেতা হতে হবে। প্রতি ফ্যাক্টরীতে তাঁর অধীনে একজন করে প্রতিনিধি থাকবে। প্রতিটি প্রতিনিধি তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন ব্যাপারে নিম্নলিখিত নিয়মবিধি প্রতিপালন করবেন।

যখনই তিনি জানবেন যে কোম্পানীর কোন জাহাজ তীরের দিকে এগিয়ে আসছে, তখুনি, অথবা কিছু সময়ের মধ্যে, অবশ্য আবহাওয়া অনুকূল হলে, তিনি ওটি নোঙর করা পর্য্যন্ত সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করবেন।

জাহাজের কাপ্তেন যাবতীয় চিঠি ও কাগজপত্র সেই প্রতিনিধির হাতে দেবেন। অন্য কারোর হাতে দেয়া চলবে না। তিনি নিয়ে গিয়ে কোম্পানীর কম্যাণ্ডারকে দেবেন।

তাঁর সংগে আরও দু-তিন জন লোক থাকবেন। কোম্পানীর সমুদয় মাল জাহাজ থেকে নামলে তবে তাঁরা স্থান ত্যাগ করতে পারবেন। প্রতিনিধিকে একটি বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে যে তাঁর সংগীরা পানোন্মত্ত না থাকেন। কারণ অনেক সময় জাহাজের কর্ম্মীরা মতলব করেই এসব লোকদের অতি মাত্রায় সুরা পান করিয়ে বিহ্বল করে রাখেন যাতে বে-আইনি ও চোরা চালানি জিনিসপত্রগুলি সহজে জাহাজ থেকে নামিয়ে নেয়া যায়। বেশ কায়দা করে সেই মালগুলিকে তারা জেলে ডিঙিতে নামিয়ে দেয়। সেই নৌকাগুলি জাহাজে মাছ ও অন্যান্য জিনিস পত্র সরবরাহ করতে আসে। এই কাজ সাধারণতঃ রাত্রিতে নিষ্পন্ন হয়।

এমন জায়গা যদি হয় যার আশে পাশে দ্বীপময় ভূখণ্ড আছে, আর জাহাজ পৌঁছোবার সময়ও যদি মোটামুটি জানা থাকে তাহলে শুল্ক সংক্রান্ত কাউন্সিলয়ের প্রতিনিধি পূর্ব্বেই সেখানে গিয়ে হাজির থাকেন। আর দু'তিনটি ছোট নৌকা দ্বীপের চারদিকে ঘুরে লক্ষ্য রাখবে। জাহাজটির আগমন নজরে পড়লেই নৌকাগুলি তার কাছে এগিয়ে যাবে যাতে বে-আইনি জিনিসপত্র সেই দ্বীপে নামিয়ে দিতে না পারে। কেননা দ্বীপ সমূহে কিছু সংখ্যক মানুষকে ঘুষ দিয়ে হাজির রাখা হয় গোপনে মালগুলি সরিয়ে নেবার জন্যে।

তিনি জাহাজ ভিড়তেই কোম্পানীর চিহ্ন বর্জিত গাঁটগুলিকে বাজেয়াপ্ত করবেন। বিদেশী ব্যবসায়ীদের মালিকানা বহির্ভূত জিনিস বাজেয়াপ্ত করারও নিয়ম থাকে।

কোন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর জিনিস থাকলে তাকে অনায়াসে পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু কর্ম্মচারী উচ্চপদস্থ হলে তা ফ্যাক্টরীর অধিকর্ত্তাকে জানাতে হয়। তিনি পরামর্শ সমিতির সংগে আলোচনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে তার বেতন বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন।

প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিটি চোরাই চালান ধরার জন্যে বেআইনি ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের চিঠিপত্র খুলে দেখতে পারেন। জাহাজের কাপ্তেনও তাঁর হাতে চিঠিপত্র ও কাগজ ইত্যাদি দিতে বাধ্য। তবে তাঁর নিজ কোম্পানীর চিঠিপত্র না খুললেও চলে।

বাজেয়াপ্ত জিনিসের এক তৃতীয়াংশ যায় দেশের গরীব লোকের হাতে। কোম্পানী পায় আর এক তৃতীয়াংশ। বাকি সব পান শুল্ক অধিকর্ত্তা ও তাঁর সহকর্ম্মীরা। ওলন্দাজগণ এই প্রথায় কাজ করেন।

প্রতিনিধি ব্যক্তিটি যাবতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার ব্যাপারে রাজার প্রতিনিধিত্ব করেন। মামলা বলতে যা বোঝায় তা হোল কম্যাণ্ডার ও তাঁর কাউন্সিলের কাছে বিচারের জন্যে যে সমস্যাগুলি আসে তা। রাজার নামে তিনি সব কাজের ব্যবস্থা ও মালপত্র সংগ্রহের অধিকার লাভ করেন।

আলোচ্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিটি যদি সৎ প্রকৃতির ও বিশেষ সতর্ক লোক হন তাহলে কোম্পানীর যথেষ্ট সাহায্যে তিনি আসতে পারেন।

ইংরেজরাও যদি তাঁদের ফ্যাক্টরী সমূহে এই ধরণের উচ্চ কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন তাহলে তাঁরাও ঢের বেশী লাভ করতে পারেন। কিন্তু ও দেশের কর্ম্মচারীরা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে লণ্ডনে তাদের শিক্ষানবিশী পর্ব্ব

শেষ হলে তাদের সুযোগ সুবিধা চিরস্থায়ী হয়ে যায়। তা কেড়ে নিতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই। শিক্ষা অন্তে তারা নিয়োগ কর্তার কাছে এমন সার্টিফিকেট লাভ করেন যার ফলে তারা অনায়াসে সাত বছর তাঁর অধিনে কাজ করতে পারেন।

ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্পর্কে যে নিষেধ বিধি আছে তা বিশেষ কড়াকড়িভাবে চালানো সম্ভব হয় না। কিন্তু ওলন্দাজদের মধ্যে এই প্রথা বিশেষ দৃঢ়ভাবে প্রতিপালিত হয়।

একটি জাহাজ যখন আমস্টার্ডম ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয় তখন জনৈক অধিকর্ত্তা স্থানীয় ব্যক্তি কাপ্তেন ও অন্যান্য জাহাজী লোককে একটি শপথ বাণী পাঠ করান যে তারা নিজেদের প্রাপ্য বেতন লাভ করেই সন্তুষ্ট থাকবেন। তারা নিজেদের স্বার্থে কোন ব্যক্তিগত ব্যবসা বানিজ্যে লিপ্ত হবেন না।

ত্ব'মাসের বেতন তাদের অগ্রিম দানের প্রথা। কিন্তু শপথ গ্রহণ সত্ত্বেও কোম্পানীর বেতন দানের পদ্ধতি তাদের বাধ্য করে চাকরীরত থেকেও আত্মরক্ষার জন্যেই গোপন ব্যবসা চালাতে।

নিজেদের বিবেকে যাতে না বাঁধে সে জন্যে তারা অনেক কৌশল করেন। ভারতে পোঁছে যদি দেখেন যে উত্তম চাকরী পাওয়া যাবে, তাহলে অতি দ্রুত তারা বিয়ে করেন। তখন স্ত্রীর নামেই গোপন ব্যবসা চালানো যায়। স্ত্রীর নামে ব্যবসা চালানো আইন সংগত নয়। সুতরাং তখনও তা গোপনেই চালাতে হয়। তারা অবশ্য মনে করেন যে বেনামায় ব্যবসা করা নীতি বিরুদ্ধ কাজ নয়। বিবেকেও বাঁধে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনেক সময় ধরা পড়ে যান। আমি সে রকম ঘটনা অনেকগুলিই জানি। তার মধ্যে একটি বিশেষ কৌতুককর উদাহরণ এখানে উল্লেখ কচ্ছি।

জাহাজের জনৈক ধনী কাপ্তেন কোম্পানীর প্রধান পুরুষগণের পত্নীদের প্রণয় আকাঙ্খা করে তাঁদের উপহাসের পাত্র হয়ে পড়েন। একদিন বাটাভিয়াতে আরও অনেক মহিলার সামনে এই কথার আলোচনা হলে মাদাম লা জেনারেল এমন কিছু মন্তব্য করেন যাতে কাপ্তেনটি অত্যন্ত আহত ও পীড়িত হন। তবে তখন কিছু প্রত্যুত্তর না দিয়ে তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রধান পুরুষগণ ও তাঁদের পত্নীদের গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্টই খোঁজ খবর রাখতেন। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন যে সুযোগ মত তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। যেভাবে নিয়েছিলেন তা এই ঃ

কাপ্তেনের পলিকট ছেড়ে বাটাভিয়াতে ফিরে যাবার সময় হোল। পলিকটের গভর্ণর-পত্নীর সংগে মাদাম লা জেনারেলের কিছু ব্যক্তিগত ব্যবসার সম্পর্ক ছিল। গভর্ণরের স্ত্রী কাপ্তেনকে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন মনে করতেন। অতএব তাঁকে অনুরোধ করলেন অতি মূল্যবান আট বেল্ জিনিস গোপনে তাঁর জাহাজে করে বাটাভিয়াতে নিয়ে যেতে হবে। আর বিশেষ সাবধানতা নিতে হবে যে জিনিস যেন ড্যাম্পে বা জলে ভিজে নষ্ট না হয়। কাপ্তেন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি সতর্কতা সহকারে জিনিস নিয়ে যাবেন। তিনি মালপত্রগুলি জাহাজে একটু আলাদা ভাবেই রাখলেন।

বাটাভিয়াতে জাহাজ পৌঁছে গেল। নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কাপ্তেন সর্ব্বাগ্রে চলে গেলেন জেনারেলকে অভিবাদন জানাতে। আর কোম্পানীর চিঠিপত্র তাঁকে দিতে হবে। সাধারণ একটা প্রথা আছে যে জাহাজ ভিড়লে কাপ্তেন যখন জেনারেলের সংগে দেখা করতে যান তখনকার সময়ানুসারে তাকে দ্বিপ্রহরের বা সান্ধ্য ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

ভোজন পর্ব্ব শেষে জেনারেল জানতে চাইলেন যে কাপ্তেন পলিকট থেকে নতুন কি খবর এনেছেন। আরও প্রশ্ন করলেন যে তথাকার গভর্ণর ও তাঁর পত্নী কোন বিশেষ কিছু অনুরোধ জানিয়েছেন কি না। কিছুটা নিস্পৃহভাবে কাপ্তেন উত্তর দিলেন যে তেমন কিছুই তাঁরা বলেন নি। তবে গভর্ণর পত্নী আট বেল উচ্চ মূল্যের জিনিস তাঁর হেফাজতে দিয়েছেন জাহাজে তুলে নিয়ে আসার জন্যে। আরও বলে দিয়েছেন যে জিনিসগুলি যেন ড্যাম্পে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে। তারপর এখানে পৌঁছে তা মাদাম লা জেনারেলের হাতে পৌঁছে দিতে বলেছেন। তখুনি জেনারেল তাঁর পত্নীর দিকে ক্রোধভরে তাকিয়ে রূঢ়ভাবে জানতে চাইলেন যে পলিকটের গভর্ণরের সংগে তাঁর ব্যবসা সম্পর্ক আছে কি না। আর তা হচ্ছে কোম্পানীর নিয়মানুসারে দুষ্কৃতি সম্বন্ধীয় অপরাধ। মাদাম বেশ জোরালোভাবে সে কথার প্রতিবাদ করলেন। আরও বললেন যে কাপ্তেন বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তখন জেনারেল কাপ্তেনকে বললেন যে তিনি বোধহয় কোথাও একটা ভুল করেছেন। আর শুল্ক অধিকর্ত্তাকে হুকুম দিলেন যে তিনি জাহাজে গিয়ে সেই মালের গাঁটগুলিকে নামিয়ে এনে জেটিতে কোন উন্মুক্ত স্থানে রেখে দিন। তারপর দেখুন যে কেউ এসে তার দাবী করেন কি না। মালগুলি বেশ কিছু দিন সেইভাবে পড়ে রইলো। কোন ব্যবসায়ী

তার খোঁজ খবর করলেন না। তখন তা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। এইভাবে কাপ্তেন নিঃশব্দে মাদাম লা জেনারেলের কাছে একদা অপমানিত হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন।

কোম্পানীর অধস্তন কর্ম্মচারীরা ক্রমান্বয়ে পদোন্নতি লাভ করে করনিক থেকে কমাণ্ডার পদে পর্য্যন্ত উন্নত হন। সুতরাং পদোন্নতির আশায় তারা সৎভাবে কাজ করতে উৎসাহিত হন। নিজেদের উচ্চতম পদের উপযোগী করে তোলার জন্যে তারা ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় রীতিনীতি সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন।

এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোল কাউকে কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে না। যাবতীয় বিষয় ধাপে ধাপে আয়ত্ব না করা পর্য্যন্ত কারোর জন্যে কোন উন্নতির পথ মুক্ত করা চলবে না। এক সময় প্রথা হয়েছিল এবং তাতে ওলন্দাজগণের ব্যবসা বাণিজ্য অতি মাত্রায় লোকসানের মুখেও পড়েছিল। তা হচ্ছে যে হল্যাণ্ডের উচ্চপর্য্যায়ের লোকেরা তাদের পুত্র সন্তানদের ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিতেন এমন কাজে নিযুক্ত করে যাতে গোপন ব্যবসা চালিয়ে প্রচুর লাভ করা যায়। মুখ্য কর্ত্তাব্যক্তি ও তাঁদের পত্নীদের সংগে সেই উচ্চস্তরের জনসমাজের সহজ পরিচয় লাভের অবকাশেই তারা অনায়াসে চাকরী পেয়ে যান। কারণ কোম্পানীর মুখ্য ব্যক্তিদের ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। অতএব একটি কর্ম্মপদ খালি হলে কিছুদিন কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কারোর একটি সুপারিশ পত্র পেশ করলেই তা লাভ করা যায়।

কয়েক বছর পূর্ব্বে বাটাভিয়াস্থ জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল দেখলেন যে এইভাবে লোক নিয়োগের ফলে কোম্পানীর প্রভূত ক্ষতি হয়। তখন তাঁরা ডিরেক্টরদের লিখলেন যে তাঁরা যে কোন উপযুক্ত লোককে ভারতে পাঠাতে পারেন। কিন্তু কোন সুপারিশ পত্র দিয়ে যেন কাউকে আর পাঠানো না হয়। ভবিষ্যতে সুপারিশ পত্রে কোন কাজ হবে না বরং তাতে তাঁদের বন্ধুবর্গের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আর এই ব্যাপারটি বস্তুতঃই অন্যায্য যে কারোর গুণ ও শক্তি প্রকৃত নেই, অথচ সুপারিশের জোরে তাকে কাজের সুযোগ প্রদান করা হবে। যারা কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে আসবেন তাদের শক্তি বুদ্ধি ও উপযোগিতা যাচাই করার মত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জেনারেল ও কাউন্সিলের আছে। সুতরাং তাঁরাই প্রার্থীদের যোগ্যতা বিচার করে লোক নিযুক্ত করবেন। আর তাই সমীচিন কাজ।

একটি বিষয় এখনও বলা হয়নি। ব্যবসায়ী কোম্পানী সম্পর্কে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদ্যাবধি ওলন্দাজ কোম্পানী সেই সতর্কতা অবলম্বন করে চলেছেন। তাঁরা ভারতবর্ষে এমন কোন লোককে কাপ্তেন বা জাহাজ চালকের পদে বহাল করে পাঠাবেন না যিনি জাহাজী কাজের নিম্নতম স্তর থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে উচ্চতর পদে উন্নীত না হয়েছেন; তাকে আরও জানতে হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার বিবরণ সংগ্রহ করার পদ্ধতি। সমগ্র যাত্রা পথের সমুদয় উপকূল ভাগের সংগেও সম্যকরূপে পরিচিত হতে হবে। কাপ্তেনকে দুর্ব্বল দেহ হলে চলবে না। খাদ্য সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তাকে একখণ্ড চীজ্‌ বা এক টুকরো বীফ্‌ যা হয়ত দু'বছর আরকে ভেজানো ছিল, তা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বস্তুতঃ তারা খাদ্য ব্যাপারে আদর্শ পুরুষ। অন্যান্য দেশে এবিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথা। তারা জাহাজে কাপ্তেনের পদে এমন লোককে বহাল করবেন যিনি হয়ত কোনদিন সমুদ্রই দেখেন নি। এই ধরণের ব্যাপারে অবশ্য বিশেষ অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতা অধিক কার্য্যকর হয়। তাদের জাহাজে খাদ্য ব্যবস্থাও থাকে ভিন্ন ধরণের। রান্নার আসবাবপত্র দরকার হয়। আরও থাকে প্রচুর ভেড়া, বাছুর, মুরগী ও তাদের রক্ষক এবং প্রতিপালক। এই পশু প্রাণীগুলি মল-মূত্র ত্যাগ ক'রে জাহাজকে অপরিচ্ছন্নও করে তোলে। মিতব্যয়িতা হোল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহায়ক। সুতরাং ডিরেক্টরদের এ বিষয়ে মনোযোগ থাকা একান্ত আবশ্যক।

অধ্যায় পনের

হীরকের বিবরণ ; হীরক সমন্বিত নদী ও খনি। গ্রন্থকারের রমলকোটার হীরক খনিতে ভ্রমণ।

যাবতীয় পাথরের মধ্যে হীরা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। আমার ব্যবসার মধ্যে এই জিনিসটি সবচেয়ে অধিক স্থান জুড়ে আছে। এই বিষয়ে সার্ব্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে আমি হীরক সমন্বিত সমস্ত নদী ও খনি ঘুরে দেখার সংকল্প করেছিলাম। কোন বিপদের আশংকায় আমার ভ্রমণ কখনও স্থগিত থাকেনি। অথচ হীরকের খনিসমূহ সম্বন্ধে অতি ভয়াবহ সব বর্ণনা শোনা যায়। অনুন্নত দেশ সমূহে নানা বিপদজনক রাস্তাঘাট দিয়ে চলাফেরা করতে হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে আমি ভীত হইনি বা আমার মত কখনও পরিবর্ত্তিত হয় নি। আমার মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি চারটি খনিতে গিয়েছি। সে সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা দিতে চাই। আরও চারটি নদীর কথা বলবো যেখানে হীরা পাওয়া যায়। আমি সেই সকল জায়গায় গিয়ে কোন অসুবিধায় পড়িনি বা কেউ কখনও আমার সংগে কোন অভদ্র ব্যবহার করেনি। যারা ঐসব অঞ্চলের সংগে পরিচিত নন তারা এই বিষয়ে আমাকেও ভীতিগ্রস্ত করে তোলেন। সুতরাং আমি বলতে পারি যে অন্য লোকদের যাত্রাপথকে আমি সুগম করে তুলেছি। আরও বলা যায় যে আমিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি খনি অঞ্চলে যাবার রাস্তা :.াকদের জন্যে উন্মুক্ত করেছেন। এই খনিগুলিই একমাত্র স্থান যেখানে হীরকের সন্ধান পাওয়া যায়।

আমি প্রথম যে খনিটিতে যাই সেটি কর্ণাট প্রদেশে বিজাপুর রাজ্যে অবস্থিত। নাম রমলকোটা। গোলকুণ্ডা থেকে স্থানটির দূরত্ব পাঁচদিনের যাত্রাপথ। বিজাপুর থেকে যেতে হলে আট নয় দিনের প্রয়োজন হয়। বিগতকালে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের রাজারা ছিলেন মুঘল সম্রাটের অধীনস্থ। তথাকার সুবাদারগণ কালক্রমে বিদ্রোহ করে স্বাধীন সুলতানে পরিণত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও অনেকে এখনও বলেন যে হীরা আমদানী হয় মুঘল সাম্রাজ্য থেকে। স্থানীয় লোকদের মুখে শুনে যতদূর বোঝা যায় তাতে আমার মনে হয়েছে যে মাত্র দুইশত বছর পূর্ব্বে রমলকোটার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

যে স্থানে হীরক পাওয়া যায় তার চার পাশের মাটি বালুকাময়। পাহাড় জঙ্গলেও আকীর্ণ। ফন্টেনব্লোর চারদিকের সংগে খানিকটা তুলনা করা যায়। ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে অনেক ফাটল ও গর্ত। কোনটি আধ আংগুল চওড়া, আবার কতকগুলির মাপ পুরো এক আংগুল মত। খনি জীবীদের কাজের জন্যে ছোট ছোট মাথা বাঁকানো কিছু লোহার যন্ত্র আছে। সেগুলিকে ফাটলে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা মাটি বা বালি টেনে বের করে। তারপর তা কোন পাত্রে তুলে রেখে দেয়। সেই মাটি বা বালির মধ্যেই পরে হীরা খুঁজে পাওয়া যায়। ফাটলগুলি সর্ব্বদা সোজা থাকে না। কতক উচুঁতে, কতক আবার নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। এজন্যে অনেক সময় পাহাড় ভাঙ্গতে হয়। তবে তা সর্ব্বদা ফাটলের গতি লক্ষ্য রেখে করা দরকার। পাথর খুলে খুলে মাটি ও বালি যা পাওয়া যাবে তাকে দু'তিনবার ক'রে ধুয়ে দেখতে হবে। হীরা থাকলে তখন নজরে পড়বে। এই খনিতেই স্বচ্ছতম ও শ্বেত শুভ্র জলের মত রঙের হীরা পাওয়া যায়। তবে মুস্কিল এই যে পাথর ভেঙ্গে মাটি ও বালি বের করার সময় শ্রমিকরা এমন জোরে লোহার শাবল চালায় যে তাতে হীরক ফেটে বা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নয়তো তার গায়ে ফুটো হয় বা ফাটল ধরে। এই কারণে উক্ত খনি থেকে বেশীরভাগ টুকরো আকারের পাথর বেরোয়। খনিতে যারা কাজ করেন তারা আবার ফাটাফুটো পাথর (হীরা) দেখলে তাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো করে ফেলেন। এই কাজে তারা বেশ নিপুন। টুকরো পাথরকে আমরা 'পাত' বলি। তা দেখতে খুব ভাল। পাথর যদি পরিষ্কার হয় তাহলে খনির কর্ম্মীরা কোন রকমে একটু খনি যন্ত্রের স্পর্শমাত্র লাগিয়ে দেয়। তাকে কোন প্রকার নতুনরূপ দানের চেষ্টা করেন না। বেশী ঘষামাজা করলে ওজন হ্রাসের সম্ভাবনা। তবে গায়ে যদি সামান্য চির থাকে, বা কোন দাগ, অথবা ছোট কালো ও লাল ফুটকি দেখা যায় তাহলে তারা ওটির গায়ে পল্ কেটে তা ঢেকে দিতে পারে। তার ফলে সেই চির্ খাওয়া দাগ বা অন্য কোন দোষত্রুটী আর নজরে পড়বে না। সামান্য একটু চির্ যদি থাকে তা লুপ্ত করে দেয়া যায় একটি পল্ নকসার কিনারা দিয়ে। একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে ব্যবসায়ীরা হীরক রত্নের গায়ে লাল দাগের চেয়ে কালো ফুটকি বেশী পছন্দ করেন। পাথরের লাল চিহ্নকে আবার আগুনে উত্তপ্ত করলে তা কালো হয়ে ওঠে। ওদের এই কৌশলগুলি আমি বেশ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছিলাম। সেইগুলি থেকে

প্রেরিত এক প্যাকেট হীরা পরখ করে দেখলাম প্রতিটি জিনিসই পল্‌কাটা। আর পল্‌গুলি বেশ ছোট আকারের। তখন আর বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে পাথরগুলিতে কিছু না কিছু দাগ অবশ্যই ছিল।

এই খনিতে বহুসংখ্যক হীরক কাটায় নিপুন লোক কাজ করে। তাদের প্রত্যেকের একটি করে ইস্পাতের চাকা আছে যা আকারে আমাদের প্লেটের মত। অকটি মাত্র পাথরের খণ্ড সেই চাকাটির উপর বসিয়ে অনবরত তাতে জল ঢালা হতে থাকে।

যতক্ষণ পাথরের গুঁড়া দেখা না যাবে ততক্ষণই জল ঢালতে হবে। গুঁড়া দেখা গেলেই তাড়াতাড়ি তেল ঢেলে দেবার নিয়ম যাতে হীরক চূর্ণ কিছু নষ্ট না হয়। পাথরকে দ্রুত পালিশ করলে কাজটা ব্যয়বহুল হয়। আমাদের চেয়ে তাদের ওজন গ্রহণের পদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

এমন একটি বড় হীরকের কথা জানি যাকে একশত পঞ্চাশ লিভর সীসার বিপরীতে রেখে ওজন করা হয়েছিল। রাস্তবিকই সেটি খুব বড় পাথর ছিল। ছেটে কেটে ফেলার পর তার ওজন রয়েছে একশত তিন ক্যারেট। হীরে কাটার যন্ত্র আমাদের মতই। যন্ত্রটি বড় ও চক্রাকার। চার জন কৃষ্ণকায় লোক সেটিকে চালায়। একটি বিষয়ে ভারতীয়রা আমাদের সংগে একমত নন। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করেন না যে ওজন কমানোর চেষ্টাতে পাথরের গায়ে চির্ পড়ে। যদি তাদের ধারণা ঠিক হয় তাহলে তার কারণ মনে হয় একটি বালক সর্ব্বদা একখানি পাতলা কাঠের চামচ দিয়ে অনবরত চাকাটিতে তেল ও হীরক চূর্ণ দিতে থাকে। মনে হয় সেই তেল ও গুড়োগুলো দেবার ফলে চাকা তেমন দ্রুত চলে না, যেমনটি আমাদের দেশে হয়। যে কাঠের চাকাটি ইস্পাতের চাকাটিকে ঘোরায় সেটির ব্যাস তিন ফুটের বেশী বড় হয় না।

আমাদের দেশে পাথরকে পালিশ করে যেমন উজ্জ্বল করে তোলা হয় ভারতবর্ষে সে রকমটি হয় না। এর কারণ বোধ হয় আমাদের চাকার মত ওদেরটি সহজ স্বচ্ছন্দভাবে চলে না। ইস্পাতে তৈরী চাকা, তদুপরি সেটিকে পালিশ রাখার জন্য যে চূর্ণ পদার্থ দেয়া হয় তা কোন গাছের ছাল দিয়ে তৈরী। চব্বিশ ঘণ্টা পরপর তা দেয়ার প্রয়োজন হয়। আর ও জিনিসের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিসও দেয়া চলে না। এরা যদি আমাদের মত লোহার চাকা ব্যবহার করতেন তাহলে সেই গুঁড়ো জিনিসের প্রয়োজন হোত না।

একটি উখা হলেই চলতো। পাথর দিয়েও ভাল পালিশের কাজ হতে পারে। আর ওরা তা যেভাবে করেন, তার চেয়ে উৎকৃষ্টতরই হোত।

চাকাটিকে চব্বিশ ঘন্টা পর পর মেজে ঘসে নিতে হয়। সেকাজ গুঁড়া জিনিস বা উখা যা দিয়ে হোক করা চলে। কারিগর কর্ম্মবিমুখ ও অলস প্রকৃতির না হলে তা বার ঘণ্টা অন্তর করলে আরও ভাল হয়। চাকার উপরে কিছু সময় পাথরটি রেখে কিছুক্ষণ তা ঘোরালেই ওটি আয়নার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গাছের গুঁড়া বা উখা দিয়ে চাকার নির্দিষ্ট স্থানটি পালিশ করে না নিলে সেখানে অন্য কোন গুঁড়ো জিনিস বসে না। কিন্তু তা না বসলে দু' ঘন্টার কাজ এক ঘন্টাতে সম্পন্ন হয়।

কোন কোন হীরক রত্ন স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত কঠিন থাকে। গাছের গায়ে যেমন গাঁট থাকে, হীরক খণ্ডেও তদনুরূপ গাঁট থাকে। ভারতে যারা হীরক কাটেন তাঁরা এই ধরণের জিনিস কাটতে দ্বিধা গ্রস্ত হন না। ইউরোপের কারিগররা কিন্তু তা করতে হলে খুব মুস্কিলে পড়তেন। সাধারণভাবে তাঁরা সেকাজ করতে রাজী হন না। ভারতীয়দের অবশ্য এই কাজের জন্যে কিছু বেশী পারিশ্রমিক দিতে হয়।

এখন আমি খনি পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। স্বাধীনতা ও আনুগত্য দুই এর মধ্যে দিয়ে ব্যবসাপত্র চলে। যে কোন ক্রয় মূল্যের শতকরা দুইভাগ দিতে হয় রাজাকে। তিনি আবার বছর বছর একটা নির্দিষ্ট হারে কিছু অর্থ পান ব্যবসায়ীদের কাছে। সেই পাওনাটি হয় খনি থেকে জিনিস সংগ্রহের জন্যে। খনি শ্রমিকদের জানা থাকে কোথায় ভাল হীরা পাওয়া যেতে পারে। অতএব ব্যবসায়ীরা তাদের সহায়তায় সেই রকম পাঁচশত ফুটের পরিধিযুক্ত স্থান ইজারা নেন। সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জন শ্রমিক কাজে বহাল হয়। কাজ দ্রুত নিষ্পন্ন করার জন্যে অনেক সময় একশত লোকও নিযুক্ত হয়। কাজের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন পঞ্চাশ জন শ্রমিকের জন্যে শুল্ক দিতে হবে প্রায় বত্রিশ শিলিং করে। আর একশত শ্রমিক কাজ করলে চৌষট্টি শিলিং দানের প্রথা।

এই দরিদ্র শ্রমিকরা প্রতিজন প্রতিবছরে আয় করে মাত্র একটি টাকা। দিনে এক পেনিরও কম মজুরী তারা পায়। অথচ এই কাছে এমন লোকের প্রয়োজন যাদের এই বিষয়ে গভীর ও নিখুঁত জ্ঞান আছে। কিন্তু তাদের বেতন মজুরী কত সামান্য। হীরা খুঁজে বের করার সময় তাদের সম্বন্ধে কোন

সন্দেহের অবকাশ থাকে না। হীরার টুকরো লুকিয়ে রাখা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও দেখা যায় যে তারা এত সামান্য কাপড় পরেন যে সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। তবে অনেক সময় তারা বেশ কায়দা করে তা গিলে ফেলে। হীরক খনিতে যে ব্যবসায়ীরা কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাদের মধ্যে একজন মুখ্য ব্যক্তি আমাকে একদিন বললেন যে খনি শ্রমিকদের মধ্যে যারা বহুদিন তাঁর কাছে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে একজন একবার একটি হীরক খণ্ড চুরি করেছিল। সেটির ওজন ছিল প্রায় দুই ক্যারাট। লোকটি হীরার টুকারটিকে লুকিয়ে রেখেছিল চোখের কোনে। কিন্তু চুরি হওয়ার কথা জানাজানি হতেই জিনিসটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। এই জাতীয় অদ্ভুত সব চাতুরী বন্ধ করার জন্যে ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদা দশ বার জন লোক নিয়োগ করেন সতর্ক প্রহরার জন্যে।

ঘটনাচক্রে যদি বেশ বড় আকারের হীরক পাওয়া যায় তাহলে তা খনির অধিকর্ত্তার কাছে নিয়ে যেতে হয়। তিনি তার প্রতিদানে একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ দান করেন। সেটি হচ্ছে সূতী বস্ত্রে তৈরী একটি পাগড়ী। জিনিসটি বিশেষ মূল্যবান নয়। তার সঙ্গে আরও দেয়া হয় কিছু রৌপ্য মুদ্রা, অথবা কিছু চাল ও এক থালি চিনি।

যে ব্যবসায়ীরা হীরক ক্রয়ের জন্যে খনি অঞ্চলে যান তারা স্বগৃহেই থাকেন। খনির অধিকর্ত্তা প্রতিদিন সকালে দশ এগারটার সময় স্নানাহার সমাধা ক'রে (বেনিয়ানরা স্নানাহার না করে কোথাও যান না) হীরা নিয়ে চলে যান ব্যবসায়ীদের গৃহে। হীরার সংখ্যাও যদি বেশী হয় এবং মূল্যও যদি যথেষ্ট হয় তাহলেও ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করে তা তাদের হেফাজতে রেখে আসেন। বিদেশী বণিকদের কাছে বিশেষ রাখেন না। দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাছে রত্নাদি সাত আট দিন কি তারও বেশী সময় থাকে যাতে তারা ভাল-ভাবে পরখ করে দেখতে পারেন। দেখাশোনা ও পর্য্যালোচনা শেষ হলে ব্যবসায়ী তা ফেরত দিয়ে থাকেন। তবে জিনিস যদি তার পছন্দ হয়ে যায় তাহলে তখুনি ক্রয় বিক্রয়ের পালা শেষ হয়ে যায়। আর তা না হলে পাথরের মালিক জিনিসগুলিকে কোমরবন্ধে, পাগড়ীর মধ্যে অথবা জামার মধ্যে নিয়ে চলে যাবেন। কারোর পক্ষে তা আর দেখা সম্ভব হবে না। খনির অধিকর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন দফায় আরও জিনিস এনে দেখাতে পারেন। ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি নিষ্পন্ন হলে ক্রেতা তার হিসেবরক্ষককে মূল্য চুকিয়ে দেবার নির্দ্দেশ

দিয়ে দেন। যদি কখনও দাম মিটিয়ে দিতে তিনচার দিন কি আরও বেশী বিলম্ব করেন তাহলে মাস হিসেবে শতকরা দেড় ভাগ সুদ দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যবসায়ী যদি বেশ সংগতিশালী হন তাহলে আগ্রা, গোলকুণ্ডা বা বিজাপুরের হুণ্ডী আদান প্রদান হয় বেশী। তবে সুরাট এ বিষয়ে সকলের চেয়ে অগ্রণী। এর কারণ সুরাট ভারতীয় বন্দর সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধতম। বিদেশাগত জিনিস ক্রয় বিক্রয় ওখানে খুব বেশী চলে। ভারতীয়দের প্রয়োজনের পক্ষে তা বিশেষ উপযুক্ত।

এই অঞ্চলের ব্যবসায়ী ও সাধারণ গেরস্থের ছোট ছেলেদের দেখতে বেশ আনন্দবোধ হয়। এরা অধিকাংশই দশ থেকে পনের ষোল বছর বয়সের। সহরের কোন পার্কে বা বাগানে গিয়ে তারা প্রতিদিন সকালে জমায়েত হয়। প্রত্যেকের কোমরবন্ধের সংগে হীরা ওজন করার বাটখারা শুদ্ধ একটি থলে ঝোলানো থাকে। তার মধ্যে আরও থাকে পাঁচ ছয়শত স্বর্ণ মুদ্রা। হীরা বিক্রয় করার জন্যে আসবেন এমন লোকের অপেক্ষায়ই ওরা সেখানে গিয়ে জড় হয়। তারা আসবেন খনি অঞ্চল থেকে। যিনি হীরা বিক্রী করার জন্যে আসবেন তিনি বালকদের মধ্যে যেটি বয়োজ্যেষ্ঠ তার হাতে তা দেবেন। সেই-ই দলের নেতা। প্রধান বালক হীরাটি দেখে পর্য্যাক্রমে সকলের হাতে তা দেবে। জিনিসটি এইভাবে সকলের হাত ঘুরে আবার প্রথম ও প্রধান বালকের হাতে ফিরে আসবে।

সে তখন কেনার উদ্দেশ্যে জিনিসটির দাম জানতে চাইবে। দাম বেশী দিয়ে কেনা হলে সেই প্রধান বালকই সেজন্যে দায়ী হবে। সন্ধ্যার দিকে সকলে মিলে হিসেব করবে কি কেনা হোল, কত দাম পড়লো ইত্যাদি। তাছাড়া পাথরগুলি বের করে তখন পরখ করে দেখবে এবং স্বচ্ছতা, ওজন ও জেল্লা অনুসারে তাকে বিভক্ত করবে। তারপর প্রতিটির আলাদাভাবে দাম ঠিক করে রাখবে। কারণ অজানা আগন্তুকদের কাছে তা বিক্রী করার আশা থাকে। আর সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা হয় যে কিভাবে ক্রয় মূল্য অপেক্ষা চড়া দামে বিক্রী করা যায়। শেষ পর্য্যন্ত বালকরা হীরা নিয়ে চলে যায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে। তাদের কাছে অনেক প্রকার হীরা থাকে। তার সংগে তুলনা করা হলে ভাল মন্দ বোঝা যায়। বিক্রী করে যা লাভ হয় তা সেই বালকদের মধ্যে ভাগ করে নেবার নিয়ম। তবে ওদের মধ্যে যে প্রধান সে কেবল অন্যদের অপেক্ষা শতকরা চার আনা বেশী পেয়ে থাকে।

বালকরা বয়সে ছোট হলেও সবরকম পাথরের দামপত্র সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান। ওদের মধ্যে কেউ যদি পাথর কিনে আবার তা বিক্রী করতে চায় এবং তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে অন্য আর একটি বালক সেটি কিনে রাখবে। এক ডজন পাথরের প্যাকেট ওদের হাতে দিলেও এমন হবে না যে তার মধ্যে থেকে ফাটল, বিন্দু বা অন্য কোন দোষ ত্রুটিযুক্ত দু'একটি জিনিস বের না করবে।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে এই সকল ভারতীয়দের অজানা বিদেশী মানুষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, বিশেষতঃ যাদের ওরা ফ্রাঙ্ক বলেন তাদের প্রতি। আমি খনি অঞ্চলে পৌঁছেই তথাকার গভর্ণরের সংগে দেখা করতে যাই। তিনি বিজাপুরের রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ প্রদেশটি শাসন করেন। তিনি মুসলমান। আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তিনি বললেন যে আমি সেখানে সর্ব্বদাই আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। তারা নিঃসন্দেহ ছিলেন যে আমার সংগে সোনা অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা আছে। আমার সংগে যা ছিল তা আমার বাসস্থানেই দেখানো চলতো। জায়গাটি নিরাপদ। আমার জিনিসপত্র ও অর্থ কড়ির দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করবেন। আমার সংগে যে কয়েকটি ভৃত্য ছিল তদুপরি তিনি আরও চারজন নিযুক্ত করে দিলেন। তিনি তাদের বলে দিলেন যে দিনরাত যেন তারা আমার সোনাদানার উপরে লক্ষ্য রাখে। আর তারা যেন আমার হুকুম ঠিক মত পালন করে। আমি তার ওখান ছেড়ে চলে আসার পরেই তিনি আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ফিরে যেতেই তিনি বললেন, "আমি আপনাকে আবার ডেকে এনেছি এই বলার জন্যে যে আপনার কোন ভয় নেই। পান ভোজন করুন এবং নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখবেন। একটি কথা আপনাকে বলা হয় নি। আপনি রাজাকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করবেন না। সমস্ত ক্রয়ের উপরে তার শতকরা দু'ভাগ পাওনা।"

তিনি আরও বললেন, "কিছু সংখ্যক মুসলমান খনিতে এসে যা করে গিয়েছেন, আপনি তদনুরূপ করার চেষ্টা করবেন না। ব্যবসায়ী ও দালালদের সংগে যুক্ত হয়ে রাজার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবার কাজ ওদের মত বন্ধ রাখবেন না। তারা মুখে বলতেন যে মাত্র দশ হাজার প্যাগোডা (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যের জিনিস কিনেছেন, অথচ বাস্তবে তারা পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা খাটিয়েছেন সেই ব্যবসাতে।"

আমি তখন জিনিস কেনার কাজে হাতে দিলাম। দেখলাম যে প্রচুর লাভ করার অবকাশ রয়েছে। প্রতিটি জিনিস গোলকুণ্ডার তুলনায় শতকরা বিশ ভাগ সস্তা। তদুপরি ঘটনাচক্রে কখনও হয়ত কারোর হাতে বড় বড় পাথরও এসে যায়।

একদিন সন্ধ্যার মুখে অতি দীনহীন বেশে জনৈক বেনিয়ান এলেন আমার কাছে। বিশেষ বিনীতভাবে আমার পাশেই বসলেন তিনি। তার গায়ে জড়ানো ছিল পটির মত একটি জিনিস। মাথায় বাঁধা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার একখানি রুমাল। এদেশে কেউ কারোর পোষাক সম্বন্ধে মাথা ঘামায় না। কারোর হয়ত দেখা যাবে অতি শোচনীয় অবস্থার একখণ্ড সূতী কাপড় ছাড়া আর কিছু পরনে নেই। কিন্তু তার কোমরের কাপড়ের মধ্যে হয়ত লুকোনো আছে যথেষ্ট পরিমাণের কিছু হীরা। আমি তার সংগে ভদ্র ব্যবহারই করলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমার দোভাষীর মাধ্যমে জানতে চাইলেন যে আমি কিছু চুনীরত্ন কিনতে ইচ্ছুক কিনা। দোভাষী তাকে তা দেখাতে বললেন। অতঃপর তিনি তার কোমরবন্ধের আড়াল ভেদ করে একটি ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বের করলেন। তার মধ্যে দেখা গেল প্রায় বিশটি চুনী বসানো আংটি। আমি তা দেখে ওকে বললাম যে আমার প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলি অত্যন্ত ছোট। আমি বড় সাইজের মণি রত্নের সন্ধান কচ্ছি। যাই হোক, আমার মনে পড়লো, ইস্পাহানের এক ভদ্র মহিলা তার জন্যে একটি চুনী বসানো আংটি নিয়ে যাবায় জন্যে বলেছিলেন। আমি সেই লোকটির কাছে একটি আংটি কিনলাম প্রায় চারশত ফ্রাঙ্ক মূল্য দিয়ে। আমি বিলক্ষণ জানতাম যে জিনিসটির দাম তিনি তিনশত ফ্রাঙ্কের বেশী আশা করেন নি। তথাপি আমি স্বেচ্ছায় আরও একশত ফ্রাঙ্ক অতিরিক্ত দেবার ঝুঁকি নিলাম। কারণ আমার ধারণা হয়েছিল যে লোকটি কেবলমাত্র রুবি বিক্রী করার জন্যে আসেন নি। তার ধরণ ধারণ দেখে আমার মনে হয়েছিল যে লোকটি আমাকে ও দোভাষীকে একটু আলাদাভাবে পেতে চায় আরও কোন ভাল জিনিস দেখানোর জন্যে। মুসলমানদের নমাজ করার সময় হতে গভর্ণরের নিযুক্ত তিনটি ভৃত্যই চলে গেল। চতুর্থটি ছিল আমার প্রয়োজনেই। আমি একটা ছুঁতো করে তাকে সরিয়ে দিলাম। তাকে পাঠিয়ে দিলাম রুটি কিনে আনার জন্যে। সে বেশ খানিকটা সময় সেখানে কাটিয়ে এল। ওখান-কার অধিকাংশ বাসিন্দাই হিন্দু। তারা ভাত খেতেই পছন্দ করেন। রুটিতে

তত রুচি নেই। অতএব কারোর রুটির দরকার হলে তার জন্যে অনেক দূরে যেতে হয়। অর্থাৎ বিজাপুরের রাজার কেল্লাতে যেখানে মুসলমান বাসিন্দা আছে সেখানে গিয়ে রুটি আনতে হবে।

বেনিয়ান দেখলেন আমি ও দোভাষী ছাড়া আর সকলেই চলে গেল। তখন বেশ কৌতূহলকরভাবে তিনি মাথার পাগড়ীটি খুলে নামালেন। তারপর চুলের পাক খুললেন। দেশীয় প্রথায় চুলগুলি তার মাথাকে ঘিরে বাঁধা ছিল। লক্ষ্য করলাম যে তার চুলের মধ্যে থেকে তিনি একখণ্ড ছেঁড়া কাপড় বের কচ্ছেন। তার মধ্যে লুকোনো ছিল এক টুকরো হীরা। ওজন ৪৮১/২ ক্যারাট। চমৎকার জেল্লা; আকারও উত্তম। হীরার এক তৃতীয়াংশ স্বচ্ছ। তবে তার একপাশে সামান্য একটু চির্ ছিল। মনে হোল সেই দাগটি পাথরটির মধ্যে অনেকখানি ভেদ করে চলে গিয়েছে। বাকী অংশ জুড়েও ছিল চির ও লাল সব দাগ।

আমি রত্নটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পরখ করে দেখছিলাম। তখন বেনিয়ান বলে উঠলেন, "এনিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। কাল সকালে অবসর সময়ে একাকী বসে ভাল করে দেখবেন।" তারপর আবার বললেন, "দিনের এক চতুর্থাংশ কেটে গেলে আপনি আমাকে সহরের বাইরে দেখতে পাবেন। রত্নটি আপনার পছন্দ হলে দামটা সংগে নিয়ে যাবেন।" এই কথাব পর তিনি কত দাম আশা করেন তাও জানালেন। প্রসংগক্রমে বলা যায় যে দিনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হলে সমস্ত বেনিয়ারা, নর-নারী নির্ব্বিশেষে সকলে সহরে নিজেদের বাসস্থানে গিয়ে স্নানাদি জাতীয় স্বাভাবিক সব দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পন্ন করেন। পুরোহিতদের সহায়তায় তারা প্রতিদিন যে পূজা প্রার্থনা করেন তাও এই সময়ে নিজ নিজ আবাসে গিয়ে করার নিয়ম। বেনিয়ান আমাকে সেই সময়টির কথা বলার কারণ হোল যে তখন আর কেউ উপস্থিত থাকবে না। আমি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে যেতে ক্রটী করি নি। তার প্রস্তাবিত অর্থ কড়িও সংগে নিয়েছিলাম। তবে কিছু কম নিলাম। তা আলাদা করে রেখেছিলাম দর কষাকষির পরে কিছু দেয়া যাবে এই মনস্থ করে। পরে অবশ্য একশত প্যাগোডা মুদ্রা অতিরিক্ত দিয়েছিলাম। সুরাটে ফিরে আমি পাথরটি জনৈক ডাচ কাপ্তেনকে বিক্রী করে দিলাম। তাতে আমার যথেষ্ট লাভ হয়েছিল।

আমি সেই রত্নটি কেনার তিন দিন পরে গোলকুণ্ডার একজন সংবাদদাতা এলেন। তাকে পাঠিয়েছিলেন জনৈক ওষুধ প্রস্তুতকারক। বোয়েভে নাম্নে

একটি লোককে আমি গোলকুণ্ডায় রেখে এসেছিলাম আমার পাওনা টাকার কিছু অংশ আদায় ও তার রক্ষণের উদ্দেশ্যে। ভারতীয় মুদ্রায় যেখানে পাওনা মিটিয়ে দেয় সেখানে তাকে আবার স্বর্ণ প্যাগোডা মুদ্রার পরিবর্ত্তিত করে নিতে হয়। সংবাদদাতা জানালেন যে, সেই লোকটি যেদিন টাকা আদায় করলেন তারপর দিন তিনি কঠিন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি আমাকে যে চিঠিখানি পাঠিয়েছিলেন তাতেও তার অসুস্থতার কথা ছিল। টাকা যে আদায় হয়েছে সে খবর দিতেও ভুলে যাননি। টাকাকড়ি সব আমার খাস কামরায় সীলমোহর করে রেখেছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তার মৃত্যু আসন্ন, তখন আমাকে দ্রুত ফিরে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। কারণ তার মনে হয়েছিল যে ওখানে আমার যে ভৃত্যরা রয়েছে তাদের জিম্মায় আমার টাকা কড়ি নিরাপদ নয়। এই সংবাদ ও চিঠি পেয়েই আমি গভর্ণরের সংগে দেখা করতে গেলাম বিদায় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। তিনি তো অবাক হলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে আমি আমার অর্থ কড়ি সব ব্যয় করে ফেলেছি নাকি। তদুত্তরে আমি জানালাম যে অর্দ্ধেক আন্দাজ খরচ হয়েছে। তখন আমার হাতে বিশ হাজারেরও অধিক প্যাগোডা মুদ্রা ছিল। তা শুনে তিনি বললেন যে আমার মত হলে তিনি সেই অর্থ আবার খাটাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তিনি ব্যবস্থা করে দিলে আমার ক্রয় ব্যাপারে কোনও লোকসান হবে না। তিনি আরও জানতে চাইলেন যে আমি তাঁকে আমার জিনিসপত্র দেখাতে আগ্রহী কিনা। তিনি জিনিসের সংখ্যা পরিমাণ জানতেন বটে, কিন্তু তাহলেও বিক্রেতাকে সমুদয় জিনিসের একটি বিবরণ তালিকা রাজাকে দিতে হবে। কারণ যারা কিনবেন তাদের রাজাকে শত করা দুই ভাগ শুল্ক প্রদানের নিয়ম। আমি তখন তাঁকে আমার ক্রীত জিনিসগুলি দেখালাম। তিনি আবার জানতে চাইলেন যে কত মূল্যে তা কিনেছিলাম। রাজার পাওনা গণ্ডার হিসেব রক্ষক বেনিয়ানের হিসেবের বইএর সংগে আমার প্রদত্ত অংক মিলে গিয়েছিল।

আমি তখন রাজার প্রাপ্য দুই শতাংশ শুল্ক প্রদান করলাম। তা দেখে তিনি (গভর্ণর) মন্তব্য করলেন যে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ফরাসীরা (ফ্রাঙ্ক) বিশ্বাসযোগ্য লোক। এই বিষয়ে তিনি আরও সুনিশ্চিত ভাব দেখালেন যখন আমি সেই ৪৮½ ক্যারাটের হীরাটি বের করে তাকে দেখলাম।

সেই প্রসংগে আমি বললাম, "মহাশয়! এই জিনিসটির বিবরণ বেনিয়ানের খাতায় নেই। সহরের কোন লোকই জানেনা যে এটি আমি কিনেছি। আমি না দেখালে আপনিও জানার সুযোগ পেতেন না। আমি কোন রাজাকে তাঁর ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে চাই না। এই রত্নটির ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে তাঁর যা প্রাপ্য তা আমি দিচ্ছি।"

সুবাদারকে দেখে মনে হোল যে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন। আর তিনি যেন নীতিগতভাবে আমার কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে একটি উচ্চতর ভাবের সন্ধান পেলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত প্রশংসাও করলেন। আরও বললেন যে আমি প্রকৃত একজন সৎলোকের মত কাজ করেছি। ওদেশে হিন্দু বা মুসলমান কোন সমাজেই এই প্রকার আর একটি মানুষ নেই যিনি এই ভাবে কাজ করতেন। বিশেষ করে কারোর যদি জানা থাকে যে তার ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে অন্য লোক কিছু জানে না, তাহলে সেখানে আরও গোপন রাখার চেষ্টা চলে। এই ঘটনার পরে তিনি স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ধনী ও ব্যবসায়ীদের আহ্বান করে নিয়ে এলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত তাদের জানিয়ে তিনি হুকুম দিলেন যে তাদের কাছে যত উৎকৃষ্টতম মনি রত্ন আছে তা নিয়ে আসা হোক। তিন চার জন ব্যবসায়ী তাঁর হুকুম মাফিক তা নিয়ে এলেন। আমিও দু'এক ঘণ্টার মধ্যে সেই বিশ হাজার প্যাগোডা মুদ্রা ব্যয় করে ফেললাম। জিনিস পত্র কেনা ও দরদাম মিটিয়ে দেবার পরে সুবাদার আবার ব্যবসায়ীদের বললেন যে একজন সৎলোকের সংগে আজ তাদের আদান প্রদান হোল। সুতরাং তাদের উচিত আমাকে কিছু একটি স্মারক চিহ্ন প্রদান করা। তাঁরা বিশেষ সদাশয়তা সহকারেই আমাকে একটি মূল্যবান হীরা প্রদান করলেন। আর সুবাদার আমাকে উপহার দিলেন একটি পাগড়ী ও একটি কোমর বন্ধ।

এখানে আমাকে অদ্ভুত ও অসাধারণ একটি বর্ণনা দিতে হবে। তা হোল, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই জিনিসপত্র বিক্রয় করার রীতি পদ্ধতি। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতানুসারে নীরবে কাজ করে যান। একে অপরকে কিছু জানান না এবং বলেনও না। কেউ কারোর সংগে এ বিষয়ে বাক্যালাপও করেন না। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জন মুখোমুখি হয়ে বসেন। তাদের একজন কোমর বন্ধ খোলেন, আর বিক্রেতা ক্রেতার ডান হাতটি ধরেন এবং নিজের হাতটি কোমর বন্ধের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। সেই

আবরণের আড়ালেই গোপনে ক্রয় বিক্রয়ের কাজ নিষ্পন্ন হয়। কেউ তা জানতে ও বুঝতে পারেন না। অথচ অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও সেখানে উপস্থিত থাকেন। তারাও ঠিক অনুরূপ প্রথায় নীরবে তাদের বেচা কেনার পর্ব্ব চালিয়ে যান। ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জনই মুখে কোন কথা উচ্চারণ করেন না বা চোখের ইসারাতেও কিছু প্রকাশ করেন না। যা কিছু হয় তা সবই হাতের মাধ্যমে। তা সম্পন্ন হয় নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ঃ

বিক্রেতা ক্রেতার হাতটি পুরোপুরি ধরলে বুঝতে হবে মূল্য এক হাজার মুদ্রা। আর তিনি যদি অনেকবার ক্রেতার হাতখানি ধরেন তাহলে যতবার ধরেছেন তত হাজার টাকা। যে জাতীয় মুদ্রায় মূল্যদানের কথা সেই রকমটি দিতে হবে। আর তা সংখ্যা নির্নীত হয় হাত চেপে ধরার সংখানুসারে ও হাজার হিসেবে। আংগুল ধরলে শতক হিসেবে হয়। অর্থাৎ একটি আংগুল ধরলে একশত, পাঁচটিতে পাঁচশত। আবার আংগুলের মধ্যবর্ত্তী গাঁটটি ধরলে বুঝতে হবে পঞ্চাশ মুদ্রা। আংগুলের মাথাটি ধরলে দশটি মুদ্রার প্রশ্ন। এই হচ্ছে ভারতীয় ব্যবসাতে বিক্রয় মূল্য দানের রীতি। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। একই জায়গায় হয়ত অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছে, সেখানেই একটি প্যাকেট উপস্থিত সকলের চোখ এড়িয়ে পাঁচ ছয় বার ভিন্ন ভিন্ন হাত ঘুরে এল। কি জিনিস, কত মূল্যে বিক্রয় হোল তা কেউ জানতেই পারলেন না। তবে গোপনে কিনলে পাথরের ওজন সম্পর্কে প্রবঞ্চিত হবার আশংকা থাকে। সর্ব্ব সমক্ষে কিনলে সেখানে রাজার নিযুক্ত বিশেষ প্রতিনিধি থাকেন হীরার ওজন গ্রহণের জন্যে। তিনি সেই কাজের জন্যে ব্যবসীদের কাছে কোন পারিশ্রমিক আশা করেন না। তিনি ওজন ঠিক করে দিলে তা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েরই গ্রহণ যোগ্য হয়। আর সেখানে দু'পক্ষের কাউকেই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শণের কোন প্রশ্ন থাকে না

আমার খনির কাজ শেষ হতে সুবাদার আমাকে ছয়টি অশ্বারোহী লোক দিলেন যাতে আমি বিশেষ নিরাপদে তাঁর রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করতে পারি। তাঁর রাজ্যাধিকার একটি নদী দ্বারা চিহ্নিত। নদীটি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্যকে বিভক্ত করে রেখেছে। নদীটি পার হওয়া খুব দুষ্কর। সেটি অতি প্রশস্ত, গভীর ও খরস্রোতা। কোন সেতু নেই, আবার কোন নৌকারও ব্যবস্থা দেখা যায় না। অন্যান্য স্থানে নদী পারাপারের জন্যে যেমন ব্যবস্থা এখানেও তদনুরূপ। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বেও বর্ণনা

দিয়েছি। মানুষ, মালপত্র, গাড়ী ঘোড়া, গরু বাছুর সব একই প্রথায় এপার ওপার যাতায়াত করে।

গোলাকার একটি যান। আয়তন দশ বার ফুট। তৈরী হয় বেত দিয়ে। বেত অনেকটা আমাদের ঝুড়ি তৈরীর লতাগাছের মত। নৌকাগুলির আবরণ তৈরী হয় বলদের চামড়া দিয়ে। এগুলি ঠিক নৌকা না হলেও এই জিনিস দিয়েই নৌকার কাজ চলে। আমি ইতিপূর্ব্বে যাত্রীরা কিভাবে এই জিনিসের দ্বারা কাজ চালান তা বর্ণনা করেছি। ভাল নৌকা বা একটি সেতুর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হতে পারতো। কিন্তু গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর দুই রাজ্যের শাসকদেরই এ বিষয়ে আপত্তি আছে। কারণ নদীটি দুই রাজ্যকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এইটিই সীমানা নির্দেশক।

প্রতি সন্ধ্যায় দুই তীরবর্ত্তী মাঝিদের দু'জন উপ-সুবাদারকে রিপোর্ট দিতে হয় যে নদীর দুই তীরবর্ত্তী এক মাইল আন্দাজ জায়গা থেকে সঠিক কত মানুষ, মালবাহী পশু প্রাণী ও কি পরিমাণ পণ্য দ্রব্য সারাদিনে নদীর এপারে ওপারে চলাচল করেছে সেই বিবরণটি নিখুঁত হওয়া চাই।

আমি যেদিন গোলকুণ্ডাতে পৌঁছলাম তার তিন দিন আগে বোয়েতের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি মূলতঃ ছিলেন ওষুধ প্রস্তুতকারক। আমি তাকে যে ঘরটিতে রেখেছিলাম সেটি দুই রকম সীলমোহর দিয়ে বন্ধ করা ছিল। একটি সীল কাজীর। ইনি হলেন প্রধান বিচারপতির মত। আর একটি শাহ-বন্দরের। তিনি ব্যবসায়ীদের মুখ্য কর্ত্তা। বিচার বিভাগের জনৈক কর্ম্মী আমার ভৃত্যদের সংগে মিলে ঘরের দরজা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। আমি সেই ভৃত্যদের পরলোকগত বোয়েতের সংগে রেখে এসেছিলেন। আমি ওখানে পৌঁছোতেই সেই খবর কাজী ও শাহ-বন্দরকে জানানো হোল। তা শুনে তাঁরা আমার খোঁজ নেবার জন্যে লোক পাঠালেন।

আমি তাঁদের অভিবাদন জানাতেই কাজী সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন যে মৃত ব্যক্তির ঘরে যে টাকা কড়ি আছে তা আমার কিনা। আর আমার অধিকার আমি কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবো। তদুত্তরে বললাম, আমি হিসেব রক্ষককে যে বিনিময় সংক্রান্ত চিঠিপত্র দিয়েছিলাম তা দেখাতে পারি। এছাড়া উত্তম প্রমাণ আর কি হতে পারে। আমি এখান ছেড়ে চলে যাবার পর তিনি আমার নির্দেশেই মৃত ব্যক্তির হাতে সেই টাকা দিয়েছিলেন। বোয়েতেকে আমি আরও বলেছিলাম যে হিসেব রক্ষক যদি

রৌপ্য মুদ্রা দান করেন তাহলে তিনি যেন তা স্বর্ণ মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করে আমাকে পাঠিয়ে দেন। আমার এই উত্তর শুনে তাঁরা দু'জন হিসেব রক্ষককে ডেকে পাঠালেন। তাঁরাই আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা বলতে পারবেন আমার বর্ণনা সত্য কিনা। তারা এসে যখন আমার বক্তব্যকে সত্য বলে ঘোষণা করলেন তখন কাজী তাঁর প্রতিনিধিকে আমার ঘরের দরজা খুলে দিতে হুকুম দিলেন। আরও দেখতে বললেন যে সমস্ত থলেগুলির সীলমোহর ঠিক আছে কিনা। যতক্ষণে আমি সব ঠিক আছে বলে ঘোষণা না করলাম এবং কিছুই ক্ষতি হয়নি বললাম ততক্ষণ সেই লোকটি আমার বাড়ী ছেড়ে যাননি।

তাঁর সংগে আমাকেও আবার যেতে হয়েছিল কাজী ও শাহ্-বন্দরের কাছে বিবৃতি দানের জন্য। তাঁরা যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্যে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম। আমার কাজ শেষ হোল পারসীক ভাষায় লেখা একটি দলিলে নাম সহি করার পর। তাতে লেখা হয়েছিল যে আমি আমার সমস্ত জিনিস ও অর্থ কড়ি ঠিকমত পেয়েছি।

কাজী সাহেব আমাকে বললেন যে বোয়েতেকে সমাধিস্থ করার খরচটা আমাকে দিতে হবে। তাছাড়া আরও দিতে হবে যারা সীলমোহর করেছেন ও আমার বাড়ীঘর পাহাড়া দিয়েছেন তাদের প্রাপ্য। সর্ব্বসাকুল্যে ব্যয় হয়েছিল নয় টাকা। ইউরোপের অধিকাংশ জায়গায় সেই সব ব্যাপারে এত সহজে কাজ সম্পন্ন হয় না।

অধ্যায় ষোল

গ্রন্থকারের অন্যান্য খনিতে ভ্রমণ। হীরক অনুসন্ধানের রীতি পদ্ধতি।

গোলকুণ্ডার পূর্ব্বদিকে সাত মাইল দূরে আর একটি হীরক খনি আছে। ভারতীয় ভাষায় বলে খনি। পারসীক ভাষায় তা কোলার।

অন্য খনিটি ছেড়ে আসার সময় আমি যে নদীটি পার হয়ে এসেছি তারই অতি নিকটে এই খনি। সহরের দেড় লীগ দূরে ক্রুশাকার একটি উচ্চ পর্ব্বত-মালা দেখা যায়। পর্ব্বত ও সহরের অন্তর্বর্ত্তী স্থানটি সমতল। সেখানেই খনি। সেই খনিতেই হীরা পাওয়া যায়। পাহাড়ের যত কাছে গিয়ে সন্ধান চালানো যাবে তত বড় আকারের হীরা পাওয়া যাবে। তবে খুব উঁচুতে উঠে গেলে আর হীরা পাওয়া যায় না।

খনিটি আবিস্কৃত হয়েছে প্রায় একশত বছর পূর্ব্বে। আর তা হয়েছে একটি দরিদ্র লোকের চেষ্টাতে। সে একখণ্ড জমি খনন করছিল জোয়ারের চাষ করার জন্যে। তখন একটি বিশেষ ধরণের পাথর তার নজরে পড়ে যায়। সেটির ওজন ছিল প্রায় পঁচিশ ক্যারাট। এই জাতীয় পাথর সে কখনও দেখেনি। তবে তার মনে হয়েছিল যে ওটির মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে। তখন সে পাথরটি নিয়ে চলে যায় গোলকুণ্ডাতে। সৌভাগ্যবশতঃ জনৈক হীরক ব্যবসায়ীর সংগে তার আলাপ পরিচয় হয়ে যায়। ব্যবসায়ী তার কাছে জেনে নিয়েছিলেন যে কোথায় সেই পাথরটি পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরও বিস্মিত হয়েছিলেন হীরকটির ওজন দেখে। কারণ তৎপূর্ব্বে যা হীরা পাওয়া গিয়েছিল তার ওজন দশ বার ক্যারাটের বেশী ছিল না।

সেই নতুন আবিষ্কারের কথা অতি দ্রুত দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সহরের কিছু সংখ্যক ধনী লোক তখুনি স্থানটি খননের কাজে ব্যাপৃত হলেন। এখনও সেখানে এত বড় সাইজের পাথর এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় যে রকমটি আর কোন খনিতে দেখা যায় না। বর্ত্তমানে সেখানে, আমি থাকতে [illegible] দশ থেকে চল্লিশ ক্যারাট ওজনেরও যথেষ্ট পাথর তোলা হয়। [illegible] হয়ত আরও বড় পাওয়া যায়। পাথর তুলে তাকে ছাটকাট করার [illegible] তার ওজন নয় শত ক্যারাট পর্য্যন্তও দেখা গিয়েছে। মীর জুমলা এই

ধরনের একটি হীরক ঔরংজেবকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি অন্যত্রও বলেছি যে তা পাওয়া গিয়েছিল এই খনিতে।

কোলার খনির মর্য্যাদা ও মূল্যমান নির্দ্ধারিত হয় ওখানে সংগৃহীত পাথরের বৃহৎ আকারের জন্যে। তবে দুর্ভাগ্য এই যে সাধারণতঃ ওখানকার হীরা স্বচ্ছ নয়। আর তার জেল্লার মধ্যে স্থানীয় মাটির প্রভাব দেখা যায়। মাটি জলে ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে হলে পাথরে একটা কালচে ভাব আসে। কতকগুলি পাথর সবুজ আভাযুক্ত। আর কিছু সংখ্যক পাথরে লালচে আভা পড়ে। তার কারণ মাটির রঙ্ লাল। কিছু পাথর আবার হলদে মত হয়ে যায়। এই জাতীয় রঙ রূপের বিশিষ্টতা হয় সহর ও পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী জমিতে মাটির বৈচিত্র্য অনুসারে। অনেক পাথর আছে যা কাটার পরে একরকম আঁটালো রস বা কষ নিষ্কাশিত হয়। সেজন্যে সর্ব্বদা হাতে রুমাল রাখার প্রয়োজন হয় তা মুছে ফেলার জন্যে।

হীরার ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে এই বলা যায় যে ইউরোপে আমরা পাথর পরখ করি দিনের আলোতে। আর তা করি পাথর পালিশ করার আগে খরখরে অবস্থায় এবং তখন বিশেষ সতর্কতার সংগে দেখতে হয় যে তাতে কোন চির ফাটল আছে নাকি এবং জেল্লা ইত্যাদি কি প্রকার। কিন্তু ভারতবর্ষে এই কাজ হয় রাত্রিতে। কোন দেয়ালে এক স্কোয়ার ফুট একটি স্থান খনন করা হয়। সেখানে বড় সলতের একটি বাতি জ্বালাবার প্রথা। সেই আলোর সামনে দুই আংগুলের ফাঁকে হীরকটি ধরে তারা পাথরের জেল্লা ও স্বচ্ছতা যাচাই করেন। যে জাতীয় ঔজ্জ্বল্যকে ভারতীয়রা "অতি সুন্দর ও অলৌকিক" বলেন তা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। তবে পালিশ করার আগে তা বোঝা খুব কঠিন। চাকায় দিলে তা সহজে সুস্পষ্টভাবে বোঝা না গেলেও আর একটি উপায়ে সুনির্দিষ্টরূপে ঔজ্জ্বল্যের মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব। তা হচ্ছে পত্রময় একটি গাছের নীচে পাথরটিকে রাখা। গাছের সবুজ ছায়াতে সহজেই ধরা যায় যে ওটি নীলাভা যুক্ত কিনা।

আমি যে বার এই খনিতে প্রথম যাই তখন ওখানে প্রায় ষাট হাজার লোক কর্ম্মরত ছিল। নারী, পুরুষ ও শিশু মিলে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের কাজ করতো। পুরুষেরা মাটি খুঁড়তো, আর মহিলা ও শিশুর দল তা বহন করে অন্যত্র নিয়ে যেত। এই খনিতে হীরক অনুসন্ধানের কাজ চলে রমলকোটের প্রথা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতর পদ্ধতিতে।

খনিজীবীরা হীরক সংগ্রহের জন্যে স্থান নির্ব্বাচন করে তার কাছেই আরও একটি জায়গাকে সমতল করে নেয়। দ্বিতীয় স্থানটি প্রথমটির সমানতো হবেই, বরং কিছু বড়ও হতে পারে। ওটিকে ঘিরে তারা দুই ফুট আন্দাজ উঁচু একটি দেয়াল তুলে নেয়।

এই দেয়ালের ভিতের দিকে দুই ফুট অন্তর ফাঁকা জায়গা রাখা হয় জল নিষ্কাশনের জন্যে। জল টেনে বের করার আগে পর্য্যন্ত ফাঁকগুলির মুখ বন্ধ রাখার নিয়ম। এইভাবে জায়গাটি তৈরী হলে যারা অনুসন্ধান কর্ম্মে লিপ্ত হবেন তারা তাদের মালিক ও আত্মীয় বন্ধুরা সকলে গিয়ে সেখানে মিলিত হন। মালিক যে দেবতার পূজা করেন তাঁর একটি প্রস্তরমূর্ত্তি এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মূর্ত্তিটি দাঁড়ান ভঙ্গীর। সকলে প্রতিমাটির সামনে সাষ্টাঙ্গে তিনবার প্রণিপাত করেন। পুরোহিত এসে দেবতার পূজা অর্চ্চনা সম্পন্ন করেন। পূজা প্রার্থনা শেষ হলে পুরোহিত জাফরান ও গদ মিশিয়ে একপ্রকার আটালো জিনিস তৈরী করে প্রত্যেকের কপালে এমন আকারের টীকা পরিয়ে দেন তাতে সাত আটটি চালের দানা বসিয়ে দিতে পারা যায়। পুরোহিতই সেই চাল বসিয়ে দেন। তারপর প্রত্যেকে হাঁড়িতে করে আনীত জল দিয়ে স্নান সমাপন করেন। স্নানান্তে পদমর্য্যাদা অনুসারে সারিবদ্ধ হয়ে সকলে খেতে বসেন। নতুন ব্যবসাপত্রের শুভারম্ভ উপলক্ষে মালিক সকলকে খাদ্য প্রদান করেন। এই কাজটি করেন তিনি সকলের শুভেচ্ছা লাভের জন্যে ও কর্ম্মীরা যাতে বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। খাদ্য মধ্যে ভাত পরিবেশন করেন জনৈক ব্রাহ্মণ। কারণ হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণের হাতে খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। হিন্দু সমাজে কিছু লোক এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে নিজের স্ত্রীর হাতে তৈরী খাবার গ্রহণ করতেও রাজী নন। তারা স্বহস্তে রান্না করে খান। তারা এমন একটি পাতায় করে ভাত খান যেটি জোড়া থাকে। তা দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের আখরোটের পাতার মত। খাবারের সময় সকলকে একটি করে ছোট তামার বাটিতে কিছু পরিমাণ চিনিসহ চার আউন্স আন্দাজ ঘি দেয়া হয়।

ভোজন পর্ব্ব শেষ হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লেগে যান। পুরুষরা মাটি খোঁড়ার কাজ করেন। মহিলা ও শিশুগণ মাটি তুলে নিয়ে যান। জমি খনন করা হয় দশ বার অথবা চৌদ্দ ফুট গভীর করে। খোদিত স্থানে জল এসে গেলে আর কিছু আশা করার থাকে না। সমস্ত মাটি তুলে নিয়ে

নির্দিষ্ট স্থানে স্তূপীকৃত হলে সকলে মিলে খাদ থেকেই জল তুলে সেই মৃত্তিকা-স্তূপে জল ঢালতে থাকেন। উদ্দেশ্য, সেই সদ্য তোলা মাটিকে নরম করা। জল ঢেলে মাটিকে জমা রাখা হয় তার অাঁটালো ভাবের মাত্রা অনুযায়ী। যতক্ষণ মাটি গলে তরলাকার না হবে ততক্ষণ তা জলে ভেজানো থাকবে। অতঃপর সময় মত দেয়ালের গর্ত্তগুলির মুখ খুলে জল সব বের করে দেবার নিয়ম। ক্রমশঃ আরও জল ঢেলে দেবার প্রথা। তার ফলে মাটি কাদা সব ধুয়ে বেরিয়ে যাবে। থাকবে শুধু বালি। মাটির ধরণ এমন যে দু'তিনবার জল ঢেলে তবে তা সরান যায়। তারপর বালি রোদে শুকোবে। সূর্য্যের তাপ এত প্রখর যে অতি দ্রুতই তা শুকিয়ে যায়। ওদের একপ্রকার বিশেষ চালুনি আছে যা দেখতে অনেকটা আমাদের দানা শস্য ঝেড়ে তোলার জন্যে যে কুলো ব্যবহৃত হয় তার মত। এদের চালুনি ব্যবহারের রীতিও আমাদের দেশের মতই। চালুনিতে দিয়ে ছাঁকার পর যে মোটা দানাগুলি থাকে তা মাটিতে রেখে দেবার নিয়ম।

সমস্ত মাটি ঝাড়া হলে তাকে জমিতে ছড়িয়ে বিশেষ একটা যন্ত্র দিয়ে যতটা সম্ভব সমতল করে বসিয়ে দেন। তখন সকলে গোড়ার দিকে আধ ফুট চওড়া এক একটি কাঠের পাটা হাতে নিয়ে ছড়ানো মাটির এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত পিটিয়ে চলেন। দু'তিনবার পেটাতে হয়। সেই মাটিকে আবার চালুনি দিয়ে ঝেড়ে নেবেন। বারবার ঝেড়ে জমিতে ছড়িয়ে নাড়াচাড়া করে দেখার নিয়ম যাতে হীরা খুঁজে পাওয়া যায়। রমলকোটেও এই প্রথায়ই হীরক সংগ্রহ করা হয়। পূর্ব্বে মাটি পিটিয়ে ভেঙ্গে সমতল করার কাজে লোহার যন্ত্র ব্যবহার করা হোত। তার ফলে হীরকের গায়ে অনেক চির ফাটল দেখা যেত।

এই খনিতেও রাজাকে দেয় শুল্ক, খনিতে কর্ম্মরত শ্রমিকের বেতন, বড় সাইজের পাথর খুঁজে বের করতে পারলে পুরস্কার দানের রীতি রমলকোটের খনিরই অনুরূপ। আগের দিনে সবুজ আবরণ যুক্ত হীরা কিনতে কেউ দ্বিধা বোধ করতেন না। কারণ, হীরাকে কাটলে সাদা এবং অতি চমৎকার জেল্লা বেরোত।

ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে কোলার ও রমলকোটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আর একটি খনি ছিল। কিন্তু প্রতারণা বঞ্চনার ফলে রাজা সেটিকে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। ওই বিষয়ে স্বল্প কথায় কিছু বলতে চাই। ওখানেও এমন

পাথর পাওয়া যেত যাতে সবুজ আবরণ থাকতো। তবে তা অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ। অন্যান্য পাথরের চেয়ে তা ঢের বেশী মনোরম। কিন্তু সেই সবুজ আবরণকে ঘসে সরাতে চেষ্টা করলে পাথরটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। তবে সেই একই রকমের আর একটি পাথর দিয়ে ঘসামাজা করলে ভেঙ্গে যেত না। চাকাতে তুলে মসৃণ করার চেষ্টা হলে সে চাপ সহ্য হোত না। ভেঙ্গে টুকরো হয়ে পড়তো। এজন্যে শেষোক্ত প্রথায় পরিস্রুত হীরক ক্রয় সম্পর্কে সকলেই খুব সতর্ক হতেন। এ ছাড়া আমি যে প্রতারণার কথা উল্লেখ করেছি তার জন্যেও রাজা খনিটি বন্ধ করে দিয়েছেন।

একদা ইংরেজ কোম্পানীর তরফে সুরাটে মেসার্স ফ্রেমলিন ও ফ্রান্সিস ব্রেটন ছিলেন প্রেসিডেন্ট। তখন এডওয়ার্ড ফার্ডিনাণ্ড নামে জনৈক ইহুদী দুই ভদ্রমহোদয়ের সংগে যুক্ত হয়েছিলেন একটি হীরক ক্রয় ব্যাপারে। ইহুদীটি ছিলেন স্বাধীন ব্যবসায়ী ; কোন কোম্পানীর সংগে যুক্ত ছিলেন না। ঘটনাটি ঘটেছিল খনিটি আবিষ্কারের স্বল্প সময় পরে। পাথরটিও ছিল সুন্দর আকৃতির ও স্বচ্ছ রূপের। ওজন ৪২ ক্যারাট। এডওয়ার্ড ইউরোপে ফিরে গেলেন। তখন মেসার্স ফ্রেমলিন ও ব্রেটন তাঁর হাতে হীরাটি দিয়ে বলে দিলেন বিশেষ সুযোগে ওটিকে বিক্রী করে তার হিসেব ও টাকাকড়ি যেন তাঁদের পাঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি লিগোর্ণে পৌঁছে ওটি তাঁর কতিপয় ইহুদী বন্ধুকে দেখালেন। তাঁরা প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পাউণ্ড মূল্য দানের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু তিনি আরও অধিক মূল্য দাবী করাতে জিনিসটি আর বিক্রী হোল না। অনন্তর তিনি হীরাটি নিয়ে চলে যান ভেনিসে। উদ্দেশ্য, পাথরটিকে কাটাবেন। কাটার কাজ ভালই হয়েছিল। কোনদিকে কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু যন্ত্রে দেয়া মাত্রই তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমিও একবার এই জাতীয় একটি পাথর সংগ্রহ করে প্রবঞ্চিত হয়েছিলাম। সেটির ওজন ছিল দুই ক্যারাট। যন্ত্রে দিয়ে আধাআধি পালিশ করার পরেই তা বিভক্ত হয়ে যায়।

অধ্যায় সতের

গ্রন্থকারের হীরক খনি ভ্রমণের ধারা।

আমি এবারে চলে এলাম তৃতীয় খনিতে। এইটি সবচেয়ে পুরোনো। এর অবস্থান বাংলাদেশে। স্থানটির নাম সোমেলপুর (সম্বলপুর নয়)। সহরটি বেশ বড়। তার কাছেই হীরা পাওয়া যায়। আর একটি নাম কোয়েল (গোয়েল ?)। এই নামে একটি নদী আছে। তার বালির মধ্যেই হীরক থাকে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলের মালিকানা জনৈক রাজার। তিনি পূর্ব্বে ছিলেন মহান মুঘল সম্রাটদের অধীনস্থ করদ রাজা। জাহাঙ্গীর ও তদীয় পুত্র শাজাহানের মধ্যে বিরোধের সুযোগে তিনি মুঘলদের বশ্যতাকে অস্বীকার করেন। শাজাহান রাজত্ব লাভ করেই রাজার কাছে কর দাবী করেছিলেন। আর তা করেছিলেন বকেয়া ও বর্ত্তমান মিলিয়ে। কিন্তু রাজার বিষয় সম্পদ এমন ছিল না যে তিনি সমস্ত দাবী মেটাতে পারতেন। অতএব তিনি দেশ ত্যাগ করে প্রজাদের নিয়ে পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। রাজার কর দানে অস্বীকৃতির কথা শুনে শাজাহান প্রথমে বুঝতে পারেন নি যে তিনি আত্মগোপনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তিনি রাজার রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করলেন। তিনি শুনেছিলেন যে ওদেশে প্রচুর হীরা পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনা হোল বিপরীত। যারা বাদশার পক্ষ থেকে ওখানে গিয়েছিলেন তারা দেখলেন যে সেখানে না আছে হীরা, না আছে মানুষ জন। এমন কি কোনও খাদ্য দ্রব্যও কিছু ছিল না। কারণ প্রজারা যা বহন করে নিয়ে যেতে পারে নি রাজা সেই অবশিষ্ট শস্যাদি পুড়িয়ে ভস্মীভূত করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। সেই খাদ্য বিনাশের কাজ এমন ধারায় হয়েছিল যে শাজাহান প্রেরিত সৈন্যবহরের অধিকাংশ খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হোল যে রাজা দেশে ফিরে আসবেন এবং মুঘল সম্রাটকে নাম মাত্র বাৎসরিক কর দেবেন।

আগ্রা থেকে উক্ত খনিতে যাবার রাস্তা নিম্নরূপ ঃ

আগ্রা ছেড়ে এলাহাবাদ ও বারাণসী হয়ে সাসারাম পৌঁছতে রাস্তা চলতে হয় একশত সাতষট্টি ক্রোশ। সাসারাম আগ্রার পূর্ব্বদিকে। খনি অঞ্চল ও

সাসারামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দক্ষিণ মুখে একুশ ক্রোশ দূরে একটি বড় সহর। সহরটি রাজার অধীনস্থ। এই রাজার কথাই আমি বর্ণনা করেছি। উক্ত রাজার রাজ্যে অনেক নদী আছে। সেই নদীতে হীরা পাওয়া যায়।

সহরের অদূরে একটি কেল্লা। নাম রোটাস। এশিয়ার সমুদয় শক্তিশালী দুর্গের মধ্যে এটি একটি। দুর্গটি পাহাড়ে অবস্থিত। দুর্গ প্রাচীরে বহিরাগত অংশ ছয়টি, কামান স্থাপিত আছে সাতাশটি, আর জলময় পরিখা তিনটি। তাতে আছে প্রচুর উৎকৃষ্ট মাছ। পাহাড়ে ওঠার একটি মাত্র সরু রাস্তা। পাহাড়ের গায়ে আধ লীগ আন্দাজ সমতল জায়গা আছে। সেখানে ধান ও দানা শস্য জন্মায়। প্রস্রবণ আছে দশটিরও অধিক। তা থেকেই জমিতে জল সেচন হয়। পাহাড়টির ভিত থেকে চূড়া পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই খাড়া ধরনের দেহাংশ রয়েছে। তার অধিকাংশ বনময়। রাজা একদা সাধারণ নিয়মে সাত আটশত লোক দ্বারা কেল্লাটি রক্ষা করতেন। বর্ত্তমানে কিন্তু ওটি মহান মুঘল সম্রাটের অধিকারভুক্ত। মুঘল বাদশাহ তা অধিকার করেছেন সুদক্ষ সেনাপতি মীর জুমলার কূট কৌশলের মাধ্যমে। মীর জুমলার সংগে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে অনেকবার। রাজা তিনটি পুত্র রেখে যান। তারা একে অপরের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। জেষ্ঠ্যকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় পুত্র মুঘল দরবারে কর্ম্মরত হন। মুঘল সম্রাট তাকে চার হাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করে পিতার ন্যায় মুঘল বাদশাকে কর দানের প্রথা অবলম্বন করেন।

ভারতে যারা তৈমুরলঙের বংশধর তারা এই স্থানটি অবরোধ করেও কেল্লা অধিকার করতে সক্ষম হন নি। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে দু'জনার সাসারামেই মৃত্যু হয়।

রোটাস দুর্গ ও সাসারামের মধ্যে দূরত্ব ত্রিশ ক্রোশ।

সোমেলপুর সহর বড় হলেও সেখানকার বাড়ী ঘর সব মাটির। চালাগুলি নারকেল পাতার। প্রায় ত্রিশ ক্রোশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হওয়াতে তা অত্যন্ত বিপদজনক। চোর ডাকাতরা জানে যে ব্যবসায়ীরা হীরক খনিতে গেলে তাদের সংগে টাকা কড়ি থাকবেই। সুতরাং তারা ব্যবসায়ীদের আক্রমণ করে এবং অনেক সময় হত্যা করারই সংকল্প করে। রাজার আবাস সহর থেকে এক ক্রোশ দূরে। তিনি বাস করেন তাঁবুতে। তা একটি বিশিষ্ট স্থান ও পরিবেশে অবস্থিত। কোয়েল নামে নদীটি কেল্লার পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

এই নদীটি হীরার আকর। এর উৎস দক্ষিণ দিকের একটি পাহাড়ে। ওখান থেকে নেমে এসে নদীটি গঙ্গায় আত্মনিলয় করেছে।

নদীটিতে হীরকের সন্ধান হয় নিম্ন উপায়ে। বর্ষার দুরন্ত চাপ শিথিল হলে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের পর হীরক অনুসন্ধানীরা জানুয়ারী মাসের অবসান অপেক্ষায় থাকেন। তখন নদীর জল অনেক জায়গায় শুকিয়ে নীচে নেমে যায়। জল তখন দুই ফুটের বেশী থাকে না। আর বালির স্তূপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। জানুয়ারীর শেষভাগে অথবা ফেব্রুয়ারীর গোড়াতে সোমেলপুর সহর, নদীবক্ষ থেকে সুউচ্চে অবস্থিত আর একটি সহর এবং সমতল ভূমির কিছু ছোট ছোট গ্রামের নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ মিলে প্রায় আট হাজার লোক একত্র হয়ে কাজে লেগে যান।

যারা একাজে সুদক্ষ তারা জানেন যে বালির নীচের স্তরে হীরা আছে। সেখানে একপ্রকার ছোট ছোট পাথর পাওয়া যায় যে দেখতে ঠিক আমরা যাকে 'বজ্র পাথর' বলি, তার মত। সোমেলপুরের নদীতে তারাই প্রথম হীরা অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেন। খুঁজতে খুঁজতে তারা এগিয়ে চলে যায় পাহাড়ের দিকে। সেই পাহাড়ই নদীর উৎসভূমি। সহর ও নদীর উৎসস্থলের মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ ক্রোশ। বালির মধ্যে যেখানে হীরা থাকার সম্ভাবনা তা খনন করার পদ্ধতি দুই প্রকার। জায়গাটিকে খুঁটি পুঁতে বেড়া ও মাটির দেয়াল তুলে বেষ্টন করে নেবার প্রথা যাতে জল নিষ্কাশন করে তাকে শুকিয়ে নেয়া যায়। এই ব্যবস্থা করা হয় একটি সেতুর ভিত বা জেটি তৈরীর উদ্দেশ্যে। অতঃপর তারা বালি তোলার কাজে হাত দেন। জায়গাটি দুই ফুটের বেশী গভীর করে খনন করা হয় না। সমস্ত বালি তুলে নিয়ে নদী তীরে নির্ম্মিত এক বিশেষ জায়গাতে তা ছড়িয়ে রাখার নিয়ম। স্থানটি এক কি দেড় ফুট উঁচু দেয়ালে বেষ্টিত। দেয়ালের গায়ে কিছু গর্ত থাকে। তার মধ্যে বালি জমা করে তাতে জল ঢেলে জমাট ভেঙ্গে দেয়া হয়। এর পরবর্ত্তী কাজের প্রথা পদ্ধতি আমার পূর্ব্ব বর্ণিত খনির অনুরূপ।

এই নদীতে প্রাপ্ত পাথর স্বাভাবিকরূপে সূক্ষ্মাগ্র। ওখানে বড় আকারের পাথর বিশেষ পাওয়া যায় না। বহুদিন পূর্ব্বে এই প্রকার পাথর ইউরোপে দেখা যেত। এখন ব্যবসায়ীদের ধারণা যে খনিটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। তবে একথা ঠিক যে দীর্ঘ দিন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অথচ নদীতে কোন জিনিস পাওয়া যায় নি। আর তা হয়েছে যুদ্ধের ফলে।

আমি অন্যত্র কর্ণাট প্রদেশের একটি হীরক খনির বর্ণনা দিয়েছি। প্রধান সেনাপতি মীর জুমলা এবং গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর আদেশে সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা চান নি যে ওখানে আর কাজ চালানো হয়। কারণ সেখানকার এবং বলতে গেলে এই ছয়টি খনিরই (পাশাপাশি) পাথর কালো বা হলদে রঙের। তাছাড়া ঔজ্জ্বল্যের দিকেও উৎকৃষ্ট নয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ বোর্ণিয়োতে একটি নদী আছে। নাম সুক্কাদন। এর বালিতে চমৎকার সব পাথর পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিও কোয়েল নদীর পাথরের মতই তা সুদৃঢ় ও সুন্দর।

বাটাভিয়ার জেনারেল ভান্‌দিম এক সময় আমাকে সুরাটে এই ধরণের ছয়টি পাথর পাঠিয়েছিলেন। তার এক একটির ওজন ছিল চার ক্যারাট। তাঁর ধারণা ছিল যে অন্যান্য খনিজ পাথরের ন্যায় তা তত শক্ত নয়। এবিষয়ে তাঁর ধারণা নির্ভুল ছিল না। কারণ সেরকম কোন পার্থক্য নজরে পড়ে নি। তিনি এই বিষয়ে ভাল করে জানার জন্যেই পাথরগুলিকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। একবার আমি বাটাভিয়াতে আছি, তখন কোম্পানীর মুখ্য কর্ত্তাদের একজন আমাকে সাড়ে পঁচিশ ক্যারাটের একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্মাগ্র হীরক দেখান। জিনিসটি একেবারে খাঁটি। ওটির প্রাপ্তিস্থান সেই সুক্কাদন নদী। আমার মতে ওটির যা ন্যায্য দাম তিনি তদপেক্ষা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অধিক মূল্য দিয়ে কিনেছেন। তবে আমি সর্ব্বদাই শুনতাম যে এই জাতীয় পাথর অত্যন্ত দুর্লভ। বোর্ণিয়োর এই নদীতীরে আমার যাওয়া হয় নি। তার প্রধান কারণ—দ্বীপখণ্ডের রানী বিদেশীদের ওখান থেকে হীরা নিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করেন না। সুতরাং তা নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। অতি সামান্য যেটুকু গোপনে আনা যায় তা বিক্রী হয় বাটাভিয়াতে।

আমাকে হয়ত কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি বোর্ণিয়োর রাজার কথা উল্লেখ না করে কেবল রানীর প্রসংগ কেন তুললাম। তার কারণ, এই রাজ্যে নারীর হাতেই থাকে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা। পুরুষের কোন শাসনাধিকার নেই। কেননা, সে দেশের জনসমাজ রাজপদে প্রকৃত একজন উত্তরাধিকারীকে পেতে চান। পুরুষরা ওখানে নিজেদের সন্তান সম্বন্ধে কোন চিন্তা ভাবনা করেন না। মহিলারা নিজেদের সন্তান সম্পর্কে বিশেষ সচেতন। এই জন্যেই নারীকে শাসনাধিকার দিতে সকলে আগ্রহী। রানীই প্রধান। তাঁর স্বামী প্রজামাত্র। স্ত্রীরূপে রানী তাঁকে যেটুকু অধিকার দিতে প্রস্তুত, তিনি সেইটুকুই মাত্র লাভ করে সন্তুষ্ট থাকেন। তার বেশী কিছু আশা করেন না।

অধ্যায় আঠার

খনিতে হীরক ওজন করার পদ্ধতি, প্রচলিত বিভিন্ন রকমের সোনা ও রূপা। ভ্রমণের রাস্তা ঘাট। হীরার মূল্য নির্দ্ধারণের রীতি নীতি।

আমি এখন হীরকের ব্যবসা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দিতে চাই। আমার বর্ণনা পাঠকদের কাছে দুর্ব্বোধ্য হবে না আশা করি। আমার মনে হয় এই বিষয়ে ইতিপূর্বে আর কেউ কিছু লেখেন নি। আমি প্রথমে বলবো এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রকার বাটখারার কথা।

রম্‌ল্‌কোটার খনিতে ১¾ ক্যারাট অর্থাৎ সাত গ্রেণ ধরে ওজন করার প্রথা। কোলার খনিতেও এই একই ধারায় ওজন গ্রহণের কাজ চলে। বাংলাদেশে সোমেলপুরের খনিতে ওজন হয় রতি হিসেবে। এক রতি ৩½ গ্রেন অথবা এক ক্যারাটের ⅞ ভাগের সমান। শেষোক্ত ওজন প্রথাটি মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত।

গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যে ওজন গ্রহণের যে মাধ্যম তা ১⅛ ক্যারাটের সমতুল্য। পর্তুগীজরা ওজন করেন পাঁচ গ্রেণ মাত্রা ধরে।

ভারতে হীরা ক্রয় বিক্রয়ের কাজ যে জাতীয় টাকা কড়ির মাধ্যমে হয় এখন তার বিবরণ দেয়া যাক।

প্রথমতঃ বাংলাদেশের যে রাজার কথা আমি বলেছি তাঁর রাজ্যে পাওনা মেটানো হয় টাকা দ্বারা। কারণ রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত রমলকোটার নিকটবর্তী দু'টি খনিতে নতুন এক প্রকার স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন। সেই মুদ্রা রাজার স্বনামে প্রবর্তিত। মুঘল সম্রাটের সংগে এ বিষয়ে কোন সম্পর্ক নেই। নতুন মুদ্রা সর্বদা সমান মূল্য বহন করে না। কখনও একটি মুদ্রার মূল্যমান ৩½ টাকা। আবার কোন সময় তার কিছু বেশী কি কম। এই বিভিন্নতা ঘটে রাজ্যে ব্যবসার অবস্থা ও উত্থান পতনের ফলে। তদনুসারে মুদ্রা বিনিময় কারীরা সুলতান ও সুবাদারের সংগে বন্দোবস্ত করে কাজ চালান।

গোলকুণ্ডা সুলতানের অধিকারভুক্ত কোলার খনিতে মূল্য প্রদান হয় বিজাপুর সুলতানের মুদ্রার সমতুল্য নতুন স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা। তবে কোলারে শতকরা এক থেকে চার ভাগ অধিক মূল্য বা লভ্যাংশ দিতে হয় কিনবার

সময়। কারণ তাদের মুদ্রার সোনা উন্নত পর্য্যায়ের। সেই খনিতে ব্যবসায়ীরা অন্য কোন মুদ্রা গ্রহণ করেন না।

এই সকল স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করেন ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানী তাদের নিজ নিজ ফ্যাক্টরীতে। এই কাজের জন্যে তাঁরা রাজার অনুমতি আদায় করেন কখনও পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা, কখনও বা জোর পূর্ব্বক। ইংরেজদের তুলনায় ওলন্দাজগণের মুদ্রা নির্মাণে শতকরা এক দুই অংশ অধিক ব্যয় হয়। কারণ তাদের মুদ্রা উৎকৃষ্টতর। খনির কর্মীরাও এই মুদ্রাই পছন্দ করেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ী কিছু ভুয়া সংবাদ পান যে খনিতে কর্ম্মরত ব্যক্তিরা অতি অমার্জিত এবং প্রায় বর্বর বললেও চলে। তাছাড়া গোলকুণ্ডা ও খনির অন্তবর্ত্তী রাস্তা অত্যন্ত বিপদজনক। সুতরাং ব্যবসায়ীরা গোল-কুণ্ডাতেই থাকেন। সেখানে খনির মালিকদের প্রতিনিধিরা অপেক্ষা করেন। তাঁদের কাছে বিক্রয়ের জন্যে হীরক পাঠানো হয়। মূল্য প্রদানের কাজ চলে অতি পুরাতন স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারা। তা বহু শতাব্দী পূর্বে নির্মিত এবং লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত। মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষে যে সকল রাজা মহারাজারা রাজত্ব করেছেন তাদের সময়কার মুদ্রা। এই সকল প্রাচীন মুদ্রার মূল্যমান ৪½ টাকা, অর্থাৎ নতুনের তুলনায় এক টাকা বেশী। এই মুদ্রায় কিন্তু সোনা বেশী থাকে না। কাজেই ওজনে ভারি নয়।

আমি এর কারণ বিশ্লেষণ না করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে না। বিনিময় কর্মচারী অর্থাৎ পোদ্দার রাজাকে প্ররোচনা দিয়ে পুরোনা মুদ্রাকে নতুন করে গঠন করার ব্যবস্থা করেন না। এই বাবদ উক্ত কর্মচারী রাজাকে মোটা অংকের অর্থ প্রদান করেন। তার কারণ, তিনি পরে সেই পুরাতন মুদ্রা বাজারে চালিয়ে প্রভূত লাভ করার অবকাশ পান। ব্যবসায়ীরা কখনও সেই স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়কারী দ্বারা পরখ না করিয়ে গ্রহণ করেন না। কতক মুদ্রার সীলমোহর হয়ত উঠে গিয়েছে। কিছু সংখ্যক নিম্নপর্য্যায়ের, বাকি কিছু হয়ত ওজনে ঠিক নেই। অতএব ভালভাবে যাচাই না করে গ্রহণ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা। ফেরত দিতে গেলেও প্রচুর ঝামেলা ঝঞ্ঝাট। তখন বিনিময়কারীকে পরখ করার জন্যে যা পারিশ্রমিক দিতে হয়েছে তদুপরি আরও শতকরা পাঁচ কি ছয় পর্যন্ত ঘাটতি দিতে হবে। খনি কর্মীরাও এই কারণে বিনিময়কর্তাকে না দেখিয়ে তা গ্রহণ করেন না। তিনি যাচাই করে মতামত প্রদান করার পরে তা গ্রহণ বর্জনের প্রশ্ন ওঠে। এ জন্যে

তিনিও সামান্য কিছু লভ্যাংশ রাখেন। এই কাজে সময় বাঁচানোর জন্যে একটি প্রথা আছে। এক হাজার, দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রার কিছু ক্রয় বিক্রয় হলে তা প্রথমে পোদ্দারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন তিনি নিজের পাওনাটা বুঝে নিয়ে মুদ্রাগুলিকে পরীক্ষা করে একটা ব্যাগে পুরবেন এবং তার মুখ সীলমোহর দিয়ে বন্ধ করে দেবেন। তারপর টাকার মালিক হীরক কিনে তা কোন ব্যবসায়ীকে যদি দিতে চান তাহলে ব্যাগটি পোদ্দারের কাছে নিয়ে এসে তিনি নিজে সীল দেখে বলে দেবেন যে মুদ্রাগুলি পরীক্ষিত এবং কিছু নিকৃষ্ট মুদ্রা পাওয়া গেলে তার জন্যে তিনি দায়ী হবেন।

মূল্য গ্রহণ ব্যাপারে খনির লোকেরা মুঘল সম্রাট ও গোলকুণ্ডার সুলতানের মুদ্রা গ্রহণ করেন নির্বিবাদে। এই দুই শাসকের মধ্যে সদ্ভাব থাকাতে উভয়ের মুদ্রায় কোন প্রভেদ নেই।

সাধারণভাবে যা মনে হয় তদপেক্ষা ভারতবাসীদের বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার মাত্রা ঢের বেশী। স্বর্ণমুদ্রাগুলি অতি ক্ষুদ্র। মোটা ধরণের কড়ে আংগুলের নখের মত আকৃতির। সুতরাং তার কোন অংশে কিছু কাট ছাট করলে তা সহজেই নজরে পড়বে। এ জন্যে মুদ্রার অভ্যন্তর ভাগে ছোট ছোট ছিদ্র করে তা থেকে স্বর্ণ রেণু বের করে নেয়া হয়। সেই রেণুর মূল্যেও নেহাৎ কম হয় না। ছিদ্রকে এমনভাবে নিপুন কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হয় যে মনেই হবে না যে কেউ তাকে স্পর্শ করেছে। গ্রাম অঞ্চলে অথবা নদীতে খেয়া পারাপারের সময় মাঝিকে একটি রূপার টাকা দিলে তারা তখুনি ওটিকে আগুনে ফেলে দেবেন। আগুনে পুড়ে তা সাদা থাকলে গ্রহণযোগ্য। কালো হয়ে গেলে একেবারে বাতিল। ভারতবর্ষের রূপা সাধারণতঃ অতি উচ্চ পর্যায়ের। ইউরোপের আমদানী রৌপ্য মুদ্রাকে তারা আবার টাকশালে পাঠিয়ে নতুনরূপে গঠন করে আনেন। অনেকে মনে করেন (আমার প্রথম যাত্রার জনৈক ব্যবসায়ী এই প্রসংগ তুলে আমার মনে বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করেছিলেন) যে খনি অঞ্চলে মশলা, তামাক, আয়না ইত্যাদি ও অন্যান্য আরও সাধারণ জিনিসকে হীরকের সংগে বিনিময় করলে পূর্ব বর্ণিত অবস্থার প্রতিবিধান হতে পারে। আমার মনে হয় তারা আরও অধিকতর রূপে প্রতারিত হন। আমি তার প্রমাণও পেয়েছি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে খনিতে যাঁরা হীরার ব্যবসা চালান তাদের প্রয়োজন হোল উত্তম সোনা সংগ্রহ করার এবং তা উৎকৃষ্টতর হলে আরও ভাল হয়।

এখন খনিতে যাবার রাস্তাঘাট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। আধুনিক লেখকদের বর্ণনায় মনে হবে সেই রাস্তা ঘাট অত্যন্ত বিপজ্জনক, দুরূহ এবং বাঘ সিংহ ও বর্ব্বর মানুষে অধ্যুষিত। কিন্তু আমি তা দেখেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের। আমি বরং দেখেছি যে কোথাও কোনও হিংস্র পশু নেই। আর আঞ্চলিক অধিবাসীরা বিদেশীদের প্রতি যথেষ্ট সদিচ্ছা ও ভদ্রতা পোষণ করেন।

গোলকুণ্ডা সম্পর্কে বলা যায় যে স্থানটির অবস্থান প্রসংগে বিশেষ কিছু জানার নেই। মানচিত্রের সাহায্যে যা জানা যায় প্রকৃত অবস্থানের সংগে তার কোন মিল নাই। মুখ্য খনি অঞ্চল রমলকোটা ও গোলকুণ্ডার মধ্যবর্ত্তী রাস্তা সম্বন্ধে স্বল্পই জানা যায়। আমি যে রাস্তা ধরে গিয়েছিলাম তা হচ্ছে এই—এই দেশের স্থানক দূরত্বের পরিমাপ হয় ক্রোশ ধরে। ফরাসী চার লীগের সমতুল্য হোল এক ক্রোশ। গোলকুণ্ডা থেকে যাত্রা করে কৃষ্ণানদী হয়ে রসলকোটের খনি পর্য্যন্ত দূরত্ব সতের ক্রোশ। কৃষ্ণানদী ও বিজাপুরের সীমানা নির্ধারণ করে দিচ্ছে।

গোলকুণ্ডা ও কোলার খনির মধ্যে ব্যবধান হোল ১৩$\frac{1}{2}$ ক্রোশ।

আমি এখন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা দেব যা ইউরোপে সুবিদিত নয়।

তিন থেকে একশত ক্যারাট ওজনের হীরার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ রীতি আলোচনার বিষয়। তিন ক্যারাটের কম ওজনের হীরার কথা বলবো না। কেননা, তার দামের কথা যথেষ্ট সুবিদিত।

হীরা ক্রয়ের সময় সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার যে জিনিসটির ওজন কত এবং তা খাঁটি কিনা। আরও দেখতে হবে পাথরটি মোটা, চৌকো, কি রকমের এবং কোণগুলি নিখুঁত কিনা। পাথরের জেল্লা হবে চমৎকার সাদা ও ঝকঝকে, কোন দাগ চিহ্ন ও চির ফাটা থাকবে না। অনেক পল কাটা পাথরকে বলা হয় "একটি গোলাপ"। আরও দেখা উচিত যে পাথরটি গোলালো অথবা ডিম্বাকার কি রকম। পাথরটির গড়ন ছড়ানো না স্তূপাকার, জেল্লা সব দিকে সমান কিনা, আর তাতে কোন দাগ ফাটাফুটো না থাকে তাও দেখে নিতে হবে।

আলোচ্য গুণ সম্পন্ন এক ক্যারাটের একটি হীরার মূল্য এগার পাউণ্ডের উপরে। অনেক সময় বেশীও হয়। একই পর্যায়ের নিখুঁত পাথর যদি

বারো ক্যারাটের হয় তাহলে তার মূল্য নির্ধারিত হয় নিম্নোক্ত প্রথায়। হিসেবটি আমাদের লিভর্‌ মুদ্রায় করলে এই দাঁড়ায়। বারো সংখ্যক বারো একশত চুয়াল্লিশ। এক ক্যারাটের দাম লিভার ১৫০ মুদ্রা বা কখনও বেশী। সুতরাং বার ক্যারাটের একটি হীরার মূল্য লিভরে হয়—১২ × ১২ × ১৫০ = ২১৬০০ লিভর।

তবে নিখুঁত হীরার মূল্য স্থির হয় বিশেষ নিয়মে, অর্থাৎ এক ক্যারাটের ওজন ধরেই করার প্রথা।

যেমন, একখণ্ড পনের ক্যারাটের হীরা। নিখুঁত নয়। জেল্লা নিম্ন পর্যায়ের। আকারেও নিকৃষ্ট। সারা গায়ে দাগ ও চির্‌। এই ধরণের এক ক্যারাটের একটি পাথরের দাম ষাট, আশী কি বেশী হলে একশত লিভরের বেশী হয় না। তাহলে পনের ক্যারাটের ক্ষেত্রে পনের গুণ বেশী ধরে হিসেব করলেই চলে। এই হিসেব অনুসারে বিচার করলে বোঝা যায় যে উত্তম ও নিখুঁত আর ত্রুটিযুক্ত দুই প্রকার পাথরের দাম কত পার্থক্য।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম দু'টি হীরকের একটি আছে এশিয়াতে মুঘল বাদশার হাতে। আর দ্বিতীয়টির মালিক হলেন ইউরোপের তাসকানির ডিউক। অতি চমৎকারভাবে তা কাটা ও পালিশ করা।

মহান মুঘল বাদশার হীরকটির ওজন ২৭৯$\frac{9}{16}$ ক্যারাট। সেটির জেল্লা নিখুঁত, আকার উত্তম। তবে সামান্য একটু দোষ আছে। পাথরটির নীচের দিকে কিনারায় একটি ছিদ্র।

তাসকানির ডিউকের হীরাটির ওজন ১৩৯$\frac{1}{2}$ ক্যারাট। অতি স্বচ্ছ এবং উত্তম আকৃতির। চারদিকে পলকাটা। খানিকটা লেবুর রঙের মত আভা-যুক্ত। তার এক এক ক্যারাটের মূল্য আমার মতে ১৩৫ লিভর মুদ্রা। অতএব গোটা পাথরটির দাম হবে দুই মিলিয়ন, ছয়শত আট হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ লিভর।

খনির লোকদের ভাষায় এই পাথরকে বলা হয় 'ইরি' (হীরা)। তুর্কী, পারসীক ও আরবী ভাষায় বলে 'থল্‌মস্‌'। ইউরোপীয় ভাষা সমূহে ডায়মণ্ড ব্যতীত আর কোন শব্দের প্রচলন নেই।

খনি অঞ্চলে আমি কয়েকবারই যাতায়াত করেছি। অল্প কথায় এখানে আমি যা বিবৃত করলাম তা আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। ঘটনাচক্রে আমার বর্ণনা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যদি অন্য কেউ এই বিষয়ে কিছু লিখে থাকেন বা বর্ণনা করেছেন এমন হয় তবে তা আমার প্রদত্ত রিপোর্ট থেকেই সংগৃহীত।

অধ্যায় উনিশ

রঙীন পাথর ও তার আকর।

প্রাচ্যদেশে মাত্র দু'টি স্থানে রঙীন পাথর পাওয়া যায়। তাহোল— পেগুরাজ্য ও সিংহল দ্বীপ। প্রথমটি পার্বত্য প্রদেশ। স্থানটি সিরেন (আভা?)। বারো দিনের যাত্রা পথের ব্যবধানে এবং উত্তর মুখো। পর্বতটির নাম কেপ্‌লান (কিয়াতপিয়েন)। স্থানীয় খনিতেই অধিকাংশ চুনী, স্পিনেল বা চুনীর জননী, হলদে তোপাজ, নীল ও সাদা স্যাফায়ার, হায়াসিথ, এমেথিস্ট এবং আরও নানা প্রকার বিভিন্ন রঙের পাথর পাওয়া যায়। সুদৃঢ় পাথরের সংগে অন্য রকমের নরম পাথর যা পাওয়া যায় তাকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'বচন'। তা বিশেষ মূল্যবান নয়।

পেগুর রাজা যে সহরে বাস করেন তার নাম সিরেন। রাজ্যের বন্দরটির নাম আভা। আভা থেকে সিরেনে যেতে হলে বড় চওড়া নৌকাতে চড়তে হয়। সময় ব্যয় হয় ষাট দিন। বনভূমির জন্যে স্থলপথে যাওয়া চলে না। সেই বন জঙ্গল বাঘ সিংহ ও হাতীতে পরিপূর্ণ। সমগ্র পৃথিবীতে এই স্থানটি দরিদ্রতম। রুবি রত্ন ছাড়া ওখানে আর কিছু নেই। তাও পরিমানে তেমন প্রচুর নয়। মূল্য বাবদ বছরে উল্লেখযোগ্য কিছু অর্থ আয় হয় না।

সংগৃহীত প্রস্তররাজি মধ্যে উত্তম গুণসম্পন্ন তিন চার ক্যারাটের জিনিস পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ওখানকার জিনিস অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বিধি নিষেধ অতি কঠোর। রাজা যে জিনিস পরখ করে দেখেন নি তা ভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া চলে না। যা উৎকৃষ্ট তা তিনি রেখে দেন। আমার সমস্ত ভ্রমণ যাত্রায় ইউরোপ থেকে এশিয়াতে চুনী রত্ন নিয়ে প্রচুর লাভ করেছি। ভিনসেন্ট ল্য ব্লাঙ্ক বর্ণনা দিয়েছেন যে রাজার প্রাসাদে ডিমের মত সাইজের রুবি তিনি দেখেছেন। সে বিষয়ে আমার কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

উত্তম পর্যায়ের কিছু চুনীর দাম নিম্নরূপ। আমার বিভিন্ন ভ্রমণ যাত্রায় আমি মসলিপত্তন ও গোলকুণ্ডায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম। তখন ব্যবসায়ীদের তা বিক্রী করতে দেখেছি। চুনীরত্ন বিক্রী হয় রতি হিসেবে। এক রতি ৩$\frac{1}{2}$ গ্রেণ বা $\frac{7}{8}$ ক্যারাটের সমতুল্য। মূল্য দান হয় পুরাতন স্বর্ণ

মুদ্রাতে। সেই মুদ্রা সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

ছয় রতি ওজনের একটি নিখুঁত চুনীর জন্যে যে কোন দাম আশা করা যায়। ওদেশে যাবতীয় রঙীন পাথরকেই চুনী বলা হয়। কেবল রঙের পার্থক্য। পেগুর ভাষাতেও তদনুরূপ। যেমন, স্যাফায়ারকে বলে নীল রুবি, এসেথিষ্টকে বেগুনী, আর তোপাজকে হলদে রঙের চুনী বলা হয়। অন্যান্যগুলিও রঙের দিকেই কেবল ভিন্ন।

বিক্রেতারা নিজেদের লভ্যাংশ সম্বন্ধে এত সচেতন ও সতর্ক যে খুব ভাল জিনিস হলেও কাউকে তারা প্যাকেট খুলে চুনীরত্ন দেখাবেন না। দেখবার আগে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে জিনিস না কিনলেও বিক্রেতাকে সামান্য কিছু উপহার, যেমন একটি পাগড়ী বা একটি কোমরবন্ধ দিতে হবে। তবে কেউ যদি তাদের সংগে অতি উদার ব্যবহার করেন তাহলে তাদের সমস্ত ভাণ্ডার খুলে দেখাবেন। তার ফলে কিছু ক্রয় বিক্রয়ের কাজও হয়ত চলবে।

প্রাচ্য খণ্ডের আর যে স্থানটিতে চুনী ও অন্যান্য রঙীন পাথর পাওয়া যায় তাহল সিংহল দ্বীপের একটি নদী। দ্বীপের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি পর্বত নদীটির উৎস স্থল। বর্ষাকালে নদীবক্ষ অতি মাত্রায় স্ফীত হয়। তিন চার মাস পর সেই জলোচ্ছ্বাস হ্রাস পায়। তখন দরিদ্র জন সমাজ সেই নদী-বক্ষের বালুরাশিতে অনুসন্ধান চালিয়ে চুনী, স্যাফায়ার ও তোপাজ সংগ্রহ করেন। এই নদীতে প্রাপ্ত পাথর পেগুর পাথর থেকে ঢের বেশী সুন্দর ও স্বচ্ছ।

একটি বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি। যে পর্বতশ্রেণী পেগু থেকে ক্যাম্বোডিয়া রাজ্য পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে তার বিশেষ কয়েকটি অংশে চুনী পাওয়া যায়। সেখানে বেশী পাওয়া যায় 'বালাস' চুনী আর স্পিনেল, স্যাফায়ার ও তোপাজ। সেই পর্বতমালায় স্বর্ণখনিও আছে। রেউ চিনির গাছও জন্মায় সেখানে। এই গাছের অতি মাত্রায় প্রসিদ্ধি। কারণ এশিয়ার অন্যান্য স্থানের গাছের মত তা দ্রুত নষ্ট হয় না।

ইউরোপেও দু'টি জায়গায় রঙীন পাথর উৎপন্ন হয়। স্থান দু'টি মুখ্যতঃ বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরী। বোহেমিয়ার একটি খনিতে নানা আকারের চকমকি পাথর পাওয়া যায়। তার মধ্যে কতকগুলির আকার ডিমের মত। কতক

গুলির সাইজ হাতের মুঠোর ন্যায়। কিছু পাথর ভাঙ্গলে তা থেকে চুনীরত্ন বেরোয়। আর তা পেগুতে প্রাপ্ত চুনীর মতই সুন্দর ও সুদৃঢ়। একটি দিনের কথা মনে পড়ে। আমি তখন হাঙ্গেরীর ভাইসরয়ের সংগে প্রাগে ছিলাম। আমি সেই সময় তাঁর অধীনে কাজ করতাম। টেবিলে বসার মুখে তিনি হাত ধুয়েছিলেন ফ্রীতল্যাণ্ডের (ফীনল্যাণ্ড ?) ডিউক জেনারেল ওয়ালেন-স্টানের সংগে একত্রে। তিনি জেনারেলের হাতে একটি চুনীরত্নের আংটি দেখে খুব প্রশংসা করেন। পরে শুনলেন যে সেই পাথরের খনি বোহে-মিয়াতে। তখন তিনি আরও প্রশংসামুখর হয়ে উঠলেন। আর ভাইসরয়ের যাত্রাকালে তিনি তাঁকে একশত খণ্ড চকমকি পাথর উপহার দিলেন একটি ঝুড়িতে করে। আমরা হাঙ্গেরীতে ফিরে গেলে ভাইসরয় সমস্ত পাথর ভেঙ্গে টুকরো করালেন। একশত চকমকি পাথরের মধ্যে দু'টি মাত্র এমন ছিল যার মধ্যে চুনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তার একটি পাঁচ ক্যারাট ওজনের, আর দ্বিতীয়টি এক ক্যারাটের।

হাঙ্গেরীর একটি খনিতে 'ওপাল' পাথর পাওয়া যায়। পৃথিবীর আর কোথাও তা পাওয়া যায় না।

টারকুইজ উৎপন্ন হয় একমাত্র পারস্যে। তা পাওয়া যায় দু'টি খনিতে। একটির নাম "প্রাচীন পাহাড়"। মেসেদের উত্তর পশ্চিমদিকে তিন দিন যাত্রাপথের ব্যবধানে তার অবস্থিতি। নিশাপুর নামে একটি বড় সহরের কাছাকাছি। আর একটির নাম "নতুন"। পূর্বোক্তটির সংগে এর দূরত্ব পাঁচ দিনের যাত্রাপথ। নতুন খনির পাথর নিকৃষ্ট ধরণের নীলরঙের। একটু খানি সাদাটে ভাবের। খুব পছন্দসই জিনিস নয়। অল্প মূল্যে যত ইচ্ছা কেনা যায়। পারস্যাধিপতি বহু বছর পূর্বে 'প্রাচীন পাহাড়ে' পাথর কাটার কাজ অন্য লোকদের পক্ষে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর নিজের জন্যেই কেবল তা উন্মুক্ত। এর কারণ ওদেশে জরির কাজ করেন যে স্বর্ণকারগণ তারা ব্যতীত আর কোন লোক সোনার কাজ করেন না। তারা আবার সোনার উপরে মীনার কাজ করতে পারেন না। কোন নকসা বা খোদাইএর কাজেও তারা অনভিজ্ঞ। সুতরাং ওখানে তরবারী, ছুরিকা ও অন্যান্য জিনিসের হাতলে অলঙ্করণের জন্যে প্রাচীন পাহাড়ের টারকুইস্ পাথরই ব্যবহৃত হয় এনামেলের কাজের পরিবর্তে। এই পাথরকে কেটে কেটেই পুষ্প পত্রাদির নকসা এবং আরও নানাবিধ রূপাকৃতি তৈরী করে নিতে হয়। মণিকারগণই

তা করেন। জিনিসগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয় এবং তা করতে খাটুনিও যথেষ্ট। তবে নকসার কল্পনায় কোন নৈপুন্য বা শিল্পবোধ নেই।

মরকতমণি প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে অনেকের মনেই একটি পুরানো ভ্রান্ত ধারণা আছে যে উক্ত পাথর মূলতঃ প্রাচ্য দেশেই পাওয়া গিয়েছিল। (আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে এ বিষয়ে অন্য চিন্তা কেউ করতে পারেননি)। তার ফলে অদ্যাপি অধিকাংশ মণিকার ও কারুকৃৎরা একটি অত্যুজ্জ্বল মরকত মণি দেখলে তাকে একটু নিম্ন পর্য্যায়ে নামিয়ে বলতে চান যে ওটি প্রাচ্য দেশীয় রত্ন (অথচ পূর্ব্বদেশে ইহা কখনও উৎপন্ন হয়নি)। আমার বলতে বাধা নেই যে আমাদের মহাদেশে এমন কোন জায়গা খুঁজে পাইনি যেখানে এই জাতীয় মণিরত্ন উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমি এটাও নিশ্চিত জেনেছি যে পূর্ব্বাঞ্চলের মূল ভূখণ্ডে বা দ্বীপময় অংশে কোথাও এ জিনিস কখনও জন্মায়নি। আমার সমুদয় ভ্রমণ যাত্রায় আমি বিশেষভাবে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু কেউ বলতে পারেননি যে এশিয়ার কোন জায়গাটিতে এই জিনিস জন্মায়। তবে একথা সত্য যে আমেরিকা আবিষ্কৃত হলে কিছু পরিমাণ খরখরে ধরণের অমার্জিত পাথর প্রায়ই দক্ষিণ সাগরের পথ ধরে পেরু থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যাওয়া হোত। সেখান থেকে আবার ইউরোপে চালান যেত। সেজন্যে তাকে 'প্রাচ্য দেশীয়' আখ্যাদানের কোন যৌক্তিকতা নেই। কিম্বা এর উৎসস্থল পূর্ব্ব দেশে এই মতেরও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। এই জাতীয় আমদানীর ফলে সারা ইউরোপে মরকত মণির কিছু মাত্র অভাব দেখা যায়নি। এখন সেই প্রথা বন্ধ হওয়ার ফলে সমস্ত জিনিস চলে যায় উত্তর সাগরের (আটলাণ্টিক) পথ ধরে স্পেনে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আমি দেখেছি যে ফ্রান্সে যে দরে এমারেল্ড বিক্রী হয় তদপেক্ষা শতকরা বিশ ভাগ কম মূল্যে ভারতবর্ষে তা সংগ্রহ করা যায়।

আমেরিকা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নৌ চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকাবাসীরা দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছোলে বাংলাদেশ, আরাকান, পেগু, গোয়া, এবং আরও নানাস্থানের অধিবাসীরা সব রকম কাপড় চোপর ও প্রচুর পালিশ করা রত্ন পাথর, যেমন হীরা, চুনী এবং তৎসহ সোনারূপার জিনিস, রেশমী বস্ত্র, পারসীক গালিচা নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হতেন। তবে একটি বিষয় জানা দরকার যে তারা সরাসরি

আমেরিকানদের কাছে কিছুই বিক্রী করতে পারতেন না। তাদের বিক্রী করার সুযোগ হোত কেবলমাত্র ম্যানিলাবাসীদের কাছে। তারপর সেই জিনিস প্রথম বিক্রেতারা স্থান ত্যাগ করলে আবার বিক্রয় হয়। তদনুরূপ কেউ যদি উত্তর সাগরের রাস্তা ধরে গোয়া থেকে স্পেনে যাবার অনুমতি লাভ করেন, তাহলে তাকে ফিলিপাইন পর্য্যন্ত শতকরা আশী অথবা একশত দিতে হবে টাকাকড়ি প্রেরণের জন্যে। আর কিছু ক্রয়ের জন্যে অনুমতি না পেলেও তা দিতে হবে। এই রীতি আরও চলে ফিলিপাইন ও নবস্পেনের অন্তবর্ত্তী যাত্রা পথে।

[এই ঘটনা হোত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ আবিষ্কৃত হবার পূর্বে। কারণ তখন ব্যবসায়ীরা এই সুন্দর রাস্তা অতি দুরূহ উপায়ে অতিক্রম করে ইউরোপে আসতেন। অনুৎকৃষ্ট জিনিসপত্র দেশে থাকতো। আর বাকী সব চলে যেত ইউরোপে]।

অধ্যায় কুড়ি

মুক্তার কথা এবং তা কোথায় উৎপন্ন হয়

মুক্তা উৎপন্ন হয় পূর্ব্ব ও পশ্চিম সাগরে। পাঠকের সন্তুষ্টির জন্যে এবং এই বিষয়ে কিছু অনুল্লিখিত থাকে এই অশংকায় আমি আমেরিকা ভ্রমণ না করলেও যে সকল স্থানে মুক্তা সংগৃহীত হয় তাদের সকলের কথাই বলবো। আর তা শুরু করবো প্রাচ্য দেশকে ধরেই।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে পারস্য উপসাগরের বাহরেন দ্বীপকে ঘিরে একটি মুক্তা সংগ্রহের কেন্দ্র আছে। ওটির মালিকানা পারস্য সম্রাটের। ওখানে একটি উত্তম কেল্লা আছে। তার মধ্যে তিনশত সৈন্যের একটি বহর রয়েছে। এই দ্বীপের পানীয় জল এবং পারস্য উপকূলের ব্যবহার্য্য জল নোনা। স্বাদও বিকৃত। স্থানীয় অধিবাসীরাই কেবল তা পান করতে পারেন। বিদেশীদের পক্ষে উত্তম জল সংগ্রহের কাজ ব্যয় বহুল। কারণ তা সংগ্রহকারীদের সাগরের মধ্যে আধ লীগ আন্দাজ এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বীপভূমি থেকে সেস্থান প্রায় দুই লীগ দূরে। নৌকাতে করে যারা জল সংগ্রহের জন্যে যান, তারা সংখ্যায় থাকেন পাঁচ কি ছয় জন। দু'জন লোক সাগর তলে ডুব দিয়ে জল তোলেন। তাদের কোমর বন্ধে দু'টি চারটি বোতল ঝোলানো থাকে। অতল সমুদ্রের গহ্বরে গিয়ে জল ভর্ত্তি করে বোতলের মুখ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে ফেলতে হয়। সমুদ্রের তলদেশে দুই তিন ফুট গভীরে জল উৎকৃষ্ট তো বটেই, বরং পানীয় হিসেবে তাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা চলে। জল সংগ্রহের জন্যে যারা সমুদ্র গহ্বরে নেমে যান তাদের সংগে নৌকারোহীদের যোগ সংযোগ থাকে একটি দড়ির মাধ্যমে। নীচেকার লোক দড়িতে টান দিলে নৌকারোহীরা বুঝতে পারেন যে তাদের কাজ শেষ হয়েছে. এবার টেনে তুলতে হবে।

পর্তুগীজরা অর্মাস ও মাসকাট দখল করার পরে কোন নৌকা সাগরে কিছু সংগ্রহের জন্যে নামলে তাকে তাঁদের অনুমতি বা অনুজ্ঞাপত্র সংগ্রহ করতে হয়। সেজন্যে পনেরটি আব্বাসী মুদ্রা জমা দেবার প্রথা ছিল। অনুজ্ঞাপত্র সংগ্রহ না করে যারা সমুদ্রে নামতেন তাদের ডুবিয়ে দেবার জন্যে বহু সংখ্যক দুই মাস্তলের ছোট জাহাজ নিযুক্ত রাখা হোত। তারপর

আরবগণ মাসকাট্ পুনর্দখল করলো। উপসাগরের পর্তুগীজদের সর্বময় কর্তৃত্ব ও আর অক্ষুণ্ণ রইল না। এমতাবস্থায় যারা সমুদ্রে জিনিস সংগ্রহ করতে যেতেন তাদের কাজ সফল হোক কি, না হোক, মাত্র পাঁচটি আবাসী মুদ্রা প্রদান করলেই চলতো। আর তা পেতেন পারস্যের সম্রাট। ব্যবসায়ীরা প্রতি হাজার ঝিনুকের জন্যে সামান্য কিছু দিতেন সেই রাজাকে।

মুক্তা সংগ্রহের দ্বিতীয় কেন্দ্র বাহরেণের বিপরীত দিকে আরবীয়-ফেলিকস উপকূলে। স্থানটি এল্-কাতিফ্ সহরের সন্নিকটে। এই জায়গাটি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ আরবের শাসক শাসন করেন।

ওখানে সংগৃহীত মুক্তার অধিকাংশ বিক্রী হয় ভারতবর্ষে। কারণ ভারতীয়রা আমাদের মত খুঁতখুঁতে স্বভাবের নন। যা কিছু উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট, নিটোল রূপের গোলাকার বা বিকৃত গড়নের সব সেখানে চলে। প্রতিটি জিনিসের মূল্য স্বতন্ত্র এবং সমস্তই বিক্রীর যোগ্য। কিছু পরিমাণে যায় বসোয়াতে। পারস্য ও রাশিয়াতে যা যায় তার বিক্রয় কেন্দ্র বন্দর—কংগোতে। অর্মাস থেকে তার দূরত্ব দু'দিনের যাত্রা পথ। আমি যে সকল স্থানের নাম উল্লেখ করলাম সেখানকার এবং এশিয়ার অন্যান্য অংশের লোকেরা সাদা অপেক্ষা হলদে আভার মুক্তা বেশী পছন্দ করেন। শোনা যায় যে ঈষৎ সোনালী আভার মুক্তা কখনও তার জেল্লা হারায় না। কিন্তু শ্বেত-শুভ্র হলে তা ত্রিশ বছরের অধিককাল স্থায়িত্ব লাভ করে না। দেশের উষ্ণ আবহাওয়া এবং মানব দেহের ঘর্ম নিঃসরণের ফলে মুক্তা বিশ্রী ধরণের হলদে ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

অর্মাস উপসাগরের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে এই বিষয়ে আরও কিছু বলতে চাই। তা আমার পারস্য দেশ সম্পর্কিত বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ হবে। বিষয়টি হোল- আরব শাসকের চমৎকার একটি মুক্তা। তিনিই পর্তুগীজদের হাত থেকে মাস্কাট পুনরধিকার করেছেন। তারপর তিনি মাস্কাটের সুলতান ইমেনহেকুট্ নাম গ্রহণ করেছেন। পূর্বে তাঁর নাম ছিল নোবেনুয়ের আসক বিন্-আলী। প্রদেশটি অতি ছোট। তবে আরবীয়—ফেলিক্স্ মধ্যে সর্বোত্তম। সেখানে জনসমাজের প্রয়োজনীয় যা জন্মায় তা হোল, নানা রকমের চমৎকার সব ফল। তার মধ্যে আবার অত্যধিক চিত্তহারী হচ্ছে আংগুর। তার দ্বারা অতি উচ্চাঙ্গের সুরা প্রস্তুত করা যায়। এই রাজার হাতেই আছে পৃথিবীর সুন্দরতম মুক্তা।

সেটি কেবল সাইজের জন্যেই বিখ্যাত নয় অথবা নিখুঁত গোলাকারও নয়। ওজন মাত্র ১২$\frac{1}{16}$ ক্যারাট। কিন্তু এমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ যে তার মধ্যে দিয়ে পুরো আলো ঠিক্‌রে পড়ে।

অর্মাসের বিপরীত দিকের উপসাগর আরবীয় ফেলিক্‌স্‌ থেকে পারস্য উপকূল পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক বারো লীগ প্রশস্ত। আরব ও পারস্যের মধ্যে মৈত্রী ও শান্তির সম্পর্ক থাকায় মাস্‌কাটের রাজা অর্মাসের খানের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন। খান সাহেব তখন রাজাকে বিশেষ জ'াকজমক সহকারে অভ্যর্থনা করেন।

সেই উৎসবে তিনি ইংরেজ, ডাচ ও অন্যান্য সব ফ্রাঙ্কদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমিও ছিলাম নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। উৎসব পর্ব অন্তে রাজা তাঁর গলায় ঝোলানো একটি ছোট থলের মধ্যে থেকে সেই মুক্তাটি বের করে খান ও সমবেত ব্যক্তিদের দেখান। খান সেটি কিনে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। উদ্দেশ্য, পারস্য সম্রাটকে উপহার প্রদান। তিনি মুক্তাটির মূল্য বাবদ দু'হাজার তোমান মুদ্রা দানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা সেটিকে হস্তান্তরিত করতে রাজী হননি। তারপব সাগর পার হওয়ার সময় আমি এমন একজন বেনিয়ানের সংগে পরিচিত হয়েছিলাম যাকে মুঘল সম্রাট উক্ত রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন সেই মুক্তাটি ক্রয়ের প্রস্তাব দানের জন্যে। তিনি নয় হাজার পাউণ্ড মুদ্রা মূল্যদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজা তা গ্রহণ করেননি।

এই বিবরণে মণিরত্ন প্রসংগে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে উৎকৃষ্ট রত্নরাজি কেবল ইউরোপেই কদর পায় না। ইউরোপ থেকে তা এশিয়াতেও যায় প্রচুর পরিমাণে। আমিও একাজ করেছি। দেখেছি যে মূল্যবান পাথর ও মুক্তার সৌন্দর্য সুষমা যদি অসাধারণ হয় তাহলে এশিয়াতে তার কদর হয় অতিমাত্রায়। তবে চীন ও জাপানের কথা ওঠেনা। সেখানে এ জিনিসের কোন কদর নেই।

পূর্বদেশে মুক্তা সংগ্রহের আর একটি কেন্দ্র আছে সিংহল দ্বীপের মানার সহরের নিকটবর্ত্তী সাগরে। সেখানে সংগৃহীত মুক্তাবলী অত্যধিক সুন্দর। সর্বত্র সংগৃহীত মুক্তার মধ্যে নিখুঁত গোলাকার হিসেবে ও জেল্লার দিকে এর জুড়ি নেই। তবে তিন চার ক্যারাটের বেশী ওজনের মুক্তা কচ্চিৎ কখনও পাওয়া যায়।

জাপানের উপকূলেও অতি চমৎকার সাইজ ও রঙের মুক্তা উৎপন্ন হয়। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। তা আবার সংগ্রহ করা হয়না। কারণ, আমি পূর্বেও বলেছি যে জাপানীরা মুক্তা প্রিয় নন।

বাহরেন ও এল্‌কাতিকে প্রাপ্ত মুক্তা যদিও ঈষৎ হলদে আভাযুক্ত তাহলেও তা মানারের মুক্তার মতই কদর লাভ করে। একথাও আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। সমগ্র পূর্বদেশ জুড়ে শোনা যায় যে সেই মুক্তারাজি সুগঠিত ও পরিপক্ক। তার রঙ কখনও পরিবর্তিত হয়না।

আমি এখন পাশ্চাত্য দেশে মুক্তা সংগ্রহের রীতি আলোচনা করবো। কেন্দ্র সমূহ মেক্সিকো উপসাগরের তীরে অবস্থিত। সেখানে পাঁচটি কেন্দ্র আছে। তাদের অবস্থান পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরপর সাজানো।

প্রথমটি কুবাগুয়া দ্বীপের কাছে। তার আয়তন মাত্র তিন লীগ। মূল ভূখণ্ড থেকে দূরত্ব পাঁচলীগ। সাউথ দোমিনিকে থেকে একশত ষাট লীগ দূরে। স্থানটি স্পেন উপদ্বীপে অবস্থিত। অত্যন্ত অনুর্বর জায়গা। কোন জিনিস পাওয়া যায় না। জলের অভাব অত্যধিক। তথাকার বাসিন্দারা মূল ভূখণ্ড থেকে জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হন। প্রতীচ্য খণ্ডে এই দ্বীপটির বিশেষ রকম খ্যাতি। তার কারণ, মুক্তা সংগ্রহের অধিকাংশ কেন্দ্র সেখানে অবস্থিত। তবে ওখানে প্রাপ্ত সর্ববৃহৎ মুক্তা পাঁচ ক্যারাটের বেশী ওজনের হয় না।

দ্বিতীয় সংগ্রহ কেন্দ্র মারগুয়েরাতে অর্থাৎ মুক্তাদ্বীপে। স্থানটি কুবাগুয়ার এক লীগ দূরে। আয়তনে অনেক বড়। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস ওখানে পাওয়া যায়। তবে জলাভাব কুবাগুয়ারই মত। জলের জন্যে যেতে হয় কাদিজের সন্নিকটে কুমানা নদীতে। আমেরিকার পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে এইটি যে বৃহত্তম তা নয়। তবে মোটামুটি প্রধান। ওখানে প্রাপ্ত মুক্তা নিখুঁত ভাব অর্থাৎ স্বচ্ছতা ও আকারে অন্যান্য মুক্তাকে হার মানায়। শেষোক্ত স্থানে সংগৃহীত একটি মুক্তা আমার ছিল। সেটি অতি উত্তম আকারের নাস্‌পাতির মত। ঔজ্জ্বল্যও চমৎকার। ওজন পঞ্চান্ন ক্যারাট। সেটি আমি মুঘল সম্রাটের মাতুল শায়েস্তা খানকে বিক্রী করেছি।

অনেকে শুনে বিস্মিত হন যে মুক্তা ইউরোপ থেকে পূর্বদেশে আমদানী হয়। আর তা প্রচুর পরিমাণে। এর মুখ্য কারণ, পশ্চিমদেশের ন্যায় অত অধিক ওজনের মুক্তা প্রাচ্য অঞ্চলের সংগ্রহ কেন্দ্রে পাওয়া যায় না। বড়

মুক্তার জন্যে ইউরোপের তুলনায় এশিয়ার রাজা মহারাজারা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঢের বেশী উচ্চমূল্য দিয়ে থাকেন। আর তা কেবল মুক্তার জন্যেই নয়। সর্ববিধ মণিরত্নের জন্যেই দিতে প্রস্তুত। বিশেষ করে তা যখন সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়, তখন। তবে হীরার ক্ষেত্রে তা হয় না।

মূল ভূখণ্ডের সন্নিকটে তৃতীয় মুক্তা সংগ্রহ কেন্দ্র আছে কোমোগোতিতে। চতুর্থটি রয়েছে একই উপকূলে রিওদেল হচাতে। পঞ্চম ও শেষটির অবস্থান রিওদেলাহচার ষাট লীগ দূরবর্তী সেণ্ট মার্থাতে।

আলোচ্য তিনটি সংগ্রহ কেন্দ্রে উত্তম ওজনের মুক্তা উৎপন্ন হয়। তবে তার আকার, গড়ন ভালো নয়। রঙ্‌ও সীসার মত আমেজসম্পন্ন এবং মলিন।

পরিশেষে স্কটল্যাণ্ডের মুক্তার কথা আলোচনা করা যাক। ব্যাভেরিয়ার নদীসমূহে প্রাপ্ত মুক্তা দ্বারা কণ্ঠহার তৈরী হয় এবং তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু তাহলেও পূর্বদেশ ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মুক্তার সংগে তার তুলনা হয় না।

মুক্তা সম্বন্ধে আমার পূর্ববর্তী লেখকদের কেউ-ই সম্ভবতঃ একথা লেখেননি যে কয়েক বছর আগে জাপানের উপকূলভাগের একটি বিশেষ অংশে মুক্তা সংগ্রহের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

ওলন্দাজদের সংগৃহীত সেখানকার কিছু মুক্তা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তার রঙ ও জেল্লা অতি চমৎকার। সাইজেও বেশ বড়। কিন্তু গড়ন অসমান। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে জাপানীরা মুক্তাপ্রেমী নন। এই জিনিস সম্বন্ধে তারা আগ্রহী হলে এই অনুসন্ধান উপলক্ষ্য করে সম্ভবতঃ আরও কিছু তীরভূমি ও চড়া আবিষ্কৃত হবে যেখানে আরও উৎকৃষ্ট জিনিস পাওয়া যেতে পারে।

এই পর্যায়টির শেষে মুক্তা সম্বন্ধে আমাকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করতে হবে। আর তা হবে বিভিন্ন মুক্তার রঙ্, জেল্লা সম্পর্কে। মুক্তার কিছু সংখ্যক অত্যন্ত শ্বেত শুভ্র, বাকি কতক হলদে ভাবাপন্ন। কিন্তু হয়ত কালো। সীসার মত রঙেরও অনেক দেখা যায়। শেষোক্তটি পাওয়া যায় কেবলমাত্র আমেরিকাতে। মুক্তার এই প্রকার রঙ হয় সমুদ্র গহ্বরস্থ প্রকৃতির প্রভাবে। পূর্বদেশের তুলনায় ওখানকার সমুদ্র গহ্বর অধিকতর কর্দমাক্ত। স্পেনীয় নৌবহরের একটি মাল বাহী জাহাজে পরলোকগত এম. দ্য. জর্ডিনের

ছয়টি নিখুঁত রূপের গোলাকার মুক্তা ছিল। তা জেট্ পাথরের মত কালো। সব শুদ্ধ তার ওজন ছিল বারো ক্যারাট। তিনি তা আমাকে দিয়েছিলেন অন্যান্য জিনিসের সংগে পূর্বাঞ্চলে নিয়ে যাবার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল যদি বিক্রী করা যায়। কিন্তু আমাকে তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ সেই সম্পর্কে কারোর কোন আগ্রহ দেখা যায়নি।

মুক্তার রঙ হলদে হওয়ার মূলে কিছু কারণ থাকে। তা হচ্ছে যে জেলেরা ঝিনুক বিক্রী করেন স্তূপাকার করে। ব্যবসায়ীরা তা কিনে চৌদ্দ পনের দিন সময় কাটিয়ে দেন। তারপর মুক্তা বের করার ব্যবস্থা হয়। ইতিমধ্যে শুক্তির মুখ হয়ত নিজে থেকেই খুলে যেতে থাকে। সেই সময়ক্ষেপের ফলে ঝিনুকের মধ্যে যে জল থাকে তা শুকিয়ে যায়। যদি সামান্য একটু থেকেও যায় তা বিকৃত ও দূষিত হয়ে ওঠে। সেই জলের সংস্পর্শে গিয়ে মুক্তা হলদে রঙ্ ধারণ করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ঝিনুকের জল স্বাভাবিক পরিমাণে ও অবস্থায় থাকলে মুক্তা সর্বদাই শ্বেত শুভ্র থাকে।

শুক্তি নিজে থেকে খুলে যাবে এইটিই নিয়ম এবং সকলেই তা চান। মানুষ যেভাবে জোর করে ঝিনুকের মুখ খোলার চেষ্টা করেন তাতে মুক্তার ক্ষতি হতে পারে। মান্নার প্রণালীর ঝিনুক পারস্য উপসাগরের শুক্তি থেকে পাঁচ ছয় দিন আগে স্বাভাবিক ভাবেই খুলে যায়। এর কারণ মান্নারে অত্যধিক উত্তাপ। জায়গাটির সংগে উত্তর অক্ষাংশের ব্যবধান দশ ডিগ্রী। আর বাহরেন দ্বীপের অবস্থান প্রায় সাতাশ ডিগ্রী। সুতরাং মান্নারে আহরিত মুক্তারাজি মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকে হলদে রঙের। পরিশেষে বলা যায় যে প্রাচ্য দেশের লোকদের সাদা মুক্তা প্রসংগে রুচি অনেকখানি আমাদেরই মত। আমি সর্বদাই মন্তব্য করেছি যে—শুভ্রতম মুক্তাই তাঁদের পছন্দ। তাঁদের আরও পছন্দের জিনিস হোল উত্তমরূপের সাদাহীরা, রুটি ও নারী।

অধ্যায় একুশ

শুক্তি মধ্যে মুক্তা সৃষ্টির রহস্য। মুক্তা সংগ্রহের সময় ও রীতি-পদ্ধতি।

একটি বিষয় আমার আজানা নয় যে কতিপয় প্রাচীন লেখকের বর্ণনানুসারে সাধারণ একটা বিশ্বাস আছে যে মুক্তার জন্ম হয় আকাশ ঝরা শিশির বিন্দু থেকে। আর তা-ই দেখা যায় প্রতিটি শুক্তির মধ্যে। কিন্তু সেই গ্রন্থকারগণের এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল না। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঝিনুক কখনও সমুদ্র গহ্বর থেকে নড়েনা বা উপরে ভেসে ওঠে না। সমুদ্রের অতলে শিশির বিন্দু সরাসরি প্রবেশ করতে পারে না। ঝিনুক তুলতে হলে অনেক সময় বারো হাত গভীরে ডুব দিতে হয়। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে।

একটি শুক্তিতে স্বাভাবিক ভাবে ছয় সাতটি মুক্তা পাওয়া যায়। আমার চোখে এমন ঝিনুকও পড়েছে যার মধ্যে দশটি মুক্তা তৈরী হয়েছে। তবে সেগুলি সব সমান সাইজের নয়। মুরগীর পেটে যেভাবে ডিম জন্মায় ঠিক সেই ভাবেই যেন ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা সৃষ্টি হয়। বৃহত্তম ডিমটি যেমন প্রথমে নিষ্কাশিত হয়, আর ছোটগুলি অভ্যন্তরে থাকে পূর্ণতা লাভ ও পরিপুষ্টির জন্যে ঠিক তদনুরূপ রীতিতে সর্বাপেক্ষা বড় মুক্তাটি ঝিনুকের মুখপাতে এগিয়ে আসে সকলের আগে। ক্ষুদ্রাকারগুলি থেকে যায় নীচের দিকে যথার্থ আকার লাভের জন্যে। প্রকৃতির প্রভাবেই তারা পূর্ণ আকার লাভ করবে। সব ঝিনুকেই মুক্তা ফলে না। অনেক ঝিনুকের মুখ খুলে খুলেও হয়ত একটি মুক্তার সন্ধান মিলবে না।

মুক্তা সংগ্রহকারীদের এই কাজে যথেষ্ট লাভ হয় মনে করলে ভুল ধারণা হবে। এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেলে আর এই কাজ করতেন না। এই কাজ কেবল তাদের অনাহারে মৃত্যুর কবল থেকেই রক্ষা করে। পারস্য ভ্রমণের বৃত্তান্তে আমি বলেছি যে বসোরা হতে জাস্ক্ অন্তরীপ পর্যন্ত পারস্য উপসাগরের উভয় তীরস্থ জমিতে কিছুই জন্মায় না। স্থানীয় অধিবাসীরা এত দরিদ্র ও এমন শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করেন যে কখনও তাদের রুটী বা ভাত জোটে না। খাদ্য হিসেবে তারা সংগ্রহ

করতে পারেন কেবলমাত্র খেজুর ও নোনা মাছ। অভ্যন্তর ভাগে প্রায় বিশ লীগ স্থান পরিভ্রমণ করলেও কোন ঘাস তৃণ নজরে পড়বে না।

পূর্ব সাগরীয় অঞ্চলে মুক্তার জন্যে শুক্তি সংগ্রহের কাজ চলে বছরে দু'বার। প্রথম ক্ষেপে হয় মার্চ ও এপ্রিল মাসে। দ্বিতীয় দফায় চলে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। তা বিক্রীর কাজ চলে জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত। তবে সেই সংগ্রহের কাজ প্রতি বছর হয় না। যারা সেই কাজ করেন তারা পূর্বে জেনে নেবেন যে শুক্তি পাওয়া যাবে কিনা। চেষ্টা বিফল না হয় তার জন্যে তারা মুক্তা সংগ্রহের কেন্দ্রে সাত আটটি নৌকা পাঠিয়ে দেন। নৌকাগুলি প্রায় হাজার সংখ্যক মুখখোলা ঝিনুক নিয়ে ফিরে আসে। তাতে যদি কয়েক শিলিং মূল্যেরও কিছু মুক্তা পাওয়া না যায় তাহলে বুঝতে হবে যে অনুসন্ধানের কাজ সেবারে সফল হবে না। দরিদ্র লোকদের এজন্যে যা ব্যয় করতে হবে তাও তারা ফিরিয়ে পাবেন না। এই উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রার আয়োজন ব্যবস্থা এবং অনুসন্ধান ও সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় খাদ্য বাবদ যা ব্যয় করতে হয় তাঁরা তা ধার করেন মাসিক তিন চার শতাংশ সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে। সুতরাং এক হাজার ঝিনুকে যদি কয়েক শিলিং মাত্র মূল্যের মুক্তাও পাওয়া না যায় তাহলে সেই বছর তারা সমুদ্রে মুক্তার সন্ধানে যাবার সংকল্প ত্যাগ করেন। ব্যবসায়ীরা শুক্তির বহর ক্রয় করেন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। কেনাকাটার পর যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বড়-বড় মুক্তা পাওয়া গেলে তো সৌভাগ্যের কথা। তবে তা ঘটে কচ্চিৎ কখনও, বিশেষতঃ মান্নার কেন্দ্রে। সেখানে যে বড় সাইজের মুক্তার ফলন নেই তা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি। ওখানকার অধিকাংশ মুক্তা আউন্স হিসেবে বিক্রী হয়। এক গ্রেণ আধ গ্রেণ ওজনের মুক্তা খুব কমই দেখা যায়। কখনও যদি দুই তিন ক্যারাটের একটিও পাওয়া যায় তাহলে তা বিশেষ ঘটনার পর্যায়ে পড়বে। কোন কোন বছরে হয়ত এক হাজার ঝিনুকে পাঁচ শিলিং আন্দাজ মূল্যের জিনিস পাওয়া যায়। এই রকমটি হলে সারা বছরের সন্ধান কার্যে হয়ত বাইশ পাউণ্ড কি তার কিছু বেশী রোজগার হয়।

পর্তুগীজদের হাতে যখন মান্নারের কর্তৃত্ব ছিল তখন তাঁরা প্রতিটি নৌকার উপরে উপ-শুল্ক ধার্য করতেন। এখন তার মালিকানা চলে গিয়েছে ওলন্দাজগণের হাতে। তারা প্রতিজন ডুবুরীর মাথা পিছু শুল্ক আদায় করেন। উত্তম সংগ্রহের বছরে তারা শুল্ক স্বরূপ পেয়ে থাকেন প্রায় ১৭,২০০ রিয়েল

মুদ্রা। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের এইভাবে শুল্ক আদায়ের কারণ হোল—তারা মুক্তা সংগ্রহকারীদের মালাবারী দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। শত্রুরা সশস্ত্র নৌকা নিয়ে আসে ডুবুরীদের ধরে নিয়ে নিজেদের দাস হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে।

যতক্ষণ মুক্তা সন্ধানের কাজ চলে ততক্ষণ ওলন্দাজগণ সমুদ্রে দু'তিনখানি সশস্ত্র নৌকা রাখেন মালাবারী আক্রমণের প্রহরা স্বরূপ। এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বনের ফলে কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। ডুবুরীদের অধিকাংশ হিন্দু। কিছু সংখ্যক মুসলমানও এই কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তাদের নৌকা আলাদা। দুই ভিন্ন ধর্মীরা কখনও মিলিত ভাবে কাজ করেন না। ওলন্দাজরা কিন্তু শেষোক্তদের উপরে পাওনা গণ্ডার জন্যে—অতিরিক্ত চাপ দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ হিন্দুদের সমতুল্য শুল্ক দান করেও মুসলমানদের একদিনের আহরণ দিতে হয় ওলন্দাজগণকে। কোন দিনটির সংগ্রহ দান করবেন তা স্থির করে দেবেন পাওনাদারগণ।

যে বছরে অধিক বৃষ্টিপাত হয়, মুক্তা সংগ্রহের কাজ সেবারে অত্যন্ত লাভ জনক। অনেকের ধারণা যে সমুদ্রের অতলতম গহ্বরে যে ঝিনুক থাকে তার মুক্তা শুভ্রতম। তার কারণ সেখানকার জল তত উষ্ণ থাকে না। সূর্য কিরণের পক্ষে সেখানে পৌছোঁনো সহজ নয়। এই ভুল ধারণার পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। মুক্তা সংগ্রহের কাজ চলে চড়া ভূমির নীচে চার থেকে বার ফুট গভীরে। অনেক সময় আড়াইশত পর্যন্ত নৌকা নামে এই কাজের জন্যে। অধিকাংশ নৌকাতে চালক থাকে একজন। বৃহত্তম নৌকায়ও থাকে মাত্র দু'জন। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে নৌকাগুলি তীর ছেড়ে যাত্রা পথে নেমে যায়। কারণ স্থলভাগের বায়ুর চাপে নৌকা চালানোর চেষ্টা চলে। আর বাতাসের চাপ বেলা দশটা পর্যন্ত ঠিক থাকে। মধ্যাহ্নের কিছু পরে তারা ফিরে আসে সমুদ্র বাতাসে ভর করে। স্থলবায়ুর প্রবাহ অন্তর্হিত হলেই আসে জলবায়ুর চাপ। তা চলতে থাকে বেলা এগার, বারটা থেকে। চড়াগুলি সমুদ্রবক্ষে প্রায় পাঁচ ছয় লীগ দূরে অবস্থিত। নৌকাগুলি সেখানে পৌছোলে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে শুক্তি সংগ্রহ করা হয়।

যারা ডুব দিয়ে নিচে নামে তাদের বাহুতে দড়ি বাঁধা থাকে। নৌকাতে যারা থাকে তারা সেই দড়ির মাথাটি ধরে রাখেন। ডুবুরীর বুড়ো আংগুলের সংগে আট দশ সের ওজনের একটি পাথর বাঁধা থাকে। নৌকাস্থিত লোক

সেটিকেও বেঁধে দড়িটি হাতে রাখে। ডুবুরীর কাছে বস্তার আকারে তৈরী জাল থাকে। তার মুখে এমন দড়ি থাকে যা টানলে তা খুলে ফেলা চলে; আবার বন্ধ করাও যায়। ডুবুরী জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যেইমাত্র সে অতলে নেমে গেল, সেই নেমে যাওয়াটি অতি দ্রুতই হয় পায়ে আটকানো পাথরের ওজনের টানে, অমনি পাথরটিকে খুলে ফেলে দেবে। নৌকার লোকেরা সেটিকে টেনে উপরে তুলে নেবে। যতক্ষণ ডুবুরীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের শক্তি থাকে ততক্ষণ সে জালটিকে ঝিনুক দ্বারা পূর্ণ করে তুলবে। যেই মাত্র শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হওয়ার আশংকা দেখা যাবে তখুনি দড়িতে নাড়া দেবার কথা। তা হবে তাকে উপরে তোলার সংকেত। নৌকার আরোহীরা তন্মুহূর্তে তাকে উপরে টেনে তুলবে। মান্নারের ডুবুরীরা অতি সুদক্ষ সংগ্রাহক। বাহরেণ ও এল্ কাতিফের ডুবুরীদের তুলনায় এরা অনেক বেশী সময় জলের নীচে থাকতে অভ্যস্ত। কারণ শেষোক্ত ডুবুরীরা জলে নামার সময় কানে তুলা ও নাকে আংটা বসায় না জল প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্যে। এই প্রথা পারস্যে উপসাগরে চালু আছে।

ডুবুরীকে উপরে তুলে তারপর ঝিনুকের বস্তা তোলার নিয়ম। ঝিনুকের বস্তা তুলতে সময় দরকার হয় সাত আট মিনিট। ডুবুরীকে সেই সময়টুকু দেয়া হয় দম নেবার জন্যে। তারপর সে আবার জলের নীচে নেমে যাবে। এই রকম নামাওঠা সে দশ বার ঘণ্টায় কয়েকবারই করে। অবশেষে তীরে চলে যায়। যাদের অর্থাভাব তারা সংগৃহীত জিনিস তখুনি বিক্রী করে দেয়। আর যাদের খাদ্যের সংস্থান আছে তারা সংগ্রহের কাজ চূড়ান্তভাবে শেষ না হলে কিছু বিক্রী করে না। ঝিনুক বন্ধ অবস্থায়ই রেখে দেবার নিয়ম। স্বাভাবিক ক্ষয়ের ফলে সময় মতই ঝিনুকের মুখ খুলে যায়। এমন সব শামুক আছে যা আমাদের রুয়েন শুক্তির তুলনায় চার গুণ বড়। কিন্তু এই ধরণের শামুক জাতীয় শুক্তির গাত্র দেহ নিম্নস্তরের এবং দুর্গন্ধময়। কারোর তা খাদ্য নয়। ফেলে দেয়া হয়।

মৌক্তিক আখ্যান শেষ করার মুখে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র ইউরোপে মুক্তা বিক্রীত হয় ক্যারাটের ওজনে হিসেব ধরে। এক ক্যারাট চার গ্রেণের সমান। হীরা ওজনের প্রথায় এই ওজন চলে। এশিয়াতে ওজন প্রথা স্বতন্ত্র। পারস্যে মুক্তার ওজন নেয়া হয় 'আব্বাসে'র বিপরীতে। আব্বাস এক ক্যারাটের এক অষ্টমাংশ কম। ভারতবর্ষে মুঘল

সাম্রাজ্যে এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যে ওজন ধার্য হয় রতি হিসেবে। আব্বাসের মত রতিও এক ক্যারাটের এক অষ্টমাংশ কম।

পূর্বে গোয়া ছিল এমন একটি স্থান যেখানে সমস্ত এশিয়ার বৃহত্তম ব্যবসা কেন্দ্র ছিল চালু। হীরা, রুবি, স্যাফায়ার, তোপাজ ও আরও রকমারী সব রত্নের ব্যবসা চলতো ওখানে। সমস্ত খনিজীবীরা সেখানে গিয়ে সমবেত হতেন খনিতে প্রাপ্ত যাবতীয় সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস নিয়ে। কারণ ওখানে ছিল ক্রয় বিক্রয়ের অবাধ স্বাধীনতা। পরন্তু তাদের দেশে কোন জিনিস রাজা বাদশাহকে দেখালে তাঁরা নিজেদের খুশীমত মূল্যে তা বিক্রী করাতে বাধ্য করতেন। গোয়াতে মুক্তার ব্যবসাও খুব চালু ছিল।

পারস্য উপসাগরের বাহেরণ দ্বীপ এবং সিংহল উপকূলে মান্নার প্রণালী—এই দু'টি স্থানে আহরিত মুক্তাই ওখানে আমদানী হোত। আমেরিকার মুক্তাও বিক্রী হোত সেখানে। তখন একটি বিষয় সুবিদিত ছিল গোয়া এবং ভারতে পর্তুগীজ অধিকৃত অন্যান্য স্থান সমূহে মুক্তার জন্যে বিশেষ রকম একটি ওজন প্রথা চালু ছিল। কিন্তু তা অপরাপর মুক্তা ব্যবসার কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা—কোথাও প্রচলিত ছিলনা। আমি আফ্রিকার নাম উল্লেখ করিনি। কারণ সেখানে এই জিনিসের ব্যবসা অজানাই থেকে গেছে। তারও কারণ আছে। পৃথিবীর এই অংশের নারী সমাজ মণিরত্নের পরিবর্তে উৎকৃষ্ট কাচ, স্ফটিক, কুট প্রবালের দানা অথবা হলদে তৈলজ পদার্থের কণ্ঠহার, বালা প্রভৃতি ব্যবহার করেন।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থান পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত সেখানে তাঁরা মুক্তা বিক্রী করেন একটি বিশেষ ওজন মাধ্যমে। তাকে বলা হয় 'চোগো'। কিন্তু নিজেরা যখন ক্রয় করেন তখন ব্যবসায়ীরা যে অঞ্চলের লোক সেখানকার নিয়ম অর্থাৎ আব্বাস, রতি ইত্যাদি হিসেবে করেন। এক ক্যারাটের চেয়ে এক চেগো পাঁচ গুণ বেশী। কিন্তু চেগোর মাত্রা (রেশিয়ো) ক্যারাটের তুলনায় ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে।

অধ্যায় বাইশ

বৃহত্তম ও সুন্দরতম হীরা ও রুবি যা গ্রন্থকার এশিয়া ও ইউরোপে দেখেছেন তার বিবরণ। ভারতে শেষ যাত্রা সম্পন্ন করে গ্রন্থকার স্বদেশের রাজাকে যে সকল বৃহৎ রত্ন বিক্রী করেছেন তার আলোচনা। চমৎকার একটি তোপাজ ও পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তার কথা।

নম্বর দ্বারা বিন্যস্ত করেছি এবং তদনুসারেই আমি হীরকের বর্ণনা দিতে চাই। আমার জানিত সর্বাধিক ওজনের হীরাটির প্রসংগ দ্বারাই বর্ণনা শুরু হবে।

এক নম্বর : এই হীরকটি মহান মুঘল সম্রাটের সম্পদ। তিনি অন্যান্য মণিরত্নের সংগে এটিও আমাকে দেখিয়েছিলেন। কাটাছাটার পরে যে আকৃতিটি হয়েছিল তাই-ই দেখলাম। রত্নটির ওজন গ্রহণের সুযোগও তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। ওজন উঠেছিল ৩১৯½ রতি। ক্যারাটে তা দাঁড়ায় ২৭৯$\frac{9}{16}$। অমসৃণ স্বাভাবিক অবস্থায় ওজন ছিল ৯০৭ রতি, আর ক্যারাটে ৭৯৩$\frac{5}{8}$। একটি ডিমকে মাঝখানে ধরে কাটলে এক একটি অংশের আকৃতি যেমন হয় পাথরটি ঠিক সেইরকম গড়নের।

দুই নম্বর : পাথরটির আকার তাস্‌কানির মহান ডিউকের হীরকটির অনুরূপ। তিনি সদাশয়তা বশতঃ সেটিকে দেখার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন একাধিকবার। ওজনে ১৩৯½ ক্যারাট। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে হীরাটির রঙ্ খানিকটা লেবুর রঙ্ ঘেষা।

তিন নম্বর : এটির ওজন ১৭৬$\frac{1}{8}$ ম্যানজেলিন বা ২৪২$\frac{5}{16}$ ক্যারাট। আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যের ওজন মাধ্যম হোল ম্যানজেলিন। এক ম্যানজেলিন আমাদের ১$\frac{3}{8}$ ক্যারাটের সমান। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে আমি যখন গোলকুণ্ডায় ছিলাম তখন এই পাথরটি দেখার সুযোগ হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্যবসায়ীদের কাছে আমি যত হীরক দেখেছি তার মধ্যে এইটি বৃহত্তম। রত্নটির মালিক আমাকে সীসা দ্বারা ওর একটি মডেল তৈরী করে নেবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমি সেটিকে সুরাটে আমার দু'টি বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি জিনিসটির সৌন্দর্য এবং ওজন তাঁদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। মূল্য ৫০০,০০০ টাকা, তাও লিখে দিলাম। তাঁরা জিনিসটির জন্যে অর্ডার দিলেন। আর জানালেন যে জিনিসটি

বেশ স্বচ্ছ ও উত্তমজেল্লার হলে তাঁরা ৪০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই মূল্যে তা ক্রয় করা সম্ভব ছিলনা। তবে আমার বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা যদি ৪৫০,০০০ টাকা দিতে সম্মত হতেন তাহলে হয়ত সম্ভব হোত।

চার নম্বরটি আমি আমেদাবাদে কিনেছিলাম আমার এক বন্ধুর জন্যে। তার ওজন ১৭৮ রতি বা ১৫৭$\frac{1}{8}$ ক্যারাট।

পাঁচ নম্বরটির আকার চার নম্বর হীরকটির মত। এই আকার হয়েছে দু'পাশে কাটাছাটার পরে। ওজন হয়েছিল ৯৪$\frac{1}{2}$ ক্যারাট। রঙ ও ঔজ্জ্বল্য উঁচুদরের ও নিখুঁত। যে দিকটি সমান, সেদিকের নিম্নাংশে দু'টি ফাটল বা চির আছে। সেই অংশটি কাগজের মত পাতলা। পাথরটিকে কাটার সময় আমি সেই পাতলা অংশটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। তার সংগে মাথার দিকে যে সূক্ষ্মাগ্র অংশ ছিল তাও কেটে দেয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সেখানে একটি চিরের মত দাগ থেকে গেল।

ছয় নম্বরের হীরাটি ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে আমি কিনেছিলাম কোলার খনিতে। ওটি সুন্দর ও নিখুঁত। খনিতেই কাটা হয়েছিল। পাথরটি অত্যন্ত ভারি। ওজনে ৩৬ ম্যানজেলিস, অর্থাৎ ৬৩$\frac{3}{8}$ ক্যারাট।

সাত ও আট নম্বর। এই দু'টি হীরা তৈরী হয়েছে একখণ্ড ফাটা পাথর থেকে। যখন পুরোটি ছিল তখন ওজন উঠেছিল ৭৫$\frac{5}{8}$ ম্যানজেলিন বা ১০৪ ক্যারাট। রঙ উত্তম হলেও ভেতরে যেন কিছু খাদ দেখা গেল। জিনিসটি যেমন আকারে বড়, তেমনি তার উচ্চমূল্য। কাজেই বেনিয়ানরা কেউ-ই সেটি কিনতে আগ্রহী হননি। শেষ পর্যন্ত বত্নু নামে জনৈক ওলন্দাজ কেনার জন্যে এগিয়ে এলেন। তিনি ওটিকে ভেঙ্গে খণ্ড করে দেখলেন যে তার মধ্যে প্রায় আট ক্যারাট আন্দাজ খাদ রয়েছে। আর তা হচ্ছে গলিত উদ্ভিদের জমাট বাঁধা কাই। ক্ষুদ্র খণ্ডটি ছিল পরিষ্কার। কেবল একটি সূক্ষ্ম চির ছিল যা প্রায় নজরে পড়ে না। অপর অংশের ডান দিক জুড়েই ফাটল। তখন তাকে সাত আট টুকরো করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। ওলন্দাজটি সেই পাথরকে ভেঙ্গে টুকরো করার ব্যাপারে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তবে তার ভাগ্য এই যে ওটিকে খণ্ড করার সময় শত টুকরো হয়ে যায়নি। তাহলেও জিনিসটি দিয়ে তিনি কিছু লাভ করতে পারেননি। এই ঘটনাটিতে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছে যে বেনিয়ানরা যে কাজে হাত দিতে সাহস পাননা সেখানে ফ্রাঙ্করা গিয়ে কিছু লাভ করবেন এমন আশা করা উচি

আমি শেষবার ভারত ভ্রমণ অন্তে ফিরে আসার মুখে রাজার কাছে বিশটি হীরা বিক্রয় করেছিলাম। সেই সম্বন্ধে অর্থাৎ সেই রত্ন সমূহের আকার, আয়তন, ওজন ও ঘনত্ব সম্বন্ধে পাঠকদের জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ দিতে চাই।

এখানে নম্বর সহযোগে যে বর্ণনা দেয়া হোল তার মধ্যে আছে মহান মুঘল সম্রাটের সম্পদ এবং পৃথিবীর সুন্দরতম চুনী ও তোপাজ।

এক নম্বর চুনী রত্নটির মালিক পারস্যের সম্রাট। এটি আকারে ও ঘনমানে একটি ডিমের মত। এ পিঠ ও পিঠ ভেদ করা। রঙ অতি উজ্জ্বল। চমৎকার স্বচ্ছ। ত্রুটীর মধ্যে একপাশে সামান্য একটু চির। যাদের হেফাজতে ওটি আছে তারা মূল্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে নারাজ। এই সম্রাটের কাছে যে মুক্তা আছে সেই সম্বন্ধেও এই একই কথা। এই দু'টি জিনিসের মূল্য সম্বন্ধে আর কেউ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা তাঁরা চাননা। পারস্যাধিপতির মণিরত্নের যাঁরা হিসেব রক্ষক তাঁরা বলেন যে এই চুনীটি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে আছে।

দুই নম্বর চুনীটি বৃহদাকার। এটি মুঘল সম্রাটের মাতুল জাফর খানের কাছে বিক্রীত হয়েছিল। দাম ৯৫,০০০ টাকা। তিনি এটি অন্যান্য জিনিসের সংগে মুঘল সম্রাটকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর ওজন গ্রহণের উৎসব পর্ব দিনে। এবিষয়ে পূর্বেও আমি আলোচনা করেছি। পাথরটির ন্যায্য মূল্যের চেয়ে কিছু কম টাকা দিয়েই তিনি ওটি কেনার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানে তখন একজন প্রধান ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক সময় সম্রাটের মুখ্য মণিকার ছিলেন। ঈর্ষাদ্বেষের কুপ্রভাবে পড়ে তিনি কর্মচ্যুত হন। তিনি পাথরটি হাতে নিয়ে বললেন যে ওটি "বালাস" পাথর নয়। জাফর খান প্রতারিত হয়েছেন। সুতরাং ওটির মূল্য ৫০০ টাকার বেশী হতে পারেনা। সেই আলোচনার কথা রাজার কর্ণগোচর হতে তিনি সেই প্রধান জহুরী ও অন্যান্য মণিকারদের ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তারা এসে বললেন যে পাথরটি উচ্চাঙ্গেরই বটে। মুঘল সম্রাট শাজাহান ছিলেন মণিরত্ন সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও অভিজ্ঞতম ব্যক্তি। তিনি তখন পুত্র ঔরংজেবের হাতে বন্দী হয়ে আগ্রায় দিন যাপন করছেন। ঔরংজেব সেই রত্নটিকে পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন তার মতামত জানার জন্যে। শাজাহান বিশেষভাবে পরখ ও বিবেচনা করে সেই প্রধান জহুরীর মতেই মত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন যে চুনীটি "বালাস" পর্য্যায়ের নয়। আর দাম পাঁচশত টাকার বেশী হতে পারেনা।

পাথরটি ঔরংজেবের হাতে ফিরে এলে যে বনিকের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল তাকে বাধ্য করা হোল ওটি ফিরিয়ে নিতে। ক্রয় বিক্রয়ের টাকা ফেরত দিতে হোল।

তিন ও চার নম্বর যুক্ত চুনী বিজাপুর সুলতানের সম্পদ। চতুর্থটির নক্সায় তার উচ্চতা আংটির উপরিভাগেই পুরোপুরি দেখা যায়। তৃতীয়টির ওজন ১৪ ম্যানজেলিন, যা ১৭½ ক্যারাটের সমান। এক ম্যানজেলিন পাঁচ গ্রেণের তুল্য। এটির নীচের অংশে খোলকাটা। বেশ পরিষ্কার ও উৎকৃষ্ট ধরণের জিনিস। বিজাপুরের সুলতান এটি ক্রয় করেন ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে। মূল্য দিতে হয়েছিল নতুন স্বর্ণ মুদ্রার ১৪,২০০। টাকার হিসেবে এক একটি স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ৩½ টাকা।

পঞ্চমটিও চুনী। জনৈক বেনিয়ান আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় বারাণসীতে আমাকে ওটি দেখিয়েছিলেন। ওজন ৫৮ রতি। দ্বিতীয় পর্যায়ের পাথর। আকার খানিকটা বাদামের ন্যায়। নীচের দিকে একটি গর্ত মত এবং অগ্রভাগে আছে একটি ছিদ্র। আমি ওটির জন্যে ৪০,০০০ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু যার হাতে ওটি ছিল সেই ব্যবসায়ী দাম হাঁকলেন ৫৫,০০০ টাকা। আমার মনে হয় আমি রত্নটি ৫০,০০০ হাজার টাকায় কিনতে পারতাম।

ছয় নম্বরটি তোপাজ। এই জিনিসটিও মুঘল সম্রাটের। আমার শেষ ভারত ভ্রমণকালে আমি যখন তাঁর দরবারে ছিলাম তখন এটি ব্যতীত আর কোনও রত্ন তাঁকে ধারণ করতে দেখিনি। তোপাজটির ওজন ১৮½ রতি। এটি গোয়াতে সংগ্রহ করা হয় মুঘল সম্রাটের জন্যেই। মূল্য দিতে হয়েছিল ১৮১,০০০ টাকা।

নম্বর সাত। এশিয়ার মহান রাজা বাদশারাই পৃথিবীতে একমাত্র সম্পদশালী নন যাঁদের কাছেই কেবল মূল্যবান ও সুন্দর মণিরত্ন আছে। মুঘল সম্রাটের কাছেও আমি এত বড় চুনী দেখিনি যেরকমটি সাত ও আট নম্বরের পাথরে দেখা যায়। এই জিনিস আছে আমাদের দেশের রাজার কাছে। তিনি হলেন পৃথিবীর সমস্ত রাজা মহারাজা মণ্ডলে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও জাঁকজমকশালী।

আমাদের জানা বৃহত্তম মুক্তাবলীর বর্ণনাও দেয়া হোল নম্বর অনুসারে।

এক নম্বর মুক্তাটি ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট ক্রয় করেন জনৈক

আরবীয়ের কাছে। তিনি ওটি সেই সময়েই সংগ্রহ করেছিলেন এল্ কাতিফের মুক্তা সংগ্রহের কেন্দ্র থেকে। দাম পড়েছিল ৩২,০০০ তোমান মুদ্রা। এযাবৎ আবিষ্কৃত মুক্তাবলীর মধ্যে এটি বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা নিখুঁত। কোনদিকে কোন খুঁত নেই।

দুই নম্বরটি বৃহত্তম মুক্তা। আমি এটি মুঘল দরবারে দেখেছিলাম। মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরী একটি ময়ূরের গলদেশে ওটি ঝোলানো ছিল। মুক্তাটি ছিল ময়ূরের বুকের উপর। পাখীটি সিংহাসনকে ঘিরে থাকতো।

তৃতীয় মুক্তাটি আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় আমি শায়েস্তা খানকে বিক্রয় করি। তিনি মুঘল সম্রাটের মাতুল ও বাংলার সুবাদার। ওজন ৫৫ ক্যারাট। তবে জেল্লা গিয়েছিল নিষ্প্রভ হয়ে। ইউরোপ থেকে এশিয়াতে আমদানী যাবতীয় মুক্তা মধ্যে এটি বৃহত্তম।

চার নম্বর মুক্তাটি যেমন বড়, তেমনি বর্ণ ও গড়নে একেবারে নিখুঁত। দেখতে অনেকটা জলপাই-এর মত। এটি বসানো আছে চুনী ও মরকত মণির একটি কণ্ঠহারের মধ্যস্থলে। এই হারটি মুঘল সম্রাটের-গলায় দেখা যায় অনেক সময় সেটি ঝুলে থাকে তার কোমর পর্যন্ত।

নিখুঁত গোলাকার হিসেবে পাঁচ নম্বর মুক্তাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার জানিত মুক্তারাজি মধ্যে এটি বৃহত্তম। মুঘল সম্রাটের রত্নরাজির ভাণ্ডারেই এর স্থান। এর জুড়ি আর একটি কখনও নজরে পড়েনি। সেই কারণেই সম্রাট এটিকে শরীরে ধারণ ও ব্যবহার করেন না। কোন অলঙ্কারে খচিত হয়নি যে সকল রত্ন তার সংগে এটিকে রেখে দেয়া হয়েছে। ওর জুড়ি আর একটি পাওয়া গেলে জোড়া মিলিয়ে কানের অলঙ্কার তৈরী করা যেত। প্রতিটি মুক্তাকে দু'টি চুনী বা মরকত মণির মধ্যে বসানো চলতো। এই হচ্ছে ওদেশের রীতি। ওখানে ধনী দরিদ্র, ছোট বড় এমন কেউ নেই যিনি শক্তি অনুসারে দু'খানি রঙীন পাথরের মধ্যে একটি মুক্তা বসিয়ে কর্ণাভরণ ব্যবহার না করেন।

অধ্যায় তেইশ

প্রবাল ও হলদে রঙের তৈল স্ফটিক এবং তার প্রাপ্তিস্থল।

ইউরোপে প্রবাল কোনও মূল্যবান পাথর ও মণিরত্নের পর্যায়ভুক্ত না হলেও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে তার যথেষ্ট কদর ও আদর। প্রকৃতির বুকে জাত বস্তু সামগ্রী মধ্যে যা কিছু সুন্দরতম প্রবাল তাদের মধ্যে একটি। অনেক দেশ আছে যেখানে মানুষ মূল্যবান পাথর অপেক্ষা প্রবাল পছন্দ করেন বেশী। সামান্য কিছু আলোচনা করে আমি বর্ণনা দেব যে কোন কোন স্থানে এবং কি প্রকারে প্রবাল সংগৃহীত হয়, আর সে সম্বন্ধে আমার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে।

প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে সার্ভিনিয়ার উপকূলে প্রবাল সংগ্রহের তিনটি কেন্দ্র আছে। অরগুয়েবেল-এ যা পাওয়া যায় তা সবচেয়ে সুন্দর। দ্বিতীয় স্থানের নাম বোজা। আর তৃতীয়টি আছে সেন্ট পিয়ের দ্বীপের সংলগ্ন স্থানে। আর একটি প্রবাল কেন্দ্র আছে কর্সিকা দ্বীপের উপকূলে। সেখানে আহরিত প্রবাল পাতলা, তবে খুব বাহারী রঙের। আফ্রিকার উপকূলে দু'টি স্থানেও প্রবাল জন্মায়। একটি ব্যাষ্টিয়ন দ্য ফ্রান্স, আর দ্বিতীয়টি হোল তবার্ক। এখানকার প্রবাল মোটামুটি রকমে ভারি ও লম্বা, কিন্তু বিবর্ণ রূপের। সপ্তম কেন্দ্র ত্রিপণির সন্নিকটে সিসিলি উপকূলে। এখানে প্রাপ্ত প্রবালও পাতলা, কিন্তু রঙ উত্তম। আরও একটি প্রবাল কেন্দ্রের কথা জানা যায় কুইয়ার অন্তরীপের দিকে ক্যাটালোনিয়া উপকূলে। তথাকার প্রবাল যেমন ভারি, তেমনি চমৎকার তার রঙ। তবে শাখা প্রশাখা সমূহ অতি ছোট। কর্সিকা দ্বীপের অনুরূপ আর একটি সংগ্রহ কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে মজোরকা দ্বীপে। এই সমস্ত কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরের কূলে অবস্থিত স্থানসমূহে বটে, কিন্তু সমুদ্র মধ্যে কোন কেন্দ্র নেই। প্রবাল উত্তোলনের রীতি পদ্ধতি নিম্নরূপ :

গভীর সমুদ্রে খাদ ও গর্তযুক্ত পাহাড়ের নীচে প্রবাল জন্মায়। নিম্নোক্ত উপায়ে তা সংগৃহীত হয়। সংগ্রহকারীরা দু'খানি কাঠকে ক্রুশের মত বসিয়ে একটি ভেলা জাতীয় জিনিস তৈরী করেন। তদুপরি কেন্দ্রস্থলে ভারি এক বোঝা সীসা জমা করেন যাতে ভেলাটিকে সহজে জলের নীচে নামিয়ে নেয়া

যায়। ভেলাটিকে ঘিরে গোছা গোছা খড় ও শণ বেঁধে তাকে মুড়ে মুড়ে বুড়ো আংগুলের মত করে নিতে হয়। ভেলার মাথায় ও পেছনে দু'টি দড়ি বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেবার প্রথা। পাহাড়ের পাশ ধরে ভেলাকে জলস্রোতে নামিয়ে দিতে হয়। সেটি নীচে নেমে গেলে নৌকাতে আবদ্ধ খড়গুলি প্রবালের গায়ে আটকে পড়ে। আরও পাঁচ ছয়টি নৌকা থাকে ডুবন্ত ভেলা বা নৌকাকে উপরে টেনে তোলার জন্যে। এই তোলার কাজে অনেক সময় অতি মাত্রায় পরিশ্রম করতে হয়। টেনে তোলার জন্যে আবদ্ধ দড়ির একটি ছিঁড়ে গেলেও সমস্ত মাঝি মাল্লাদের জীবননাশ হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং প্রবাল উত্তোলনের কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রবাল শুদ্ধ নৌকাকে টেনে তোলার সময় যে পরিমাণ জিনিস উপরে উঠে আসে ততোধিক আবার সমুদ্রগর্ভে পড়ে নিমজ্জিত হয়। সমুদ্রগর্ভ কর্দমাক্ত হওয়াতে প্রতিদিনই যথেষ্ট প্রবাল নষ্ট হয়ে যায়। ফল যেমন মাটিতে পড়ে থাকলে পোকায় খেয়ে ধ্বংস করে, তেমনি প্রবালও সমুদ্রগর্ভে জমা হয়ে পড়ে থাকলে তার ক্ষয় ক্ষতি অনিবার্য।

এই প্রসংগে বলা যায় যে মার্সেলিসের একটি দোকানে আমি কিছু চমৎকার জিনিস দেখেছি। সেখানে প্রবাল তৈরী হয়েছিল। সেটি বুড়ো আংগুলের মত একটি খণ্ড এবং তা কিছুটা কাচের ন্যায়। তাকে কেটে দু'ভাগ করা হোল। তার মধ্যে দেখা গেল একটি পোকা। পোকাটি কিলবিল করে বেড়াচ্ছে দেখলাম। প্রবাল খণ্ডের গর্তের মধ্যেই তাকে কয়েক মাস জীবন্ত অবস্থায় আবদ্ধ রাখা হোল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রবালের কিছু শাখা প্রশাখার মধ্যে মৌচাকের অনুরূপ এক প্রকার স্পঞ্জজাতীয় জিনিস জন্মায়। তার মধ্যে ছোট ছোট পোকা নিরাপদে থাকে মৌমাছিদের মত। প্রকৃতির বিচিত্র গতিতে আনন্দের মধ্যে ওরা কাজ করে চলে।

অনেকের বিশ্বাস যে প্রবাল সমুদ্রের গর্ভে নরম থাকে। বস্তুত তা কঠিন। তবে একথা ঠিক যে বছরের কয়েকটি বিশেষ সময় বা মাসব্যাপী ডালপালাগুলির ডগা থেকে এক প্রকার সাদা রস নিষ্কাশিত হয় যা দেখতে ঠিক মাতৃস্তন্যের মত। তাকে প্রবালের বীজ বলা চলে। সমুদ্র গহ্বরে যে কোন জিনিসের উপরে তা পড়লে নতুন প্রবাল শাখা সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন, সমুদ্রবক্ষে পতিত কোন মানুষের মাথার খুলি, তলোয়ারের ফলা এবং বোমা জাতীয় জিনিষ যার উপরেই সেই রস পড়ুক না কেন সেখানেই প্রবাল

গড়ে উঠবে। প্রবালের নতুন শাখা সেই জিনিসগুলির সংগে জড়িয়ে প্রায় ছয় ইঞ্চি আন্দাজ আকারের হয়। একটি বোমার সংগে জড়ানো কিছু প্রবাল শাখা আমার কাছেই আছে।

প্রবাল সংগ্রহের কাজ শুরু হয় এপ্রিলের গোড়াতে, আর তা চলে জুলাই মাসের শেষ অবধি। সাধারণত এই কাজে নৌকা নিযুক্ত হয় প্রায় দু'শত। কোন বছর হয়ত আরও বেশী, কখনও হয়ত নৌকার সংখ্যা কিছু কমও থাকে।

নৌকাগুলি তৈরী হয় জেনোয়া নদীর তীরে। নৌকাগুলি অত্যন্ত হাল্‌কা। নৌকাতে প্রচুর পাল থাকে দ্রুত চলার জন্যে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আর অংশের নৌকা এত দ্রুত চলতে পারে না। এদের পিছু হটিয়ে চলার শক্তি আর কোন নৌকার নেই। প্রতিটি নৌকাতে লোক থাকে সাতজন। তাদের কাজ করার জন্যে একজন পরিচালক থাকে। ভূখণ্ডের বাইরে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে প্রবাল উত্তোলনের কাজ চলে। তবে পাহাড়ের অবস্থান জেনে তবে এগোতে হয়। জলদস্যুদের ভয়ে সমুদ্র বক্ষে অধিকদূর এগিয়ে যাওয়া যায় না। দস্যুদের আভাস পাওয়া গেলেই অতি দ্রুত নৌকা চালিয়ে সরে পড়ার নিয়ম।

প্রবাল প্রসংগে পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি দেশের কথা এখন আলোচনা করা যাক। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে জাপানীরা মুক্তা বা মূল্যবান পাথর কোনটিকেই পছন্দ করেন না। কিন্তু সুন্দর প্রবালের দাগ তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। তাঁদের ব্যাগের মুখ বন্ধ করার ফাঁসে তা ব্যবহার করেন। ওদের এই থলেগুলি ঠিক পূর্ব যুগে ফ্রান্সে যেমনটি হোত তদানুরূপ। রেশমী সুতায় তৈরী ব্যাগের মুখে আবদ্ধ দঁড়ির মাথায় বৃহত্তম আকারের প্রবালদানা ঝুলিয়ে দেবার ফ্যাশান চালু আছে জাপানী সমাজে। অতএব তাঁরা এমন বড় সাইজের প্রবাল দানা পছন্দ করেন যা একটি ডিমের মত হলেও উত্তম কথা। আর তা সংগ্রহ করার জন্যে তাঁরা যে কোন উচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত। পূর্বে পর্তুগীজরা জাপানে এই ব্যবসা চালাতেন বেশ জোরালোভাবে। তাঁরা আমাকে বলেছেন যে বৃহদাকার একটি প্রবালের জন্যে তাঁরা দেড় হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত মূল্য পেয়েছেন। ব্যাপারটা কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়কর যে জাপানীরা একটি উৎকৃষ্ট প্রবালের জন্য এত টাকা খরচ করেন। অথচ তাঁরা অন্যান্য মণিরত্ন সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। আর এমন একটি জিনিস

তাঁদের কাছে অতিমাত্রায় প্রিয় যা অন্যদেশের লোকের কাছে তত কদর পায় না।

জাপানীরা আর একটি জিনিস অত্যন্ত পছন্দ করেন। তা হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার মাছের চামড়া (আঁশ ?)। তা অনেক পশু চর্ম্ম অপেক্ষাও কঠিন এবং অমসৃণ। সেই মাছের পিঠে ছোট ছোট ছয়টি, কখনও বা আটটি কাঁটা বা হাড় থাকে। তা বেশ উঁচু হয়ে উঠে এবং বৃত্ত সৃষ্টি করে। বৃত্তের মাঝে আরও একটি অনুরূপ কিছু গড়ে ওঠার ফলে তা দেখতে হয় ঠিক একটি হীরার ফুলের মত। এই মাছের চামড়া দিয়ে তারা অসি কোষ তৈরী করেন। সেই মৎস্য চর্ম্মকে যত সুষমভাবে ও সুন্দর করে গোলাপ ফুলের মত করে সাজানো যাবে তাদ্বারা তত অধিক অর্থ আয় হবে। হাজার হাজার মুদ্রা মূল্য পাওয়া যায় তার জন্যে। একথা আমি শুনেছি ওলন্দাজদের মুখে।

পুনরায় প্রবাল প্রসংগে কিছু আলোচনা করে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য শেষ করার মুখে একটি কথা বলা দরকার যে এশিয়া দেশের সাধারণ মানুষ প্রবাল দানার মালা হাতে ও গলায় পরেন অলঙ্কারের মত। এই প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায় মুখ্যতঃ উত্তর অঞ্চল অভিমুখে মুঘল সাম্রাজ্য মধ্যে। আরও দেখা যায় পার্বত্য প্রদেশে, আসাম রাজ্যে ও ভুটানে।

তৈল স্ফটিক (অম্বর) বাল্‌টিক সাগরের একটি নির্দিষ্ট উপকূল ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। স্বতন্ত্র ধরণের এক প্রকার বাতাসের চাপে এই জিনিস সময় সময় সমুদ্র থেকে উঠে এসে বালির উপরে পড়ে। ব্রাণ্ডেন বুর্গের ইলেক্‌টর হলেন সেই স্থানটির মালিক। তিনি প্রতি বছর কয়েক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে তা ইজারা দিয়ে থাকেন। ইজারাদারগণ পাহাড়াওয়ালা নিযুক্ত করেন। তারা সমস্ত উপকূলভাগ জুড়ে ঘুরে বেড়ান। সমুদ্র কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে অম্বর নিক্ষেপ করে। কেউ তা চুরি করতে পারেন না। যদি বা কেউ তা করতে প্রয়াসী হন তাহলে তাকে দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

তৈল-স্ফটিক আর কিছুই নয়। তা হোল সমুদ্র মধ্যে একটা বিশেষ আঁটালো জিনিসের জমাট বাঁধা রূপ। এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে যখন কোন কোন অম্বর খণ্ডের গায়ে মাছি ও অন্যান্য পোকা মাকড়কে শুকিয়ে আটকে থাকতে দেখেছি। আমার কাছে এই প্রকার অনেক খণ্ড অম্বর আছে। তার মধ্যে একটির অভ্যন্তরে চার পাঁচটি ছোট মাছি আটকে পড়ে আছে।

প্রবাল প্রসংগে আমি জাপানের কথা বলেছি। এখন অম্বরের কথা বলতে গিয়ে চীনের প্রসংগে আলোচনা করবো। চীনাদের মধ্যে একটি রেওয়াজ আছে কোনও খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোনও ভোজ পর্বের আয়োজন করেন তখন সেই উৎসবের মহিমা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ভোজ শেষে তিন চারটি পাত্রে প্রচুর পরিমাণে তৈল-স্ফটিক জ্বালিয়ে দিতে পারলে। অম্বর পুড়িয়ে মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। যত অধিক পরিমাণে তা পোড়ানো যায় তত অধিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এক লিভর ওজনের একটি খণ্ডের দাম পাড় প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড। চীনবাসীরা অগ্নির উপাসনা করেন বলেই এই জিনিস ব্যবহার করেন। অম্বর আগুনে দিলেই এক প্রকার গন্ধ বেরোয় যা চীনাদের বিশেষ পছন্দ। তার মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। তার ফলে তা অন্যান্য দাহ্য পদার্থ অপেক্ষা ঢের বেশী জ্বলে। এই কারণে অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের তুলনায় অম্বর শ্রেষ্ঠতম বস্তুরূপে গণ্য হবে যদি তা চীন দেশে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে বিদেশীদের কাছে বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত থাকা চাই। একমাত্র ওলন্দাজ কোম্পানীই এই জিনিসের এক-চেটিয়া ব্যবসা চালান। চৈনিকরা বাটাভিয়াতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে তা ক্রয় করেন।

তিমি মাছের তেল সম্পর্কে কিছু আলোচনা না করে এই অধ্যায়টি সমাপ্ত করা সমীচিন হবে না। আমার বিশেষ স্পষ্ট জানা নেই যে কোথায় এবং কি প্রকারে এই জিনিস সংগৃহীত হয়। তবে মনে হয়, পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রেই কেবল তা জন্মায়। তাহলেও অনেক সময় ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের উপকূল ভাগেও পাওয়া যায়। সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায় মেসিন্দ উপকূলে। আর তা মুখ্যতঃ দেখা যায় নদীর মোহনায় বিশেষতঃ রিরো-দি-সেনা নামক মোহনাতে। মোজাম্বিকের গভর্ণর ওখানকার শাসন কার্য শেষ হলে যখন গোয়াতে ফিরে আসেন তখন তিনি প্রায় ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের তিমি তেল নিয়ে আসেন। অনেক সময় বেশ বড় আকারের ও ওজনে ভারি স্ফটিক-তৈলের খণ্ড পাওয়া যায়।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। একখানি পর্তুগীজ জাহাজ গোয়া ত্যাগ করে ম্যানিলা অভিমুখে যাবার সময় মালাক্কা প্রণালী পার হতে না হতেই একটি দুরন্ত ঝড়ের মুখে পড়ে যায়। বেশ কয়েকদিন ঝড় চলেছিল। আকাশ ছিল মেঘাবৃত। তার ফলে জাহাজের চালক সঠিক পথ খুঁজে পাননি।

ইতিমধ্যে জাহাজের চাল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য নিঃশেষ হয়ে এল। নাবিকরা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন যে জাহাজস্থিত শেতাঙ্গদের খাদ্য ব্যবস্থা অটুট রাখার জন্যে কৃষ্ণকায় লোকদের জলে নিক্ষেপ করা হবে কিনা। যখন তারা প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন যে কৃষ্ণকায়দের জলে নিমগ্ন করবেন, তখন এক সুপ্রভাতে সূর্য্যের মুখ দেখা গেল। তখন মনে হোল যে অনতিদূরেই একটি দ্বীপ আছে। কিন্তু পরবর্তী দিনের পূর্বে সেখানে জাহাজ নোঙর করা সম্ভব হয়নি। কারণ সমুদ্র জলের স্ফীতি ও উচ্চতা ছিল অধিক। আর বাতাসের চাপও ছিল অতি প্রবল। জাহাজে অর্লিয়েন্সের অধিবাসী জনৈক ফরাসী ভদ্রলোক ছিলেন। নাম মারিন রেনড্‌। তাঁর একটি ভাই ছিলেন সংগে। তিনি তীরে নেমে একটি নদীর সন্ধান পেলেন এবং তার মোহনায় গিয়েছিলেন স্নান করতে। তাঁর সংগে ছিলেন দু'জন পর্তুগীজ সৈনিক ও একজন সার্জেণ্ট। স্নান করার সময় একজন সৈনিক দেখলেন যে তীরের কাছাকাছি জলে বৃহৎ এক খণ্ড কি জিনিস ভেসে চলেছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তা নরম পাথরের মত কিছু। আর কিছু চিন্তা না করে তিনি তা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। অপর চার ব্যক্তিও ঠিক তদনুরূপই করলেন। তাঁরাও দেখতে গিয়েছিলেন এবং হাতে ধরেও দেখলেন। কিন্তু বুঝতে পারেননি জিনিসটি আসলে কি।

জাহাজে ফিরে রাত্রে সৈনিক চিন্তা করলেন যে কি জিনিস তাঁর হাতে পড়েছিল। তিনি তিমি-তৈলের কথাও শুনেছিলেন। তখন তাঁর মনে হঠাৎ একটা চিন্তার ঝলক এসে গেল যে সেই জিনিসটিতো তাও হতে পারে। বস্তুতঃই তিনি ভুল চিন্তা করেননি। পরদিন তিনি সংগীদের কিছু না বলে একটি বস্তা নিয়ে তীরভূমিতে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি নদীর দিকে এমনভাবে এগিয়ে চললেন যেন সেখানে স্নান করবেন।

তখন আবার এক বোঝা তিমি-তেল তার নজরে পড়ে গেল। তিনি তা নিয়ে এলেন জাহাজে। আর রেখে দিলেন বাক্সে। কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রাখা সম্ভব হয়নি। সন্ধ্যারদিকে তা জানালেন মারিন রেণডকে। তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাস করতেই পারেন নি যে বস্তুতঃই তা তিমি মাছের চর্বি। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে তিনি বুঝলেন যে সৈনিকটির ধারণা নির্ভুল। ভাগ্য পরীক্ষার স্থলে সৈনিক জিনিসটি মারিনের কাছে বিক্রয়ের প্রস্তাব দিলেন। ল্য চাইলেন দু'টি এমন চৈনিক স্বর্ণ মুদ্রা যার মূল্য

মান পাউণ্ডের দরে দাঁড়ায় পঁয়তাল্লিশ পাউণ্ড। কিন্তু মারিন একটি মাত্র মুদ্রা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বিক্রেতা তার দৃঢ়মত পোষণ করে ওটিকে বাক্সে পুরে রাখলেন। কয়েকদিন পর ঈর্ষা বশতঃই হোক, অথবা নিজের প্রস্তাবিত মূল্যে কেনা সম্ভব হয়নি বলে, মারিন ব্যাপারটি সকলকে জানিয়ে দিলেন। আবার এও হতে পারে যে অন্যান্যরা বিষয়টি জানার ভিন্ন অবকাশও পেয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, খবরটা কিন্তু সারাটি জাহাজে ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। সকলেই জেনে গেল যে সৈনিকের বাক্সে বড় এক খণ্ড তিমির চর্বি আছে। আর তিনি তা পেয়েছেন সেই দ্বীপেরই তীরভূমিতে। পর্তুগীজরা নোঙর ফেলেছেন যেখানে তার কাছেই তা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং জাহাজের নাবিকগণ ও অন্যান্য সৈনিকরা সে জিনিসের অংশ দাবী করলেন নিজেদের ন্যায্য পাওনা হিসেবে। মারিন রেনড্ তুচ্ছ প্রতিহিংসা-বশতঃ ব্যাপারটাকে গুরুতর করে তুললেন এইভাবে। সকলে মিলে বললেন যে একসংগে তারা কাজ কচ্ছেন এবং এক ধারায়ই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অতএব, ভাগ্য যা দিয়েছে তার অংশ সকলের জন্যে সমান হওয়া উচিত। ভাগ্য দেবী সৈনিকের জন্যেই কেবল সেই চর্বির ব্যবস্থা করেননি। জাহাজস্থিত সকলকেই তা ভাগ করে দিতে হবে।

সৈনিক তো যতদূর সম্ভব নিজের দিকে টেনে কথা বলার চেষ্টা কচ্ছিলেন। আশে পাশে আবার এমন কয়েক জন লোক ছিলেন যারা তার পক্ষই সমর্থন করলেন এই আশাতে যদি কিছু উত্তম অংশ পাওয়া যায়। আরও কিছু অলীক দাবীদার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই বিতর্ক বিবাদ এমন পর্যায়ে উঠলো যে একটা তীব্র গণ্ডগোল ও বিঘ্ন সৃষ্টি হোল। জাহাজের কাপ্তেন তখন এগিয়ে এলেন তাঁর দূরদর্শিতা দ্বারা ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলার জন্যে। তিনি জাহাজীদের ও সৈনিকগণকে বললেন যে বৃহদাকার সেই তিমি তৈলের খণ্ডটি একটি দুর্লভ জিনিস। সুতরাং ওটি রাজাকে উপহার দানের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। তাকে কেটে টুকরো করলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। আর গোয়াতে পৌঁছোনো পর্যন্ত রেখে দিলে তাদের লাভই হবে। সেখানে গিয়ে ভাইসরয়কে উপহার দিলে তিনিও উচ্চ মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। তাতে সকলেরই পাওনা বেশী হবে। কাপ্তেনের প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করলেন। তারা ম্যানিলার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখান থেকে ফিরে তিমি-তৈলের খণ্ডটি ভাইসরয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া

হোল। কাপ্তেন তাঁকে বললেন যে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে। দু'জনে মিলে পরামর্শ করলেন যে কি প্রকারে জিনিসটা ভাইসয়রের হাতে যেতে পারে এবং তাঁর কিছু ব্যয় না হয়। নাবিক ও সৈনিকদের পক্ষে যারা সেটিকে ভাইসরয়ের হাতে তুলে দিলেন তারা ধন্যবাদ লাভ করে কৃতার্থ হলেন। ভাইসরয় আরও বললেন যে তিনি তাদের সদিচ্ছা ও শুভেচ্ছা উপলব্ধি করেছেন এই চমৎকার উপহার মাধ্যমে। তিনি জিনিসটি রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তখন রাজা ছিলেন চতুর্থ ফিলিপ। তিনি তখন পর্তুগাল শাসন কচ্ছিলেন। তিমির চর্বিখণ্ডের দাবীদারগণের এইভাবে আশাভঙ্গ হয়েছিল। রাজা বা ভাইসরয় কারোর কাছেই তারা প্রতিদানে কিছু পাননি।

আর একখণ্ড ভারি তিমি তৈল সম্পর্কে আমি আর একটি কথা বলবো। ১৬৪৬ কি ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে মিডলবার্গের প্রসিদ্ধতম পরিবারের অন্যতম একটি জিল্যাণ্ডার যারা ওলন্দাজ কোম্পানীর পক্ষে মরিস দ্বীপের কর্তৃত্বভার পেয়েছিলেন তারা সেই তৈলখণ্ডটি তীরভূমিতে পেয়ে যান এবং কোম্পানীতে পাঠিয়ে দেন। দ্বীপটি সেন্টলরেন্স-এর পূর্বদিকে অবস্থিত। ওখানকার জনসমাজ সর্বদাই শত্রুবেষ্টিত। তৈলখণ্ডটির উপরে এমন একটি চিহ্ন দেখা গেল যাতে মনে হলো কেউ যেন তার একখণ্ড ভেঙ্গে নিয়েছে। কমাণ্ডারকে দোষী সাব্যস্ত করা হোল. অবশ্য সেই অভিযোগ বাটাভিয়াতে প্রত্যাহৃত হয়েছিল। তাহলেও অনেকের মনেই সন্দেহ স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। কমাণ্ডার দেখলেন যে কর্তৃপক্ষ তাকে আর নিয়োগপত্র দেবেন না। অতএব তিনি জিল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। তিনি যে জাহাজে চ.ড় গিয়েছিলেন আমিও সেটিতে ছিলাম।

অধ্যায় চব্বিশ

কস্তুরী, বেজোয়ার ও অন্যান্য রোগ নিরাময়ক প্রস্তরাদি

বানিজ্যিক বস্তুসমূহের মধ্যে কস্তুরী মৃগনাভি ও বেজোয়ার দুর্লভতম। এটা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। এশিয়া দেশেই তা পাওয়া যায়। এবিষয়ে উপযুক্ত কিছু বিবরণ দানই আমার উদ্দেশ্য।

সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক পরিমাণ মৃগনাভি আমদানী হয় ভুটান রাজ্য থেকে। অতঃপর তা আনীত হয় বাংলাদেশের মুখ্য শহর পাটনাতে। উদ্দেশ্য ওখানে তা বিক্রী করা। পারস্যের প্রয়োজনীয় মৃগনাভিও যায় ওখান থেকেই। যারা কস্তুরী বিক্রয় করেন তারা তার বিনিময়ে হলদে তৈল-স্ফটিক ও প্রবাল গ্রহণ করতে আগ্রহী। সোনা রূপা অপেক্ষা এই জিনিস সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ অধিক। কারণ পূর্বোক্ত দু'টি জিনিসের ব্যবসাতে লাভ ঢের বেশী। এই পশুর একটি চামড়া সংগ্রহের জন্যে আমার কৌতূহল ও আগ্রহ ছিল অত্যধিক। সেটি আমি প্যারিসে এনে দেখিয়েছি।

পশুটিকে হনন করে ওর পেটের নীচে যে থলিটি থাকে তা কেটে নেওয়া হয়। সেটি দেখতে ঠিক একটি ডিমের মত। ওর অবস্থান নাভির থেকেও জননেন্দ্রিয়ের কাছে। কস্তুরীটি থলে থেকে বের করে নেবার নিয়ম। সেই সময় তার চেহারা থাকে ঘনীভূত রক্তের ন্যায়। সংগ্রহকারীরা যখন তাতে ভেজাল মেশাতে চান তখন যকৃতের কিছু অংশ ও খানিকটা রক্ত মিশিয়ে দেন। আর আসল কস্তুরী কিছু বের করে নেন। থলের সেই মিশ্রিত পদার্থে ছোট ছোট এক প্রকার পোকা জন্মায়। তারা মূল মৃগনাভিকে খেয়ে ফেলে। তার ফলে পরে দেখা যায় উৎকৃষ্ট কস্তুরী আর বিশেষ নেই। আর একদল চাষী আছে যারা থলেটি কেটে যতটা সম্ভব কস্তুরী নিষ্কাশন করে তৎ-পরিবর্তে সীসার ছোট ছোট টুকরো পুরে দেন ওজনে ভারি করার জন্যে। যে সকল বণিকরা কস্তুরী কিনে বিদেশে চালান দেন তারা শেষোক্ত জিনিসটি পছন্দ করেন। তার কারণ তাতে পোকা জন্মায় না। আর সেই প্রতারণা আবিষ্কার করাও অত্যন্ত দুরূহ। কেননা পশুটির পেটের চামড়া দিয়েই এমন থলে তৈরী করা হয় এবং তার মুখটি চামড়ার সূতা দিয়ে সেলাই করা থাকে যাতে মনে হয় যে খাঁটি কস্তুরীরই থলে।

নবনির্মিত থলেগুলি পূর্ণ থাকে কিছু খাঁটি কস্তুরী ও তার সংগে ভেজাল জিনিস দ্বারা।

ব্যবসায়ীদের পক্ষে তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে থলেটি খুলেই যদি তার মুখ বন্ধ করা হয় এবং তার মধ্যে যদি হাওয়া প্রবেশ করতে না পারে, গন্ধ বেরিয়ে যাবার অবকাশ না থাকে (অর্থাৎ কিছু বের করে ফেলার সময় যা হতে পারে), তাহলে সেটিকে কারোর নাকের সামনে ধরলে গন্ধের তীব্রতাবশতঃ তার নাক থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। সুতরাং উচিত হচ্ছে ওর গন্ধের তীব্রতা কিছু কমিয়ে সহনীয় করে তোলা যাতে তা মানুষের মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে। আমি এই পশুর যে চামড়াটি প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিলাম তার গন্ধ এত উগ্র ছিল যে ওটি আমার ঘরে রাখা সম্ভব হয়নি। তখন রেখে দিলাম চিলে কোঠার ঘরে। শেষ পর্যন্ত আমার ভৃত্যরা চামড়ায় আবদ্ধ থলেটিকে কেটে ফেলে দিয়েছিল। তার পরেও চামড়াটির গন্ধ ছাড়েনি।

ছত্রিশ ডিগ্রী অক্ষাংশ ব্যতীত এই পশুর সন্ধান পাওয়া যায় না। আর ষাট ডিগ্রীতে গেলে তা পাওয়া যায় প্রচুর সংখ্যক। সেই জায়গাগুলি নিবিড় বনময়। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে সেখানে যে বরফ পড়ে তা প্রায় দশ বার ফুট উঁচু হয়ে জমে। তখন পশু প্রাণীর খাদ্যাভাব হয় নিদারুণ। তার ফলে কস্তুরী মৃগকুল দক্ষিণদিকে ৪৪, ৪৫ ডিগ্রী নীচে নেমে আসে ধান ও দানা শস্যের সন্ধানে। সেই সময়েই চাষীরা ফাঁস এগিয়ে দিয়ে ওদের ফাঁদে আবদ্ধ করে। এতদ্ব্যতীত লাঠির ঘায়ে বা তীর বিদ্ধ করেও ওদের হনন করা হয়। আমি শুনেছি যে মৃগগুলি ঐ সময় খাদ্যাভাবে এত দুর্বল ও রোগা হয়ে যায় যে কতকগুলিকে শিকারী কুকুরের সাহায্যেও ধরা চলে। ওখানে অত্যধিক সংখ্যক এই প্রাণী থাকে বটে এবং প্রতিটির দেহে একটি করে থলেও আছে, তবে তার মধ্যে বৃহত্তমটির আকার সাধারণত: একটি মুরগীর ডিমের মত। তার মধ্যে মাত্র আধ আউন্স আন্দাজ কস্তুরী পাওয়া যায়। এক আউন্স সংগ্রহ করতে অনেক সময় তিন চারটি থলের আবশ্যক হয়।

এই গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডে আমি ভূটানের রাজা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। সেই বিবরণে তাঁর রাজ্যের কথাও স্থান পাবে। আমার আশঙ্কা এই যে কস্তুরী মৃগনাভির ব্যবসাতে এই যে প্রতারণা, তার ফলে ব্যবসাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই জিনিস টন্‌কিন্ অথবা কোচিনেও পাওয়া যায়।

তবে দাম অত্যধিক। কারণ ওদেশে এই জিনিস অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। রাজারও ভীতি হয়েছিল যে প্রতারণামূলক পদ্ধতির জন্যে ব্যবসাটি তাঁর রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত হয়ে না যায়। অতএব কিছুকাল পূর্বে তিনি হুকুম দিয়েছেন যে থলেগুলির মুখ বন্ধ না করে খোলা অবস্থাতেই ভুটানে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে হবে। সেখানে তা পরীক্ষা করা হলে তারপর সীল-মোহরের দ্বারা মুখ বন্ধ করা যাবে। আমি যে কয়েকটি কিনেছিলাম তা এই পদ্ধতিতে সীলমোহর করা। রাজা এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্বেও চাষী বা সংগ্রহকারীরা তা খুলে ছোট ছোট সীসার খণ্ড তার মধ্যে পুরে দেন। এ কথা আমি পূর্বেও বলেছি। ব্যবসায়ীরাও এ বিষয়ে কোন আপত্তি করেন না। কারণ সীসার প্রভাবে মৃগনাভির কোন ক্ষতি হয় না। কেবল ওজনই পরিবর্ত্তিত হয়। আমার পাটনা ভ্রমণের এক দফাতে আমি ৭৬৭৩টি থলে কিনেছিলাম। তাদের ওজন হয়েছিল ২৫৫৭½ আউন্স। আর থলে ছাড়িয়ে কস্তুরী বের করার পরে তার ওজন হয় ৪৫২ আউন্স।

বেজোয়ার (পশু প্রাণীর পাকস্থলীজাত দ্রব্য) আমদানী হয় গোলকুণ্ডা রাজ্যের একটি প্রদেশ থেকে। স্থানটি রাজ্যের উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। এই জিনিস জন্মায় ছাগলের উদরে জাবরকাটা উদ্ভিদ ও তৃণ মধ্যে। সেই বিশেষ উদ্ভিদ একটি চারাগাছ জাতীয়। নামটি স্মরণ নেই। চারা গাছ-গুলির ডালপালার মাথায় ছোট ছোট কুঁড়ি ধরে। ছাগল তা খায়। তারপর ওদের পাকস্থলীতে বেজোয়ার নিষ্কাশিত হয়। ছাগলের পেটেও তা সৃষ্টি হয় সেই কুঁড়ির মত আকারে ও গাছের ডালের ডগটির মত হয়ে। জিনিস-গুলি সেজন্যে নানা ভিন্ন আকারের দেখা যায়। কৃষকরা ছাগলের পেট টিপে টিপে বুঝতে পারেন যে কি পরিমাণ বেজোয়ার জন্মেছে। সেই অনুযায়ী ছাগলের মূল্য নির্ণীত হয়। সঠিক পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণের জন্যে তারা ছাগলের পেটের নীচে হাত দিয়ে বার বার পাকস্থলীতে চাপ দিতে থাকেন। তার ফলে সমস্ত পাথরকে মধ্যস্থলে এনে জমা করা যাবে। তাছাড়া পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ণয়েরও তা অন্যতম পদ্ধতি।

বেজোয়ার মূল্য ধার্য হয় আকারানুসারে। তবে গুণ ও শক্তিতে ছোট-গুলি বড় আকার অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়। গুণের দিকে ও আকার প্রভাবিত হওয়ার আশংকাও যথেষ্ট। কতকলোক আছে যারা গাছের আ ট দিয়ে এক প্রকার কাই তৈরী করে বেজোয়ারের খণ্ডকে আকারে আয়তনে

বড় করে তোলেন। কাই-এর সঙ্গে এমন রঙ মিশিয়ে দেয়া হয় যাতে তা ঠিক বেজোয়ারের মতই রঙ ধারণ করে। তারা জানেন যে কতবার রঙের প্রলেপ দিলে তা খাঁটি বেজোয়ারের মত হয়ে উঠবে। দু'টি উপায়ে সেই প্রতারণা ধরা যায়।

প্রথমতঃ বেজোয়ার খণ্ডকে ওজন করে তারপর তাকে কিছু সময় ঈষদুষ্ণ জলে ভিজিয়ে রেখে। তার ফলে যদি রঙের পরিবর্তন না হয়, যদি ওজনে একটুও কমে না যায় তাহলে বুঝতে হবে জিনিসটি নির্ভেজাল ও খাঁটি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি—একটি সূক্ষ্ম লৌহ শলাকা গরম করে বেজোয়ারের গায়ে ধরে রাখা! শলাকাটি যদি তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তাকে শুকনো করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে জিনিসটি খাঁটি নয়।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বেজোয়ার যত বড় আকারের হয় দামও তার তত বেশী। হীরার যেমন আকারও ওজনানুসারে মূল্য বৃদ্ধি পায়, এক্ষেত্রেও তদনুরূপ। যেমন ধরা যাক—পাঁচ ছয়টি বেজোয়ারের ওজন একত্রে এক আউন্স হলে প্রতি আউন্সের মূল্য ১৫ থেকে ১৮ ফ্রাঙ্ক। কিন্তু একটি পাথরই যদি এক আউন্স হয় তাহলে তার দাম উঠবে ১০০ ফ্রাঙ্ক। আমি ৪½ আউন্স ওজনের একটি বিক্রী করেছি ২,০০০ লিভর অর্থাৎ ১৫০ পাউণ্ড মূল্যে।

বেজোয়ার সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা ও অনুসন্ধান করার উৎসাহ ও কৌতূহল ছিল আমার খুব বেশী। এজন্যে আমি অনেকবার গোলকুণ্ডায় গিয়েছি। সেখানে এই জিনিসের আমদানী যথেষ্ট। কিন্তু কারোর জানা নেই যে ছাগলের দেহের কোন অংশে ঠিক তা জন্মায়। আমার পঞ্চম ভ্রমণ যাত্রায় কয়েকজন ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীর কর্মচারী, যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালাতে সাহস পান না, তাঁরা আমার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন। কারণ আমি তাঁদের জন্যে প্রায় ষাট হাজার টাকা মূল্যের বেজোয়ার কিনেছিলাম। যাঁদের কাছে তা কিনেছিলাম সেই ব্যবসায়ীরা আমাকে প্রতিদানে কিছু উপহার দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি সে বিষয়ে অক্ষমতা জানিয়ে তাঁদের বললাম যে আমি কারোর জন্যে কিছু করে তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করি না। আমি তাদের বলেছিলাম যে মৌসুমীবায়ুর আগমনমুখে আমি পুনরায় তাঁদের কিছু সাহায্য হয়ত করতে পারবো। তখন যদি সম্ভব হয় তাহলে আমার জন্যে তাঁরা এটুকু

করতে পারেন যে বেজোয়ার উৎপন্ন হয়েছে এমন তিন চারটি ছাগল আমাকে সংগ্রহ করে দেবেন। আমি তার ন্যায্য মূল্যদানের প্রতিশ্রুতি দিলাম।

আমার সেই ইচ্ছা ও অনুরোধ শুনে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং বললেন যে বেজোয়ার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এত প্রবল যে কোন লোক যদি এই জাতীয় ছাগল অন্যত্র নিয়ে যাবার উদ্যোগ করেন তবে তার অবশ্যই প্রাণ-দণ্ড হবে। আমি স্পষ্টতঃই দেখলাম যে আমার অনুরোধে তারা বিব্রতবোধ করলেন। একদিকে তারা শাস্তির ভয়ে ভীত; আবার ভাবলেন তাদের এক দফা জিনিস বিক্রী করার কাজ আমি পণ্ড করতে চলেছি। তাদের পক্ষে তা বড় রকমের ক্ষতির কারণ হবে। কেননা, তারা জিনিস বিক্রী করুন, আর নাই করুন ব্যবসাকেন্দ্র চালনার জন্যে রাজাকে ছয় হাজার প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। সেই স্বর্ণ মুদ্রার মূল্যমান আমাদের দেশীয় লিভর মুদ্রাতে হয় ৪৫,০০০। পাউণ্ডের হিসেবে দাঁড়ায় তা ৩৩৭৫। পনের দিন কি তার কাছাকাছি সময় আমি তাদের সম্পর্কে আর কিছু চিন্তা করিনি। কিন্তু তাঁদের তিন জন একদিন ভোর না হতেই এসে আমার দরজায় করাঘাত করলেন। আমি তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি। তাঁরা আমার ঘরে এসেই জানতে চাইলেন যে আমার ভৃত্যরা সকলে বিদেশী কিনা। আমার ভৃত্যদের একজনও সেই সহরের বাসিন্দা ছিলেন না। তাদের কয়েকজন পারসীক, বাকি সকলে সুরাটের লোক। সুতরাং আমি তাদের জানালাম যে ওরা সকলেই বিদেশী। এই কথা শুনে কোন মত মন্তব্য প্রকাশ না করেই তারা চলে গেলেন।

আবার আধ ঘণ্টা পর তারা ছয়টি ছাগল নিয়ে এসে হাজির হলেন। আমি তাদের পরীক্ষা করে দেখলাম। বাস্তবিকই প্রাণীগুলি ছিল অতি সুন্দর। উঁচু গড়নের। পশমও খুব সূক্ষ্ম এবং নরম। ঠিক যেন রেশমের মত। ছাগল কয়টি নির্বিঘ্নে আমার হল ঘরে চলে গেল। ব্যবসায়ীদের মধ্যে যিনি প্রধানতম তিনি পশুগুলিকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি এগিয়ে এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলতে শুরু করলেন যে তাঁরা আমাকে কিছু উপহার দিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু আমি তা গ্রহণ করতে রাজী হই নি। অথচ আমি তাঁদের বড় এক প্যাকেট বেজোয়ার বিক্রয় করার সুযোগ করে দিয়েছি। এখন তাঁরা আমার জন্যে আন্তরিকতাসহ ছয়টি ছাগল নিয়ে এসেছেন। আমি যেন তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত না হই। কিন্তু আমি তা পুরোপুরি উপহার স্বরূপ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হইনি।

আমি পশু কয়টির প্রকৃত মূল্য কত তা জানতে চাইলাম। কিন্তু তা বলতে যেন তাঁদের কুণ্ঠা দেখা গেল। কিছুক্ষণ পর যা দাম বললেন তা শুনে মনে হোল তাঁরা যেন বিদ্রূপ কচ্ছেন। কারণ প্রথম যে ছাগলটির দিকে অংগুলি নির্দেশ করলেন তার দাম তিন টাকা। পরবর্তী দু'টি চারটাকা করে। তা শুনে আমি প্রশ্ন করলাম যে কয়েকটির দাম বেশী কেন। তখন জানা গেল যে একটি ছাগলের পেটে বেজোয়ার আছে মাত্র এক খণ্ড। আর অন্যান্যগুলির মধ্যে রয়েছে দুই তিন বা চারটি পাথর। তখন আমি নিজেই ওদের পেট টিপে টিপে পরখ করে দেখতে প্রয়াসী হলাম। এইভাবে পরীক্ষণের কথা আমি ইতিপূর্বেও বলেছি। সেই ছয়টি ছাগলের পেটে ছিল সতেরটি বেজোয়ার। তার অর্ধেক আন্দাজের আকার একটি বাদামের আধখানার মত। তার অভ্যন্তর ছাগলের নরম বিষ্ঠার ন্যায়। এর কারণ, বেজোয়ার ছাগলের পাকস্থলীতে খাদ্যের মধ্যেই জন্মায়। অনেকে আবার বলেন যে তা পশুটির যকৃতের পাশে সৃষ্টি হয়। কারোর ধারণা হৃৎপিণ্ডের পাশে থাকে। কিন্তু কোন মতেরই সত্যতা নির্ণয় করতে পারিনি।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশেই গরুর দেহে প্রচুর বেজোয়ার পাওয়া যায়। তার মধ্যে এমন কিছু থাকে যার ওজন সতের আঠার আউন্স পর্যন্ত হয়। তদনুরূপ একটি দেয়া হয়েছিল তা'''কানির মহান ডিউককে। তবে গরুর দেহাভ্যন্তরে প্রাপ্ত বেজোয়ার সম্পর্কে কারোর কোন আগ্রহ দেখা যায় না। কারণ ছাগ দেহে প্রাপ্ত ছয় গ্রেণ ওজনের একটির কাছে গরুর শরীরে জাত ত্রিশটিও দাঁড়াতে পারে না।

বাঁদরের শরীরে উৎপন্ন বেজোয়ার সম্বন্ধে অনেকের ধারণা যে তার দুই গ্রেণ ছাগলের দেহস্থিত ছয় গ্রেণের কাজ দেয়। তবে বাঁদরের বেজোয়ার অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তু। মাক্কাসার দ্বীপের বাঁদরের শরীরেই বিশেষভাবে তা পাওয়া যায়। সেই জিনিস গোলাকার কিন্তু অপরাপর জন্তুর দেহে যা জন্মায় তা নানা ভিন্ন আকারের। আর তা গঠিত হয় যে ধরণের কুঁড়ি ও ডালপালা ওরা খায় সেই অনুযায়ী। বাঁদরের দেহে জাত এই পাথর দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে এর মূল্যমানও অতিরিক্ত। সকলেই এই জিনিস অনুসন্ধান করেন। আর বাদামের মত আকারের একটি হলে তার দাম হয় অত্যধিক। অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় পর্তুগীজরা বেজোয়ার সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন। কারণ তাঁরা একে অপরকে সর্বদা সন্দেহের চোখে দেখেন। শত্রুতা হলেই কারোকে বিষ প্রয়োগ করা হয়। বেজোয়ার বিষ প্রতিষেধক।

শজারুর দেহে আর এক প্রকার পাথর জন্মায়। তাও বিশেষ আগ্রহের বস্তু। সে জিনিস পাওয়া যায় শজারুর মাথায়। বিষক্রিয়ার প্রতিষেধে বেজোয়ার অপেক্ষা এই জিনিস ঢের বেশী উপকারী। পনের মিনিট আন্দাজ সময় জিনিসটি জলে ভিজিয়ে রাখলে সেই জল এমন তেঁতো হয় যে মনে হবে পৃথিবীতে সেরকম তিক্ত বস্তু বোধহয় আর নেই। এই প্রাণীর পেটেও অনেক সময় এক রকম পাথর জন্মে যা মস্তকে জাত জিনিসেরই মত। তবে একটি বিষয়ে প্রভেদও আছে। তা হচ্ছে যে শেষোক্তটিকে জলে ভিজিয়ে রাখলে তার আকার ওজনের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু প্রথমটি তাতে ওজনে হ্রাস পায়। আমি সারা জীবনে এই পাথর কিনেছি তিনটি। তার মধ্যে একটির দাম পড়েছিল অত্যন্ত বেশী। আমি পরে সেটিকে বিক্রী করেছিলাম ভিনিশীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত দোমিনিকে দে সান্তিসের কাছে। পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তে আমি তাঁর কথা বলেছি। আরও একটি শজারু পাথর কিনে-ছিলাম চড়া দামে। সেটি আজও আমার কাছে আছে। তৃতীয় আর একটি দামী পাথর উপহার দিয়েছি এক বন্ধুকে।

এখন আমি বিষ পাথরের কথা আলোচনা করবো। তার এক একটির আকার স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রার মত। কতকগুলি আবার ডিম্বাকার। এগুলির মধ্যভাগ পুরু, আর কিনারাসমূহ পাতলা। ভারতীয়রা বলেন যে এই পাথর বিশেষ এক জাতের সাপের মাথায় জন্মায়। কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দু সমাজের পুরোহিত সম্প্রদায় তাঁদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আসলে তা কয়েকটি বিশেষ ধাতব ঔষধ জাতীয় বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরী। যা দিয়েই তৈরী হোক, এর কিন্তু বিষ টেনে বের করার অদ্ভুত শক্তি আছে। কোন মানুষকে বিষাক্ত প্রাণীতে দংশন করলে সেখানে এই পাথর বসিয়ে দিলে বিষ নিষ্কাশিত হয়ে যায়। দংশিত স্থানে ক্ষত সৃষ্টি না হলে জায়গাটিকে কেটে দেয়া দরকার যাতে কিছু রক্ত বেরোয়। তারপর পাথরটিকে বসিয়ে দিলে যতক্ষণ সমুদয় বিষ নিষ্কাশিত না হবে ততক্ষণ ওটি সেখানে আটকে থাকবে, খুলে পড়বে না কিছুতেই। পাথরটিকে অতঃপর পরিষ্কার করা হয় নারী স্তন্যের মধ্যে ডুবিয়ে। তা যদি সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় তাহলে গরুর দুধের দ্বারাও সে কাজ হতে পারে। দশ বার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে পাথরটি যে বিষ টেনে নিয়েছে তা দুধের সংগে মিশে যাবে। আর দুধও তখন বিবর্ণ ও বিষময় হয়ে উঠবে।

আমি একদিন গোয়ার আর্চবিশপের সংগে সান্ধ্য ভোজন করি। সেই দিন তিনি আমাকে তাঁর সংগ্রহাগারে নিয়ে যান। সেখানে ছিল অনেক দুষ্প্রাপ্য জিনিস। তার মধ্যে একটি ছিল বিষ পাথর। এর উপাদান সম্বন্ধেও তিনি আমাকে বলেছিলেন। আরও জানালেন যে মাত্র তিনদিন পূর্বে এর গুণাগুণ পরীক্ষা করার অবকাশ পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেটি আমাকে উপহার দিলেন। একদিন তিনি সল সেট দ্বীপের একটি স্থানে যাবার সময় একটি জলাভূমি অতিক্রম করেন। এই দ্বীপটির মধ্যেই গোয়া অবস্থিত। তাঁর পাল্‌কী বাহকদের মধ্যে একজন ছিল প্রায় নগ্নদেহ। তখন সেই লোকটিকে সাপে কামড়ে দেয়। তিনি সেই পাথরটি দ্বারা লোকটিকে বিষ মুক্ত করেন। আমি এই পাথর কিনেছিলাম অনেকগুলি। ব্রাহ্মণরাই কেবল তা বিক্রী করেন। সেজন্যেই আমার মনে হয়েছে যে তাঁরাই এই জিনিস তৈরী করেন। দু'টি উপায়ে সর্প প্রস্তর (বিষ পাথর) পরখ করে দেখা যায় যে তা প্রকৃত খাঁটি জিনিস, না ভেজাল মিশ্রিত। প্রথমত পাথরটিকে মুখে পুরে দেয়া। জিনিসটি খাঁটি হলে তা তখুনি লাফিয়ে গিয়ে তালুতে আবদ্ধ হবে। দ্বিতীয় পন্থায় পাথরটিকে এক গ্লাস জলে ফেলে দিলে তৎক্ষণাৎ জল ফুটতে আরম্ভ করবে। গ্লাসের তলায় পাথরটি পড়ে থাকবে। আর তা থেকে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ সৃষ্টি হয়ে উপরে উঠে আসবে।

আরও এক প্রকার পাথর আছে। তাকে বলে "গোখুরা সাপের পাথর"। এক প্রকার পাথর আছে যার মাথার পেছনে একটি ফণার মত দেহাংশ ঝোলানো থাকে। সেই ফণার পেছনে পাথরটি থাকে। সর্বাপেক্ষা ছোট পাথরটির সাইজ হয় একটি মুরগীর ডিমের মত। এশিয়া ও আফ্রিকাতে বিরাট আকারের সব সাপ আছে। লম্বায় তা পঁচিশ ফুট পর্যন্ত হয়। বাটাভিয়াতে তার চামড়া সংরক্ষণের প্রথা আছে। সেই সাপ (অজগর) আঠার বছর বয়সের একটি মেয়েকে গিলে ফেলেছিল। তার বিবরণ আমি অন্যত্র দিয়েছি। এই পাথর পাওয়া যায় এমন সাপের দেহে যাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আকারের গুলির দৈর্ঘ্য মাত্র দু' ফুট। পাথরগুলি শক্ত নয়। অন্য পাথরের সংগে তাকে ঘসলে এক প্রকার আঁটালো জিনিস বেরোয়। তা জলে মিশিয়ে পান করলে মনুষ্য দেহের বিষক্রিয়া তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। এই জাতীয় সাপ দেখা যায় একমাত্র মেলিণ্ডা উপকূলে। পাথর পাওয়া যেতে মোজাম্বিক প্রত্যাগত পর্তুগীজ নাবিক ও সৈনিকদের কাছে।

অধ্যায় পঁচিশ

এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল স্থানে সোনা উৎপন্ন হয়।

চীনদেশের পূর্বদিকে জাপানে অনেক দ্বীপ আছে। তা এগিয়ে গেছে উত্তর খণ্ডে। অনেকের ধারণা সেই সকল দ্বীপের মধ্যে নিপ্পন বৃহত্তম এবং মূল ভূখণ্ডের সংগে যুক্ত। এশিয়ার মধ্যে এই স্থানটিতে সোনা পাওয়া যায় সর্বাধিক। কিন্তু অধিকাংশ সোনা উৎপন্ন হয় ফরমোসা দ্বীপে। সেখান থেকে তা জাপানে যায়। ওলন্দাজগণ কর্তৃক ফরমোসা অধিকৃত হতে তাঁরা ওখানকার স্বর্ণ ব্যবসায়কে আর উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে পারেনি। অথচ তাঁদের ধারণা যে ওখানেই সোনা জন্মায়।

চীনেও স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। চৈনিকরা তা রূপার সংগে বিনিময় করেন। বিনিময় চলে উভয়বিধ ধাতুর মূল্যমান অনুসারে। তাঁরা সোনা অপেক্ষা রূপার দিকে বেশী ঝোঁক দেখান এই কারণে যে তাঁদের দেশে রৌপ্য খনি নাই। কিন্তু তাঁদের দেশের সোনা এশিয়ার যে কোনও দেশে প্রাপ্ত সোনার চেয়ে নিকৃষ্ট।

সেলিবিস বা মাক্কাসার দ্বীপেও সোনা জন্মায়। তা পাওয়া যায় নদীতে। সেখানে তা বালির সংগে মিশ্রিত থাকে।

সুমাত্রা দ্বীপে বর্ষা ঋতু অন্তে স্রোতস্বিনীসমূহের জল যখন শুকিয়ে যায় তখন বিভিন্ন আকারের উপল খণ্ড মধ্যে সোনার সূক্ষ্ম সব কুচো পাওয়া যায়। উত্তর পূর্ব মুখো পাহাড় থেকে বৃষ্টির ধারা তা বয়ে নিয়ে আসে। এই দ্বীপেরই পশ্চিম উপকূলে ওলন্দাজগণ জাহাজে মরিচ তুলতে যান। সেখানেও চাষীরা— প্রচুর সোনা নিয়ে আসে। তবে তা অতি নিকৃষ্ট ধরণের। এমন কি চীনদেশীয় সোনা অপেক্ষাও তা হীন।

কাশ্মীর সীমান্তের বাইরে একটি রাজ্য তিব্বত। রাজার শাসনাধীন। প্রাচীনকালের ককেশাসের মত। সেখানে একটির পর আর একটি করে তিনটি পর্বত আছে। তার একটি পাহাড়ে চমৎকার ও উৎকৃষ্ট সোনা উৎপন্ন হয়। বাকি দু'টির একটিতে পাওয়া যায় গ্রানাইট পাথর, আর দ্বিতীয়টিতে আছে উজ্জ্বল নীলবর্ণ পাথর।

স্বর্ণ খনির শেষ বিবরণে উল্লেখযোগ্য স্থান হোল টিপ্‌রা (টিপ্পেরা ?) রাজ্য। পরবর্তী গ্রন্থ খণ্ডে আমি তার বর্ণনা দেব। তবে সেখানে প্রাপ্ত সোনা অত্যন্ত অপকৃষ্ট ধরণের। প্রায় চীনদেশীয় সোনার অনুরূপ।

এশিয়াস্থিত স্বর্ণাকর সম্বন্ধ স্থানসমূহের বিবরণ এই। এখন আফ্রিকার সোনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করবো। আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশী সোনা উৎপন্ন হয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মোজাম্বিকের গভর্ণরের অধীনে থাকেন শোফল ও সুপঙ্গের কম্যাণ্ডারগণ। এই দু'টি ছোট স্থানের প্রথমটি সেনা নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর মোহনা থেকে ষাট লীগ দূরে। দ্বিতীয়টির অবস্থান দশ লীগ উচ্চস্থানে। নদীর মুখ থেকে এই দু'টি স্থান পর্যন্ত দু'দিকে বহু সংখ্যক নিগ্রো উপনিবেশ। প্রতিটি ভূবাসন এক একজন পর্তু-গীজের অধিনস্থ। বহুদিন ধরে পর্তুগীজরা দেশটির শাসক। তাঁদের ধরণ ধারণ ছোটখাট রাজার মত। একে অপরের সংগে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত হন সামান্য সব ব্যাপার উপলক্ষ্য করে। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের পাঁচ হাজার পর্যন্ত কাফ্রী দাস আছে। এই রাজারা মোজাম্বিকের গভর্ণরের অধিনস্থ। তিনিই ওদের জামা পোষাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করেন। তিনি যে সকল জিনিস সরবরাহ করেন তার মূল্য নির্ধারিত হয় বাজার দর অনুসারে। মোজাম্বিকের গভর্ণর যখন গোয়া ত্যাগ করে তাঁর কর্মভার গ্রহণ করতে গেলেন তখন তিনি প্রচুর জিনিসপত্র, বিশেষত কালো রঙের সূতী বস্ত্র সংগে নিয়ে যান।

গোয়ার ভাইসরয়ের অধিনস্থ স্থানগুলির মধ্যে মোজাম্বিক শ্রেষ্ঠ। গোয়াস্থিত তাঁর প্রতিনিধি প্রতি বছর দু'টি জাহাজ বোঝাই করে কাপড় পাঠাতেন তাঁকে। তিনি আবার তা পাঠিয়ে দিতেন সোফলা ও সুপঙ্গাতে। তারপর সেই কাপড় আরও যেত মনোমোতপা রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত। রাজ্য ও রাজধানীর একই নাম। এর অপর আর একটি নাম বুবেবরণ। এর অবস্থান সুপঙ্গা থেকে ১৫০ লীগ দূরে। এই সকল দেশের যিনি শাসক তাঁর উপাধি হোল মনোমোতপার সম্রাট। তাঁর অধিকার আবিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মনোমোতপা রাজ্যেই আফ্রিকার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোপেক্ষা খাঁটি সোনা উৎপন্ন হয়। সেখানে সোনা অনায়াসেই আহরণ করা সম্ভব। কেননা দুই তিন ফুট মাটি খুঁড়লেই তা পাওয়া যায়। এই

দেশের কতকগুলি জায়গায় মানুষের বসতি নেই। কারণ হোল জলাভাব। জল একেবারেই নেই। ওখানে জমির উপরেই নানা আকার ওজনের খণ্ড খণ্ড সোনা পাওয়া যায়। এমন এক একটি খণ্ড দেখা যায় যার ওজন এক আউন্স। দুষ্প্রাপ্য বস্তু হিসেবে আমি তার কয়েকটি খণ্ড সংগ্রহ করেছিলাম। তা আমি বন্ধুদের উপহার দিয়েছি। তার মধ্যে কয়েকটি টুকরো দুই আউন্স ওজনেরও ছিল। এখনও আমার কাছে দেড় আউন্স একটি খণ্ড আছে। আমি সুরাটে এম. দ্য. জার্ডিনের পুত্র আর্দিলিয়রের আবাসে কিছুদিন ছিলাম। এঁর কথা আমি আমার পারস্য ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছি। তখন আবিসিনিয়ার রাজদূত ওখানে আসেন। আমরা তাঁকে অভিবাদন জানাতে যাই। আমি তাঁকে রূপার নকসাযুক্ত এক জোড়া পকেট-পিস্তল উপহার দিয়েছিলাম।

তিনি একদিন আমাদের সান্ধ্য ভোজনে আপ্যায়িত করেন। তখন তিনি আমাদের অনেক জিনিস দেখান। তা তিনি নিয়ে এসেছিলেন স্বদেশের রাজার পক্ষ থেকে মুঘল সম্রাটকে উপহার দানের জন্যে। তার মধ্যে ছিল চৌদ্দটি চমৎকার ঘোড়া। তিনি সবশুদ্ধ ত্রিশটি অশ্ব এনেছিলেন স্বদেশে থেকে। কিন্তু বাকি পশুগুলি মোচা থেকে সুরাটে আসার পথে জাহাজে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনি আরও এনেছিলেন স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে কিছু সংখ্যক তরুণ কৃতদাস। পরিশেষে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় জিনিস যা দেখলাম তা হোল দুই ফুট চার ইঞ্চি লম্বা একটি স্বর্ণময় বৃক্ষ। তার ডাপালার বিস্তার ব্যাস চারদিকে পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি। ডাল ছিল দশ বারটি। তাদের কয়েকটি প্রায় আধ ফুট লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া। বাকি সব ক্ষুদ্রাকার। বড় বড় শাখার কিছু অংশ উঁচুনীচু গড়নের। তা দেখতে কিছুটা কুঁড়ির মত আকারের। গাছটির শিকড়গুলি খানিকটা স্বাভাবিকরূপে তৈরী। তবে তা ছোটখাট। দীর্ঘতমটি চার পাঁচ ইঞ্চির বেশী নয়।

মনোমোতপা রাজ্যের বাসিন্দাগণের জানা থাকে যে কোন সময়ে সূতী বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস সোফলা ও সুপঙ্গাতে পৌঁছোয়। সুতরাং তারা সময় মত সেখানে গিয়ে হাজির হন নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্যে। অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশ সমূহের কাফ্রীরাও এসে ভিড় জমান। পূর্বোক্ত দুই প্রদেশের গভর্ণরগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী সূতী কাপড় ও অপরাপর জিনিস বিক্রয় করেন ধারে বাকিতে। তাঁরা ব্যবস্থা ও বিশ্বাস রাখেন যে ক্রেতারা আগামী বছরে সোনা এনে ন্যায্য পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে

দেবেন। তার গভর্ণরদের যদি এ বিষয়ে আস্থা না থাকে তাহলে পর্তুগীজ ও কাফ্রীদের মধ্যে কোন ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। ইথিয়োপীয়দের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থা। তাঁরা প্রতি বছর কায়রোতে সোনা নিয়ে যান। সেই সম্পর্কে আমি মহান সিগনোরে সেরাগ্লেয়োর বিবরণ দান প্রসংগে উল্লেখ করেছি।

মনোমোতপার অধিবাসীরা দেশটির নিকৃষ্ট জলের জন্যে দীর্ঘায়ু হতে পারেন না। পঁচিশ বছর বয়স হতেই তাদের দেহে শোথ রোগ দেখা দেয়। কাজেই তারা যদি চল্লিশ বছর অতিক্রম করে কিছুদিন জীবিত থাকেন তাহলে তা হয় অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। সেনা নদীর উৎপত্তিস্থল সোকরণ। এই দেশটি অপর আর একজন রাজার অধিনে। সুপঙ্গার উর্দ্ধসীমায় একশত লীগ দূরে কি তার কাছাকাছি একটির উৎস। সেনা নদীতে পতিত আরও অনেক নদীতে প্রচুর সোনা কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই সোনাও সোফলা ও সুপঙ্গাতে নিয়ে যাওয়া হয়। জায়গাটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। অধিবাসীদের জীবনসীমা ও পরমায়ু ইউরোপীয়দের মত। কোন কোন বছরে মোকরণ প্রদেশ অপেক্ষা বহুদূরবর্ত্তী স্থানসমূহের কাফ্রীরাও ওখানে এসে জড় হন। এমনকি উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চলের মানুষও আসেন।

পর্তুগীজরা দেশটির সঠিক নাম জানেন না। কাফ্রীদের কাছে তারা শুনেছেন যে দেশটির নাম সাবিয়া। একজন রাজা শাসন করেন। কাফ্রীরা সোফলার রাস্তায়ই চার মাস সময় অতিবাহিত করেন। তাদের সংগৃহীত সোনা অতি চমৎকার। মনোমোতপার সোনার ন্যায় এগুলিও খণ্ডাকার। তারা বলেন যে তা সংগৃহীত হয়েছে উচ্চ পর্বতশ্রেণীতে। সেখানে দশ বার ফুট গভীর করে খুঁড়লেই সোনা পাওয়া যায়। এরা গজদন্তও নিয়ে আসেন প্রচুর। তারা বলেন যে ঐ অঞ্চলে অনেক হাতী আছে। মাঝে মাঝে ওদের দলবদ্ধ হয়ে বেরোতে দেখা যায়। কেল্লা ও উদ্যানে বেড়ার খুঁটি তৈরী হয় গজদন্ত দিয়ে। আমি অন্যত্রও এই প্রথা দেখেছি। কাফ্রীদের সাধারণ খাদ্য পশুর মাংস। তারা চার জন মিলে বর্শাজাতীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করে হাতীকে ভূতলশায়ী করেন, তারপর হনন করা হয়। ওদেশের সমস্ত জলই দূষিত। জলের জন্যেই তাদের পা শোথ রোগে আক্রান্ত হয়। এক আধজনকে যদি এই রোগ মুক্ত দেখা যায় তাহলে তা বিস্ময়কর ব্যাপার।

সোফলার উপরিভাগে জনৈক রাজার শাসনাধীনে একটি দেশ আছে। নাম ‘ধারোই’। দেশটির কিছু অংশে এক প্রকার মূল জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়।

তা এক ইঞ্চি মোটা ও হলদে রঙের। যে জ্বরে বমি হয় তা এই উদ্ভিদে আরোগ্য হয়। এর ফলন অতি সামান্য। সেজন্যে রাজার নিষেধাজ্ঞা আছে যে তা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। তাহলে কঠোর শাস্তির বিধান থাকবে। দোম্ ফিলিপ দে মাসকারেনস্ গোয়াতে ভাইসরয় ছিলেন। সেই সময় কারোইর রাজা তাঁকে প্রায় তিন ফুট লম্বা একখণ্ড এই মূল (শিকড়) পাঠিয়েছিলেন। তার দু'দিকে সোনার অলঙ্করণ সজ্জা ছিল। আর মাঝখানে ছিল সোনার আংটি। ভাইসরয় তা পেয়ে অত্যন্ত খুসী হন। তিনি সেটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুকে উপহার প্রদান করেন। দুই খণ্ড পাঠিয়েছিলেন সুরাটের ইংরেজ প্রেসিডেন্ট মিঃ ফ্রেমলিনকে। তিনি আমাকে তা দেখিয়েছিলেন। একটি টুকরো আমি জিহ্বাতে রাখতেই দেখলাম তার স্বাদ অতি মাত্রায় তেঁতো।

জাপান ব্যতীত এশিয়ার আর কোথাও রৌপ্য খনি নেই। কয়েক বছর পূর্বে অতি উত্তম টিনের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে দেলেগোর, সঙ্গোর, বোর্দেলন ও বাতাতে। তার ফলে ইংরেজদের কিছু ক্ষতি হয়েছে। কারণ পূর্বের ন্যায় তাঁদের টিনের চাহিদা আর রইল না। এশিয়াতেই এখন তা প্রচুর উৎপন্ন হচ্ছে। ওদেশে টিনের ব্যবহার হয় কেবলমাত্র রান্নার বাসন কেট্‌লি ও তামার তৈজসপত্র তৈরী করার জন্যে।

অধ্যায় ছাব্বিশ

গোমরুণ ছেড়ে সুরাট অভিমুখে যাত্রাকালে একটি বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। আমি গোমরুণ ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত। ওলন্দাজ কোম্পানীর জনৈক দালালের একটি জাহাজে চেপে আমার সুরাট যাত্রার সময় আসন্ন। জাহাজটি চালানোর ভার ছিল কাপ্তেন হনুসের উপরে। এমন সময় ইংরেজ প্রতিনিধি আমাকে এক বাণ্ডিল চিঠি দিলেন সুরাটের প্রেসিডেণ্টকে পৌঁছে দেবার জন্যে। চিঠিগুলি ইংলণ্ড থেকে এসেছিল দ্রুতগামী যানে। প্যাকেটটি অত্যন্ত বড়। কোম্পানীর চিঠিপত্র ছাড়া তার মধ্যে এজেন্ট মহোদয় আরও সব চিঠি পুরে দিয়েছিলেন যা সুরাট ও ভারতের অন্যান্য স্থানের লোকদের ব্যক্তিগত। আমার যাত্রার দিন সন্ধ্যায় আমি প্যাকেটটি গ্রহণ করলাম। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন জনৈক ওলন্দাজ। নাম এম. কাসেমব্রট। তিনি স্থল পথে পারস্যে এসেছিলেন। গোমরুণের কম্যাণ্ডার এম. হেনরী ভান উকের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। ইংরেজ প্রতিনিধির সঙ্গে আমি যখনই দেখা করতে যেতাম কাসেমব্রট আমার সঙ্গে থাকতেন। আর ভান উকের সংগে দেখা হলে প্রতিবারেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করতেন যে ইংরেজ প্রতিনিধি আমাকে সুরাটে নিয়ে যাবার জন্যে কোনও চিঠিপত্র দিয়েছেন কিনা। তদুত্তরে আমি অকপটভাবে বলেছিলাম যে তিনি আমার মারফত কিছু চিঠি পাঠাবেন বলেছেন। কিন্তু এই দু'টি লোকের কু-মতলব সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ হয়নি। পরে বোঝা গেল যে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সেই চিঠির বাণ্ডিল হস্তগত করা। এর কারণ, তখন একটা জনরব উঠেছিল যে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে একটা বিরোধ চলছে। অতএব ওখানকার ইংরেজরা নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু সংবাদ পেয়েছেন বা পাবেন। এই বিষয়ে তাঁদের মনে আরও গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল এই কারণে যে জনৈক আরবীয় দূত মরুভূমির রাস্তা ধরে ওখানে এসেছিলেন এবং ইংরেজ প্রতিনিধির জন্যে এক প্যাকেট চিঠি এনেছিলেন। তা দেখেই কম্যাণ্ডার ভান উকের তীব্র দুশ্চিন্তা হয়েছিল।

ইংরেজ প্রতিনিধি আমাকে চিঠির বাণ্ডিল দান করা মাত্র কাসেমব্রট গিয়ে ভান উককে সমস্ত ঘটনা, এমনকি বাণ্ডিলটির সাইজ আকার প্রকার সব

জানিয়ে এলেন। তাছাড়া কাসেমবট সর্বক্ষণ আমার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সেই সময় ইংরেজ প্রতিনিধি আমার যাত্রা উপলক্ষ্যে শুভকামনা করে আমাকে এক পাত্র সুরা প্রদান করেন। আমি তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করে তা পান করি এবং ভান উকের কাছে বিদায় গ্রহণ করতে চলে যাই। কিন্তু তিনি বললেন যে তাঁর সংগে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব শেষ না করে আমার যাওয়া চলবে না। আমাকে প্রায় জোর করে তিনি আটকে রাখলেন। আমার সংগে এই জাতীয় ব্যবহারের মূলে ছিল তাঁর কু-কৌশলকে কার্য্যে পরিণত করার জন্যে অধিকতর সময় ও সুযোগ লাভ করা। তিনি আমার সংগে যেতে পারবেন না বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আমরা খাবার টেবিলে থাকতেই তিনটি জাহাজ এসে নোঙর ফেললো। তিনি জাহাজে চড়ার জন্যে আমাকে তাঁর নিজস্ব নৌকা দিলেন। সংগে পাঠালেন তাঁর অফিসের চার পাঁচ জন কর্মীকে। ভাবটি দেখা গেল যে তারা আমাকে প্রহরা দিয়ে নিয়ে যাবেন। জাহাজের কাপ্তেনও তাদের সংগে ছিলেন। তাঁর সংগে এবিষয়ে তিনি কথা-বার্তা বলে রেখেছিলেন মনে হয়।

আমি জাহাজে উঠতেই কাপ্তেন আমাকে তাঁর খাস কেবিনটিতে থাকার জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। ইতিমধ্যে তিনি আমার ভৃত্যদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন আমার বিছানাপত্র সেখানে নিয়ে রাখার জন্যে। ভৃত্যরা দু'দিন পূর্বেই জাহাজে উঠে অপেক্ষারত ছিলেন। আমি এই সব ব্যাপারে আপত্তি তুলতে কাপ্তেন আমাকে বললেন যে কম্যাণ্ডার তাঁকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হুকুম দিয়েছেন। তথাপি আমি বললাম যে তাঁর ক্যাবিনে যেতে আমি রাজী নই। তবে এই সর্তে আমি রাজী হতে পারি যে ক্যাবিনটিতে সমান অংশে তিনি ও আমি দু'জনে থাকবো। এই ব্যবস্থা সমর্থিত হতে আমি আমার বড় কোটের পকেট থেকে ইংরেজী চিঠির বাণ্ডিলটি টেনে বের করলাম। অতঃপর সেটি আমার জনৈক ভৃত্যের হাতে দিয়ে আমার বাক্সতে রেখে দিতে বললাম। সে আমার বাক্সটি রেখেছিল জাহাজের এক কিনারায় আমারই বিছানার এক পাশে। আমাদের সংগে সংগে জাহাজের দিকে আরও দু:খানি ছোট নৌকা গিয়েছিল। তাতে ছিল ষাটটিরও বেশী রৌপ্য মুদ্রাপূর্ণ থলি। কতকগুলিতে পঞ্চাশ, আর বাকিগুলিতে একশত করে তোমান মণি মুদ্রা ছিল। এই কাজে ব্যবহারের জন্যেই থলিসমূহ পারস্যে তৈরী হয়েছিল। নৌকাগুলি জাহাজের কাছে পৌঁছতেই মাঝি

মাল্লারা থলির বহরকে জাহাজে তুলতে লাগলো। কিন্তু কাজ চলছিল অতি মন্থর গতিতে। সেই মন্থরতার মুখ্য কারণ ছিল আমাদের সারারাত সেখানে বিলম্ব করানো। আর আমি যাতে বিছানায় গিয়ে শয়ন করতে বাধ্য হই। তা সত্বেও তাঁরা দেখলেন যে আমি বিশ্রামে যেতে অনিচ্ছুক।

তখন কাপ্তেন, জাহাজ চালক, এবং কোম্পানীর দালাল, যিনি জাহাজের মালিক, যাঁর কথা আমি আগেও বলেছি, তাঁরা সকলে ওলন্দাজগণের সংগে পরামর্শ করলেন। সকলে মিলে সম্ভবতঃ স্থির করলেন যে একশত তোমান শুদ্ধ একটি থলি জাহাজে তোলার সময় যাতে জলে পড়ে যায় সেই রকম অবস্থা সৃষ্টি করবেন। এই ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁদের কু-অভিসন্ধিকে কাজে লাগানোর জন্যে। থলিটি জলে পড়ে যাওয়া মাত্র তাঁরা গোমরুণে একটি নৌকা পাঠালেন একজন ডুবুরীর সন্ধানে। ডুবুরী প্রভাত হতেই জাহাজে এসে পৌঁছোলেন জলে ডুবে থলিটি উদ্ধারের জন্যে। দেখা গেল যে জাহাজটির আগামীকাল বেলা দুই কি তিনটার পূর্বে যাত্রা শুরু করা চলবে না। কাজেই আমি শয়ন করতে চলে যাই। আমার বাক্স পেটরা কিন্তু সারাটা সময় সেই একই জায়গায় ছিল, অর্থাৎ তার অর্ধেকটা আমার বিছানার মাথারদিকে তলদেশে, আর বাকিটা বাইরে।

আমার ভৃত্যরা বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল গোলন্দাজগণের কেবিনে। আমি যখন কাপ্তেনের কেবিনে ঘুমিয়েছিলাম তখন আমার পেটিকা নিঃশব্দে টেনে বের করা হয়। আর তা খুলে চিঠির সেই বাণ্ডিল সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। তৎপরিবর্তে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলেন অনুরূপ আকার ওজনের উত্তম সীলমোহরাঙ্কিত আর একটি প্যাকেট। তার মধ্যে স্থান পেয়েছিল কিছু সাদা কাগজপত্র। মতলব করে যে টাকার ব্যাগটিকে জলে ডুবে যেতে দেয়া হয়েছিল নিজেদের কু-অভিসন্ধিকে সফল করার জন্যে, সেটি উত্তোলিত হোল সময়মত। তারপর জাহাজ ছাড়লো। আমরা ৫ই মে সুরাট বন্দরে পৌঁছে গেলাম। ওলন্দাজ কম্যাণ্ডার আমার সম্মানার্থে সমুদ্র মধ্যে প্রায় দুই তিন লীগ দূরে নৌকা পাঠিয়েছিলেন আমাকে তীরভূমিতে নিয়ে যাবার জন্যে। নৌকাটি আকারে ছিল ছোট। প্রায় মধ্য রাত্রিতে আমি তীরভূমিতে পৌঁছে যাই। আমার ইচ্ছা হয়েছিল সর্বাগ্রে গিয়ে আমি ডাচ কম্যাণ্ডারকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

জাহাজ ছেড়ে আমাদের অবতরণকালে ওখানে দুই জন কাপুসীন বিশপ উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম আমার পেটিকাস্থিত সেই চিঠির বাণ্ডিলটি ইংরেজ প্রেসিডেন্টের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে। তাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে। আমি পেটিকা থেকে বাণ্ডিলটি বের করে নিলাম। কিন্তু তাঁরা আমাকে বললেন যে সেই সময়টি তত উপযুক্ত নয়। কারণ গেঁটে বাত রোগে আক্রান্ত প্রেসিডেন্ট তখন অবশ্যই নিদ্রামগ্ন। সেই সময় তাঁর ঘুম ভাঙানো সমীচিন হবে না। সুতরাং তাঁরা আগামী দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমাকে সংগে নিয়েই তাঁর কাছে যাবেন। আর আমি স্বহস্তে চিঠির প্যাকেটটি তাঁর হাতে দিতে পারবো। কিন্তু জানা গেল যে বাতের যন্ত্রণায় তিনি যথাসময়ে নিদ্রা যেতে পারেননি। তার ফলে তখনই তাঁকে চিঠিগুলি প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট তাঁর মুখ্য কর্মচারীদের সামনেই প্যাকেটটি খুলে ফেললেন। আর দেখা গেল যে খামের মধ্যে চিঠির মত ভাঁজ করা কিছু কাগজ রয়েছে কোন চিঠিপত্র আদৌ নেই। আমি সেকথা শুনেই বুঝতে পারলাম যে ভান উক ও তাঁর সহযোগীরা আমাকে নিদারুণ প্রতারণা করেছেন। আমি তখন আমার পেটিকাটি পরীক্ষা করলাম। দেখলাম যে আমার একটি মণিরত্নও অন্তর্হিত হয়েছে। আমি সেই জিনিসটি গোমরুণের গভর্ণরের কাছে বিক্রয় করারও চেষ্টা করেছিলাম। মূল্য সম্বন্ধে তাঁর সংগে আমার মত পার্থক্য হওয়াতে তিনি সেটি আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন যখন আমি সুরাটগামী জাহাজে ওঠবো তার কয়েক ঘন্টা পূর্বে। আমি তখন ব্যস্ততার মধ্যে ওটিকেও চিঠির বাণ্ডিলের সংগেই আমার পেটিকায় রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু সুরাটে পৌঁছে তাকে আর দেখতে পেলাম না।

যাই হোক—এইভাবে চিঠির প্যাকেট চুরি হয়ে যেতে প্রেসিডেন্ট আমার প্রতি এত বিরূপ ও ক্রুদ্ধ হলেন যে তিনি আমাকে নিজ বক্তব্য কিছু বলতে দিলেন না। অধিকন্তু চিঠিগুলি অন্তর্হিত হওয়াতে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত যে সকল ইংরেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন আমি তাঁদেরও বিরাগভাজন হলাম। কারণ তাঁদের নামেও অনেক চিঠি ছিল প্যাকেটটির মধ্যে। তাঁরা এত দূর ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে অনেকবার আমার প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়েছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হলফনামা এবং অন্যান্য বিষয় দ্বারাও আমি তা প্রমাণ করতে পারি। সেই সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন হলেন এম. হার্টম্যান।

তিনি ছিলেন তখন সুরাট ফ্যাকটরীতে দ্বিতীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী। সুতরাং তাঁদের পরিকল্পিত ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তখন সর্বদা অনেক লোকের মধ্যে বাস করতাম। আমি গোলকুণ্ডাতেও যেতে পারিনি। অথচ সেখানেই হীরকের বহুল ব্যবসা চালু ছিল। আমার বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে উক্তস্থানে আমার ক্ষতি সাধনের জন্যে দশ বার জন ইংরেজ অপেক্ষমান আছেন। সেই প্রতারণামূলক ঘটনার ফলে আমার যাবতীয় পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার ক্ষতি হয়েছিল যথেষ্ট পরিমাণে। আমি অনেক নগদ টাকা পারস্যে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ তা ভারতবর্ষে কোন ব্যবসাতে খাটানো আর সম্ভব হয়নি।

আমি বাটাভিয়াতে যে চিঠিখানি পাঠিয়েছিলাম তার অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত হোল। আমি তা লিখেছিলাম ডাচ কোম্পানীর জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্যগণকে। তারিখ, সুরাট ১৬ই মে, ১৬৬৫।

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি, আপনাদের এই চিঠি লিখছি গোমরুণে কম্যাণ্ডার হেনরী ভান উক আমাকে চরম অপমান করার ফলে আমি যে নিদারুণ বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়েছি তা প্রমাণ করার জন্যে। আমার সংগে স্বদেশের রাজার রাষ্ট্রদূতের সুপারিশ পত্র ছিল। তিনি প্রথম পত্র দিয়েছিলেন ইস্পাহানে কোম্পানীর মুখ্যকর্তাকে। আর দ্বিতীয় পত্র লিখেছিলেন গোমরুণের কম্যাণ্ডার মহোদয়কে। তৃতীয় আর একখানি পাঠিয়েছিলেন সুরাটের কম্যাণ্ডারকে। তিনি এই অনুরোধ জানান যে কোম্পানীর স্বার্থ ব্যতীতও তাঁরা যেন আমাকে সাধ্যমত সহায়তা দান করেন কিন্তু এম. হেনরী ভান উক তা গ্রাহ্য করেননি। পরন্তু তিনি আমাকে এমন অবিস্মরণীয় অপমান করেছেন যা আমার মত সম্মানিত লোককে কোন রাজকর্মচারী, বিশেষত আমাদের রাজার ভ্রাতৃতুল্য কোন শাসকের কর্মী করতে পারেন, তা চিন্তার অতীত।

তিনি যে অন্যায় করেছেন তাহোল—তিনি আমার মালপত্র খুলেছেন। তার মধ্যে অনেক মণিরত্ন ছিল যার কিছু অংশ অপসৃত হয়েছে। তাছাড়া আমার সংগে একটি চিঠির প্যাকেট ছিল। সেটি সরিয়ে নিয়ে তৎস্থলে কতকগুলি সাদা কাগজ চিঠির মত ভাঁজ করে রেখেছিলেন। চিঠির বাণ্ডিলটি আমাকে দিয়েছিলেন গোমরুণের ইংরেজ প্রতিনিধি। আমার উপর দায়িত্ব ছিল সেটিকে সুরাটস্থিত ইংরেজ কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের হাতে পৌঁছে দেবার।

আমি এখন বিষয়টিকে বিচার করার ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত কচ্ছি। আপনারা ভেবে দেখবেন যে উপস্থিত এই ব্যাপারে ইংরেজ প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য ইংরেজ ভদ্রমহোদয়গণের আমার প্রতি কি ধারণা হয়েছে। আর আমি এবিষয়ে আপনাদের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করে সুবিচার প্রার্থনা করতে পারি কিনা তাও বিচার করে দেখতে আবেদন জানাই। আপনারা যদি আমাকে বাটাভিয়াতে গিয়ে আপনাদের সামনে হাজিরপূর্বক মৌখিক সমস্ত বৃত্তান্ত, অর্থাৎ আমি কি পরিমাণ অপমানিত হয়েছি, এম. ভান উক কি প্রকারে আমার প্রতি অসদাচরণমূলক ঘৃণ্য ব্যবহার করেছেন তা বর্ণনা দানের অনুমতি প্রদান করেন তাহলে বিশেষ অনুগৃহীত হব। আমি আরও অনুরোধ জানাচ্ছি যে অন্তত এই চৌর্যপরাধের প্রকৃত নায়ক সম্বন্ধে আপনারা আমাকে সন্তোষজনক কিছু সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। নতুবা আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকবো না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আমার স্বদেশের রাজার মাধ্যমে অপরাধীর দেশীয় রাজার কাছে অভিযোগ করবো। আমার দেশের রাজা আমাকে অনুজ্ঞাপত্র দান করে আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি যে প্রকারে হোক চেষ্টা করবো যাতে ভান উকের এই অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা হয়। আমি আমার আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখতে চাই। আমি যদি ইস্পাহান হয়ে প্রত্যাবর্তন করি তাহলে পারস্যাধিপতিকেও এই বিষয় জানাতে দ্বিধাবোধ করবো না। আমি তাঁকে বলবো যে তিনি আমাকে অত সম্মানসূচক ছাড়পত্র মঞ্জুর করা সত্বেও এম. ভান উক এইভাবে অপমান করেছেন।

আমার আরও বিশ্বাস সম্রাট একথা শুনে আদৌ খুসী হবেন না যে আমি ভারতে ও ইউরোপে যেসকল মণিরত্ন খরিদ করেছিলাম তাও সেই চিঠির প্যাকেটের সংগে অপহৃত হয়েছে। আমি তাঁকে আরও জানাব যে ভান উক গোমরুণে পারস্যাধিপতির শত্রু জনৈক সুলতানের সংগে মিলিত হয়ে কি ষড়যন্ত্র ও অভিসন্ধি চালিয়েছেন। সেই সুলতান ছদ্মবেশে ওখানে গিয়েছিলেন।

পরিশেষে জানাচ্ছি যে ভান উক আমাকে যে জাতীয় অপমান করেছেন ততোধিক অপমানের মধ্যে আমি তাঁকে ফেলতে পারি। তাঁর অপমান মানে কোম্পানীর মানমর্যাদার হানি।

ভদ্রমহোদয়গণ,

আপনারা যদি আমার সন্তুষ্টি বিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহলে আমি আমার সংকল্পকে কার্যে পরিণত করতে দ্বিধা বোধ করবো না। অবশ্য আমার বিশ্বাস যে.আপনারা কর্তব্য বিমুখ হয়ে আমাকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করবেন না। আমি আশা করি আমার ইউরোপে 'প্রত্যাগমণের পূর্বে আপনারা আমার প্রতি সুবিচার করতে পরাঙ্মুখ হবেন না। যেখানেই থাকি আমি আপনাদেরই একজন।

ভদ্রমহোয়গণ! আপনাদের একান্ত অনুগত ইত্যাদি।

গুরুতর অপরাধ দণ্ডনীয় হয় না, এমন ঘটনা বড় ঘটে না। এই অপরাধের মুখ্য নায়কদের শেষ পরিণতি অতীব শোচনীয় হয়েছিল।

পরবর্তী মৌসুমী ঋতুতে যে জাহাজগুলি সুরাট ছেড়ে গোমরুণে গিয়ে পৌঁছেছিল তাদের মাধ্যমে আমার প্রতি সেই ঘোরতর অন্যায় ব্যবহারের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল সেই অঞ্চলের সর্বত্র। তার স্বল্পদিন পরেই এম. ভ্যান উক এক্ প্রকার বিশেষ জ্বরে আক্রান্ত হন। তখন কার্মেলিয় সন্ন্যাসী রেভারেণ্ড বিশপ বলথ্‌সর তাঁকে দেখতে যান। তিনি সেই সময় ভান উকের সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করে তাঁর বক্তব্য ও মন্তব্য জানার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বিশেষ জোরালো ভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রয়াসী হন। উপরন্তু অত্যন্ত বাক্‌চাতুর্য সহকারে তিনি বললেন যে যদি ঘটনাটি সত্য হয়, আর চিঠির বাণ্ডিলটি যদি তিনিই সরিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছুক। তিনি তিনদিনের অধিককাল জীবিত থাকতে চান না। তিনি স্বহস্তে সেই চৌর্যকর্ম সম্পন্ন করেননি। তবে সেইকাজ নিষ্পন্ন করার আয়োজন ব্যবস্থার মূলে তিনি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিনি দিন গত হতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর কোন কথা বলেননি।

তাঁর পরবর্তী কর্মীর নাম বোদান। তাঁকেই তিনি পাঠিয়েছিলেন আমাকে জাহাজে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনিই প্রকৃতপক্ষে আমার পেটিকা খুলে চুরি করেছিলেন। একদিন অতিমাত্রায় নেশা করে তিনি মুক্ত বায়ুতে বাড়ীর ছাদে ঘুমিয়েছিলাম। সেখানে কোন রেলিং ছিলনা। ঘুমের মধ্যে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেলেন। পরদিন দেখা গেল তিনি সমুদ্রতীরে মৃত পড়ে আছেন। সেই দুষ্কার্যে লিপ্ত জাহাজের কাপ্তেন সম্বন্ধে জানা গেল

যে সুরাটে পৌঁছোবার চার পাঁচ দিন পরে তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন যে জনৈক মুসলমান তাঁর স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান হয়ে তাঁকে প্রহার কচ্ছেন। তা দেখে কিছু সংখ্যক ফ্রাঙ্কের মনে ক্রোধ ও বিরক্তি উদ্রেক হয় এবং তাঁরা সেই মুসলমান স্বামী-স্ত্রীকে দু'পাশে সরিয়ে দেন। সেই ঘটনার পরে মুসলমানটি কাপ্তেনকে রাস্তায় দেখে মনে করলেন যে তিনি সেই ফ্রাঙ্কদেরই একজন। এই ভেবে তিনি কাপ্তেনের দেহে পাঁচ ছয় বার ছুরিকাঘাত করেন। তৎক্ষণাৎ কাপ্তেন ভূপাতিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই হোল সেই ঘৃণ্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের শোচনীয় শেষ পরিণতি।

তৃতীয় ভাগ

অধ্যায় এক

ইস্ট ইণ্ডিজে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস

মুসলমানদের মধ্যে এত আদর্শের ভিন্নতা কিন্তু কোরাণে বিধৃত বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণজাত নয়। এই বিভেদ আরও দেখা যায় মহম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারীদের মতবাদে। তখন থেকেই দু'টি সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবাপন্ন সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছে। একটি সম্প্রদায় 'সুন্নী' নামে অভিহিত। তুর্কীরা এঁদের অনুগামী। দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে বলা হয় 'সিয়া'। এঁরা পারসীকদের সৃষ্টি। আমি এখানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্নতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলে কালক্ষেপ করবো না। সমগ্র মুসলমান সমাজ এই ভিন্ন ধর্মাদর্শে বিভক্ত। আমার পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এখন আমি কেবল বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যে এই নিরর্থক ধর্মভেদের বর্তমান অবস্থা কি তা বর্ণনা করবো।

ভারতে মুসলমান শাসনের প্রথম পর্যায়ে প্রাচ্য দেশের খৃষ্ট পন্থীরা ছিলেন অতি মাত্রায় জাঁকজমক প্রিয়। তাঁরা প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ ও ভক্তিমান ছিলেন না। আর হিন্দুরা ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির। কোন বিপদ বিঘ্ন প্রতিরোধ করার শক্তি তাঁদের ছিল না। অতএব মুসলমানরা বেশ অনায়াসে অস্ত্র বলে হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্মী উভয়কেই দমিয়ে রাখতে সক্ষম হন। তাঁরা সেই কাজে এত সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে বহু সংখ্যক হিন্দু ও খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

মহান মুঘল সম্রাট ও তাঁর দরবার শুদ্ধ সকলে ছিলেন সুন্নী। গোলকুণ্ডার সুলতান সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আর বিজাপুর রাজ্যে সিয়া-সুন্নী দুই-এরই বাস। মুঘল সম্রাটের দরবারেও দুই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পারস্য থেকে আগত ব্যক্তিদের জন্যেই তা হয়েছে। তথাকার বহু সংখ্যক লোক মুঘল সৈন্য বহরে যোগ দিয়েছেন। তারা কিন্তু সুন্নীদের সম্পর্কে অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত ছিলেন। তাহলেও বাহ্যতঃ তারা সম্রাটের ধর্মই পালন করেন। তাদের বিশ্বাস ওখানে চাকুরী ও বিষয় সম্পদ রক্ষা করতে হলে স্বধর্ম গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে তাঁরা অন্তরে আবদ্ধ রেখেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

গোলকুণ্ডা রাজ্যের বর্তমান শাসক কুতুবশাহ সিয়া নীতির বিশেষ উৎসাহী সাধক। তাঁর দরবারের অধিকাংশ আমির-ওমরাহ পারসীক। তাঁরাও পারস্য দেশের প্রথায় সমান কঠোরতা ও স্বাধীনতা সহকারে সেই ধর্মাদর্শ প্রতিপালন করেন।

আমি অন্যত্র মন্তব্য করেছি যে মুঘল সম্রাটের দেশীয় মুসলমান প্রজাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যকই উচ্চপদে কর্মরত। এই কারণে অনেক পারসীক অভাবের তাড়নায় অথবা স্বদেশ অপেক্ষা এদেশে সহজ লভ্য উচ্চতর পদের আশায় এখানে চলে আসেন। তারা অত্যন্ত চতুর প্রকৃতির লোক। সুতরাং সামরিক বিভাগে নিজেদের উন্নতির পথ সহজেই উন্মুক্ত করে নিতে পারেন। এই কারণে মুঘল সাম্রাজ্য, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর, সর্বত্রই পারস্যবাসীদের হাতে শ্রেষ্ঠ সব সামরিক পদ ন্যস্ত।

ঔরংজেব বিশেষ ভাবেই সুন্নী ধর্মমত সম্পর্কে অতি মাত্রায় উৎসাহী। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস এত প্রবল যে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণ অপেক্ষা এ বিষয়ে বাহ্যতঃ অধিক শ্রদ্ধা নিষ্ঠার প্রকাশ দেখিয়েছেন। তিনি ধর্মপ্রাণতার মুখোস পরেই অন্যায় ভাবে রাজ্য অধিকার করতে সমর্থ হন। সিংহাসন লাভের সময় তিনি এই কথাই বলেছিলেন যে তার পিতা শাহজাহান ও পিতামহ জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম ধর্মে যে শিথিলতা এসেছিল তিনি তা দূর করে কঠোর ভাবে ধর্মানুসরণের ব্যবস্থা করবেন। নিজেকে অতিশয় ধর্মপ্রাণ প্রমাণ করার জন্যে তিনি দরবেশ বা ফকিরের জীবন অবলম্বন করেছিলেন। সে যেন বস্তুতঃই এক ভিক্ষাজীবীর জীবন যাত্রা। আর সেই ভুয়া দয়া দাক্ষিণ্যের আবরণে আবৃত হয়ে তিনি সুচতুরভাবে বাদশাহী মসনদ অধিকার করতে সফল হলেন। তাঁর দরবারেও অনেক পারস্যদেশীয় লোক কর্মরত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের আলীর পুত্র হোসেন ও হাসান সম্পর্কিত ধর্মানুষ্ঠান করতে অনুমতি দিতেন না। এঁরা সুন্নীদের হাতে নিহত হন। সেকথা আমার পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তে স্থান পেয়েছে। পারস্যদেশীয় রাজ-কর্মচারীরাও নিজেদের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্রাটকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বাহ্যতঃ সুন্নীমতের সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলতেন।

অধ্যায় দুই

ইস্ট ইণ্ডিজের ফকির বা মুসলমান ভিক্ষাজীবিদের প্রসঙ্গ

জানা যায় যে ভারতবর্ষে মুসলমান ফকির আছেন ৪০০,০০০। আর হিন্দুদের মধ্যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর সংখ্যা ১,২০০,০০০। এই সংখ্যা অতি বিপুল। এরা সকলেই ভবঘুরে ও কর্মবিমুখ। মিথ্যা কৌশল করে এরা মানুষকে অন্ধ করে দেন। আর সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করেন যে তারা যা বলেন তা সমস্তই বিশেষ গভীর অর্থপূর্ণ।

মুসলমান ফকির আছেন নানা জাতীয়। একদল আছেন হিন্দু যোগীদের মত নগ্নদেহ। এঁদের কোনও গৃহাবাস নেই। যে কোনও প্রকার অসাধুতায় এঁরা লিপ্ত হন নির্বিবাদে। সোজাবুদ্ধির সরল প্রকৃতির মানুষের মনে এঁরা এমন ধারনার সঞ্চার করেন যে সব রকম অন্যায় কাজ করা চলে, আর তাতে কোনও পাপ হয় না।

আর এক ধরণের ফকির আছেন যাঁরা নানা রঙ-এর খণ্ড খণ্ড কাপড়ে তৈরী পোষাক পরেন। তা দেখে বলা কঠিন যে তা প্রকৃতপক্ষে কাপড়ের টুকরো কিনা। এই ঢিলে পোষাক পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নামানো। পোষাকের নীচে তাদের যে অতি শোচনীয় ছিন্ন বস্ত্রাদি থাকে তা খণ্ডকাপড় দ্বারা আবৃত থাকে। ফকিরগণ সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণ করেন। প্রতিদলে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি থাকেন। নেতার স্বতন্ত্র পোষকে তাঁর মর্যাদার নিদর্শন। তবে তাঁর পোষাকটি কিন্তু অন্যদের তুলনায় উঁচুদরের নয় এবং আরও বেশী সংখ্যক টুকরো কাপড়ে তা তৈরী। তদুপরি তিনি এক পায়ে ভারি এক লোহার শৃঙ্খল বেঁধে তা টেনে টেনে পথ চলেন। শিকলটি লম্বায় চার হাত আন্দাজ আর সে তুলনায় আবার মোটা। প্রার্থনার সময় সেই শৃঙ্খলটি নেড়ে উচ্চৈস্বরে একটা শব্দ কোলাহল সৃষ্টি করেন। তখন অদ্ভুত একটা গাম্ভীর্যের প্রকাশ হয়। তার ফলে লোকের শ্রদ্ধা জন্মে।

তাঁর অনুগামীরা এবং সাধারণ লোকও তাঁর জন্যে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করেন। তিনি যেখানে যাত্রা বিরতি করেন অর্থাৎ কোন রাস্তায় বা সর্ব সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে তাঁকে খাদ্য প্রদান করা হয়। তাঁর জন্যে শিষ্যভক্তরা

সেখানে গালিচা বিছিয়ে দেন। তিনি তার উপরে বসে সকলের সংগে কথাবার্তা বলেন ও উপদেশ দান করেন। তাঁর শিষ্যরা আরও একটি কাজ করেন। তাঁরা সারা দেশ ঘুরে তাঁদের গুরুর মহনীয় গুণ ও শক্তিসমূহের কথা ঘোষণা করেন এবং তিনি পরমেশ্বরের যে সকল অনুগ্রহ লাভ করেছেন তার বর্ণনা প্রদান করেন। ঈশ্বর তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক গূঢ় জ্ঞান ও শক্তি দান করেছেন যা দ্বারা তিনি পীড়িত ও আর্তদের আরাম দিতে পারেন। এর ফলে তিনি অতি অনায়াসে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হন। তারা তাঁকে অতি পূতাত্মা মনে করেন। তাঁর কাছে সকলেই আসেন অঢেল ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে। তারা দরবেশের সামনে এসেই পায়ের জুতা খুলে ভূপতিত হয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণতিজ্ঞাপন করেন। ফকিরও নিজেকে অমায়িক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নিজের হাতটি বাড়িয়ে দেবেন যাতে ভক্তরা তাঁর হাত চুম্বন করতে পারেন। অতঃপর যারা তাঁর সংগে আলাপ আলোচনা করতে চান তাদের কাছে বসিয়ে এক এক করে সকলের কথা শুনবেন। ধর্মগুরুর শক্তি সম্বন্ধে তারা বিলক্ষণ জানেন এমন ভাব প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ বন্ধ্যা নারীদের তিনি সন্তানবতী হবার উপায় ও নির্দেশ দান যখন করেন।

যে সকল ফকিরের দুইশত শিষ্য অনুচর আছেন তাঁরা তাঁদের সমবেত করেন ঢাক ও শিঙ্গা বাজিয়ে। সেই শিঙ্গা আমাদের দেশের শিকারীদের শিঙ্গার মতই। চলার পথে তাঁদের শিষ্যরা পতাকা, বল্লম ও অন্যান্য অস্ত্রাদি বহন করে নিয়ে যান। তারপর গুরু যেখানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে আসন গ্রহণ করবেন সেখানে মাটিতে তা পুঁতে দেবেন।

ইস্ট ইণ্ডিজে তৃতীয় প্রকার ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত হন যাঁরা তাঁরা দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। তাঁরা মোল্লা বা চিকিৎসক হওয়ার জন্যে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক হলে মসজিদে গিয়ে বাস করেন। সেখানে দান খয়রাতের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। কোরাণ পাঠ করে সময় কাটাতে হয়। কোরাণকে তাঁরা মুখস্থ করে ফেলেন। কোরাণ পাঠ করে যে জ্ঞান অর্জন হয় তার সংগে প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যদি যুক্ত করতে পারেন এবং আদর্শ সৎজীবনের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন তাহলে তাঁরা মসজিদের প্রধান মোল্লা বা অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। আর তখনই ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রদানের অধিকার লাভ হয়। এই ফকিরগণ বিবাহিত জীবন যাপন করেন। অনেকে আবার মহম্মদকে

অনুকরণ করার অভিলাসবশত এবং দয়া দাক্ষিণ্য করে তিন চারটি বিবাহও করেন। তাঁদের বিশ্বাস যে এইভাবে তাঁরা ঈশ্বরের সেবায় অধিক পরিমাণে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। কারণ বহু সন্তানের জনক হতে পারলে সেই সন্তানরা অধিকতররূপে ধর্মগুরুর আদর্শকে অনুসরণ ও প্রতিপালন করবে।

অধ্যায় তিন

ভারতের পৌত্তলিক হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা।

ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা এত অধিক যে একজন মুসলমান পিছু পাঁচ কি ছয় জন পৌত্তলিকবাদী হিন্দু দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এত বিরাট এক জনসমাজ কি প্রকারে একটি সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের অধীনে চলে গেলেন। আর তারা কি করেই বা মুসলমান শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু সে বিস্ময় আর থাকে না যখন দেখা যায় যে হিন্দুদের মধ্যে কোন একতা বোধ নেই। নানা কুসংস্কারের ফলে তাদের মধ্যে এমন অদ্ভুত মত বিরোধ ও রীতিনীতির ভেদাভেদ রয়েছে যে তারা কখনও একে অপরের সংগে একমত হন না। একজন হিন্দু তার সমবর্ণ নন এমন লোকের বাড়ীতে কখনও খাদ্যপানীয় গ্রহণ করেন না। গ্রহণ করবেন এমন লোকের গৃহে যিনি অন্য বর্ণ হলেও তার চেয়ে উন্নত ও সম্ভ্রান্ত। অতএব ব্রাহ্মণের গৃহে সকলেই খাদ্য পানীয় গ্রহণ করতে পারেন। ব্রাহ্মণের গৃহ দ্বার সমস্ত হিন্দু সমাজের জন্যেই উন্মুক্ত। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণ বিভেদ হচ্ছে পূর্ব যুগে ইহুদী সমাজের উপজাতি বিভাগের ন্যায়।

সাধারণ একটা ধারণা আছে এই শ্রেণী বিভাগ আছে প্রায় বাহাত্তর প্রকার। তবে আমি জনৈক অভিজ্ঞ পুরোহিতের কাছে জেনেছি যে এখন তা মুখ্যতঃ চারটি বর্ণে বা জাতিতে বিভক্ত। আর সেই চারটি মুখ্য জাতি থেকে হয়েছে অন্যান্য সকলের উদ্ভব।

প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণ। এঁরা প্রাচীন ভারতের ঋষি দার্শনিকদের উত্তর পুরুষ। এঁরা জ্যোতির্বিদায় বিশেষজ্ঞ। অদ্যাপি তাঁদের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থাদি পাঠেই তাঁরা সর্বদা ব্যাপৃত থাকেন। তাঁরা গ্রহ নক্ষত্রের অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণে এত অধিক সুনিপুণ যে সূর্য চন্দ্রের গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে তাঁরা এক মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম ঘটায় না। এই বিজ্ঞানকে রক্ষা করার জন্যে ও চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তাঁদের একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে বারাণসী সহরে। সেখানে প্রধানতঃ জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হয়। ওখানে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা ন্যায় ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তা প্রতিপালিত হয়

অত্যন্ত কঠোর ভাবে। ব্রাহ্মণ বর্ণটি সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। এই সম্প্রদায় থেকেই পুরোহিত ও আইন প্রণেতা মন্ত্রী নির্বাচিত হন। তবে ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় এত অধিক যে তাঁরা সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান না। ফলে অধিকাংশই থেকে যান অজ্ঞ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের অতিশয় বুদ্ধিমান মনে করা হয় তাঁরা হলেন অতি মাত্রায় কুখ্যাত ঐন্দ্রজালিক।

দ্বিতীয় জাতি ক্ষত্রিয়। তাঁরা যোদ্ধা ও সৈনিক। হিন্দুদের মধ্যে এঁরাই একমাত্র সাহসী। এঁরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমি যে সকল রাজামহারাজার কথা প্রায়শঃ বলেছি তাঁরা সকলেই এই জাতীয়। এঁদের মধ্যে ছোট ছোট সামন্তরাজও আছেন। নিজেদের মধ্যে ভেদবিভেদের ফলে তাঁরা মুঘল বাদশার অধীনস্থ সামন্তে পরিণত হয়েছেন। এঁদের অনেকে বাদশার অধীনে কর্মরত থাকেন। তার ফলে বাদশাহকে দেয় এঁদের রাজস্বের পরিমাণ তত বেশী নয়। তা প্রদান করেন তাঁরা দরবারে প্রাপ্ত সম্মানজনক বেতনের টাকা দিয়ে। এই সকল রাজা ও রাজপুতগণ প্রজা ও কর্মচারী হিসেবে মুঘল সম্রাটের মুখ্যতম সহায়। এই ধরণের রাজা জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের সহায়তায়ই ঔরংজেব সিংহাসন অধিকার করতে সমর্থ হন। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত এই ক্ষত্রিয়গণ সকলেই যুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হন না। এদের মধ্যে রাজপুত বংশীয়রাই যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁরা সকলেই অশ্বারোহী। অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের আর পূর্ব-যুগের মত সাহস ও শক্তি নেই। তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করে এখন ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন।

তৃতীয় বর্ণ বা জাতি বৈশ্য। এরা ব্যবসা বাণিজ্যে নিরত থাকেন। কিছু সংখ্যক করেন মুদ্রা বিনিময়, ব্যাঙ্ক পরিচালনা ও দালালের কাজ। শেষোক্তদের মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা মালপত্র ক্রয় বিক্রয় করেন। এই সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিরা এত সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুকৌশলী যে অত্যন্ত ধূর্ত প্রকৃতির ইহুদীদেরও এদের কাছে অনেক কিছু শিখবার আছে। এ বিষয়ে আমি অন্যত্রও বলেছি। এরা নিজেদের শিশু সন্তানদেরও অযথা সময় নষ্ট করতে দেন না। আমাদের মধ্যে সাধারণত যা হয় তদনুরূপ শিশুদের রাস্তায় বেড়িয়ে খেলা-ধূলাকরে সময় কাটাতে না দিয়ে তাদের গণিত শিক্ষা দেন। তারা তা নিখুঁত ভাবেই শিখে নেয়। আর তা শেখার জন্যে কোনও কলম ও খাতাপত্তর থাকে

না। নিছক স্মৃতির মাধ্যমে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা। যত কঠিন হোক না কেন, এক মুহূর্তে তারা একটি অঙ্ক কষে ফেলবে। ছোট ছেলেরা সর্বদা তাদের পিতার সংগে সংগে থাকে। পিতাও সর্বক্ষণ তাদের ব্যবসা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি যা কিছু করেন তাই শিশু পুত্রকে বুঝিয়ে বলেন। তাদের গণনার মাধ্যম সংখ্যা বাচক প্রতীকসমূহ তারা হিসেবের খাতায় লিখে রাখেন। (মূল গ্রন্থে সে সংখ্যা বা প্রতীকের কথা উল্লিখিত হয়নি)।

এই প্রথার প্রচলন আছে মুঘল সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষের সর্বত্র। তবে ভাষা ভেদে অক্ষরসমূহ স্বতন্ত্র। তাদের (ব্যবসায়ীর) প্রতি যদি কেউ কখনও ক্রোধান্বিত হন তাহলে তারা তাদের কথা খুব ধৈর্য সহকারে শোনেন। কোনও উত্তর দান করেন না। নতুবা শান্তভাবে দূরে সরে যান। চার পাঁচ দিন আর তার সংগে দেখা সাক্ষাৎ করেন না। মনে করেন তার মধ্যে তার ক্রোধের প্রশমন হবে। তারা কখনও কোনও জীবন্ত প্রাণী বা সচেতন পদার্থকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন না। নিজেদের জীবন দান করবেন, তথাপি ক্ষুদ্র একটি জীবেরও প্রাণ নাশ করবেন না। শস্যের ক্ষতিকারক প্রাণী ও অন্যান্য পোকামাকড় সম্বন্ধেও তাদের আদর্শ অনুরূপ। এই বিষয়ে তাদের ধর্মনীতি প্রতিপালিত হয় অত্যন্ত কঠোরভাবে ও উৎসাহ সহকারে। বলা বাহুল্য যে তারা পরস্পর কখনও মারামারি করেন না, যুদ্ধে যোগদানে বিরত থাকেন। রাজপুতদের গৃহে তারা খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন না। কারণ তারা জীব হত্যা করে তার মাংস খান। তবে রাজপুতরা কখনও গোমাংস খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেন না।

চতুর্থ শ্রেণী হোল শূদ্র। রাজপুতদের ন্যায় এরাও যুদ্ধে লিপ্ত হন। তবে পার্থক্য এই যে রাজপুতগণ অশ্বারোহী, আর এরা পদাতিক সৈন্যের পর্যায়-ভুক্ত। সৈন্য, তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক, যাই হোন,—যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করা বিশেষ গৌরবজনক। কিন্তু যুদ্ধকালে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পলায়নের মত হীনতা আর কিছু নেই। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈন্যের পরিবার পরিজনও চিরকালের জন্য হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। এই প্রসংগে ওদেশে আমি একটি ঘটনার কথা শুনেছি। আমি তার বর্ণনা দেব।

জনৈক যোদ্ধা তার স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্ত্রী ও তার প্রতি তদনুরূপ প্রণয়াসক্ত ছিলেন। সেই যোদ্ধা একবার রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে

যান। তবে তা কিন্তু ভীতিগ্রস্ত হয়ে করেননি। করেছিলেন এই ভেবে যে তার মৃত্যু হলে স্ত্রী বিধবা হবেন এবং কত যে দুঃখ কষ্ট পাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল বিপরীত হয়ে। স্ত্রী তার স্বামীর পলায়নের কথা শোনার পর তাকে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হতে দেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর তাকে বলেছিলেন যে যিনি নারীর প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে আসেন অমন লোককে তিনি পতিরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তিনি দ্বিতীয়বার আর স্বামীর সংগে দেখা করতে রাজী হননি। মহিলাটি এই ব্যবস্থা করেছিলেন তার পরিবারের মর্যাদা রক্ষা ও তার সন্তানদের পিতার তুলনায় অধিকতর সাহসী করে তোলার উদ্দেশ্যে। তিনি তার সংকল্পে অটল রইলেন। তার স্বামী নিজ সম্মান খ্যাতি ও প্রেম প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে পুনরায় যুদ্ধে গিয়ে যোগ দিলেন। তিনি সেখানে মহৎ কর্ম পদ্ধতির অনুগামী হলেন। তার ফলে তার কৃতিত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোল। এইভাবে তিনি নিজেকে চমৎকার ভাবে ত্রুটীমুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তার গৃহের দরজা পুনরায় উন্মুক্ত হয়েছিল তাকে সানন্দে ও সাগ্রহে বরণ করে নেয়ার জন্যে। তা তার স্ত্রী-ই করেছিলেন।

এই চারটি বর্ণ বা জাতি বহির্ভূত বাকি জনসমাজকে বলা হয় পাড়িয়া। এরা সকলেই যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত থাকেন। পুরুষানুক্রমে তারা নানা ভিন্ন শিল্প কর্মে ও ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হন। শিল্প বাণিজ্যগত ভিন্নতা ব্যতীত তাদের মধ্যে আর কোনও ভেদ বিভেদ নেই। যেমন, একজন দর্জী ধনী হলেও তিনি তার সন্তানদের নিজ ব্যবসায় ছাড়া অন্য কোনও পেশা বা বৃত্তিতে নিয়োগ করতে পারবেন না। পুত্র কন্যাদের বিবাহ দেবেন অনুরূপ ব্যবসাবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের সংগে। দর্জীর মৃত্যু হলে তার শ্মশানে সমবৃত্তির লোকেরাই গিয়ে সমবেত হন। অন্যান্য কারিগর শ্রেণীর জনসমাজের মানুষকেও এই সকল নিয়ম মেনে চলতে হয়।

আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর পেশাদার মানুষ আছে যাদের বলা হয় ঝাড়ুদার। এদের কাজ হোল লোকের বাড়ী ঘর পরিষ্কার করা। বাড়ীর মালিকরা সেই কাজের বাবদ প্রতি মাসে কিছু পারিশ্রমিক দান করেন। পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হয় বাড়ীর আয়তন অনুসারে। ভারতবর্ষে কোনও উচ্চপর্যায়ের সভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন, তাঁর বাড়ীতে যদি পঞ্চাশ জন ভৃত্যও থাকে, তাহলেও তাদের কেউ ঝাড়ু হাতে নিয়ে বাড়ী ঘর পরিষ্কার

করতে রাজী হবে না। কারণ তারা মনে করে যে তা করলে জীবন অপবিত্র হয়। ভারতে কোনও লোককে ঝাড়ুদার বা মেথর আখ্যাদানের চেয়ে আর বড় অপমান কিছু নেই। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা অসমীচিন নয় যে প্রতিটি ভৃত্যের জন্য স্বতন্ত্র কাজ নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, কেউ হয়ত কলসী ভরে পানীয় জল আনবেন, আর কেউ হয়ত হুকায় তামাক সাজবেন। একজন ভৃত্যকে যদি তার মনিব অন্য ভৃত্যের করণীয় কোনও কাজ করতে বলেন, তাহলে তা সে কখনই করবে না। তখন মনে হবে লোকটি অনড় ও অচল। তবে যারা পুরোপুরি দাস পর্যায়ভুক্ত তারা মনিবের হুকুমে যে কোনও কাজ করতে রাজী হয়।

ঝাড়ুদার বা মেথর জাতের লোক কেবলমাত্র গেরস্থের বাড়ীর জঞ্জাল অপসারণ করে। তার ফলে মানুষের ভুক্তাবশিষ্ট তারা পায়। গেরস্থ যে জাতি বর্ণেরই হোন না কেন তার জন্যে তারা ভুক্তাবশিষ্ট নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা গাধা পোষে। সেই গাধার পিঠে মনুষ্যাবাস থেকে জঞ্জাল তুলে নিয়ে মাঠে ঘাটে ফেলে দেয়। এজন্যে অন্যান্য ভারতীয়রা গাধাকে স্পর্শ করে না। পারস্য দেশে কিন্তু ভিন্ন প্রথা। সেখানে চড়ে বেড়ানো ও মালবহন, দুই কাজেই গাধার ব্যবহার্য-প্রচলন দেখা যায়। ভারতবর্ষে একমাত্র ঝাড়ুদার ও মেথর সম্প্রদায়ের লোকই শূকর লালনপোষন করে এবং তাদের মাংস খায়।

অধ্যায় চার

এশিয়ার পৌত্তলিক রাজা মহারাজাদের কথা।

এশিয়ার পৌত্তলিক রাজাদের তালিকায় প্রথম সারিতে স্থান লাভের যোগ্য হলেন আরাকানের রাজা, পেগু, শ্যাম, কোচিন-চীন ও টন্‌কিনের রাজগণ। চীনের সম্রাট সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয় যে তাঁর রাজ্যে তাতারদের আক্রমণের পূর্বে তিনিও ছিলেন পৌত্তলিক ধর্মী। কিন্তু সেই আক্রমণের দিন থেকে পরবর্তী সময়ে তাঁর অবস্থা কি প্রকার ছিল তা সঠিক জানা যায় না। এর কারণ, যে তাতারগণের অধিকারে এখন দেশটি রয়েছে তাঁরা খাঁটি পৌত্তলিকও নন, আবার মুসলমান ধর্মাবলম্বীও নন। বরং বলা যায় যে তাঁরা দুই-এর সমন্বয়ে গঠিত কোনও ধর্মে বিশ্বাসী। প্রধান প্রধান দ্বীপসমূহে, মুখ্যতঃ জাপান ও সিংহলের রাজারা এবং মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ; আরও মুঘল সাম্রাজ্যের অধিনস্থ সমস্ত রাজারা এবং গোলকুণ্ডা-বিজাপুর সংলগ্ন অন্যান্য রাজ্যসমূহের শাসকবর্গ সকলেই হিন্দু বা পৌত্তলিক। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রজা, গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের জনসমাজ এবং কোচিন, যাভা ও মাকাসার দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী-দের অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত রাজ্যসমূহের বাসিন্দারা হিন্দু।

আমি বলেছি যে সিংহলের রাজা পৌত্তলিক সে কথা সত্য। তবে এও ঠিক যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে সিংহলের একজন রাজা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় তাঁর নাম হয় জীন। পূর্ব নাম সম্রাট প্রিয় পন্দর। ইনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরে রাজপুত্র ও দেশের পুরোহিতরা মিলে তাঁর পরিবর্তে অন্য আর একজন রাজা নির্বাচন করেন। ধর্মান্তরিত রাজাও প্রজাদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেছিলেন। প্রজাদের ধর্মান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনি জেসুইট বিশপদের উপর। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলম্বোর আশে পাশে বড় বড় বারোখানি গ্রাম তাঁদের দান করেন যাতে তাঁরা ও দেশের মানুষকে নতুন ধর্ম সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন। পরবর্তীকালে তাঁরা আবার অপরকে এবিষয়ে শিক্ষা দান করে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন। রাজা বিশপদের বলেছিলেন যে দেশের

লোককে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করার যোগ্য সিংহলী ভাষা তাঁদের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব হবে না। অতঃপর দেখা গেল যে সিংহলের যুবসমাজ এত বুদ্ধিমান ও মেধাবী যে তারা অতি দ্রুত এবং মাস কয়েক-এর মধ্যে লাটিন ভাষা, খৃষ্টীয় দর্শন ও অন্যান্য বিজ্ঞান এমন শিখেছিলেন যা ইউরোপীয়রা এক বছরেও শিখতে পারেননি। অধিকন্তু সেই যুবকগণ বিশপদের এমন সুকৌশলে গুরুত্বপূর্ণ সব প্রশ্ন করতেন যা দেখে তাঁরা চমৎকৃত হয়েছিলেন।

রাজার খৃষ্টধর্ম গ্রহণের কয়েক বছর পর একজন উচ্চশিক্ষিত দেশীয় দার্শনিক, নাম অ্যালেগাম্মা মতিয়ার, তাঁকে বলা হোত দার্শনিকদের গুরু, তিনি কিছুদিন জেসুইট বিশপ এবং কলম্বোর অন্যান্য যাজকদের সংগে আলাপ আলোচনা করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হন। তদুদ্দেশ্যে তিনি জেসুইট বিশপদের কাছে গিয়ে বলেন যে তিনি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক। তবে তিনি জানতে চান যে স্বয়ং যীশুখৃষ্ট লিখিতভাবে কি উপদেশ দিয়েছেন এবং কি রেখে গেছেন। তারপর তিনি নিউ টেস্টামেন্ট পড়তে আরম্ভ করেন। ছয় মাসের মধ্যে দেখা গেল যে বইখানির এমন কোন অনুচ্ছেদ নেই যা তিনি আবৃত্তি করতে পারেন না। তিনি লাটিন ভাষা শিখেছিলেন অতি নিখুঁতভাবে। ধর্মের মূল আদর্শ তিনি উত্তমরূপে উপলব্ধি করে বিশপদের বললেন যে তিনি পবিত্র খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হতে চান। আর তিনি দেখেছেন যে যীশুখৃষ্ট প্রবর্তিত ধর্ম বস্তুতঃই সত্য ধর্ম এবং অতি উচ্চ-পর্যায়ের। কিন্তু একটি বিষয় দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন যে তাঁরা (খৃষ্টীয় যাজক) যীশুর আদর্শ ঠিক অনুভব করেন না। কারণ ধর্মগ্রন্থে জানা যায় যে প্রভু কখনও কাহারো কাছ থেকে অর্থ কড়ি গ্রহণ করেননি। অথচ তাঁর অনুগামীরা টাকা কড়ি ছাড়া কাউকে দীক্ষা দান বা মৃত্যুর পরে সমাধিস্থ করেন না। অবশ্য এই সকল বিষয় উল্লেখ করেও তিনি দীক্ষা গ্রহণে বিরত হননি। পরন্তু তিনি দীক্ষান্তে হিন্দু ও পৌত্তলিকদের ধর্মান্তরিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এই হোল সমগ্র এশিয়া ব্যাপী পৌত্তলিক পন্থীদের বর্তমান অবস্থা। আমি এখন ভারতীয় হিন্দুদের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করবো। আরও বলবো তাঁদের মুখ্য দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে। অনন্তর আমি তাঁদের রীতিনীতি এবং সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ সাধন সম্পর্কেও বিবরণ দান করবো।

অধ্যায় পাঁচ

দেবদেবী সম্বন্ধে হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

ভারতীয় হিন্দুরা গরু, বাঁদর এবং আরও অন্যান্য জীবজন্তু ও দানবদের এমন শ্রদ্ধা সম্মানের আসন দান করেন যা প্রকৃত দেবতার প্রাপ্য। তাহলেও ইহা সুনিশ্চিত যে তারা এক অখণ্ড ভগবানকে বিশ্বাস করেন। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, স্বর্গ মর্তের স্রষ্টা ও সর্বত্র বিদ্যমান। কোন কোনও জায়গায় তাঁকে বলা হয় পরমেশ্বর, কোথাও আবার, যেমন, মালাবার উপকূলে ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণরা বলেন বিষ্ণু। শেষোক্ত ব্যক্তিরা করোমণ্ডল উপকূলের অধিবাসী। হিন্দুরা সম্ভবতঃ জানেন যে বৃত্ত হচ্ছে সমস্ত নক্সা ও মূর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিখুঁত রূপের। অতএব, তাঁরা বৃত্তের আকারকে আরও উন্নত করে তুলে বলেন যে ঈশ্বরের রূপও গোলাকার। বোধ হয় এই কারণেই তাঁরা মন্দিরে মন্দিরে সাধারণতঃ গোলাকৃতি একখণ্ড পাথর রাখেন। পাথরটি তাঁরা সংগ্রহ করেন গঙ্গা নদীর বক্ষ থেকে। সেইটিকেই তাঁরা ভগবান রূপে পূজা অর্ঘ্য প্রদান করেন। তাঁরা এই নিরর্থক ধারণায় এত বদ্ধমূল যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তিও এই ব্যাপারে কোনও যুক্তিযুক্ত মতকে গ্রাহ্য করেন না। এও কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় যে এই জাতীয় উপদেষ্টার হাতে পড়ে কোন লোক যদি এই নীতির অনুগামী হয়ে পড়েন। এই ধরনের লোকেদের মধ্যে এমন আবার অনেকে আছেন যাঁরা সেই গোলাল পাথরটিকে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন এবং প্রার্থনাকালে সেটিকে বুকে চেপে ধরেন।

এই রকম অদ্ভুত অজ্ঞতাবশতঃ তাঁরা প্রাচীনকালের মূর্তি পূজকদের ন্যায় তাঁদের দেবতাকে সাধারণ মানুষের মত মনে করেন। এমন কি তাঁদের ধারণা যে দেবতাদেরও স্ত্রী আছেন। আরও মনে করেন যে সাধারণ মানুষ যেমন ভালবাসে, যেমন আনন্দ লাভ করে, তাঁরাও (দেবতারা) ঠিক তদনুরূপ অনুভূতিসম্পন্ন। রামচন্দ্রকে যে তাঁরা শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন তার মূলেও আছে তৎকৃত বিস্ময়কর ও অলৌকিক কার্যকলাপের প্রভাব। হিন্দুরা মনে করেন যে রাম তাঁর জীবনকালে সেই সকল অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করেছেন। রাম সম্বন্ধে তাঁরা নিম্নে বর্ণিত আখ্যান বর্ণনা করেন। ব্রাহ্মণ সমাজের জনৈক সুশিক্ষিত ব্যক্তির কাছেই আমি তা শুনেছি—

রাম ছিলেন দশরথ নামে এক শক্তিশালী রাজার পুত্র। দশরথের দুই পত্নীর (?) সন্তানদের মধ্যে রাম ছিলেন সর্বাপক্ষা গুণীও ধর্মপ্রাণ। তিনি ছিলেন পিতার অতি প্রিয় পুত্র। পিতা তাঁকেই রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। রামচন্দ্রের মাতার মৃত্যু (?) হলে রাজার দ্বিতীয়া পত্নী তাঁর জীবনে পুরো আধিপত্য করার অবকাশ পেয়েছিলেন। তিনি রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে রাম ও তাঁর ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাজপ্রাসাদ ও রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার। রানীর সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হতে বিলম্ব হয়নি। অপর দুই পুত্রকে দেশান্তরিত করে দ্বিতীয়া মহিষীর পুত্রকে রাজপদ প্রদান করলেন রাজা। রাম লক্ষ্মণসহ পিতার আদেশে রাজ্য ও গৃহ ত্যাগ করার পূর্বে পত্নী সীতার সংগে সাক্ষাৎ করতে যান। হিন্দুরা সীতাকে দেবীরূপে শ্রদ্ধাভক্তি করেন। সীতা রামের সঙ্গিনী হবার সংকল্প প্রকাশ করলেন। তিনি জানালেন যে সর্বত্রই তিনি রামের সংগে থাকবেন। সুতরাং তাঁরা তিনজন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত ভাগ্যহীন।

তাঁরা যখন বনভূমির মধ্যে দিয়ে যাত্রাপথে এগিয়ে চলছিলেন তখন রাম একটি পাখীর (?) সন্ধানে এগিয়ে চলে যান। অনেকক্ষণ তিনি ফিরে এলেন না। সীতা স্বামীর অনিষ্ট আশংকায় ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে নানা অনুরোধ করে লক্ষ্মণকে পাঠালেন রামকে সাহায্য করার জন্যে। লক্ষ্মণ কিন্তু যেতে চান নি, প্রবলভাবে আপত্তি করেছিলেন। তিনি বললেন যে রাম তাঁকে বলে গিয়েছেন যে তিনি যেন সীতাকে একাকিনী রেখে স্থান ত্যাগ না করেন। তিনি বোধহয় দূরদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সীতা একাকিনী থাকলে বিপদ বিঘ্ন আসতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভ্রাতৃবধূর কাতর অনুরোধে লক্ষ্মণ রামের সন্ধানে চলে গেলেন। সেই অবকাশে হিন্দুদের কাছে দেবতুল্য রাবণ সীতার সম্মুখে সন্ন্যাসীর বেশে আবির্ভূত হয়ে ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা জানালেন। রাম সীতাকে বলেছিলেন যে নিজের গণ্ডী ছেড়ে বাইরে বেরোবে না। ব্যাপারটি রাবণের অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং সীতা যেভাবে ভিক্ষা দিতে চাইলেন সেভাবে রাবণ তা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তাঁর মতলব ছিল সীতা স্বস্থান ত্যাগ করে ভিক্ষা দিতে বেরোবেন। সীতা হয়ত ভ্রমবশত বা রামের নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেই সুযোগে রাবণ তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে তাঁর জন্যে গভীর

বনে অপেক্ষ্যমান অনুচরবৃন্দের কাছে চলে যান। অতঃপর সকলে একত্রিত হয়ে সীতাকে স্বদেশে নিয়ে যান। আর ওদিকে রাম শিকার করে ফিরে এসে দেখেন সীতা নেই। তিনি শোকে দুঃখে সংগাহীন হয়ে পড়েন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁর সংগা ফিরিয়ে আনলেন এবং দু'জনে মিলে সীতার সন্ধানে বেরোলেন। সীতার প্রতি রামের প্রেমপ্রীতি ছিল অপরিসীম।

ব্রাহ্মণরা যখন তাঁদের দেবীতুল্যা সীতার দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা দান করেন তখন তাঁরা গভীর দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করেন। আর সেই সংগে প্রচুর অদ্ভুত ও হাস্যকর গল্প যোগ করে ব্যাখ্যা করেন। সীতার অপহরণকারীর অনুসন্ধান প্রসংগে রামের নানা বিস্ময়কর সাহসিকতার কথা বর্ণনা করেন। নানা প্রকার পশু প্রাণী নিয়োজিত হয়েছিল সীতার অন্বেষণ কার্যে। তন্মধ্যে একমাত্র হনুমানেরই সৌভাগ্য হয়েছিল সীতাকে খুঁজে বের করার। সে লম্ফ দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে রাবণের যে উদ্যানে সীতা শোকে দুঃখে মগ্ন হয়ে ছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হন। সীতা সেখানে একটি বাঁদরকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হন। বাঁদরটি রামচন্দ্রের পক্ষ থেকে এসেছে বলায় সীতা প্রথমে তা বিশ্বাস করেন নি। অতঃপর হনুমান নিজেকে রামের প্রকৃত অনুচর প্রতিপন্ন করার জন্যে সীতার হাতে একটি অংগুরী প্রদান করলেন। সেটি তাঁকে একদা রামচন্দ্রই প্রদান করেছিলেন। আর সীতা একসময়ে এটিকে তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে রেখেছিলেন। তখন তাঁর বিশ্বাস হোল যে তাঁর স্বামী রাম এই প্রাণীটিকে পাঠিয়েছেন তাঁর সন্ধান করতে ও নিজ সংবাদ প্রদান করার জন্যে। ব্যাপারটা বস্তুতঃই সীতার প্রতি রামের গভীর প্রেমের পরিচায়ক। হনুমান কিন্তু সেই দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারটাকে প্রকৃতই একটা অলৌকিক ঘটনায় পরিণত করেছিলেন। কিন্তু রাবণের অনুচরবৃন্দের কাছে সে গুপ্তচররূপে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তারা ওকে পুড়িয়ে মারার সংকল্প করেছিলেন। তবে সে তার জন্যে প্রস্তুত অগ্নি দ্বারা রাবণের প্রাসাদকেই ভস্মীভূত করতে উদ্যত হয়েছিল। প্রাসাদের অনেকাংশ অগ্নিগর্ভে চলে গিয়েছিল। এই কাজটি সে করেছিল তাকে পুড়িয়ে দেবার জন্যে তার লাঙুলে বস্ত্রখণ্ড জড়িয়ে যে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তা দ্বারা। হনুমান তৎক্ষণাৎ তার লেজের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দিয়েছিল সহজদাহ্য সব জিনিসের মধ্যে। তার ফলে প্রাসাদে আগুন ধরে যায়। তখন হনুমান উপলব্ধি করলো যে পুনরায় ওখানে নামলে সে রাবণের কবল থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

অতএব যে পথে সে গিয়েছিল, আবার সেই পথ ধরেই ফিরে যেতে উদ্যত হোল। ফেরার পথে সে সমুদ্রে স্নান সমাপন করেছিল।

তারপর যথাস্থানে ফিরে রামের কাছে তার দুঃসাহসিক কার্যাবলীর বিবরণ দান করে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরান্তে বন্দিনী অবস্থায় সীতাকে যে প্রকার দুঃখ দুর্দশার মধ্যে সে দেখেছে তার বর্ণনা দিয়েছিল। রাম তদীয় পত্নীর শোচনীয় অবস্থার কথা জেনে যে প্রকারে হোক তাঁকে রাবণের কবল-মুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন।

হনূমানের পরিচালনায় এবং বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত সৈন্যের সহায়তায় রাম তাঁর সংকল্পে সিদ্ধিলাভ করলেন। অতি কষ্টে তিনি রাবণের প্রাসাদে পৌঁছোলেন। তখনও সেই অগ্নি নির্বাপিত হয়নি। এমন ঘোরতর অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করেছিল হনূমান। রাবণের প্রজাপুঞ্জ তার ফলে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই অবকাশে রাম তাঁর পত্নীকে দর্শনের সুযোগ পান। তাঁরা দুজনেই দেখা হতে অসীম আনন্দে উল্লসিত হয়েছিলেন। তিনি হনূমানের অমূল্য সহায়তার জন্যে তাঁকে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদা দান করেন।

রাবণ তাঁর বাকি জীবন দরিদ্র সন্ন্যাসীর (?) মত যাপন করেন। তাঁর রাজ্য রামের সৈন্যদল কর্তৃক প্রায় ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল। সেই ধ্বংস সাধন করে রামের সৈন্যরা রাবণের দুষ্কর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। রাবণ থেকেই ভারতের সর্বত্র ভ্রমণরত অসংখ্য সন্ন্যাসীর উৎপত্তি হয়েছে (?)। সেই সন্ন্যাসীরা এমন কঠোর জীবন যাপন করেন যে তাঁদের কৃচ্ছতা একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে বিদিত। আমি তাঁদের অনেক প্রতিচ্ছবি ও আলেখ্যচিত্র সংগ্রহ করেছি। তার কিছু সংখ্যক আমি আগামী অধ্যায়ে পাঠকদের উপহার দেব।

অধ্যায় ছয়

ভারতের পেশাদার ফকির-সন্ন্যাসী ও তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা।

আমি পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় রাবণ থেকে উদ্ভুত। রাম রাবণকে রাজ্যচ্যুত করেন। তার ফলে রাবণ এমন পীড়িত ও ব্যথিত হন যে তিনি পৃথিবীময় ভবঘুরের ন্যায় ভ্রমণ করে বেড়াবার সংকল্প করেন। তিনি তখন অতি নিঃস্ব ও দীন। তাছাড়া তিনি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ। তখন থেকে বহু সংখ্যক লোক তাঁর সেই জীবনযাত্রার অনুগামী হয়ে উঠলেন। সেই জীবনে তাঁরা অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ পেলেন। কারণ সাধুসন্তরূপে সম্মান শ্রদ্ধা প্রাপ্তির ফলে ইচ্ছে মত যে কোনও অন্যায় কাজ করার অনন্ত সুযোগ পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে ভ্রমণ করেন। প্রতি দলে এক একজন প্রধান পুরুষ বা দলপতি থাকেন। তাঁরাও নগ্ন দেহ। আর তা শীত গ্রীষ্ম সব সময়। তাঁরা সর্বদা ভূমিশয্যায় শয়ন করেন। ঠাণ্ডার দিনে নবীন সন্ন্যাসীরা ও ভক্তিমান হিন্দুগণ বিকেলের দিকে গোময়ের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তা রৌদ্রে শুকিয়ে জ্বালানি করেন। খুব কদাচিৎ কখনও কখনও তাঁরা কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন। কারণ তাদের ভয় থাকে পাছে তার মধ্যে কোন জীবন্ত প্রাণী থাকে। তাহলে তা পুড়ে মরবে। জলে ভাসে এমন এক প্রকার কাঠ ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে পোকা সৃষ্টি হয় না। তরুণ সন্ন্যাসীরা গোময় সংগ্রহ করে তার সংগে শুকনো মাটি মিশিয়ে জ্বালানি তৈরী করেন। সন্ন্যাসী দলের সংখ্যানুপাতে তারা অগ্নি-কুণ্ডের আয়তন সৃষ্টি করেন। তারপর দশবার জন সন্ন্যাসী প্রতিটি অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে বসেন। ঘুমের আবেশ এলে তারা ভূমি শয্যায় শয়ন করেন। মাটিতে তারা ছাই বিছিয়ে নেন যেন তোষক-গদির কাজ হবে তাতে। মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশই একমাত্র আচ্ছাদন। যারা দৈহিক কৃচ্ছ্রতা সাধন করেন আমি তাদের কথা এখন বর্ণনা দেব।

তারা দিনমানে যেখানে যেভাবে থাকেন রাত্রিতে শয়নকালেও তার পরিবর্তন হয় না। তখন তাদের দু'পাশে আগুনের ব্যবস্থা করতে হয়। নতুবা ঠাণ্ডার তীব্রতা অসহনীয় হয়ে ওঠে। ধনী বিত্তশালী হিন্দুরা নিজেদের

সুখী মনে করেন। তারা আরও মনে করেন যে তাদের গৃহে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়। তাঁদের গৃহে সন্ন্যাসীদের আগমন হয়। সন্ন্যাসীরা তাঁদের কৃচ্ছতা ও তপস্যা অনুযায়ী গেরস্থের বাড়ীতে সমান শ্রদ্ধা লাভ করেন। তাঁদের গৌরবমহিমা নির্ভর করে সেই দলভুক্ত কারোর বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান তপস্যার জন্যে। এই রকম সন্ন্যাসীর কথা আমি পরে বলছি।

সন্ন্যাসীদের বিভিন্ন দল একত্রিত হয়ে প্রধান প্রধান মন্দিরে তীর্থযাত্রায় যান। পবিত্র নদীতে বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা স্নানের জন্যে একত্র হয়ে যাত্রা করেন। গঙ্গায় স্নানকে তাঁরা বিশেষ ধর্মের কাজ মনে করেন। যে নদীটি (সম্ভবত কৃষ্ণা) বিজাপুর রাজ্য ও গোয়ার পর্তুগীজদের অধিকৃত অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সেখানে স্নান করাও বিশেষ পুণ্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত। অতি মাত্রায় কঠোর তপস্বীদের অনেকে তাঁদের মঠ মন্দিরের কাছে শোচনীয় অবস্থার কুঁড়ে ঘরে বাস করেন। ঈশ্বর প্রেমের জন্যেই তাঁদের দিনে একবার করে খাদ্য গ্রহণের প্রথা। যাঁরা খাদ্য দান করেন, তাঁরাও একবারই দিয়ে থাকেন।

এক প্রকার গাছ আমি গোমরুণেও দেখেছি এবং তার বর্ণনা আমি পারস্য ভ্রমণের বৃত্তান্তে দিয়েছি। ফ্রাঙ্করা তাকে বলেন বেনিয়ানদের বৃক্ষ (বট বৃক্ষ)। এই গাছ যেখানে থাকে, সেখানেই তার ছায়াতে হিন্দুরা বসবেন এবং রান্নাবান্না করবেন। এই গাছকে তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। সাধারণতঃ এই জাতীয় গাছের পাশে কি নীচে তাঁরা মন্দির নির্মাণ করান। সুরাটের একটি গাছ সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া যাক।

গাছটির গুঁড়িতে একটি ফাঁকা জায়গা বা গর্ত আছে। সেখানে বিকৃত দেহা নারীর মত একটি দানবী মূর্তি আছে। এটি নাকি প্রথম নারী সত্তার প্রতিমূর্ত্তি। এঁরা তাকে বলেন মহিষমর্দিনী। প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু এসে জড় হন সেই মূর্ত্তিটিকে পূজা অর্ঘদানের জন্যে। কতিপয় ব্রাহ্মণ সর্বদা সেখানে উপস্থিত থাকেন সেই দেবীমূর্তির সেবা ও পূজা এবং তাঁকে প্রদত্ত অর্ঘরাজি গ্রহণের উদ্দেশ্যে। অর্ঘ স্বরূপ প্রদত্ত হয় চাল, জোয়ার ও অন্যান্য সব দানা শস্য। মন্দিরে নারী পুরুষ যাঁরা প্রার্থনা করতে আসেন—ব্রাহ্মণগণ তাদের ললাট কেন্দ্রে সিঁদুর গোছের একপ্রকার জিনিসের তিলক চিহ্ন অংকন করে দেন। দেবমূর্ত্তির দেহকেও তা দিয়ে সজ্জিত ও মণ্ডিত করেন। এই তিলক চিহ্ন ধারণ করে তাঁরা নির্ভয়ে থাকেন যে কোন কুপ্রভাব তাঁদের স্পর্শ করতে

পারবে না। আর তাঁরা মনে করেন এবং বলেও থাকেন যে তাঁরা তাঁদের ভগবানের আশ্রয়ে আছেন।

বট বৃক্ষতলে সে সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, আমি ১, ২, ৩ প্রভৃতি নম্বর মাধ্যমে এখানে তাদের পরিচয় দিতে চাই।

১। এখানে ব্রাহ্মণরা নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি মধ্যে কয়েকটিকে স্থাপন ও সজ্জিত করেন। যেমন, মহিষমর্দিনী, সীতা, মহাদেব এবং অনুরূপ আরও মূর্তি যার সংখ্যাও স্বল্প নয়।

২। মহিষমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি। তা মন্দিরে স্থাপিত।

৩। এই মন্দিরটি পূর্ববর্তীর কাছেই অবস্থিত। এর দ্বারদেশে আছে একটি গাভী। আর অভ্যন্তরে রয়েছে দেবতা রামের মূর্তি।

৪। এই মন্দিরে যোগীরা তপস্যায় নিরত থাকেন।

৫। চতুর্থ মন্দির এটি, রামের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।

৬। এই জিনিসটি একটি সমাধি গহ্বরের ন্যায়। জনৈক যোগী পুরুষ সেখানে বাস করেন। একটি ছোট গর্ত ব্যতীত সেখানে আলো প্রবেশের কোন পথ নেই। তাঁর ভক্তি নিষ্ঠার মাত্রাধিক্যবশতঃ তিনি কখনও নয় দশ দিনও খাদ্য পানীয় ব্যতীত সেখানে কাটিয়ে দেন। আমি স্বচক্ষে সে ঘটনা দেখার সুযোগ না পেলে তা বিশ্বাস করতাম না। কৌতূহলবশতঃই আমি সেই তপঃশ্চর্য দেখতে গিয়েছিলাম সুরাটের ওলন্দাজ কমাণ্ডারকে সংগে নিয়ে। তিনি আবার ওখানে পাহারায় বসিয়েছিলেন দেখার জন্যে যে সন্ন্যাসী দিনে কি রাত্রে কখনও কিছু খাদ্য গ্রহণ করেন কি না। প্রহরী কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাননি যাতে বলা যায় যে যোগী পুরুষটি পুষ্টি সাধনের যোগ্য কিছু গ্রহণ কচ্ছেন। তিনি আমাদের দর্জিদের ন্যায় দিবারাত্র কোন সময়েই স্থান পরিবর্ত্তন না করে একভাবে বসে থাকেন। আমি যাঁকে দেখেছি তিনি তাঁর সংকল্পানুযায়ী দশদিনের মধ্যে সাতদিনের অধিককাল সেইভাবে থাকতে সক্ষম হননি। কারণ গহ্বরস্থিত বাতির শিখার গ্যাসে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। আরও যে সকল কঠোর তপশ্চর্যার রীতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে তা মানুষের কাছে আরও অবিশ্বাস্য হোত যদি হাজার মানুষ সেই দৃশ্য দেখার সুযোগ না পেতেন।

৭। এখানে দেখেছি জনৈক তপস্বীর আসনভঙ্গী। তিনি বহু বছর দিন রাত্রি কখনও শয়ন করেন নি। যখন তাঁর নিদ্রাকর্ষণ হোত তখন তিনি

ঝোলানো একটি দড়ির সংগে দেহ ন্যস্ত করেন। সেই অবস্থায় থাকা যে কত অদ্ভুত ও অসুবিধাজনক তা বলার নয়। ফলে শরীরের সমস্ত রস নিম্নগামী হয়ে পায়ের দিকে নেমে আসে। আর পা দু'টি শোথ রোগে আক্রান্ত হয়।

৮। দু'জন যোগীর এমন আসন ভঙ্গিমা দেখেছি যাতে তাঁরা আমৃত্যু তাঁদের বাহু দু'খানি উপরে তুলে রাখেন। তার ফলে হাতের গাঁট ও গ্রন্থি এমন কঠিন ও অনড় হয়ে গেল সে জীবনে আর কখনও তাকে নামাতে পারেন নি। তাঁদের মাথার চুল লম্বা হয়ে কোমরের নীচে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। হাতের নখ আংগুলের সমান লম্বা। এই ভঙ্গীতে তাঁরা শীত গ্রীষ্ম, দিনরাত সম্পূর্ণ নগ্ন থাকেন রৌদ্র বৃষ্টিতে সমানভাবে। মশার কামড় থেকেও অব্যাহতি নেই। হাত উঁচু করে থাকার ফলে মশা তাড়াবারও উপায় থাকে না। জীবন যাত্রার অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো, যেমন—জলপান, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে সহায়ক কিছু সংখ্যক যোগী সেই দলে কাজ করেন।

৯। এখানে একটি যোগী প্রতিদিন বেশ কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর হাতে থাকে অগ্নি শিখা শুদ্ধ একটি পাত্র (ধুনুচি)। তার মধ্যে ধূপ ছড়িয়ে তিনি ঈশ্বরকে অর্ঘদান করেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সূর্য দেবতার দিকে।

১০ ও ১১। এখানে অপর দু'জনার আসনভঙ্গী। তাঁরা তাঁদের হাত দু'খানি উপরে আকাশের দিকে তুলে আছেন।

১২। এইখানে যে দেহভঙ্গী তাতে সাধকরা হাত উঁচু করেই নিদ্রা যান। এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম যে মানুষের শরীরে এর চেয়ে কষ্টদায়ক আর কিছু নেই।

১৩। এই আসনে জনৈক যোগী তাঁর হাত ও বাহুকে নীচে নামাতে পারেন না। দৈহিক দুর্বলতায় হাত দু'টি তাঁর পিঠের উপরে ঝুলে পড়েছে। হাত দু'খানি পুষ্টির অভাবে শুকিয়ে গেছে।

এই রকম অসংখ্য যোগী তপস্বী আছে। তার মধ্যে অনেকে এমন সব আসন ও দেহভঙ্গীর চর্চা করেন যা মানুষের স্বাভাবিক গঠনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেউ হয়ত চোখ সর্বদা উঁচু করে সূর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে আছে। আবার অন্য একদল তাকিয়ে আছেন নীচে মাটিতে। তাঁরা চোখ তুলে কারোর মুখের দিকে তাকান না। অথবা, একটি কথাও উচ্চারণ করেন না।

এই জাতীয় রীতি পন্থা এত রকমারী ও বিচিত্র যে তা আলোচনা করলে একটি সুদীর্ঘ বর্ণনাতে পর্যবসিত হবে।

এই বিষয়ে আগ্রহীদের অধিক তৃপ্তিদানের জন্যে এবং ব্যাপারটা যাতে তাঁরা উত্তমরূপে অনুধাবন করতে পারেন তদুদ্দেশ্যে আমি আরও কিছু এই জাতীয় যোগী তপস্বীর চিত্র উপস্থিত করবো। আমি তা যথাস্থানেই গ্রহণ করেছি; আর তা স্বাভাবিক অবস্থায়। শালীনতা রক্ষার জন্যে অনেক বিষয় গোপন রাখতে হয়েছে। তবে তাঁদের সে সম্বন্ধে কোনও লজ্জা সংকোচের বালাই নেই। তাঁরা সর্বক্ষণ গ্রাম, সহর, সর্বত্র নগ্ন দেহে ঘুরে বেড়ান, যেমনি মানুষ জন্মগ্রহণের সময় থাকেন। তবে কথা এই যে মহিলারাও ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের কাছে যান, কিন্তু কখনও কোনও সংকোচের চিহ্ন দেখা যায় না। আর তাঁদের মধ্যে কোনও ইন্দ্রিয় পরায়ণতার লক্ষণও পরিস্ফুট হতে দেখা যায় না। পরন্তু তাঁদের কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্যই থাকে না। চোখগুলি তাঁদের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায় ভয়ংকর রূপে। তা দেখে মনে হবে যে তাঁরা ইহ জগতের বাইরে অনন্ত অরূপের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছেন।

অধ্যায় সাত

মৃত্যুর পরে মানবাত্মার অবস্থা সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ও বিশ্বাস।

হিন্দুদের নানা আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্যে একটি হোল যে মৃত্যুর পরে মানবাত্মা দেহ ছেড়ে ভগবানের কাছে যায়। তিনি তখন মৃত ব্যক্তির বিগত জীবনের কার্যাবলী বিচার করে সেই আত্মাকে অন্য দেহ মধ্যে স্থান দেন। সুতরাং এই নিয়মে একই মানুষ পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে যাতায়াত করেন। যে মানুষ জাগতিক জীবনে নানা দুষ্কর্ম করেও কুঅভ্যাসের ফলে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হন, ঈশ্বর তার দেহমুক্ত আত্মাকে নিকৃষ্ট জীবের দেহ দান করেন। যেমন, গাধা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। উদ্দেশ্য, নিম্নতর জীবন পর্যায়ে তারা বিগত অন্যায় অপরাধের জন্যে দুঃখকষ্ট ভোগ করবে। তবে ধারণা এই যে গরুর দেহ ধারণ করলে আত্মা চরম সুখ অনুভব করে থাকে। কারণ গরু দেবতার তুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করে। কোনও লোক যদি গরুর লেজ হাতে ধরে মৃত্যু বরণ করেন, তাহলে শোনা যায়, তিনি সুনিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎ জীবনে পুরো সুখ শান্তির অধিকারী হবেন।

মানবাত্মার পশু প্রাণীর দেহ ধারণ সম্বন্ধে এই যে সাধারণ বিশ্বাস তার ফলে হিন্দুরা যে কোনও জীবহত্যার কাজকেই অন্যায় মনে করে তা থেকে বিরত হন। কারণ তাদের মনে ভীতি থাকে যে সেই প্রাণীর মধ্যে হয়ত তারই কোন আত্মীয় বা বন্ধুর আত্মা। কর্মফল ভোগ করে চলেছেন।

মানুষ যদি ইহজীবনে সৎকাজ করেন, অর্থাৎ তীর্থযাত্রা ও দান ধ্যান করেন তাহলে, ধারণা আছে, যে মৃত্যুর পরে তার আত্মা কোনও শক্তিমান রাজা বা কোনও ধনী ব্যক্তির দেহে স্থান পাবে। বিগত জীবনে সৎকাজের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পরবর্তী জীবনে সুখ ও আনন্দলাভের যোগ্য অবকাশ লাভ করবেন।

এই কারণেই যোগী তপস্বীরা পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত রীতিতে নানা প্রকার দৈহিক কৃচ্ছতা সাধন করেন। কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ ধরণের কষ্টকর রীতিনীতি পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁরা জীবনে সৎকাজ করেন যাতে সেই কৃচ্ছতা না করার অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারেন তার চেষ্টা করেন এবং একটি 'ইচ্ছাপত্র' (উইল) লিখে তাঁদের বংশধরদের নির্দেশ দিয়ে

যান যাতে তাঁরা ব্রাহ্মণদের ভিক্ষা দান করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে মৃত্যুর পরে তিনি এঁদের কোন উচ্চ পর্যায়ের মানবদেহ মঞ্জুর করেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ওলন্দাজ কোম্পানীর জনৈক টাকা বিনিময়কারী, নাম মোহনদাস পারেক, সুরাটে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন ধনী এবং অত্যন্ত দানশীল। তিনি জীবিতাবস্থায় হিন্দু খৃষ্টান নির্বিশেষে সকলকে প্রচুর দান ও সাহায্য করেছিলেন। তাঁর প্রেরিত চাল, ঘি ও শব্জী তরকারীর উপরে নির্ভর করেই সুরাটের শ্রদ্ধাস্পদ কাপুসীন বিশপগণ বছরের একটি বিশেষ অংশ অতিবাহিত করতেন। এই বেনিয়ান ভদ্রমহোদয় মাত্র চার পাঁচ দিন পীড়িত ছিলেন। সেই সময় ও তাঁর দেহান্তরের পর আট দশ দিন ধরে তাঁর ভ্রাতারা নয় দশ হাজার টাকা দান করেন। তারপর তাঁর দেহ সৎকার করা হয়। সাধারণ কাঠের সংগে প্রচুর চন্দনকাঠ ও ঘৃত মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এইভাবে দাহ করলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আত্মা অন্য দেহ প্রাপ্তির সময় বিশিষ্ট কোনও সম্ভ্রান্ত মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই জনসমাজে কতক লোক আছে এমন নির্বোধ যে তাদের জীবদ্দশায় তারা নিজেদের সমুদয় অর্থকড়ি মাটির তলায় পুঁতে রাখেন। আসাম রাজ্যের সমস্ত ধনী ব্যক্তিরা এই প্রথায় কাজ করেন। তারা মনে করেন যে মৃত্যুর পরে যদি তারা কোন দরিদ্র দুঃস্থ ব্যক্তি এবং যোগী ফকিরের দেহ ধারণ করতে বাধ্য হন, তাহলে তখন প্রয়োজনমত ভূগর্ভে প্রোথিত সেই টাকাকড়ি তুলে কাজে লাগাতে পারবেন। এই কারণেই ভারতবর্ষের মাটিতে এত অধিক পরিমাণ সোনারূপা ও মূল্যবান মণিরত্ন প্রোথিত থাকে। কোন হিন্দুর যদি মাটির তলায় কোনও টাকাকড়ি জমা না থাকে, তাহলে তিনি অবশ্যই দরিদ্রের পর্যায়ভুক্ত হবেন।

আমার স্মরণ আছে যে একদা আমি ভারতবর্ষে ছয়শত টাকা মূল্যে অ্যাগেট নামে মূল্যবান পাথরের ছয় ইঞ্চি উঁচু এবং আমাদের একপ্রকার রূপার থলির মত গড়নের একটি বাটি কিনেছিলাম। বিক্রেতা আমাকে বললেন যে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে ওটিকে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। তিনি তা করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলেন যে পাত্রটির পরিবর্তে নগদ টাকা রাখাই ভাল।

আমার শেষ ভ্রমণ যাত্রায় আমি জনৈক হিন্দুর কাছে প্রায় ছয় রত্তি করে ওজনের বাষট্টি খণ্ড হীরক ক্রয় করি। জিনিসগুলি অত্যধিক সুন্দর দেখে আমি বিস্ময় সহকারে তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন যে আমার বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তিনি সেই রত্নাবলী পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রহ করেছেন তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। কিন্তু অবস্থা তখন দাঁড়িয়েছে ভিন্নতর। টাকার দরকার হওয়াতে তিনি ঐ সময় ওটি বিক্রয়ের জন্যে ব্যগ্র হন। এই ধরনের ভূগর্ভে প্রোথিত অর্থ সম্পদ একদা রাজা শিবাজীর জীবনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। শিবাজী মুঘল বাদশাহ ও বিজাপুরের সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের উপদেশে শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের একটি ছোট গ্রাম (কুল্লিয়ানী) অধিকার করেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে উক্ত গ্রামে তিনি প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা প্রোথিত ধনরত্ন পেয়ে যাবেন। অতএব তিনি স্থানটিকে অংশত ধ্বংস করে বাস্তবিকই প্রচুর টাকা কড়ি পেয়েছিলেন। সেই অর্থ দ্বারাই তিনি তাঁর সৈন্যবহরের ব্যয়ভার নির্বাহ করেছেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারেরও অধিক। এই মনোভাবাপন্ন হিন্দুদের মন থেকে ভুল ধারনা দূর করা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, তাঁরা কোনও যুক্তি বিচারের ধার ধারেন না। নিজেদের বিচার বুদ্ধিকে তাঁরা পুরোপুরি প্রাচীন রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত করেন। তার মধ্যে একটি মুখ্য রীতি হোল মৃত ব্যক্তিদের দেহ আগুনে পোড়ানো।

অধ্যায় আট

মৃতদেহ সৎকার সম্পর্কে হিন্দু সমাজের রীতি পদ্ধতি

পৌত্তলিক পন্থী হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেহকে দাহ করার প্রথা অতি প্রাচীন। মৃতদেহ সাধারণতঃ নদীতীরে সৎকার করা হয়। সেখানে মৃতদেহকে স্নান করিয়ে তার সমস্ত পাপতাপ, যা থেকে তিনি জীবিতকালে মুক্ত হতে পারেন নি, তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হয় এভাবে। কুসংস্কারের মাত্রা এত বেশী হয়ে ওঠে যে পীড়িত ব্যক্তিকে মুমূর্ষু অবস্থায় কোনও নদী বা তড়াগের তীরে নিয়ে যান এবং তার পা-দু'খানিকে জলের মধ্যে নামিয়ে দেয়া হয়। ক্রমে দেহটিকে আরও জলের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র চিবুক থেকে মুখখানি বাইরে দেখা যায়। এর কারণ, যে মুহূর্তে আত্মা দেহ ত্যাগ করবে, তখন দেহ ও আত্মা উভয়ই জলে মগ্ন থাকার ফলে শুদ্ধ হয়ে উঠবে। অবশেষে সেখানেই দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হবে। শ্মশান ক্ষেত্রের পাশে অনেক মন্দিরও থাকে। ওখানে একদল লোক থাকে যাদের কাজ আগুনে পোড়া অবশিষ্ট কাঠগুলি সংগ্রহ করা। তারা এজন্যে কিছু গণ্ডগোল এবং উৎপাতও সৃষ্টি করে। সুতরাং তাদের নিকৃষ্ট হারে কিছু পয়সা কড়ি দেবার ব্যবস্থা আছে।

কোনও হিন্দুর মৃত্যু হলে তার স্বজাতি ও সমগোত্রীয় লোক সব এসে তার গৃহে জড় হন। মৃত ব্যক্তির অবস্থা ও মর্যাদা অনুসারে দেহটিকে সুন্দর ও উত্তম বস্ত্রে আবৃত করে একটি শিবিকা জাতীয় (খাট, চারপাই) জিনিসে স্থাপন করে শ্মশানে নিয়ে যান। কতক লোক দেহটি স্থাপিত খাটটিকে কাঁধে বহন করে নিয়ে যাবেন—এই প্রথা। বাকি লোক পায়ে হেঁটে তা অনুসরণ করেন। সংগীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে এগিয়ে চলেন, মাঝে মাঝে 'রাম, রাম' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। কেউ হয়ত ছোট একটি ঘণ্টা বাজাবেন মধ্যে মধ্যে মৃত ব্যক্তির জন্যে প্রার্থনা জানাবার নির্দেশ দানের জন্যে। মৃতদেহটি প্রথমে নদীর কিনারায় নিয়ে জলে ডুবিয়ে, তারপর তাকে তুলে দাহ করার প্রথা। দাহ করা হয় তিনটি ভিন্ন রকমে। আমি পরবর্তী অধ্যায়ে তার বর্ণনা দেব। মৃত ব্যক্তির আর্থিক সম্পদ অনুসারে সাধারণ কাঠের সংগে চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ কাঠ মিশিয়ে নেয়া হয়।

হিন্দুরা কেবল মৃতকেই সৎকার করেন না। তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষ্ঠুর মন জীবন্তকে পুড়িয়ে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না, কুণ্ঠিত হয় না, বেদনা বোধ করে না। অথচ তারা হয়ত একটি সাপ বা একটি ছারপোকার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে মারবেন না। কিন্তু কোন পুরুষের মৃত্যুর পরে তার জীবিত স্ত্রীকে তার মৃতদেহের সংগে পুড়িয়ে ফেলাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করেন।

অধ্যায় নয়

ভারতবর্ষে মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে নারীরা কি প্রকারে আত্মাহুতি দান করেন।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে একটি প্রাচীন রীতি আছে যে কারোর মৃত্যু হলে তার বিধবা পত্নী আর কখনও বিবাহ করতে পারবেন না। স্বামীর পরলোক-গমণের পরে স্ত্রী কান্না রোধ করে কয়েক দিন পরে মাথার চুল কেটে ও কামিয়ে ফেলবেন। শরীর থেকে সমস্ত গহনাগাটি খুলে ফেলেন। বিবাহের সময় তার স্বামী প্রদত্ত হাতের বালা, পায়ের মল কিছুই আর শরীরে থাকবে না। এই জিনিসগুলি ছিল এমন একটি নিদর্শন চিহ্ন যার মধ্যে পরিস্ফুট হোত যে তিনি স্বামীর প্রতি অনুগত ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু স্বামীর পরলোক-গমনের পরে তার জীবনই মূল্যহীন। কোথাও তার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি ও সম্মান থাকে না। যে গৃহে এতদিন তিনি ছিলেন কর্ত্রী, এখন সেখানে হবেন দাসদাসী অপেক্ষাও নিম্নতর কিছু। এই জাতীয় শোচনীয় অবস্থার ফলে তার জীবনের প্রতি আর কোনও আকর্ষণ থাকে না। অতএব, তিনি মৃত স্বামীর চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দানকেই বাকি জীবন লোক সমাজে অপমান অবস্থা লাভের চেয়ে শ্রেয়ঃ মনে করেন।

এই প্রথার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ব্রাহ্মণরা এসে সেই পতি বিয়োগকাতরা নারীকে পরামর্শ দান করে বলেন যে এই ভাবে দেহাবসান ঘটালে তারা তাদের স্বামীদের সংগে আবার পৃথিবীর অন্য কোনও অংশে পূর্বজীবন অপেক্ষা অধিকতর গৌরব, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন লাভ করবেন। দু'টি কারণে এই হতভাগ্য রমণীরা স্বামীর মৃতদেহের সংগে নিজেদের জীবন্ত দগ্ধ করতে সংকল্প করেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে পুরোহিতরা সেই অভাগিনী নারীদের অনুপ্রাণিত করেন এই কথা বলে যে তারা যখন অগ্নিতে প্রবেশ করে আত্মদানে ব্যাপৃত হবেন তখন রামচন্দ্র তাদের চমৎকার সব জিনিস দান করবেন। আর তাদের আত্মা বিভিন্ন দেহন্তর অতিক্রম করে করে শেষ পর্যন্ত চিরন্তন এক মহিমান্বিত অবস্থায় উন্নীত হবেন।

একথাও আলোচ্য যে কোন নারী তার মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ করতে পারেন না যদি তিনি যে অঞ্চলের বাসিন্দা সেখানকার গভর্ণরের অনুমতি লাভ না করেন গভর্ণররা সাধারণত মুসলমান। তারা এই আত্মদানের

রীতিতে ভীতিগ্রস্ত হন। কাজেই তিনি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে এই কাজে অনুমতি দান করেন না। পক্ষান্তরে নিঃসন্তান বিধবারা যদি মৃত স্বামীর সংগে সহমরণে সাহস হারান বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহলে তিনি তিরস্কৃত ও নিন্দিত হন এই বলে যে তার স্বামীর প্রতি কোনও ভক্তি ভালবাসা ছিল না। আর সহমরণে তার সেই সাহসের অভাব তাকে সারাজীবনই নিন্দিত করে এবং তাকে অপমানের জ্বালা ভোগ করতে হবে। তবে সন্তানবতী নারীরা কোনও প্রকারেই সহমরণে যাবার অনুমতি লাভ করেন না। প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির প্রশ্ন না তুলে সেক্ষেত্রে এই কথাই বড় হয়ে ওঠে যে সন্তানদের শিক্ষা-দান ও প্রতিপালন করার জন্যেই তাদের বেঁচে থাকা দরকার।

গভর্ণর যাদের সুনিশ্চিতভাবে সহমরণে যেতে অনুমতি প্রদান করেন না, তারা বাকী জীবন কঠোর কৃচ্ছতা ও দানধ্যানের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। কিছু সংখ্যক মহিলা বড় রাস্তার পাশে বসে অনবরত জলে শব্জী সিদ্ধ করে পথিক-দের খেতে দেন, অথবা আগুন জ্বেলে রাখেন যাতে ধূমপায়ীরা তামাক পুড়িয়ে খেতে পারেন। আর এক শ্রেণীর মহিলা আছেন যারা গরু মহিষের বিষ্ঠার মধ্যে অজীর্ণ খাদ্যাংশ পেলে তা খাবার ব্রত গ্রহণ করেন। এমন আরও অনেকে আছেন যারা এর চেয়েও অসম্ভব ও অস্বাভাবিক সব কাজ করেন।

গভর্ণর দেখলেন যে তিনি যতই নিষেধাজ্ঞা জারী করুন না কেন, সেই সহমরণযাত্রী নারীরা আরও বেশী অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাছ থেকে। কাজেই তাদের নিষেধ ও আদেশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিছুতেই তাদের সেই জঘন্য নিষ্ঠুর কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় না। কারণ নারীরাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন সেবিষয়ে। গভর্ণরের ধারণা যে তাঁর সহকারী এই ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং ঘুষও গ্রহণ করেন। এই কারণে তিনি বিরক্ত হয়ে ওবিষয়ে আর কোন প্রতিবিধান করতে আর উদ্যোগী হন না। আর তিনি হিন্দুদের বলে দিয়েছেন যে তারা সকলেই এই ভাবে 'জাহান্নামে' যেতে পারেন।

গভর্ণরের এই উক্তি ও পরোক্ষ অনুমতির বানী শুনে মৃতের গৃহ নানা বাদ্য-বাজনা, ঢাক-বাঁশী ও অন্যান্য শব্দে জমজমাট হয়ে ওঠে। মৃতদেহটিকে তখন সেই বাজনা সহযোগে কোনও সরোবর বা নদীর তীরে নিয়ে যান দান করার জন্যে। সদ্য পতিহারা নারীর আত্মীয় বন্ধুরা তার সহমরণের ইচ্ছা আগ্রহ দেখে তাকে অভিনন্দন জানান এইজন্যে যে তিনি পরজন্মে বিপুল সৌভাগ্য ও সুখের

অধিকার লাভ করবেন। এছাড়া তার সমগোত্রীয় নরনারীরা সেই মহান আত্মত্যাগের জন্যে গৌরবান্বিত বোধ করবেন অবশ্যই। বাদ্যবাজনার শব্দেও সহযাত্রিণী নারীদের কণ্ঠে উদ্‌গত প্রার্থনা গানে স্থানটি প্রবল কোলাহলময় হয়ে ওঠে। নারীরা সেই হতভাগ্য সহমরণ যাত্রিণীর গুণগানও করতে থাকেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণও তাকে উৎসাহ দান করেন তার সাহস ও সংকল্প অটুট রাখার জন্যে। অনেক ইউরোপীয়দের বিশ্বাস যে মানুষ স্বভাবতঃই মৃত্যুকে এড়াতে চায়, মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়। সুতরাং সহমরণের পথে যিনি চলেছেন তাকে বোধহয় কোন নেশাকর বস্তু খাওয়ানো হয় যার ফলে তার মন থেকে মৃত্যু ভয় ও সংশয় সব দূর হয়ে যেতে পারে। ব্রাহ্মণদের এই ব্যাপারে স্বার্থ এই যে সহমরণ প্রার্থিনীর দেহে যা কিছু সোনারূপার অলঙ্কার গহনা অর্থাৎ বালা, হার, দুল ও মল থাকে তা প্রকৃত পক্ষে ও নিয়মানুসারে তারই প্রাপ্য। দরিদ্রতমদের গায়ে থাকে তামা ও দস্তার আভরণ। তবে চিতায় আরোহণের পূর্বে তারা কোন মূল্যবান পাথরের গহনা পরেন না।

বিভিন্ন দেশীয় প্রথানুসারে আমি তিন প্রকারের সতীদাহ দেখার অবকাশ পেয়েছিলাম। গুজরাট রাজ্য, আর ওদিকে আগ্রা, দিল্লীতে কিভাবে সতী-দাহ হয় তা দেখেছি। কোন নদী বা পুকুরের ধারে বারো স্কোয়ার ফুট আয়তনের একটি ছোট কুঁড়ে ঘরের মত তৈরী করা হয় নানা প্রকার বাঁশ, খড়, নল খাগড়া ইত্যাদি দিয়ে। কারণ সে সকল জিনিস দ্রুত পুড়ে যায়। মৃত্যুকামী মহিলাটি কুঁড়ের মধ্যস্থলে অর্ধশায়িত অবস্থায় আসন গ্রহণ করেন। তার মাথাটি কাঠের একটি উঁচু পীঠে ন্যস্ত করা হয়। একটি কাঠের খুঁটির সংগে তার দেহটি এলায়িত করে কোমরের সংগে তাকে বেঁধে রাখেন জনৈক ব্রাহ্মণ। এর কারণ, অগ্নিতাপের জ্বালা অনুভূত হলে তিনি পালিয়ে যেতে না পারেন। এই ভঙ্গীতে মৃত স্বামীর দেহটি তার হাঁটুর উপরে ধরে তাকে আগলে রাখতে হয়। সর্বক্ষণ তিনি পান চিবিয়ে চলেন। এইভাবে আধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে মহিলাটির পাশে যে ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি কুটিরের বাইরে চলে যান। তারপর পুরোহিতকে নির্দেশ দেয়া হয় অগ্নি-সংযোগের জন্যে। আর তখন থেকে মহিলার আত্মীয় পরিজনরা বাটি বাটি তেল নিক্ষেপ করেন সেই অগ্নিকুণ্ডে, যাতে মহিলাটি অনায়াসে দগ্ধ হয়ে দ্রুত দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হতে পারেন। দেহ দুটি ভস্মীভূত হলে ব্রাহ্মণরা ভস্ম-মিশ্রিত সোনারূপার খণ্ড যা মহিলাটির অংগাভরণ গলে গলে তৈরী হয়েছে

তা সংগ্রহ করেন। আমি পূর্বেও বলেছি যে সেই জিনিসে তাদেরই ন্যায্য অধিকার।

বাংলাদেশে সতীদাহ প্রথা ভিন্ন প্রকারের। সেখানে যদি কোন মহিলা স্বামীর শবের সংগে গঙ্গাতীরে না আসেন তাহলে তিনি অতিশয় দুর্ভাগী বলে বিবেচিত হন। মৃতদেহকে গঙ্গায় স্নান করানোর সময় তিনিও সহমরণের প্রস্তুতিস্বরূপ স্নান সমাপণ করবেন। এমনও দেখেছি যে তারা বিশ দিনের যাত্রাপথের দূরত্ব থেকেও গঙ্গাতীরে আসেন। মৃতদেহ তন্মধ্যে পচে যায়। তা থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ বেরোয়। আমি একটি ঘটনা এমন দেখেছিলাম যে উত্তরে ভুটান রাজ্যের সীমান্ত থেকে এক মহিলা পদব্রজে ও অনাহারে তার স্বামীর শবানুগমন করে এসেছিলেন গঙ্গাতীরে। সেখানে পৌঁছতে তাদের সময় ব্যয় হয়েছিল পনের ষোল দিন। মৃতদেহ আনা হয়েছিল একটি শকটে করে। তখন ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছিল।

মৃতদেহের স্নানকার্যের সংগে মহিলাটিরও স্নান সম্পন্ন হোল। অনন্তর তিনি এমন দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সহমরণ যাত্রা করলেন যা দেখে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হলেন। আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। গঙ্গার সমগ্র কিনারা ধরে এবং সারা বাংলাতেই জ্বালানি কাঠের কিছু অভাব দেখা যায়। অতএব সেই হতভাগ্য রমনীরা কাঠ ভিক্ষা করেন স্বামীদের চিতায় নিজেরের জীবন্ত দগ্ধ করে মৃত্যু বরণ করার জন্যে। তাদের জন্যে চিতা সাজানো হয় ঠিক একটি শয্যার মত করে। ছোট কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে বালিশের মত একটি তৈরী করে তার উপর মৃতকে শুইয়ে দেবার নিয়ম। তেল বা ঐ জাতীয় কোনও দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেবার রীতি আছে দেহকে সহজে ভস্মীভূত করার জন্যে। সহ-মরণে আগ্রহী নারী নানা অলঙ্কার ও সুন্দর মূল্যবান বস্ত্রে সুসজ্জিতা হয়ে ঢাক ও বাঁশীর বাজনার সংগে সচ্ছন্দে এগিয়ে যান চিতাভিমুখে।. চিতায় আরোহণ করে তিনি অর্ধশায়িতা, অর্ধআসীনা ভঙ্গীতে সেখানে স্থান গ্রহণ করেন। তারপর তার স্বামীর দেহটি তার দেহের উপর আড়াআড়ি ভাবে ন্যস্ত করা হয়। অবশেষে মহিলাটির আত্মীয় পরিজনদের কেউ নিয়ে আসেন তার জন্য একখানি চিঠি, কেউ একখণ্ড কাপড়, কেউবা একটি পুষ্পস্তবক। অপর কেহ হয়ত রূপা বা তামার টুকরো। তারা তাকে বলেন,

"এই জিনিসগুলি আমার মা, ভাই, আত্মীয় বন্ধু যারা এই জগতে থেকে আমাকে কত ভালবেসেছেন, তাদের তুমি ইহা দিও।"

মহিলাটি যখন দেখলেন যে উপস্থিত সকলের জিনিসপত্র দান শেষ হয়েছে, তখন তিনি তিনবার জানতে চান যে আর কিছু দেবার ও বলার আছে কিনা। সকলে নিরুত্তর হলে তিনি প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহ একটি কাপড়ে জড়িয়ে তার কোলে ও স্বামীর পিঠের তলায় তা স্থাপন করেন এবং পুরোহিত-দের বলেন অগ্নিসংযোগ করতে। তখন সাধারণ ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ একত্রিত হয়ে সে কাজ সম্পন্ন করেন। আমি পূর্বেও বলেছি যে বাংলাদেশে জ্বালানি কাঠের অভাব। তার ফলে মহিলাটির মৃত্যু হলে দু'টি দেহ অর্দ্ধ ভস্মীভূত হতেই তাদের গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে তা কুমীরের খাদ্যে পরিণত হয়।

বাংলা প্রদেশের হিন্দু সমাজে প্রচলিত আর একটি কু-প্রথার কথা ভুলবার নয়। কোনও নারীর সন্তান প্রসবের পরে যদি দেখা যায় যে নবজাত শিশুটি মাতৃস্তন্য পান করে না, তখন তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে একখণ্ড কাপড়ে জড়িয়ে তার চার কোণ বেঁধে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখার প্রথা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটি এইভাবে থাকে। সেই হতভাগ্য শিশুটি তখন কাক পক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাখীরা হয়ত শিশুর চোখই তুলে নিল। কখনও হয়ত তার মাথা ক্ষত বিক্ষত করে দিত। এই কারণেই বাংলা প্রদেশের হিন্দুসমাজে অনেক অন্ধলোক দেখা যায়। কারোর হয়ত একটি চোখ নেই। আবার কেহ হয়ত দু'টিই হারিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলায় শিশুটিকে গাছ থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে দেখবেন যে আগামী রাত্রিতে সে মাতৃস্তন্য পান করে কিনা। যদি দেখা যায় যে তখনও সে স্তন্য পানে অনিচ্ছুক তাহলে আবার পরদিন তাকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে রেখে আসবে। পরপর তিন দিন এইভাবে চলবে। তার পরেও যদি অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সকলে মনে করেন যে ওটি একটি দানব। তখন তাকে গঙ্গাগর্ভে বা কাছাকাছি অন্য নদী বা পুকুরে নিক্ষেপ করা হয়। যে অঞ্চলে অনেক বাঁদর আছে সেখানে এই শিশুদের উপর কাকের উৎপাত বেশী হতে পারে না। কারণ বাঁদরেরা কাকের বাসা দেখলেই গাছ থেকে বাসাগুলিকে আর ডিমগুলিকে অন্যদিকে ফেলে দেয়। তাছাড়া ইংরেজ, ডচ ও পর্তুগীজদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ সদাশয় ও সেবা পরায়ণ তাঁরা করুণার্দ্র হয়ে সেই হতভাগ্যদের শিশুদের গাছ থেকে নামিয়ে এনে সেবা যত্ন করে প্রতিপালন করেন। এই রকম একটি ঘটনা আমি হুগলীতে দেখেছি। ইউরোপীয়দের ফ্যাক্টরীর কাছেই তা ঘটেছিল।

এখন আলোচনা করা যাক যে করোমণ্ডল উপকূলে সতীদাহ প্রথা কি প্রকারে চলে। পঁচিশ ত্রিশ স্কোয়ার ফুট আয়তনের একটি স্থান নয় দশ ফুট গভীর করে খোদিত হয়। তার মধ্যে প্রচুর জ্বালানি জমা করা হয়। তার সংগে অনেক ওষুধ জমা হয় সহজে যাতে মানব দেহ ভস্মীভূত হতে পারে। গহ্বরটি উত্তমরূপে তপ্ত হলে স্বামীর মৃতদেহ সেখানে স্থাপিত হয়। তারপর স্ত্রী পান চিবোতে চিবোতে তার আত্মীয় পরিজনসহ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী-সহকারে চিতার দিকে এগিয়ে যান। সংগে বাজতে থাকে ঢাক, ঢোল ও করতাল। মহিলাটি গহ্বরটিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন, আর প্রতিবারে তার আত্মীয় স্বজনদের চুম্বন করেন। তিনবার প্রদক্ষিণ হয়ে যাবার পর ব্রাহ্মণরা মৃত দেহটিতে অগ্নিসংক্ষেপ করেন। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকে চিতার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালে সমবেত ব্রাহ্মণরাই তাকে ঠেলে আগুণের শিখার মধ্যে ফেলে দেন। তিনি পড়ে যান। আর তখন সমস্ত আত্মীয় স্বজন মিলে বিভিন্ন পাত্র পূর্ণ তেল ও নানা রকম ওষুধ জাতীয় জিনিস আগুনে ঢেলে দিতে থাকে। যাতে দেহ দু'টি দ্রুত অগ্নিগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। একথা আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

করোমণ্ডল উপকূলের অধিকাংশ স্থানে সদ্য বিধবা নারীরা স্বামীর মৃত দেহের সংগে আত্মবিসর্জন করেন না। নিজেকে স্বতন্ত্র ভাবে জীবন্ত সমাধি দান করেন। ব্রাহ্মণরা তার স্বামীর সমাধির পাশেই আর একটা গহ্বর খনন করেন একটি পুরুষ বা নারীর উচ্চতা অপেক্ষাও এক ফুট অধিক গভীর করে। এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ বালুকাময় স্থান নির্বাচিত হয়। পুরুষ ও নারীকে দাহ করে সমবেত ব্যক্তিরা ঝুড়ি ঝুড়ি বালি এনে সেই গর্তটি বন্ধ করেন। যতক্ষণ জমির উপরেও এক ফুট আন্দাজ উঁচু টিপি তৈরী না হবে ততক্ষণ বালি ছড়ানোর কাজ চলতে থাকে। অতঃপর সেই বালির স্তূপকে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলেন স্থানটিকে সমতল করার জন্যে।

করোমণ্ডল অঞ্চলে কোনও হিন্দুর মৃত্যু আসন্ন হলে অন্যান্য স্থানের মত তাকে কোন নদী বা জলাশয়ের তীরে নিয়ে যাওয়া হয় না মুমূর্ষুর আত্মাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে। করোমণ্ডলবাসীরা তাকে সোজা নিয়ে যান যেখানে হৃষ্টপুষ্টতম একটি গাভীর সন্ধান পাওয়া যাবে।

যদি স্বাস্থ্যবান গরু না পাওয়া যায়, তাহলে রুগ্ন ও দুর্বল গরুতে চলবে না। তখন মৃত্যু পথযাত্রীকে নদী বা তড়াগের তীরেই নিয়ে যেতে হবে। কারণ তার মৃত্যু গৃহে বা আবাসে হলে ব্রাহ্মণরা তার উপর জরিমানা ধার্য করেন।

অধ্যায় দশ

সতীদাহের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা।

ভারতীয় হিন্দু সমাজে মৃত স্বামীর সংগে নারীর সহমরণের বহুসংখ্যক বর্বরোচিত ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনটি আমি এখানে বিবৃত করবো। তার মধ্যে দু'টি ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী।

ভেলোরের রাজার কথা আমি এই ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রথম ভাগে বলেছি। সেই সময়ে তিনি বিজাপুর রাজের সেনাপতির হাতে নিজের প্রাণ ও রাজ্য, দুই-ই হারান। অতএব তাঁর রাজ্য ও দরবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর প্রাসাদের এগার জন মহিলা অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীরা স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ যাত্রার সংকল্প করেন। বিজাপুরের সেনাপতি তা শুনে ভেবেছিলেন যে সেই রমণীদের দৃঢ় সংকল্পকে তিনি নানা চাটুকারিতা দ্বারা দমন করতে পারবেন। কিন্তু দেখা গেল যে তাতে কোন ফল হয়নি। তাঁরা স্বামীর মৃতদেহের সংগে আত্মবিসর্জনে বদ্ধ পরিকর। তখন তিনি সেই মহিলাদের একটি কক্ষে অবরুদ্ধ রাখার হুকুম দিলেন। যার উপর সেই হুকুম মাফিক কাজ করার ভার পড়েছিল তাকে সেই বিক্ষুব্ধ মহিলারা জানিয়ে দিলেন যে তিনি সর্ববিধ চেষ্টা চালাতে পারেন, কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে না। তাঁদের বন্দী করে রাখার কোন অর্থ হয় না। তাঁরা আরও বললেন যে তাঁদের যদি ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেয়া না হয় তাহলে তিন ঘণ্টা পর আর তাদের একজনও জীবিত থাকবেন না।

সেকথা হেসে উড়িয়ে দেয়া হোল। কারোর বিশ্বাসই হয়নি যে সেরকম কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু তিন ঘণ্টা অবসান হলে উক্ত কক্ষের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দরজা খুলে দেখলেন যে এগার জন মহিলার একজনও জীবিত নেই। সকলেই মেঝেতে দেহ এলিয়ে শুয়ে আছেন। অথচ সেখানে জীবন নাশ করা যায় এমন কোনও ছুরিকা বা বিষাক্ত জিনিসের চিহ্নমাত্র নেই। কি প্রকারে তাঁরা নিজেদের জীবন নাশ করেছিলেন তার কোনও ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া গেল না। সেদিনের ঘটনায় সকলের মনে হোল, ওখানে কোন প্রেতাত্মা এসে কিছু করেছিল। এখন আর একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করা যাক।

ভারতবর্ষের দু'জন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন দুই ভাই। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁরা আগ্রায় গিয়েছিলেন তদানীন্তন মুঘল সম্রাট শাহজাহানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের মুখ্য কর্মচারীর মতে তাঁরা দরবারের রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী চলতে পারেননি। একদিন তাঁরা দুই ভাই একসংগে বাদশার আসনের সামনে প্রাসাদের বারান্দার নীচে একটি জায়গাতে বসে ছিলেন। তখন সেই মুখ্য রাজকর্মচারী তাঁদের একজনকে বললেন যে তাঁরা যে প্রকার আচার আচরণ করছেন তা মুঘল সম্রাটের দরবারের যোগ্য নয়। সেই রাজা নিজেকে শ্রেষ্ঠ শাসক মনে করতেন। আর তিনি তাঁর ভ্রাতার সংগে যেখানে রয়েছেন সেই বাসস্থানে ষোল হাজার সৈন্য এনে মোতায়েন রেখেছেন। অতএব তিনি মুঘল কর্মচারীর উক্তিতে অপমানবোধ করলেন। এবং তার প্রতিশোধ নিলেন বাদশার সামনেই। অর্থাৎ নিজ অসি কোষ মুক্ত করে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করলেন। বাদশাহ একটি উচ্চস্থানে ছিলেন উপবিষ্ট। সেখানে বসে সেই অদ্ভুত ও শোচনীয় ঘটনাটি তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

আমি পূর্বেও বর্ণনা দিয়েছি যে বাদশাহ একটি উচ্চস্থানে বসে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং বিচারের রায় দান করেন। নিহত মুখ্য কর্মচারীর ভ্রাতা কাছেই বসেছিলেন। তাঁর পায়ের কাছেই মৃত দেহটি লুটিয়ে পড়েছিল। তিনি তখুনি ভ্রাতৃহন্তাকে সমুচিত শিক্ষাদানে উদ্যত হলেন। ওদিকে হত্যাকারী রাজার ভ্রাতাও উপলব্ধি করতে পারলেন যে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে। অতএব তিনি এক মুহূর্ত কালক্ষেপ না করে নিহত রাজকর্মচারীর ভ্রাতাকে ছুরিকাহত করে তাকেও তার ভ্রাতার মৃত-দেহের উপরে ফেলে দিলেন। এই দু'টি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখে বাদশাহ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হারেমে চলে গেলেন। অতঃপর সমস্ত ওমরাহরা এবং দর্শকের সামনে সমবেত ব্যক্তিরা মিলে সেই অতিথি রাজদ্বয়কে হত্যা করে তাদের দেহ ছিন্ন বিছিন্ন করে দিলেন।

বাদশাহ তাঁর সম্মুখে এই প্রকার হীন ও ভয়ানক ঘটনা ঘটতে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন যে নিহত দুই রাজ ভ্রাতার দেহ নদীবক্ষে নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু নিহত ব্যক্তিরা আগ্রার নিকটে যে সৈন্য বহর মোতায়েন করেছিলেন তারা যখন শুনলেন যে তাদের দুই রাজার মৃত্যু ঘটেছে কিভাবে এবং মৃতদেহেরও অবমাননা হতে চলেছে, তখন তারা ভয় দেখালেন

যে আগ্রা সহরে প্রবেশ করে তারা সহরটির ধ্বংসসাধন করবেন। এই কথা শুনে বাদশাহ চিন্তা করলেন যে রাজধানীকে বিপদ মুক্ত রাখাই সমীচিন। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন যে মৃতদেহ দু'টি সৈন্যদের হাতে ন্যস্ত করা হোক। বাদশাহী হুকুম তামিল করা হয়েছিল। তারপর রাজপুত সৈন্যরা শান্ত হলেন। যখন তারা মৃত দেহ দু'টিকে দাহ করতে উদ্যোগী হলেন তখন দেখা গেল যে রাজঅন্তঃপুরের তেরজন মহিলা নানা ভঙ্গীতে অর্থাৎ যেন নৃত্যছন্দে এগিয়ে এসে চিতায় আরোহণ করলেন। প্রথমে তারা চিতা দু'টিকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়লেন। আর তারা দাঁড়ালেন হাতে হাত ধরে। ধোঁয়াতে আছন্ন হয়ে তাঁরা প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হলেন এবং তখন সকলে মিলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। ব্রাহ্মণরা তখন অনেক কাষ্ঠ খণ্ড, বাটি বাটি তেল আর নানা রকম ওষুধ জাতীয় জিনিস প্রচলিত নিয়মানুসারে ঠেলে দিলেন অগ্নিকুণ্ডে। উদ্দেশ্য, দেহগুলি যাতে দ্রুত ভস্মীভূত হয়ে যায়।

আমি আরও একটি ঘটনার কথা বলতে পারি। তা ঘটেছিল আমার সামনেই। স্থান বাংলা দেশের একটি সহর পাটনা। আমি তখন সেখানে ছিলাম। তথাকার ওলন্দাজদের সংগে উক্ত সহরের সুবাদারের গৃহেই আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সুবাদার ছিলেন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বয়স তখন তাঁর প্রায় আশী বছর। তাঁর অধীনে পাঁচ ছয় হাজার অশ্ব ছিল। সেই সময় আমরা একদিন তাঁর অভ্যাগত অভ্যর্থনার কক্ষে বসে আছি। এমন সময় অতিশয় সুন্দরী এক মহিলা এসে প্রবেশ করলেন সেই কক্ষে। তার বয়স বাইশ বছরের বেশী ছিল না কিছুতেই। মহিলাটি অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গীতে ও দৃপ্তস্বরে সুবাদারকে বললেন যে তিনি মৃত স্বামীর সংগে সহমরণে ইচ্ছুক। তিনি যেন স্বচ্ছন্দে তাকে অনুমতি দান করেন। গভর্ণর কিন্তু মেয়েটির অল্প বয়স ও সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হলেন। এবং তার আবেদন অগ্রাহ্য করে তাকে সেই নিষ্ঠুর কাজ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হোল। পরন্তু মহিলাটি আরও অনমনীয়ভাবে ও অধিকতর সাহসের সংগে বলে উঠলেন যে সুবাদার কি মনে করেন যে তার আগুনে ভয় আছে। তদুত্তরে গভর্ণর প্রশ্ন করলেন যে অগ্নি-তুল্য আর কোনও যন্ত্রণাদায়ক কিছুর সংগে তার পরিচয় আছে কিনা।

রমণী পূর্বাপেক্ষা আরও নির্ভিকভাবে বলে উঠলেন, "না, না, আমি কোন প্রকারেই আগুনকে ভয় করি না। আপনার কাছে তা প্রমাণ করার

জন্যেই বলছি। আপনি উত্তমরূপে জ্বলন্ত একটি মশাল নিয়ে আসার হুকুম দিন।"

গভর্ণর নারীর কথাবার্তা শুনে ভীতিগ্রস্ত হলেন এবং তার কথা শুনতে আর আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। পরন্তু ক্রোধাবিষ্ট হয়ে তিনি রমনীকে স্থান ত্যাগ করতে বললেন। আর বলেছিলেন যে তিনি ইচ্ছেমত যা কিছু করে জাহান্নামে যেতে পারেন। কয়েকজন যুবা বয়সের পদস্থ লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তারা গভর্ণরের অনুমতি প্রার্থনা করলেন যাতে একটিবার মহিলাটির সাহসশক্তি পরখ করে দেখা যায়। আর তিনি একটি মশাল আনয়নের ব্যবস্থা করে দিন। তারা আরও বললেন সে মহিলার সম্ভবতঃ সহমরণে যাবার সাহস নেই। প্রথমতঃ গভর্ণর ওবিষয়ে মত দিতে রাজী হননি। কিন্তু তাদের আবেদন নিবেদনের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি মশাল আনতে নির্দেশ দিলেন। ভারতবর্ষে এই মশাল তৈরী হয় কাপড়ের খণ্ড একটি লাঠির সংগে জড়িয়ে তাকে তৈলসিক্ত করে। আমরা তাকে বলি বাতি। মশাল আমাদের দেশে সহরের চৌরাস্তায় প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়। মহিলাটি মশাল দেখেই কাছে ছুটে গেলেন এবং আগুনের মধ্যে নিজের হাতটি এমন দৃঢ়ভাবে রাখলেন যে তার চোখে মুখে একটুকুও ভয়ভীতির চিহ্ন প্রস্ফুট হোল না। ক্রমশঃ তিনি কনুই পর্যন্ত হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন আগুনের মধ্যে। তার সেই অঙ্গটি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ পুড়ে গেল। সেখানে সমবেত ব্যক্তিরা তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। গভর্ণর হুকুম দিলেন যে মহিলাকে তাঁর সামনে থেকে সরিয়ে দেয়া হোক।

আমি পাটনায় অবস্থানকালে স্বচক্ষে আর একটি ঘটনা দেখেছিলাম। এখন তার বর্ণনা দেব। জনৈক ব্রাহ্মণ বাইরে থেকে এসে সহরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর স্বজাতিদের থেকে বললেন যে তাদের অবশ্যই তাঁকে দু'হাজার টাকা ও প্রায় ৫৪ গজ কাপড় দিতে হবে। সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি তাঁর দাবী সম্বন্ধে বললেন যে তা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তারা সকলেই দরিদ্র। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁর দাবী সম্পর্কে অবিচল থেকে জানালেন যে যতক্ষণ না পাওয়া যাবে ততক্ষণ তিনি আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করবেন না এবং ওখানে অপেক্ষা করবেন। এই সংকল্প নিয়ে তিনি একটি গাছে চড়ে বসলেন। আর খাদ্য পানীয় ব্যতীত তিনি কয়েকদিন

সেখানে অতিবাহিত করলেন। এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা ওলন্দাজদের কর্ণগোচর হোল। আমি তখন তাঁদের সংগেই ছিলাম।

তাঁরা ও আমি একত্রে টাকা দিয়ে পাহারা নিযুক্ত করলাম। তারা সর্বক্ষণ গাছটির কাছে থেকে লক্ষ্য রাখবেন যে লোকটি বাস্তবিকই খাদ্য ও পানীয় ব্যতীত এতদিন ওখানে থাকতে সক্ষম হল কিনা। তিনি অবশ্য ত্রিশদিন সেইভাবে কাটিয়েছিলেন। আমাদের নিয়োজিত লোকজন ছাড়া আরও প্রায় একশত লোক সেই দৃশ্যের দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাদের স্বজাতিরা সেই জনতাকে ওখানে পাঠিয়েছিলেন। তারাও গাছটির পাশ থেকে দিনে রাতে কখনও একটু নড়েননি। পরিশেষে একত্রিশ দিনে সেই অত্যাশ্চর্য ও অসাধারণ উপবাস ও কৃচ্ছ্রতা দেখে হিন্দুরা মনে করলেন যে ব্রাহ্মণ আর বেশীক্ষণ সেই অনাহার ক্লিষ্টতা সহ্য করতে সমর্থ হবেন না।

তাঁদের মনে আরও চিন্তা হোল যে নিজেদের সমাজের একজন পুরোহিত আকাঙ্ক্ষিত বস্ত্র ও অর্থ না পেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। অতএব তাঁরা নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে সেই পরিমাণ কাপড় ও দু'হাজার টাকা সংগ্রহ করে তাঁকে দিলেন। ব্রাহ্মণ কাপড়ের বাণ্ডিল ও টাকাগুলি দেখেই গাছ থেকে নেমে এলেন এবং সমবেত সকলকে ভর্ৎসনা করলেন গরীব দুঃখীদের দান করার ব্যাপারে তাদের অনাগ্রহ ও অনীহার জন্যে। তিনি সমস্ত টাকা দুঃস্থতম ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে নিজের জন্যে রাখলেন মাত্র পাঁচ ছয়টি টাকা। তিনি কাপড় নিয়েও অনুরূপ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। কাপড়গুলিকে তিনি টুকরো টুকরো করে কাটলেন। নিজের জন্য এমন এক খণ্ড কাপড় রাখলেন যা দ্বারা তাঁর দেহের মধ্যভাগকে মাত্র আবৃত করা চলে। অতঃপর বাকী কাপড় বিলিয়ে দিলেন সকলকে। আর নিজে যেন কোথায় অন্তর্দ্ধান হলেন জনতার মধ্যে। কোনদিন তাঁর আর খবর কেউ পান নি, বা তাঁকে দেখা যায় নি। তাঁর জন্যে সকলে অনেক চিন্তা ও চেষ্টা করেছিলেন। এই দেখে সকলের একটা কথা মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল যে সেই ব্যাপারটির পশ্চাতে কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাব ছিল।

বাটাভিয়াতে প্রচুর চীনদেশীয় মানুষ আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রচলিত দেখেছি এমন একটি প্রথার বিবরণ দিতে চাই। কোনও চৈনিকের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে সমবেত তাঁর আত্মীয় বন্ধুরা ক্রন্দনরত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি কোথায় যেতে চান। আর তিনি যদি কিছু পেতে চান তাহলে স্বচ্ছন্দে

তা বলতে পারেন। তারা তাকে তা দিতে পারবেন। সে জিনিস সোনা, রূপা অথবা নারী যাই-ই হোক না কেন।

চীনাদের মৃত্যু হলে সৎকার কাজের সময় নানা অনুষ্ঠানের বিধি আছে। তার মধ্যে মুখ্য হোল বাজী পোড়ানো। পৃথিবীতে চীনারা এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। তাদের জুড়ি নেই। খুব দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই এই ব্যাপারে তেমন কিছু ব্যয় করা সম্ভব হয় না। ছোট একটি বাক্সে কিছু রূপা রেখে তা মৃত ব্যক্তির কাছে প্রোথিত করার নিয়ম। কিছু পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যও সমাধির পাশে রাখা হয় এই বিশ্বাসে যে মৃতব্যক্তি তা গ্রহণ করবেন।

সৈন্যবহরের কিছু সংখ্যককে প্রতি সন্ধ্যায় বাটাভিয়ার বাইরে পাঠানো হোত রাত্রিতে সহরটির চতুর্দিকে ঘুরে পাহারা দেবার জন্যে। একবার তাদের মাথায় কি খেয়াল চাপলো যে তারা সমাধিস্থলে যাবেন। সেখানে গিয়ে সমাধি পাশে প্রদত্ত খাদ্যবস্তু সব তারা খেয়ে ফেললেন। পর পর কয়েক দিনই তারা সেই খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যেই মাত্র চীনারা তা জানতে পারলেন তখনই সৈন্যরা যাতে জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে না পারেন তার ব্যবস্থা করে ফেললেন। মৃত ব্যক্তির সমাধি পাশে রক্ষিত খাদ্যকে তারা বিষাক্ত করে রাখলেন তিন চার দিন। এই নিয়ে বাটাভিয়াতে বেশ গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্যবসাক্ষেত্রেও চীনাদের বিশিষ্ট স্থান। তারা ওলন্দাজদের অপেক্ষাও ঢের বেশী ধূর্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু তথাকার বাসিন্দারা তাদের সুনজরে দেখেন না। ওলন্দাজরা সৈনিকের বৃত্তিও গ্রহণ করেছিলেন। তারা চীনাদের খাদ্যে বিষ প্রয়োগের দায়ে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁরা বিশেষ চতুরতার সংগে সেই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে সৈন্যরা যদি লোভে পড়ে মৃত ব্যক্তিদের সমাধি পাশে পরিত্যক্ত খাদ্য গ্রহণ করেন তার জন্যে অপর কেহ দায়ী নন। সে খাদ্য সৈনিকদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না। যাদের আত্মীয় পরিজন সেখানে সমাধিস্থ আছেন তারা কখনও এ বিষয়ে কোনও আপত্তি-অভিযাগ করেননি। সুতরাং এই বিষয়ে আর কিছু বলার নেই। অতঃপর সৈনিকরাও তা নিয়ে আর কোন কথা বলতে সাহস পান নি।

অধ্যায় এগার

ভারতবর্ষে হিন্দুদের মুখ্যতম ও প্রসিদ্ধতম মন্দিরাদি

ভারতের সহর ও গ্রামাঞ্চল—সর্বত্রই ছোট বড় নানা আকার আয়তনের হিন্দু মঠ মন্দির আছে অসংখ্য। তাদের আর একটি নাম দেউল। হিন্দুরা মন্দিরে যান দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করার জন্যে এবং পূজা ও অর্ঘ্য দানের উদ্দেশ্যে। কিন্তু অনেক দরিদ্র লোক গ্রাম থেকে বহুদূরে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে পর্বতে বাস করেন। তারা একখণ্ড পাথরে অদ্ভুত রকমে হলদে ও লাল রঙ দিয়ে নাক চোখ এঁকে সেটিকে পূজা করেন।

ভারতবর্ষের চারটি শ্রেষ্ঠ মন্দির জগন্নাথ ক্ষেত্র, বারাণসী, মথুরা ও তিরুপতিতে অবস্থিত। আমি প্রতিটি মন্দিরের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করবো।

জগন্নাথ ক্ষেত্র গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত। (মূল গ্রন্থে ভুল মন্তব্য—জগন্নাথ ক্ষেত্র বঙ্গোপসাগরের কূলে এবং গঙ্গা থেকে বহু দূরে)। সেখানকার মন্দিরটি সুবৃহৎ। স্থানটিতে প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ সমাজ অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের পুরোহিতগণ বাস করেন। মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগের গঠন এইরূপ ঃ

ক্রুশের আকারে পরিকল্পিত এবং অন্যান্য মন্দিরের মতই অনুপাত সিদ্ধ। মন্দিরের গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত মূল দেব মূর্তির চোখ দু'টি হীরকের ; গলায় একটি হীরক হার কোমর পর্যন্ত ঝোলানো। হীরক খণ্ডগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতমটির ওজন চল্লিশ ক্যারাট মত। হাতে বালা আছে নানা প্রকারের। তা তৈরী হয়েছে মুক্তা ও চুনীরত্ন দ্বারা। অতি চমৎকার ও জাঁকালো এই মূর্তিটি কৃষ্ণের। এই শ্রেষ্ঠ মন্দিরে প্রতিদিন যা আয় হয় তা দ্বারা সেদিন পনের বিশ হাজার তীর্থযাত্রীকে খাদ্য দান করা চলে। এই প্রকার বৃহৎ সংখ্যক যাত্রী সেখানে প্রায়ই সমবেত হন। কারণ মন্দিরটি ভারতীয় হিন্দুদের কাছে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধার জিনিস। ভারতের সমস্ত অঞ্চল থেকে যাত্রীরা ওখানে যাতায়াত করেন।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে অন্যান্য লোকদের মত মণিকারগণও মন্দিরে আসতেন। অধুনা তাদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ জনৈক মণিকার একদা মন্দিরে প্রবেশ করে আর বেরিয়ে আসেননি।

সেখানে রাত্রি যাপন করে মূর্তির একটি চোখের হীরক খসিয়ে ফেলেন তা চুরি করার উদ্দেশ্যে। প্রভাতে মন্দিরের দ্বার খোলার পরে দেখা গেল মণিকার স্থান ত্যাগ করার সময় দ্বার পথে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। দেবতা এইভাবে তার দুষ্কর্মের শাস্তি বিধান করেছিলেন এক অলৌকিক উপায়ে।

মহিমময় আকারের এই মন্দিরটি ভারতবর্ষের একটি প্রধানতম মন্দিররূপে পরিচিত। এর কারণ এটি গঙ্গারতীরে (?) (সমুদ্রতীরে) অবস্থিত। হিন্দুরা সেই নদীর (সমুদ্র) জলকে অতি পবিত্র মনে করেন। তাদের বিশ্বাস যে সেখানে স্নান করলে সমস্ত পাপতাপ ধুয়ে যায়। এই কারণেই মন্দিরটি এত অর্থ সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। (সেখানে ২০,০০০ হাজার গাভী প্রতিপালিত হয়)। এই অর্থ কড়ি জমা হয় প্রতিদিন ভারতের সমগ্র অঞ্চল থেকে আগত অগণিত সংখ্যক যাত্রীদের প্রদত্ত শ্রদ্ধার্ঘ দ্বারা। কিন্তু তারা সেই অর্থ কড়ি নিজেদের ইচ্ছামত প্রদান করতে পারেন না। তার মাত্রা ধার্য হয় প্রধান পুরোহিতের দ্বারা।

মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে যাত্রীদের দাড়ি কামিয়ে গঙ্গায় স্নান করে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হতে হয়। এছাড়া ব্রত উৎযাপণের উপযোগী অন্যান্য কাজও সম্পন্ন করতে হয়। তাদের সামর্থ ও অবস্থানুযায়ী অর্থ ব্যায়ের নিয়ম। তারা এবিষয়ে বিশেষভাবে ও নিখুঁতরূপে খবরতত্ত্ব রাখেন। প্রধান পুরোহিত সেই সকল কাজের বাবদ প্রভূত অর্থ লাভ করেন। তবে তা থেকে তিনি নিজের জন্যে কিছুমাত্র রাখেন না। যাবতীয় অর্থ সামগ্রী দরিদ্রদের খাদ্য বিতরণ ও মন্দিরের রক্ষণ পরিচালনার জন্যে ব্যয়িত হয়। পরন্তু প্রধান পুরোহিত অনেক সময় তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য—যেমন দুধ, মাখন, চাল, ময়দা ইত্যাদি দান করেন। যে সকল দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগে বাসনপত্র থাকে না, তাদের তৈরী খাদ্য দানের ব্যবস্থা আছে।

যারা অতি দরিদ্র, যাদের সংগে কোন বাসন বা পাত্র থাকে না তাদের খাদ্য বিতরণের প্রথাটি চমৎকার ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সকাল বেলায় ভিন্ন সাইজের মাটির হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়। খাদ্যদানের সময় দরিদ্র যাত্রীরা সমবেত হলে, যেমন ধরুন, পাঁচ জন যাত্রী জড় হয়েছেন, তখন মুখ্য ব্রাহ্মণ আর একজন ব্রাহ্মণকে হুকুম দিলেন একটি হাঁড়ি শুদ্ধ ভাত নিয়ে আসতে। তারপর তিনি সেই হাঁড়িটিকে মাটিতে ফেলে দিতে ওটি

ঠিক সমান পাঁচটি খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যায়। তখন প্রতিটি যাত্রী তার এক একটি খণ্ড গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে তীর্থযাত্রীদের ভাত বিতরণ করার নিয়ম। ব্রাহ্মণরা একটি মাটির হাঁড়িতে কখনই দু'বার ভাত রান্না করেন না। তামার পাত্রকে এই কাজে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা চলে। থালির বদলে এক প্রকার পাতা (শাল পাতা) ব্যবহৃত হয় যা আমাদের দেশের আখরোটের পাতার চেয়েও বড়। অনেকগুলি পাতাকে কাঠি দিয়ে জুড়ে জুড়ে থালির মত করা হয়। এই প্রকারে তৈরী এক একটি পাত্র থালির ব্যাস এক ফুটও হয়ে থাকে। মাখন গালিয়ে নেবার ব্যবস্থা আছে। থালিতে ভাত নিয়ে তারা আংগুল দিয়ে খান। ঘি তুলে নেবার জন্যে ছোট চামচের ব্যবহার চলে। আমরা যেমন খাবার পরে এক গ্লাস স্পেনিশ সুরা পান করি, তারা তেমনি দই খান।

জগন্নাথ মন্দিরে স্থাপিত দেবমূর্তি সম্বন্ধে আমি আরও বিশদ বর্ণনা দিতে চাই। গলা থেকে মূর্তির পাদপীঠ পর্যন্ত জমকালো একটি পোষাকে তাঁর দেহ আবৃত। পোষাকটি বেদীর উপর পর্যন্ত ঝোলানো। উৎসব পর্বের সময় পোষাকটি সোনালী ও রূপালী কিংখাবে তৈরী হয়। প্রথমেই বলতে হয় যে এই দেবমূর্তির হাত-পা নেই। নিম্নোক্তভাবে এই বৈশিষ্ট কে ব্যাখ্যা করা যায়।

হিন্দুদের জনৈক ধর্মগুরু স্বর্গারোহণ করলে তাঁরা গভীর শোক সাগরে নিমজ্জিত হন এবং অশ্রুবিসর্জন করতে থাকেন। ঈশ্বর তখন স্বর্গরাজ্য থেকে তাঁদের কাছে একটি দেবদূত প্রেরণ করেন। তিনি দেখতে ঠিক লোকান্তরিত ধর্মগুরুর মত। হিন্দুরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করেন। উক্ত দেবদূত পরে একটি মূর্তি গড়তে শুরু করেন। কিন্তু ভক্তরা অধৈর্য হয়ে সেটিকে তৎক্ষণাৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। অথচ তখনও মূর্তির হাত-পা তৈরী হয়নি। আর আকার আকৃতিও ছিল অতি অদ্ভুত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসম্পূর্ণ। তখন তারা ছোট ছোট মুক্তা দিয়ে মূর্তির হাত তৈরী করে দিলেন। সেই মুক্তাকে আমরা বলি—"আউন্সের ওজনে মুক্তারাজি।" মূর্তির পদদ্বয় সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তা নেই বটে, কিন্তু পোষাকে দেহের নিম্নাংশ এমন আবৃত যে তা বুঝবার জো নেই। মুখ ও হাত দু'টি ব্যতীত বাকী সমস্ত দেহাংশ আবরণে আবৃত। দেহ ও মস্তক চন্দন কাঠে নির্মিত। সুউচ্চ গম্বুজাকার মন্দির দেহের অভ্যন্তরে যেখানে মূর্তি সমাসীন, তার ভিত থেকে

মাথা পর্যন্ত প্রচুর কুলুঙ্গির মত স্থান আছে। সেই মূর্তিগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যকের রূপাকার বীভৎস দানবের মত। বিবিধ বর্ণের প্রস্তরে তা গঠিত।

প্রধান মন্দিরের প্রতি পার্শ্বে আরও অনেক ক্ষুদ্রাকার মন্দির আছে। সেখানেও যাত্রীরা অল্প স্বল্প কিছু অর্থ কড়ি দান করেন। যারা ব্যবসা বাণিজ্য রক্ষার জন্যে বা কারোর অসুস্থতা বশতঃ কোনও দেবতার কাছে কিছু মানৎ করেন, তাঁর একটি মূর্তি বা প্রতীক ওখানে নিয়ে যান ভক্তি-শ্রদ্ধার স্মারক চিহ্ন স্বরূপ। মূল মন্দিরের মুখ্য দেবতাকে প্রতিদিন সুগন্ধ তৈলে সিক্ত করা হয়। তার ফলে মূর্তি কালো কষ্ঠি পাথরের মত হয়ে ওঠে। জগন্নাথের ডান দিকে থাকেন তাঁর ভগ্নী সুভদ্রা দেবী। তিনিও দাঁড়ান ভঙ্গীর এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত। বা-দিকে আছেন ভ্রাতা বলভদ্র। তিনিও বস্ত্রাবৃতা। মুখ্য মূর্তিটির সামনে একটু বা-দিকে রয়েছেন জগন্নাথের স্ত্রী-দেবী। নাম তাঁর রুক্মিনী (?)। এই মূর্তি সোনার তালে গঠিত। দাঁড়ান ভঙ্গীর। পূর্বোক্ত প্রধান তিনটি মূর্তি কিন্তু চন্দন কাঠের।

অপর দু'টি মন্দির মুখ্য ব্রাহ্মণের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট। মন্দিরে কর্মরত অন্যান্য ব্রাহ্মণরাও সেখানেই থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণরা উন্মুক্ত মস্তকে চলাফেরা করেন। তাঁদের অনেকেরই মস্তক মুণ্ডিত। একখানি বস্ত্রই তাঁদের পরিচ্ছদ। সেই কাপড়টিরই একাংশ পরিধান করেন। বাকি অংশ উত্তরীয় ধরণে ব্যবহার করেন। মন্দিরের কাছেই আছে তাঁদের জনৈক গুরুর সমাধি ক্ষেত্র। নাম তার কবীর (?, হরিদাস)। তাঁকে হিন্দুরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল যে সমস্ত মূর্তি প্রতিমা এক প্রকার বেদীতে স্থাপিত। সেই বেদী আবার বেড়া বা রেলিং-এ বেষ্টিত। কারণ কোনও পুণ্যার্থীর মূর্তিকে স্পর্শ করার অনুমতি নেই। তবে মুখ্য পুরোহিত যদি বিশেষ কোনও ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করে দেন তাহলে তাঁর সঙ্গে গিয়ে স্পর্শ করা চলে।

এবারে বারাণসীর মন্দির প্রসংগে যাওয়া যাক। জগন্নাথ মন্দিরের পরে সমগ্র ভারতে এই মন্দিরটি হোল প্রসিদ্ধতম। এটিও গঙ্গাতীরে অবস্থিত। আর সহরের নামানুসারেই নামটি হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে মন্দিরের দ্বারদেশ থেকে শুরু করে নদী পর্যন্ত আছে প্রস্তরময় সিঁড়ি সোপান। তার সংগে কিছু পরে পরে রয়েছে পাটাতন মত বাঁধানো স্থান। আরও দেখা যায় ক্ষুদ্রাকার ও অন্ধকার সব কুঠ্‌রী। তাদের কতকগুলি ব্রাহ্মণদের

বাসস্থান, বাকি সব রান্নাঘর। সেখানে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত রান্না করেন। হিন্দুরা গঙ্গায় স্নান করে তবে মন্দিরে যান পূজা অর্ঘ্য দান করতে। তারপর তারা স্বহস্তে খাদ্য প্রস্তুত করেন। অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারেন না। তার কারণ—তাদের মনে আশংকা থাকে যে কোনও অপরিচ্ছন্ন লোক হয়ত এগিয়ে গিয়ে খাদ্য দূষিত করে দেবেন। সর্বোপরি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে তারা অত্যুগ্র আকাঙ্খা ও আগ্রহ নিয়ে গঙ্গার জল পান করেন। তাদের ধারণা যে তা পান করলে সর্ব পাপ মুক্ত হওয়া যায়।

প্রতিদিন দেখা যায় যে ব্রাহ্মণরা নদীর জল যেখানে স্বচ্ছ সেখানে চলে যান গোলাকার ও মসৃণ সব ছোট ছোট জলাধার নিয়ে। উদ্দেশ্য ভাল জল তুলে আনবেন। পাত্রগুলির এক একটিতে এক বালতি আন্দাজ জল ধরে। জলপূর্ণ পাত্রগুলি সর্বাগ্রে নিয়ে যেতে হয় প্রধান পুরোহিতের কাছে। তিনি নির্দেশ দেবেন জলাধারের মুখ অতি মিহি লাল রঙ্-এর কাপড় দিয়ে বেঁধে দেবার। অতঃপর তিনি তদুপরি তাঁর নিজস্ব সীলমোহর বসিয়ে দেবেন। ব্রাহ্মণরা সেই জলাধারকে একটি কাষ্ঠদণ্ডের মাথায় ঝোলানো ছয়টি ছোট দঁড়ির ফাঁসের মধ্যে বসিয়ে কাঁধে তুলে দিয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে কাঁধের বোঝাকে পরিবর্তন করা হয় ভিন্ন ভিন্ন লোকের মাধ্যমে। এক একদল সেই জলাধার বহন করে দুই মাইল রাস্তাও এগিয়ে চলেন। কখনও কখনও সেই জল বিক্রী করা হয়। আবার কখনও তা কাউকে উপহার প্রদান করেন। তবে ধনী ব্যক্তিদের কাছেই অধিকতর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক আশা করা যায়। কিছু সংখ্যক হিন্দু আছেন যারা উৎসব-অনুষ্ঠান, বিশেষতঃ পুত্রকন্যার বিবাহ-কালে এই জল উচ্চ মূল্যে ক্রয় করেন। ভোজন পর্বের শেষে এই জল পান করার বিধি, যেমন ইউরোপে আমরা 'মাসকাট' জাতীয় মিষ্টি সুরা পান করি। আমন্ত্রণকারীর ইচ্ছা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রতিজন অতিথি এক গ্লাসও এই জল পান করার অবকাশ পান। গঙ্গার জল এত শ্রদ্ধার জিনিস হওয়ার মূল কারণ এই যে তা কখনও দূষিত হয় না। ক্ষতিকারক কোনও পোকামাকড় তাতে জন্মায় না। তবে যা শুনেছি তা বিশ্বাসযোগ্য কিনা বলা কঠিন। কারণ যে পরিমাণ লোক প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিচার্য।

যাক—পুনরায় বারাণসীর মন্দির প্রসংগে ফিরে চলি। মন্দিরটির ভিত চৌকো এবং অন্যান্য মন্দিরেরই অনুরূপ। চারটি দিক সম আকার ও সম মাপের। মধ্যস্থলে সুউচ্চ একটি চূড়া নানা স্তরবদ্ধ হয়েও কিনারা সৃষ্টি করে

উপরে উঠে গিয়েছে। চূড়াটি শেষ পর্যন্ত একটি বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। শিখরের প্রতিটি স্তর-বাহুতে আর একটি করে ছোট শিখর থাকে যা বাইরের দিকে উন্মুক্ত। উচ্চ শিখরে ওঠার পূর্বে অনেকগুলি ঝুল বারান্দা ও কুলুঙ্গীর মত স্থান দেখা যায়। 'তার ফলে মুক্ত বায়ু চলাচল সহজ হয়। শিখরটির সর্বাঙ্গে নানা প্রাণীর মূর্তি খোদিত। আর তা অতি অমার্জিত রূপের। শিখরের নীচে মন্দিরের গর্ভগৃহে সাত-আট ফুট উঁচু ও পাঁচ ছয় ফুট চওড়া একটি বেদী আছে। তার সম্মুখভাগে সিঁড়ির দু'টি ধাপ। তার সাহায্যে উপরে ওঠা যায়। সিঁরটি সুন্দর বুনটের কাপড় দিয়ে আবৃত থাকে। উৎসবপর্বের সময় তার গুরুত্ব অনুসারে কখনও সাধারণ রেশমী কাপড়, কোন সময় হয়ত সোনালী জরির কাজ করা রেশমী কাপড় দিয়ে সেই আবরণ তৈরী হয়। বেদিটির আবরণ সোণালী বা রূপালী কিংখাব অথবা চমৎকার রঙ্‌বেরঙ্‌-এর সুচিত্রিত কাপড়ের। মন্দিরের বাইরে দাঁড়ালে বেদীতে অধিষ্ঠিত দেব-মূর্তিকে মুখোমুখি দেখা যায়। মহিলা ও বালিকাদের বাইরে থেকেই দেবমূর্তিকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়। বিশেষ কয়েকটি জাতীয় রমণী ব্যতীত আর কোনও নারী ও বালিকার মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

প্রধান বেদীর উপরে অধিষ্ঠিত মূর্তি মধ্যে একখানি দাঁড়ান এবং সেটি পাঁচ ছয় ফুট উঁচু। তার হাত পা ও দেহ কিছুই দেখা যায় না। কেবলমাত্র গ্রীবা ও মাথাটি দৃশ্যমান। দেহের বাকী অংশ সমস্ত নীচের দিকে বেদী পর্যন্ত একটি পোষাকের অন্তরালে অদৃশ্য। পোষাকটি একেবারে বেদীর কিনারা পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। কখনও মূর্তির কণ্ঠে মূল্যবান সোনা, চুনী, মুক্তা ও মরকতমণির হার দেখা যায়। মূর্তিটি গঠিত হয়েছে ভীম মহাদেবের আদলে ও তাঁর সম্মানার্থে। ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি একদা অতি শ্রেষ্ঠ পূতাত্মা ব্যক্তি-সত্তারূপে বিবেচিত হতেন। তাঁরা সদা সর্বদাই তাঁর কথা বলেন। বেদীর ডান দিকে একটি প্রাণীর আকৃতি আছে যার দেহের কোনও অংশ হাতীর, কিছু অংশ ঘোড়ার, আর বাকী অংশ খচ্চরের অনুরূপ। এটি বিরাট এবং স্বর্ণময়। ওকে বলা হয় গরু অর্থাৎ বৃষ। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোনও লোক ওর কাছে যেতে পারেন না। শোনা যায় যে এই প্রাণীটির পিঠে চড়েই সেই মহাত্মা পুরুষ এই মর জগতে বহু দূর দুরান্ত ভ্রমণ করেছেন। তার জন্যেই ওর প্রতিরূপ নির্মাণ করে সংরক্ষিত হয়েছে।

সেই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ঘুরে দেখা যে মানব সমাজ তাদের কর্তব্য পালন কচ্ছেন কিনা। আর পরস্পর ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত হয় কিনা। মন্দিরের প্রধান দ্বারপথ ও বেদীর মধ্যস্থলে খানিকটা বাঁ দিক ঘিরে একটি ছোট পীঠ-স্থান আছে। তদুপরি যোগাসনে উপবিষ্ট প্রায় দুই ফুট উঁচু একখানি কালো পাথরের মূর্তি আছে। আমি যখন ওখানে গিয়েছিলাম তখন মূর্তিটির কাছে বাঁ-দিকে একটি ছোট বালক উপস্থিত ছিল। বালকটি প্রধান পুরোহিতের পুত্র। ওখানে দর্শনার্থী হয়ে যত লোক জড় হতেন, তারা সকলে রুমালের মত একখণ্ড সিল্ক বা কিংখাব বালকটির দিকে ছুঁড়ে দিতেন। সে তখন সেই কাপড়ের খণ্ডগুলি দিয়ে মূর্তির দেহ মুছে আবার তা তাদের ফিরিয়ে দিত। দর্শনার্থীরা তার দিকে একপ্রকার দানার মালা ছুড়ে দিতেন। দানাগুলি দেখতে অনেকটা ছোট সুপারী বা বাদামের মত। তার একটা সুগন্ধ আছে।

হিন্দুরা অনেকে সেই মালা গলায় পরেন। আর প্রার্থনাকালে অনেকে তার এক একটি দানার হিসেবে ঈশ্বরের নামজপ করেন। অনেকে আবার দেবতার দিকে প্রবালের মালা, হলদে অম্বর পাথর, ফল ও ফুল ছুঁড়ে দেন। সবশেষে দেখা যায় যে যা কিছু সেখানে গিয়ে পড়ুক, মুখ্য ব্রাহ্মণ তনয় তা মূর্তির পাশে বুলিয়ে এবং তাঁর মুখ ছুঁইয়ে পূর্বোক্ত প্রথায় দাতাদের তা ফিরিয়ে দেয়। মূর্তিটি মুরলীরাম অর্থাৎ ভগবান মুরলীধারী। তিনি হলেন প্রধান বেদীতে অধিষ্ঠিত ভ্রাতা।

মন্দিরের মুখ্য তোরণদ্বারের নীচে প্রধান পুরোহিতদের একজন বসে থাকেন। তাঁর পাশে থাকে একটি থালায় কিছু জলের সংগে হলদে রঙ-এর একটি জিনিস মেশানো। হিন্দুরা এক এক করে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ান। তিনি তখন সকলের ললাটে সেই রঙ দিয়ে তিলক চিহ্ন অংকণ করে দেন। সেই তিলক ভ্রূযুগলের কেন্দ্রস্থল থেকে শুরু করে নাকের ডগা পর্যন্ত নেমে আসে। তারপর তা আরও অঙ্কিত হয় বাহুদ্বয়ে ও বুকের মাঝখানে। তিলক চিহ্নিত হয়ে যারা গঙ্গায় স্নান করেন তারা কিছু বিশেষত্ব লাভ করেন। যারা নিজ গৃহে স্নান সমাপন করেন (আরা সকলেই খাবার আগে, এমনকি রান্নায় ব্যাপৃত হওয়ার আগে স্নান করেন), যারা কুয়ার জলে বা নদীর জল তুলে স্নান করেন, তারা সঠিক পবিত্র দেহ হন না। সুতরাং তারা এই রঙ দিয়ে তিলক ধারণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণ ভেদে এই তিলক চিহ্নের রঙও হয় বিভিন্ন।

মুঘল বাদশার সাম্রাজ্য মধ্যে যারা হলদে রঙ্-এর তিলক চিহ্ন ধারণ করেন তারা হলেন শ্রেষ্ঠতম জাতির মানুষ। তারা বিশেষ উন্নত ও পবিত্র। কারণ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মে দৈহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করার সময় এরা অন্যান্য বর্ণের মানুষ অপেক্ষা অধিক নিয়মনিষ্ঠা পালন করেন। সেই সময় অন্য বর্ণের মানুষ মাত্র এক পাত্র জল ব্যবহার করেন। আর উচ্চ পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিরা জলের সংগে একমুঠো বালি নিয়ে যান। প্রথমে দেহাংশে বালি মাখিয়ে তারপর জল দ্বারা পরিষ্কৃত হন। কোনও অপরিচ্ছন্নতা ও অপবিত্রতা তারা প্রশ্রয় দেন না। পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে তারা নির্ভয়ে খাদ্য গ্রহণ করেন।

এই মহনীয় মন্দিরের যে অংশটি গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে সূর্যাস্তমুখী থাকে, সেই দিকে একটি বাড়ী আছে। সেটি উচ্চ শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুঘল বাদশার দরবারে কর্মরত জয়সিংহ সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ওটি প্রতিষ্ঠা করেন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত। ইনি ছিলেন হিন্দুরাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত। আমি রাজার সন্তান-সন্ততিদের দেখেছি। তাঁরা ওখানে শিক্ষালাভ করতেন। অনেক ব্রাহ্মণ সেখানে শিক্ষকের পদে ব্রতী ছিলেন। তাঁরা এমন একটি ভাষায় লেখাপড়া শেখাতেন যা পুরোহিত সম্প্রদায়ের জন্যেই নির্দিষ্ট। সেই ভাষা সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কলেজটির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে চারদিক ভাল করে দেখার জন্যে আমি উপরে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, দ্বিস্তর বিশিষ্ট একটি গ্যালারী চারদিক ঘিরে আছে। তার নীচেরটিতে দু'জন রাজকুমার বসে ছিলেন। তাঁদের সংগে ছিলেন অনেক সম্ভ্রান্ত তরুণ ও ব্রাহ্মণ। তাঁরা মেঝেতে খড়ি দিয়ে নানাপ্রকার নক্সা অংকন কচ্ছিলেন যা অনেকটা গাণিতিক নক্সার মত। আমি সেখানে প্রবেশ করতেই রাজপুত্ররা জানতে চাইলেন, আমি কে। আমি ফরাসী দেশীয় শুনেই তাঁরা আমাকে উপরে ডেকে নিলেন। তাঁরা ইউরোপ, বিশেষত ফ্রান্স সম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন করলেন। জনৈক ব্রাহ্মণের দু'টি ভূগোলক ছিল। তাঁকে তা দিয়েছিলেন ওলন্দাজরা। আমি সেই গোলকে ফ্রান্সের অবস্থান দেখিয়ে দিলাম। এই জাতীয় আলাপ আলোচনার পরে তাঁরা আমাকে পান খেতে দিলেন।

আমি বিদায় নেবার মুখে ব্রাহ্মণদের কাছে জানতে চাইলাম যে কখন আমি মন্দিরের দ্বার মুক্ত পাব। তাঁরা আমাকে পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের

কিছু পূর্বে সেখানে যেতে বললেন। আমি নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে উপস্থিত হতে ভুল করিনি। রাজা মন্দিরের দ্বারপথের বাঁ-দিকে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। দরজার সামনে স্তম্ভোপরি একটি গ্যালারির মত স্থান দেখা গেল। ওখানে সে সময় বহু লোকের সমাগম হয়েছিল। স্ত্রী-পুরুষ ও শিশু মন্দির দ্বার খোলার জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন। গ্যালারী ও প্রাঙ্গণের একটি অংশ যখন লোকারণ্য হোল তখন আটজন ব্রাহ্মণ এগিয়ে এলেন। তাঁরা চারজন করে মন্দির দ্বারের দু'পাশে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধূপদান। আরও অনেক ব্রাহ্মণ মিলে ঢাক ও অন্যান্য সব বাজনা বাজিয়ে একটা কোলাহল সৃষ্টি করলেন। প্রবীণতম দু'জন ব্রাহ্মণ স্তোত্র সংগীত করলেন। সমবেত সকলে সমসুরে বাজনার সংগে তার পুনরাবৃত্তি করে চললেন।

প্রত্যেকের হাতে একটি করে ময়ূরের পালক বা অন্য প্রকার পাখা থাকে মাছি তাড়ানোর জন্যে। এর কারণ, মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হলে মাছি দ্বারা দেবমূর্তির অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। সংগীত ও পাখা চালানো পুরো আধ ঘণ্টা চলার পরে দুই মুখ্য ব্রাহ্মণ দু'টি বড় ঘণ্টা তিনবার বাজান। অতঃপর তাঁরা ছোট একটি হাতুড়ী ধরনের জিনিস দিয়ে দরজায় আঘাত করেন। তৎক্ষণাৎ ছয়জন ব্রাহ্মণ দরজাটি খুলে দেন। তাঁরা মন্দিরের অভ্যন্তরেই থাকেন।

দরজা থেকে সাত আট পদক্ষেপ দূরে একটি বেদীর উপরে একখানি মূর্তি আছে। তিনি মুরলীরামের ভগ্নী। তাঁর ডান দিকে কিউপিডের মত আকৃতির একটি শিশু মূর্তি। তাঁকে বলা হয় লক্ষ্মী দেবী। তাঁর বাম বাহুতে একটি ছোট বালিকা মূর্তি আছে। তিনি সীতা দেবী। মন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হতেই বিরাট একখানি পর্দা সরিয়ে নেয়া হয়। তখন সমবেত জনতা দেবমূর্তি দর্শনের সুযোগ পান। সকলে তখন ভূপাতিত হয়ে মাথায় হাত রেখে তিনবার প্রণাম নিবেদন করেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনেক ফুল ও মালা ছুঁড়ে দেন। ব্রাহ্মণরা তা মূর্তির গায়ে ছুঁইয়ে আবার দর্শনার্থীদের ফিরিয়ে পাঠান। জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে নয়টি সল্তে বিশিষ্ট একটি দীপ ধরে থাকেন। মাঝে মাঝে তদুপরি কিছু সুগন্ধ দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করে দীপটিকে দেবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রায় আধঘণ্টা চলে।

এরপরে ভক্তবৃন্দ চলে যান; মন্দির দ্বারও রুদ্ধ হয়। দর্শনার্থীরা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রচুর চাল, ময়দা, ঘি, তেল ও দুধ প্রধান খাদ্যরূপে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণরা তার সামান্য অংশও এদিক-ওদিক হতে দেন না। নারী-মূর্তি অধিষ্ঠিত মন্দিরে মহিলারাই মুখ্যত পূজা করেন। এই কারণেই মন্দির প্রাঙ্গণ সর্বদাই নারী ও শিশুতে ভরপুর থাকে।

রাজা বৃহৎ মন্দির থেকে এই মূর্তি এনে যখন তাঁর গৃহ সংলগ্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ব্রাহ্মণদের দান ও দরিদ্রদের ভিক্ষা বাবদ ব্যয় করেন পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা।

যে রাস্তার উপরে কলেজটি অবস্থিত তার বিপরীত দিকে আর একটি মন্দির আছে। নাম তার ঋষভদাস মন্দির। মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতার নামানুসারে এই নামটি হয়েছে। আর একটু নীচে অপর একটি মন্দিরে স্থাপিত দেবতার নাম গোপাল দাস। ইনি ঋষভদাসের ভ্রাতা। মূর্তিসমূহের কেবল মুখখানিই দেখা যায়। তা পাথর বা কাঠের তৈরী। জেড্ পাথরের মত কালো তার রঙ্। তবে মুরলীরামের মূর্তি ভিন্ন ধরণের। সেটি শ্রেষ্ঠ মন্দিরে অধিষ্ঠিত এবং তাঁর সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত। রাজার মন্দিরে মুরলীরামের ভগ্নীর মূর্তির চোখে দু'টি হীরক রত্ন আছে। রাজাই সে দু'টি রত্ন বসিয়ে দিয়েছেন। গলায় দিয়েছেন মুক্তার হার। মাথার উপরে দিয়েছেন চারটি রৌপ্য স্তম্ভে খাটানো চন্দ্রাতপ।

বারাণসীর উত্তরে আটদিনের যাত্রাপথ ব্যবধানে একটি পর্বতময় দেশ আছে। তার মধ্যে স্থানে স্থানে অত্যন্ত সুন্দর চার পাঁচ মাইল প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র আছে। জায়গাগুলি খুব উর্বর। দানা শস্য, চাল ও তরিতরকারী সব জন্মায় সেখানে। কিন্তু হস্তীযূথ বেরিয়ে সেই শস্য ও ফসলের অধিকাংশ খেয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। ঐ অঞ্চলে প্রচুর হাতী আছে। পান্থ-পথিকের দল যখন সেই স্থানসমূহের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করেন তখন তারা তাঁবু ফেলে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। কারণ সেই অঞ্চলে কোনও সরাই বা যাত্রী নিবাস নেই। কিন্তু রাত্রিতে তাদের আত্মরক্ষা এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হাতীর পাল প্রায়ই রাত্রিতে খাদ্য সংগ্রহ করতে ওখানে আসে। হাতীর কবল থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তারা আগুন জ্বালিয়ে রাখেন এবং ছোট ছোট বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ করেন। কখনও তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করতে থাকেন জন্তুগুলিকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে।

এই প্রদেশে আর একটি অতি প্রাচীন ও সুগঠিত মন্দির আছে। তার বাইরে ও ভিতরে নানা মূর্তি খোদিত। মূর্তিগুলি সবই নারী ও বালিকার। পুরুষ সমাজ কখনও সেখানে পূজা-অর্ঘ্য দান করেন না। কারণ ওটিকে মহিলাদের মন্দির বলা হয়। অন্যান্য মন্দিরের মত এখানে কেন্দ্রস্থলে একটি বেদী। তদুপরি প্রায় চার পাঁচ ফুট উঁচু একটি স্বর্ণ মূর্তি। মূর্তি দণ্ডায়মান একটি বালিকার (সম্ভবতঃ দেবী কালীর স্বতন্ত্র এক রূপ)। দেবীর ডান দিকে রূপার তৈরী একটি দাঁড়ান শিশু মূর্তি। তার উচ্চতা দুই ফুট মত। নারী-মূর্তির জীবন পবিত্র। সেজন্যে ব্রাহ্মণরা শিশুটিকে তার কাছে এনে দিয়েছিলেন ধর্মাদর্শ ও সৎজীবন যাত্রার শিক্ষালাভের জন্যে। কিন্তু তিন চার বছর সেখানে থাকার ফলে সে এত সুশিক্ষিত ও সুচতুর হয়ে উঠলো যে সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রগণ তাকে পাওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের একজন তাকে রাত্রিকালে নিয়ে গেলেন অন্যত্র। তারপর তাকে আর দেখা যায় নি। তারই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঁ-দিকে। বেদীর ভিত্তিমূলে একটি বৃদ্ধমূর্তি আছে। তাকে বলা হয় মূল নারী বিগ্রহের ভৃত্য। ব্রাহ্মণরা এই মূর্তিকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। ভক্ত-পূজারীরাও প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট দিনে এখানে পূজা অর্ঘ্য দান করতে আসেন। দিনটি হোল নভেম্বর মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিন। মন্দিরটি পূর্ণিমা তিথিতেই কেবল উন্মুক্ত। পনের দিন ধরে যত যাত্রী আসেন, তারা অর্থাৎ নারী পুরুষ সকলেই মাঝে মাঝে উপবাস করেন। তারা প্রতিদিন তিনবার স্নান করেন। একপ্রকার মাটি ও চূন ঘসে ঘসে তখন দেহের সমস্ত রোম অপসারণ করেন।

অধ্যায় বারো

ভারতীয় হিন্দুদের মুখ্য মন্দির সমূহের আরও কয়েকটি।

জগন্নাথ ও বারাণসীর মন্দির ব্যতীত আরও যে বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরের কথা আলোচনার যোগ্য তা হোলে মথুরার মন্দির। মথুরার অবস্থান আগ্রার আঠার ক্রোশ দূরে এবং দিল্লীর রাস্তার উপরে। সমগ্র ভারতে এই মন্দিরটি সবচেয়ে রমণীয় এ জমকালো। পূর্বে এখানে তীর্থযাত্রীর ভিড় হোত সর্বাধিক। অধুনা অতি স্বল্প সংখ্যক লোকেরই সমাগম হয়। এই মন্দিরের প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে চলেছে। অতীতে যমুনা নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হোত। কিন্তু বর্তমানে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। নদীটি প্রায় এক মাইল দূরে সরে গিয়েছে। এখন যাত্রীদের নদীতে স্নান সেরে মন্দিরে আসতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। তার ফলে অর্থাৎ সেই দীর্ঘ সময়ে তাদের শরীর আবার অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র হতে পারে।

মন্দিরটি বিশাল। দশ বারো মাইল দূরে থেকেও ওটিকে দেখা যায়। অতি উচ্চ ও জমকালো তার রূপ ও আকার। লাল পাথর দিয়ে গঠিত। আগ্রার নিকটে বিরাট একটি খাদ থেকে সেই পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে। পাথরগুলি আমাদের শ্লেটের মত পাতলা করে কাটা। এর কতকগুলি প্রায় পনের ফুট লম্বা ও চওড়ায় নয় দশ ফুট। ছয় আংগুলও মোটা নয়। কারিগররা ইচ্ছেমত পাথরকে কেটে কুঁদে নতুন আকার দেয়। সুন্দর সুন্দর স্তম্ভও তৈরী হয় সেই পাথরে। এই জাতীয় পাথর দিয়েই তৈরী হয়েছে আগ্রার দুর্গ, জাহানাবাদের প্রাচীর শ্রেণী, রাজপ্রাসাদসমূহ, বিখ্যাত দু'টি মসজিদ ও কতিপয় বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহাবাস।

মন্দিরটি প্রসংগে আবার ফিরে যাওয়া যাক্। ওটি একটি অষ্টভুজ ভিতের উপরে অবস্থিত। খণ্ড খণ্ড পাথরে মন্দিরের দেহ আবৃত। তদুপরি চারদিক ঘিরে দুই সারিতে পশুপ্রাণী, মুখ্যতঃ বাঁদরের রূপ খোদিত। একটি সারি জমি থেকে মাত্র দুই ফুট উপরে। আর এক সারি ভিতের দুই ফুট উপরে। এই দু'টি স্থানে ওঠার জন্যে দুইটি সিঁড়ি আছে পনের ষোলখানি সোপান সমন্বিত। প্রতিটি ধাপ দুই ফুট লম্বা যাতে দু'জন লোক পাশাপাশি একই সময়ে উঠতে পারেন। এই সিঁড়ির একটি মন্দিরটির

প্রধান তোরণ দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে। বাকীটি গর্ভগৃহের পশ্চাৎ অভিমুখী গিয়েছে। মন্দিরটি ভূভাগের বড় জোর অর্ধেকখানি জায়গা জুড়ে নির্মিত। বাকি জমি মন্দিরের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ স্বরূপ। অন্যান্য মন্দিরের মত এটিও চতুষ্কোণ। মধ্যস্থলে সুউচ্চ শিখর। এই শিখরের পাশে আরও দু'টি ছোট চূড়া আছে। মন্দিরের দেহ জুড়ে ভিত থেকে শিখরের শেষ সীমানা পর্যন্ত নানা রকম পশু-প্রাণীর মূর্তি খোদিত রয়েছে। যেমন, ভেড়া, বানর ও হাতী। সমস্তই প্রস্তরে খোদিত। মন্দিরের দেহ ঘুরে বিভিন্ন কুলুঙ্গীতে নানা আকৃতির দানব মূর্তি। তিনটি শিখরের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাঁচ ছয় ফুট উঁচু গবাক্ষ আছে। প্রতিটি গবাক্ষের সংগে একটি করে ঝুল বারান্দা। তাতে চারজন লোক বসতে পারেন। বারান্দাগুলিতে ছোট ছোট চালা বা ছাদ আছে। তা কখনও চারটি স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। স্তম্ভ কখনও আবার আটটি। যেখানে স্তম্ভ আটটি সেখানে তা জোড়া জোড়া। শিখরগুলিকে বেষ্টন করেও কুলুঙ্গি আছে। তার মধ্যেও দানবাকৃতি মূর্তির সমাবেশ। মূর্তিগুলির হাত চারটি করে, পা-ও চারখানি। কিছু সংখ্যক মূর্তির মুখ মানুষের মত। কিন্তু দেহটি পশুর। তাদের শিং ও লম্বা লেজ আছে। সেই লেজ পায়ের সংগে জড়ানো। সব শেষে দেখা যায় বাঁদরে মূর্তি। এই রকম সব কুৎসিত মূর্তি দেখা যেন একটা ভয়ংকর ব্যাপার।

মন্দিরে দরজা মাত্র একটি। তা সুউচ্চ। তার দু'পাশে আছে বহু সংখ্যক স্তম্ভ এবং মানুষের ও দানবের মূর্তি। মন্দিরের মূল কেন্দ্র পাঁচ ছয় ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত পাথরের থাম দিয়ে পরিবেষ্টিত। মুখ্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারোর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তি'ন সেখানে যান ছোট একটি গুপ্ত দরজা দিয়ে। আমি তা দেখার সুযোগ পাইনি। মন্দিরে গিয়ে আমি কয়েকজন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি ওখানকার শ্রেষ্ঠ দেব বিগ্রহ রামকে দর্শন করতে পারবো কিনা। তদুত্তরে তারা বললেন, আমি তাঁদের কিছু অর্থ কড়ি দিলে তাঁরা মুখ্য ব্যক্তির অনুমতি নিয়ে আসবেন। আমি তাঁদের হাতে দু'টি টাকা দিতেই তাঁরা কর্তব্য সম্পাদন করতে বিলম্ব করেন নি। আধ ঘণ্টাও আমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। ইতিমধ্যে তাঁরা একটি দরজা খুলে দিলেন। সেটি বেষ্টিত স্থানের রেলিং-এর মধ্যস্থলে (কারণ, রেলিং সম্পূর্ণ আবদ্ধ, বাইরের দিকে কোনও পথ নেই)। দরজা থেকে পনের ষোল ফুট

ব্যবধানে আমি সোজাসুজি দেখতে পেলাম একটি চতুষ্কোণ বেদী। সেটি সোনালী ও রূপালী কিংখাবে আবৃত। তার উপরেই রয়েছে সেই শ্রেষ্ঠ দেবতা রামের মূর্তি। কালো পাথরে গড়া মুখখানিই মাত্র দেখা যায়। চোখ দু'টি মনে হোল চুনী রত্নের। গলা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহ লাল মখমলের পোষাকে মণ্ডিত। পোষাকটি খুব কারুকার্য্যময়। মূর্তির হাতও দেখা যায় না। কেন্দ্র মূর্তির দু'পাশে দুই ফুট আন্দাজ উঁচু আরও দু'খানি মূর্তি আছে। তা ঠিক পূর্বোক্তটির ন্যায় রীতি পদ্ধতিতে বিন্যস্ত। একমাত্র প্রভেদ শেষোক্ত দু'টির মুখ সাদা।

এই মন্দিরে পনের ষোল ফুট আয়তনের চৌকো একটি গাড়ীর মত জিনিস আছে। তার উচ্চতা বারো থেকে পনের ফুট। নানা রকম দৈত্য দানবের মূর্তি মুদ্রিত সূতি বস্ত্রে তা আবৃত। ওটির চাকা আছে চারটি। শুনলাম যে ওটি হোল বিগ্রহকে এদিক-ওদিক নিয়ে যাবার উপযুক্ত একটি মন্দির (রথ)। বিশেষ উৎসব পর্বের পুণ্য দিনে মূল বিগ্রহকে তুলে ওখানে বসানো হয়। তারপর তিনি যেন নানাদিকে ঘুরে অন্যান্য দেবতাদের সংগে দেখা করেন। শ্রেষ্ঠ উৎসব পর্বের দিনে তাঁকে ভক্তরা নদীর তীরেও নিয়ে যান।

চতুর্থ শ্রেষ্ঠ মন্দির তিরুপতিতে। কুমারিকা অন্তরীপ ও করোমণ্ডল উপকূলভাগে কর্ণাট প্রদেশে অবস্থিত। নবাব মীরজুমলার সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মসলীপত্তন থেকে গান্দীকোট যাবার পথে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। মন্দিরটি বিরাট। তাকে বেষ্টন করে আরও আছে বহু সংখ্যক মন্দির। ব্রাহ্মণদের আবাসও রয়েছে অনেক। সব মিলে মনে হয় যেন একটি আলাদা সহর। এর চারপাশে অনেক জলাশয় ও সরোবর আছে। এমন একটি প্রবল সংস্কার আছে যে ব্রাহ্মণরা তুলে না দিলে কোন আগন্তুক বা পথিক তা থেকে জল নিয়ে ব্যবহার করতে সাহস পান না।

অধ্যায় তেরো

হিন্দুমন্দিরে তীর্থযাত্রার রীতি পদ্ধতি।

মুঘল সাম্রাজ্য ও অন্যান্য রাজাদের রাজ্য মধ্যে বসবাসকারী জনসমাজের যারা গঙ্গার সন্নিকটে বাস করেন তাদের মধ্যে একটি প্রথা দেখেছি যে তারা বছরে অন্ততঃ একবার আমার বর্ণিত চারটি মন্দিরের একটিতে তীর্থযাত্রা করে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। এর মধ্যে জগন্নাথ মন্দিরের প্রথম স্থান। ব্রাহ্মণরা ও ধনী সমাজ এই তীর্থ যাত্রায় একাধিকবারও বের হন। অনেকে চার বছর পরে পরে যান। বাকি সকলে হয়ত ছয় ও আট বছর পরে যাত্রা করেন।

নিজেদের দেববিগ্রহকে যখন পাল্‌কী করে বা শিবিকায় তুলে ব্রাহ্মণরা শোভাযাত্রা করেন, তখন যাত্রীরা তাঁদের সংগে মন্দিরাভিমুখে যান। এই যাত্রায় তাদের ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট হয় প্রগাঢ় রূপে। এই ধরণের যাত্রা, আমি পূর্বেও বলেছি, বেশী হয় জগন্নাথ মন্দিরে—বারাণসীর মন্দিরে। কারণ, প্রথমটি সমুদ্রতীরে, আর দ্বিতীয়টি গঙ্গার ধারে। এদের জল অত্যন্ত পবিত্র ও শ্রদ্ধার বস্তু।

এই তীর্থযাত্রা ইউরোপের ন্যায় একজন বা দু'জন মিলে করেন না। কোনও সহর বা কয়েকটি গ্রামের মানুষ একত্রে দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা পথে বেরিয়ে পড়েন। দরিদ্র জনসমাজের অনেকে সারা জীবনের সঞ্চয় সংগে নিয়ে বহু দূরদূরান্ত থেকে এই যাত্রায় আসেন। কিন্তু অনেক সময় নিজেদের সমুদয় ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা তাদের থাকেনা। তখন সম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের সাহায্য করেন। প্রতিটি যাত্রী তার বাসস্থান ও আর্থিক সম্বল অনুযায়ী কখনও পাল্‌কী, কখনও কোনও গাড়ীতে চড়ে পথ চলেন। গরীব লোকদের মধ্যে অনেকে পদব্রজে, কেউ হয়ত বলদের পিটে চেপে যান। মায়ের কোলে থাকে শিশু সন্তান। আর পিতা বহন করেন প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র।

যাত্রীরা নিজেদের সংগে যে দেববিগ্রহ শোভাযাত্রা করে নিয়ে যান তার একটি উদ্দেশ্য যেন সেই দেবতা সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে দর্শন করবেন। শোভাযাত্রায় দেবতার মূর্তিকে একটি চমৎকার পাল্‌কীতে পুরো শায়িত অবস্থায় বহন করা হয়।

তার আবরণটি সোনালী কিংখাবের। ঝালর রূপালী। দেবতার বালিশ তোষক ইত্যাদিও উত্তম উপাদানে তৈরী। আমাদের দেশের মতই এখানেও আয়োজন ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণরা যাত্রীদলভুক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাত আট ফুট লম্বা হাতলওয়ালা সব পাখা সরবরাহ করেন। তাদের হাতলগুলি সোনা-রূপার পাতে মোড়া। পাখাটি কিংখাবের। তা পারসীক ধরনের। পাখার চারদিক ঘিরে বসানো থাকে ময়ূরের পালক। তাতে খুব হাওয়া চলে। ঝালরে অনেক সময় ঘণ্টা ঝোলানো থাকে। তার ফলে পাখা চালালে সুন্দর সুর-ঝঙ্কার হয়। প্রতিটি শোভাযাত্রায় এই রকম পাঁচ ছয়টি পাখার ব্যবস্থা থাকে বিগ্রহের মুখে যাতে মাছি বসতে না পারে। পাখার চালকরা মধ্যে মধ্যে হাত বদলায়। প্রথাটি ঠিক পাল্‌কী বাহকদের অনুরূপ। এই পবিত্র কাজে অনেকেই অংশ গ্রহণের সুযোগ পান।

এই প্রথা আমাদের চোখে খুব অদ্ভুত মনে হয় না। কারণ, আমি এই জিনিস স্যাক্‌সনি ও জার্মানীর অনেক অংশে দেখেছি। সেখানে কোনও মানুষকে সমাধি দানের প্রাক্কালে প্রার্থনার সময় মৃতদেহটিকে শবাধারে পুরোপুরি শায়িত রাখা হয় এবং তা উন্মুক্ত থাকে। তখন এর দুই পাশে সমবেত ব্যক্তিরা অনবরত পাখার বাতাস করতে থাকেন। এরকমটি হয় গ্রীষ্মকালে। মৃতদেহের উপরে মাছি বসতে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। মৃত ব্যক্তিব অবস্থাও তখন দেববিগ্রহের মত। কোনও কিছু অনুভব করার শক্তি থাকে না।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে আমি গোলকুণ্ডা থেকে সুরাটের রাস্তায় যখন ছিলাম তখন আমার সংগে ছিলেন এম্‌. দ্য. আর্দিলিয়র। এঁর কথা আমি অন্যত্রও বলেছি। সেই যাত্রা পথে আমরা দৌলতাবাদের নিকট দু'হাজারেরও অধিক-সংখ্যক নরনারী ও শিশুকে এইভাবে দলবদ্ধ হয়ে যেতে দেখেছিলাম। তারা এসেছিলেন তট্টা থেকে। তাদের সংগে ছিল দেববিগ্রহ। চমৎকার একটি পাল্‌কীতে বিগ্রহটিকে বসিয়ে তাঁরা চলেছিলেন তিরুপতির শ্রেষ্ঠ মন্দিরাভিমুখে। মূর্তিটিকে বসানো হয়েছিল টুকটুকে লাল মখমলের উপরে। তার দেহাবরণ ও বালিশ সেই একই মখমলের। পাল্‌কী বহনের দণ্ডাদিও সোনালী-রূপালী কাজ করা কিংখাবে মোড়া। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোনও জাতির লোক তার কাছে যেতে বা স্পর্শ করতে পারেন না। আমরা সেই দীর্ঘ শোভাযাত্রাকে এগিয়ে যেতে দেখেছিলাম। সেই বেচারা লোকগুলির অন্ধবিশ্বাস দেখে গভীর সহানুভূতি না হয়ে পারে না।

অধ্যায় চৌদ্দ

ভারতীয় হিন্দুদের বিভিন্ন আচরণ পদ্ধতি

জ্যোর্তিবিদ্যা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান অপরিসীম। তারা জনসমাজকে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শোনাতে পারেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই বেলা ১টার সময় বাংলা রাজ্যের পাটনা সহরে সূর্য গ্রহণ দৃশ্যমান হয়েছিল। একটি বিষয় দেখতে ভারি চমৎকার লাগে যখন গ্রহণের সময় অগণিত সংখ্যক নরনারী ও শিশু নানা অঞ্চল থেকে গঙ্গায় স্নান করতে আসেন। এই স্নানপর্ব শুরু হয় 'গ্রহণ' দর্শনের তিনদিন আগে থেকে। সেই সময় তারা দিবারাত্র নদীরতীরেই বাস করেন। নদীতে যে কুমীর ও মাছ আছে তাদের দেবার জন্য ভাত, দুধ ও নানা মিষ্ট দ্রব্য নিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণরা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের শুভ সময় ঘোষণা করলে হিন্দুরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ীর যাবতীয় মৃৎপাত্র ভেঙ্গে ফেলে দেন। একটি মাটির বাসনও আস্ত রাখেন না। তার ফলে সহরে অদ্ভুত একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়।

প্রতিটি ব্রাহ্মণের একখানি করে মন্ত্রতন্ত্রের বই আছে। সেই পুস্তকে প্রচুর বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ এবং আরও নানা প্রকার নক্সাদি অংকিত থাকে। তাঁরা মাটিতেও বিচিত্র নক্সা অংকন করেন। সেই শুভ সময় আসন্ন হলে তাঁরা সমবেতভাবে চীৎকার করে গঙ্গাবক্ষে খাদ্য নিক্ষেপ করার নির্দেশ দান করেন। আমাদের দেশের করতালের মত ধাতুতে গড়া কাঁসর ও তার সংগে ঢাক ও ঘণ্টা বাজিয়ে ভয়ংকর কোলাহল সৃষ্টি করেন। করতাল হাতে নিয়ে এরা একে অপরের সংগে ঠুকে ঠুকে বাজান। খাদ্য নিক্ষেপ হয়ে গেলে সকলে মিলে স্নান শুরু করেন। যতক্ষণ 'গ্রহণ' শেষ না হয় ততক্ষণ স্নান করেন। বর্ষা ঋতু অন্তে গঙ্গার জল যখন স্বভাবতঃই নীচে নেমে যায় তখনই সাধারণতঃ 'গ্রহণ' হয়। বর্ষাকাল স্থায়ী হয় জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত। তখন নদীর জলও এত বেড়ে যায় যে নদী বক্ষের বিস্তার হয় অনেকখানি। 'গ্রহণের' সময় জলের এপাশে ওপাশে কেবল মানুষের মাথাই চোখে পড়ে। ব্রাহ্মণদের দেখা যায় নদীতীরে জমিতে বসে তাঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ধনী শেঠিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষমান।

স্নান সমাপন করে তাঁরা শরীর রৌদ্রে শুকোয়। তারপর শুকনো কাপড়ে দেহের মধ্য অংশ আবৃত করেন। সব শেষে তাঁরা আসনে বসেন। সেখানে ধনী হিন্দুরা প্রচুর দানাশস্য, চাল, সবরকম আনাজ, তরকারী, দুধ, ঘি, চিনি ও ময়দা এনে জড় করেন। প্রতিটি আসনের সামনে পাঁচ ছয় ফুট আয়তনের চতুষ্কোণ একটি জায়গা বেশ পরিচ্ছন্নভাবে তৈরী করা হয়। সেখানে একটি হলদে রঙ্-এর পাত্রে গোময় গুলে তা ছড়িয়ে দেবার নিয়ম। এর কারণ, ওখানে আগুন জ্বালালে পিঁপড়ে ও পোকা মাকড় এসে পুড়ে না মরে। সম্ভব হলে কাঠ না পুড়িয়েই কাজ চালানোর চেষ্টা চলে। রান্নার জন্যে তারা সাধারণতঃ শুকনো গোময় (ঘুটে) ব্যবহার করেন। যখন কাঠ জ্বালাতে বাধ্য হন তখন খুব সতর্কতার সংগে দেখে নিতে হয় যে তার মধ্যে কোনোও পোকা মাকড় বা ডিম না থাকে। এরও কারণ সেই প্রাণী হত্যার ভীতি।

তাঁরা মনে করেন যে মানবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির ফলে হয়ত তাঁদের আত্মীয় বন্ধুরা কোনও নিম্ন পর্যায়ের প্রাণী অর্থাৎ পোকা ও কীটের দেহ ধারণ করতে পারেন। তাহলে এই প্রকারে তাদের দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। সেই অতি পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি স্থানটিতে তাঁরা নানা প্রকার নক্সাচিহ্ন, যেমন— ত্রিভুজ, অর্ধত্রিভুজ, ডিম্বাকার ; অর্ধডিম্ব প্রভৃতি খড়িচূর্ণ দ্বারা অংকন করেন। প্রতিটি নক্সাতে দুই তিন টুকরো কাঠের সংগে সামান্য গোময় রাখেন। তাও তারা অতি উত্তমরূপে ঘসামাজা করে দেখেন যে তাতে কোনও কীট-পোকা আছে কিনা। সেই কাঠ ও ডাল পালার উপরে রাখা হয় গম, চাল, তরকারী ইত্যাদি ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য। অবশেষে তাতে যথেষ্ট ঘি ঢেলে অগ্নি সংযোগ করার নিয়ম। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার থাকার আকৃতি দেখে তাঁরা স্থির করেন যে সেই বছরে দেশে শস্যাদি কিরূপ উৎপন্ন হবে।

মার্চ মাসের পূর্ণিমাতে সর্পাকার একটি মূর্তির জন্যে ভাবগম্ভীর একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আমি এই ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্তের প্রথম ভাগে তার উল্লেখ করেছি। উৎসবটি নয়দিন চলে। সেই সময় মনুষ্যসমাজ ও পশুরা নিষ্ক্রিয় থাকে। পশুশ্রেণীর অধিকাংশকে সাজানো হয় তাদের চোখের চারদিকে সিঁদুরের বৃত্তাদি অংকন করে। শিংগুলিকেও রঞ্জিত করার নিয়ম। যেক্ষেত্রে পশুপ্রীতির মাত্রা বেশী সেখানে চকচকে কোনও ধাতুর পাত বা ঝলমলে কাপড় সজ্জা অলঙ্করণের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রতিদিন প্রভাতে বিগ্রহের পূজার্চনা চলে। বালিকারা তাঁকে ঘিরে প্রায় একঘণ্টা বাঁশী ও

ঢাকের সংগে নৃত্য করে। সবশেষে সকলে মিলে ভোজন পর্ব সমাধা করেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত আনন্দ-উৎসব চালিয়ে দ্বিতীয় দফায় আবার মূর্তির পূজা হয় ও নৃত্যাদি চলে।

হিন্দু সমাজে উত্তেজক কোনও পানীয় গ্রহণের রেওয়াজ নেই। তাহলেও এই উৎসবটির সময় তারা 'তাড়ি' (তাল রসের সুরা) পান করেন। বড় বড় রাজপথের অনেক দূরে গ্রামাঞ্চলে এই জিনিস থেকে একরকম আরক তৈরী হয়। মুসলমান সুবাদার কিন্তু তা তৈরী করার অনুমতি দান করেন না। এমনকি পারস্য ও অন্য স্থান থেকে আমদানী করেও মদ্য বিক্রয়ের অনুমতি প্রদানের নিয়ম নেই।

সুরাসার বা আসব তৈরীর নিয়ম এই : বড় বড় সব মাটির জালা থাকে। জালার অভ্যন্তর ভাগ পালিশ করা ও চকচকে। পাত্রগুলি নানা ভিন্ন আকারের। তার এক একটিতে প্রচুর তাড়ি ধরে। ওর মধ্যে পঞ্চাশ ষাট পাউণ্ড পর্য্যন্ত গুড় জমা করা হয়। এই জিনিসটা দেখতে ঠিক হলদে মোমের মত। সংগে আরও দেওয়া হয় প্রায় বিশ পাউণ্ড ওজনের একপ্রকার কাঁটা গাছের বাকল। ইউরোপে চামড়া প্রস্তুতকারকরা চামড়াকে পাকা করার কাজে যে জিনিস ব্যবহার করেন তা ঠিক সেইরকম। এই বাকল দিলে তাড়ি গেঁজে ওঠে ও বিশেষ উত্তেজক হয় এবং মিষ্টি ভাব (গুড়ের) অম্লে পরিণত হয়।

এরপর সমস্ত জিনিসটাকে চোলাই করা হয়। চোলাই করার পাত্রে ছোট এক থলে লবঙ্গ বা তিনচার মুঠো মৌরী অথবা জৈত্রী নিক্ষেপ করা হয়। এই সুরাসারকে যে কোনও মাত্রায় উত্তেজক করে তোলা যায়। একদিন আমার ইচ্ছে হোল নিজের জন্যে কিছু মদ চোলাই করা যাক। তখন দশটি বোতলে তা জমা করি। বোতলগুলি ছিল খুব মোটা কাচের। তা এসেছিল ইংলণ্ড থেকে। এর এক একটিতে প্যারিসের ওজনে চার পিন্ট ধরতো। মদ্য রাখার উপযুক্ত জিনিসই। কিন্তু রাত্রে বোতলগুলির মধ্যে সেই সুরা ফেনায়িত হয়ে উঠলো। প্রাতঃকালে দেখি সুরার উত্তেজনায় সমস্ত বোতলের গায়ে ফাটল ধরেছে।

১৬৪২ খৃষ্টাব্দে আমি একবার আগ্রায় ছিলাম। তখন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। বলদাস নামে জনৈক হিন্দু ওলন্দাজ কুঠীতে দালালের কাজ করতেন। তাঁর বয়স তখন প্রায় সত্তর বছর। তিনি সংবাদ পেলেন যে

মথুরার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইহলীলা সম্বরণ করেছেন। তখুনি তিনি ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন তাঁর হিসেবপত্র বুঝে নেবার জন্যে। এর কারণ বললেন যে তাঁদের মুখ্য পুরোহিত লোকান্তরিত হয়েছেন। সুতরাং তিনিও মৃত্যু বরণ করবেন যাতে পরলোকে গিয়ে তিনি পুরোহিতের সেবা করতে পারেন। তাঁর হিসেবপত্র পরীক্ষা শেষ হলে তিনি একটি গাড়ীতে উঠলেন। কিছু আত্মীয় স্বজন তাঁর সংগী হলেন। পুরোহিতের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছবার পরে তিনি আর কোনও খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেননি। সুতরাং পথিমধ্যেই তাঁর অনাহারজনিত দুর্বলতায় মৃত্যু ঘটে।

ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যখন তারা হাই তোলেন তখন নিজেদের আংগুলের মাধ্যমে তুড়ি দিয়ে চলেন। আর তৎসংগে 'জয় নারায়ণ' ধ্বনি করতে থাকেন। এর অর্থ হচ্ছে নারায়ণকে স্মরণ করা। তিনি হলেন হিন্দুদের প্রধান দেব মণ্ডলের একজন। তুড়ি দিয়ে শব্দ সঞ্চয়ের কারণ হোল যে হাই তোলার সময় তার দেহে কোন প্রেতাত্মা বা অমঙ্গলকর কিছু প্রবেশ করতে না পারে।

আমি একবার সুরাটে ছিলাম ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে। তখন জনৈক রাজপুত সৈন্যের অশ্বোপরি দু'তিন খণ্ড কাপড় ছিল। তাকে স্থানীয় গভর্ণরের কাছে নিয়ে আসা হোল সেই কাপড়ের শুল্ক আদায়ের উদ্দেশ্যে। রাজপুতটি দৃঢ় স্বরে সাহসের সংগে গভর্ণরকে প্রশ্ন করলেন যে, যে সৈনিক সারা জীবন রাজাকে সেবা করে চলেছেন, তাকে কি আজ দু'তিন খণ্ড অতি সামান্য সূতী কাপড়ের জন্যে শুল্ক দিতে হবে? সে কাপড়ের দাম চার পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। আর তিনি তা সংগ্রহ করেছিলেন তার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই।

গভর্ণর তখন উত্তেজিত হয়ে তাকে পতিতার পুত্র বলে গালি দিলেন। তৎসংগে তিনি আরও বললেন যে তিনি যদি রাজার ছেলেও হতেন তাহলেও শুল্ক দান থেকে রেহাই পেতেন না। সৈন্যটি গভর্ণরের গালি ও কথাবার্তা শুনে এমন ভাবে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন যে মনে হোল যেন তিনি পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ব্যাপারটা হোল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি গভর্ণরের কাছে গিয়ে ছুরিকা বের করে তাঁকে সাত আটটি আঘাত হানলেন তাঁর পেটের উপরে। ফলে তাঁর মৃত্যু হোল। কিন্তু পরে আবার গভর্ণরের অনুচরবৃন্দ সৈনিকটির দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

প্রকৃত ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে এই সকল হিন্দুরা একেবারে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জমান বটে, কিন্তু তাহলেও তারা স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রা ব্যাপারে বিশেষ নীতিপরায়ণ। বিবাহিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত। অন্যথা কদাচিৎ ঘটে। এই বিষয়ে বিশেষ অস্বাভাবিক রকমের কোনও অপরাধের কথা কখনই শোনা যায় না। এদের সমাজে সাত আট বছর বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেবার প্রথা। এর কারণ, তারা কোন অন্যায় কার্যে লিপ্ত হতে না পারে। তাদের বিবাহ পদ্ধতির কিছু বিবরণ সংক্ষেপে দেয়া যাক—

বিবাহের দিন সন্ধ্যা সমাগমে বর তার আত্মীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে, কণের পিত্রালয়ে যান। তার সংগে থাকে দুই ইঞ্চি ঘন মানের একজোড়া 'মল'। উহার ভিতরাংশ ফাঁপা। একটি খিল দিয়ে মুখ আটকানো। সহজেই খুলে ফাঁকা করা যায়। পাত্র পক্ষের সংগতি অনুসারে এ জিনিস সোনা, রূপা, পিতল ও টিন দিয়ে তৈরী হয়। দরিদ্রতমরা করান দস্তা দিয়ে। বর কণের পিতার গৃহে পৌঁছে এক একটি মল মেয়েটির পায়ে পরিয়ে দেবেন। এর অর্থ তার পায়ে বেড়ি দিয়ে তাকে চিরকালের জন্যে বেঁধে ফেললেন আর কি! পরদিন বরের বাড়ীতে ভোজের আয়োজন হয়। তখন বর বধূর সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সমাগম হয়ে থাকে। সেদিন বেলা তিনটের সময় নবোঢ়াকে পতিগৃহে আনার নিয়ম। অনেক ব্রাহ্মণ পুরোহিত সেখানে উপস্থিত থাকেন।

যিনি প্রধান পুরোহিত তিনি বরের মাথাটি কণের মাথার কাছে টেনে নিয়ে অনেক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। আর উভয়ের শরীরে ও মাথায় পবিত্র শান্তি বারি সিঞ্চন করেন। এরপর একখানি থালা বা বড় একটি শাল পাতায় করে নানা রকম খাদ্য বস্তু ও সূতী বস্ত্রাদি আনা হয়। তখন ব্রাহ্মণ বরকে প্রশ্ন করেন যে ঈশ্বর যে খাদ্য সম্ভার দিয়েছেন, তিনি তা স্ত্রীর সংগে ভাগ করে গ্রহণ করবেন কিনা এবং পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন দ্বারা তাকে প্রতিপালন করবেন কিনা।

বর সে বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলে সমবেত অতিথিবৃন্দ খাদ্য গ্রহণ করতে বসবেন এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্র আসনে। বরপক্ষের অর্থ সংগতি ও সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী বিবাহ উৎসবে জাঁকজমক ও ব্যয় বাহুল্যের মাত্রা ধার্য হয়। বর বসেন হাতীর পিঠে। বধূ আসেন গাড়ী বা পাল্‌কীতে চড়ে। সংগীদের

প্রত্যেকের হাতে থাকে একটি করে মশাল। বরপক্ষ এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় শাসক ও বন্ধুমহলের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে যত সংখ্যক সম্ভব হাতী সংগ্রহ করেন। তদ্ব্যতীত সুদর্শন অশ্বসমূহও সংগ্রহ করা হয়। রাত্রির কতকাংশ তারা ঘুরে বেড়ান এবং বাজী পোড়ান রাস্তা ঘাট ও মুক্ত প্রাঙ্গণে। কিন্তু বেশী অর্থ ব্যয় হয় গঙ্গার জল সংগ্রহ ব্যাপারে। কারণ, অনেকে হয়ত গঙ্গানদী থেকে তিন চারশত মাইল দূরে বাস করেন। অথচ এই জল অতি পবিত্ররূপে বিবেচিত এবং বিশেষ ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই তা পান করেন। সেই জল বহন করে নিয়ে আসবেন ব্রাহ্মণরা। অনেক সময় মাটির পাত্রে করে অতি দূর দূরান্তে নিয়ে যেতে হয়। পাত্রগুলির অভ্যন্তর ভাগ পালিশ করা।

মহনীয় মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পাত্রগুলি উৎকৃষ্ট ও স্বচ্ছতম জলে পূর্ণ করে দেন স্বহস্তে। পরে পাত্রগুলির মুখবন্ধ করে তিনি স্বহস্তে তাঁর নিজের সীলমোহর বসিয়ে দেন। আমি পূর্বেও বলেছি, এই জল অতিথিদের পান করতে দেবার প্রথা ভোজন পর্বের অন্তে, তার পূর্বে নয়। প্রতিটি অভ্যাগতকে তিন চার গ্লাস জল দানের নিয়ম। বরপক্ষ যদি আরও বেশী জলের ব্যবস্থা করেন তাহলে বুঝতে হবে তারা অধিকতর সদাশয় ও উন্নত পর্যায়ের লোক। এই পবিত্র বারি বহু দূর স্থান থেকে আনতে হয় বলে মুখ্য পুরোহিত পাত্র পিছু কর বা শুল্ক ধার্য করেন। পাত্রগুলি গোলাকার এবং একটিতে এক বালতি মত জল ধরে। এক একটি বিবাহ উৎসবে দু-তিন হাজার টাকা ব্যয় হয় এই জল সংগ্রহ করে সকলকে পান করানোর জন্যে।

আমার বাংলাদেশে অবস্থানের সময় এক ৮ই এপ্রিল মালদহ সহরে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে একটি অত্যদ্ভুত ধর্মানুষ্ঠান হয়েছিল। হিন্দুদের অধিকাংশ সহর ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে গাছের ডালে অনেকগুলি লোহার বঁড়শির মত জিনিস ঝুলিয়ে দিলেন। সেই বঁড়শিতে অনেক সাধারণ লোক নিজেদের দেহ বিদ্ধ করালেন। কতকলোকের দেহ বিদ্ধ হোল পাশ ধরে, বাকি অনেকের হোল পিঠের মাঝখানে। বঁড়শির কাঁটা তাদের শরীরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। ফলে তাদের শরীরগুলি ঝুলে পড়লো। কতকগুলো সেইভাবে এক ঘণ্টা ঝুলে থাকলেন, অনেকে দু-ঘন্টাও থাকেন। তারপরে তারা নেমে পড়তে বাধ্য হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কেটে যাওয়া ভিন্ন ভিন্ন দেহাংশ থেকে কোনও রক্ত ক্ষরণ

হয় না। বঁড়শির কাঁটাতেও কোনও রক্ত চিহ্ন দেখা যায় না। ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ওষুধে সেই ক্ষত দু'দিনে সম্পূর্ণ সেরে যায়।

এই উৎসব পর্বে আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় যারা সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকায় তৈরী শয্যায় শয়ন করেন। সেই শলাকা তাদের দেহের মাংস ভেদ করে অনেকখানি ভেতরে চলে যায়। এই দুই প্রকার দৈহিক কৃচ্ছ সাধনায় যারা ব্যাপৃত হন তাদের জন্যে আত্মীয় স্বজনরা উপহার স্বরূপ নিয়ে আসেন পান, টাকা এবং সূতী বস্ত্র। ব্রত উদ্‌যাপনান্তে ব্রতীরা সেই উপহার রাজি গ্রহণ করে পরে তা আবার দরিদ্রদের বিতরণ করে দেন। তা দিয়ে নিজেরা কোন রকম লাভবান হতে চান না। আমি কয়েকজন ব্রতীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যে কেন তাঁরা সেই কষ্ট স্বীকার করেন। তদুত্তরে তাঁরা বলেছিলেন যে সেই প্রথম মানবাত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যেই একাজ করা হয়। আমাদের মত এঁরাও তাঁকে আদম নামে অভিহিত করেন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের মে-মাসে আমি গঙ্গাতীরে আর একটি অদ্ভুত কৃচ্ছ সাধনের ঘটনা দেখেছিলাম। নদীতটে অতি চমৎকার পরিচ্ছন্ন একটি জায়গা তৈরী হোল। তদুপরি জনৈক হতভাগ্য হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল এইভাবে। দিনভোর তাকে কেবল হাতে-পায়ে ভর দিয়ে উচু হয়ে মাটি চুম্বন করতে হবে তিন তিন বার। তারপর তিনি উঠবেন। আবার পূর্ববৎ করবেন। কিন্তু কখনও বাকি দেহ ভূমি স্পর্শ করবে না। যখন তিনি উঠবেন তখন ডান পা খানি উপরে তুলে বা-পাটির উপরে ভর দিতে হবে। শুক্লপক্ষে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খাদ্য পানীয় গ্রহণের পূর্বে উক্ত ভঙ্গীতে পরপর পঞ্চাশবার তাকে তা করতে হয়। তাহলে ভূমি চুম্বন চলে দেড়শতবার। ব্রাহ্মণরা তাকে এই শাস্তি ভোগ করার বিধান দিয়েছিলেন তার কারণ হোল তার গৃহে একটি গাভীর মৃত্যু হয়েছিল। নিয়ম মত তিনি গাভীটির মৃত্যুকালে ওটিকে জলাশয়ের ধারে নিয়ে যেতে পারেন নি স্নান করানোর জন্যে।

আরও একটি অদ্ভুত রীতি আছে। কোনও হিন্দুর যদি একটি মুদ্রা বা সামান্য কিছু সোনা হারিয়ে যায়, তা ভুলবশতঃই হোক, বা চুরি হয়ে যাক— যা হারাবে তার সমপরিমাণ সেই জিনিস তাকে দিতে হবে মুখ্য পুরোহিতকে। তিনি যদি তা না করেন, তাহলে তার সমগোত্রীয় সমাজ থেকে তাকে অপমান করে বহিষ্কার করে দেবে। এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের কারণ মানুষকে সতর্ক হতে শিক্ষা দান।

গঙ্গানদীর ওপারে আরও উত্তর অঞ্চলে নগর কোট পর্বত শ্রেণীতে দু'-তিনজন রাজা আছেন যাঁরা তাঁদের প্রজাপুঞ্জের ন্যায় ঈশ্বর বা প্রেতাত্মা, কোনটিতেই বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট গ্রন্থ আছে যার মধ্যে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ধর্মনীতি ও বাণী বিধৃত আছে। তা নিরর্থক তত্ত্ব। সেই ধর্মাদর্শের প্রবর্তক হলেন বুদ্ধদেব। তাঁর ধর্ম সম্পর্কে তিনি কোনও যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। নগর কোট পার্বত্য প্রদেশের রাজারা মুঘল সম্রাটের অধীনস্থ সামন্ত। এরা তাঁকে কর দান করেন।

অবশেষে আমার শেষ কথা বলে এই অধ্যায় সমাপ্ত করবো। তা হচ্ছে যে মালাবারি পুরুষ সমাজ সাধারণতঃ সযত্নে তাদের বা-হাতের নখ রাখেন। মাথার চুল রাখেন তারা মেয়েদের মত লম্বা করে। সেই নখ কখনও আধ আংগুল লম্বা হয়। নখ দিয়ে তারা চুল আঁচড়ানোর কাজ চালান। আর কিছু তাদের নেই। বা-হাত দিয়ে তারা যাবতীয় অপবিত্র কাজ করেন। অতএব কখনও তারা বা-হাত মুখে ছোঁয়ান না। কোন খাদ্যও সেই হাতে ধরেন না বা গ্রহণ করেন না। খাদ্য ব্যাপারে একমাত্র দক্ষিণ হস্তের ব্যবহার চলে। আমি অতঃপর মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর পূর্ব সীমানার ওধারে যে সকল রাজ্য আছে তাদের সম্বন্ধে এবং সেখানে আমার ভ্রমণ যাত্রার কথা কিছু বলবো। রাজ্যগুলি হচ্ছে—ভূটান, টিপরা (ত্রিপুরা ?), আসাম ও শ্যাম। এই সকল দেশ সম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ ইউরোপীয়দের বিশেষ কোনও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই। আমি টনকিন্ রাজ্য সম্বন্ধেও কিছু বলবো। তবে আমার জানা ছিল না যে দু'জন গ্রন্থকার এই বিষয়টি নিয়ে দুইখণ্ড গ্রন্থ লিখেছেন।

অধ্যায় পনের

ভুটান রাজ্যের কথা: এই দেশ থেকেই কস্তুরী মৃগনাভি, রেউ চিনি ও পশম আমদানী হয়।

ভুটান রাজ্য অতি সুবিস্তির্ণ। অদ্যাবধি তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা বা অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হয়নি। আমি কয়েকবার ভারত ভ্রমণকালে এ সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছি তা ভুটানবাসী যারা এদেশে ব্যবসা করতে আসেন তাদের কাছ থেকে। তার মধ্যেও আমি বেশী জানতে সক্ষম হয়েছি আমার শেষ যাত্রাকালে। তখন আমি পাটনাতে ছিলাম। পাটনা বাংলা সুবার সুবৃহৎ সহর। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে প্রসিদ্ধ। আমার পাটনায় অবস্থান কালে ভুটানী ব্যবসায়ীরা ওখানে আসতেন মৃগনাভি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। আমি তখন সেখানে ছিলাম দু'মাস। আমি প্রায় ছাব্বিশ হাজার টাকা মূল্যের কস্তুরী কিনেছিলাম। তার জন্যে ভারতে ও ইউরোপে যদি আমদানী শুল্ক দিতে না হোত, তাহলে প্রচুর লাভ করা যেত।

সর্বোৎকৃষ্ট রেউ চিনিও আসে ভুটান থেকে। এদেশে আরও এমন সব গাছ ও বীজ জন্মায় যা থেকে নানা প্রকার ওষুধ তৈরী হতে পারে। চমৎকার সব পশমও আসে ওখান থেকে। রেউচিনির ব্যাপারে যথেষ্ট ঝুঁকি ও দায়িত্ব আছে। যে পথ ধরেই যাতায়াত করা যাক না কেন, গাড়ীতেই প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনা। কারণ কাবুলের দিকে উত্তর মুখো চললে ঠাণ্ডাতে তা নষ্ট হয়। আবার দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে এগোলে যেমন দীর্ঘ পথ, তেমনি বর্ষার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। আর কোনও পণ্য দ্রব্য নেই, যা এইভাবে নষ্ট হয় বা যার জন্যে এত বেশী যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

কস্তুরী মৃগনাভি প্রসংগে দেখা যায় যে ব্যবসায়ীরা গ্রীষ্মকালে এই জিনিস দিয়ে কোনও লাভ করতে পারেন না। কারণ, তখন তা শুকিয়ে ওজনে হ্রাস পায়। এই জিনিসটির জন্যে গোরক্ষপুরে সাধারণতঃ শতকরা পঁচিশ ভাগ শুল্ক দিতে হয়। গোরক্ষপুর ভুটান ও মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী স্থান। তবে স্থানটি শেষ সীমানা থেকে সাত আট ক্রোশ দূরে। ওখানে পৌঁছেই ভারতীয় ব্যবসায়ীরা শুল্ক বিভাগীয় কর্মীদের কাছে যান। তাঁদের জানাতে হয় যে এরা ভুটান অভিমুখে চলেছেন। তাদের কেউ কিনবেন কস্তুরী, কেউ

আনবেন রেউচিনি। এই বাবদে তারা কত টাকা ব্যয় করতে প্রস্তুত; তাও ওখানে জানাতে হবে। শুল্ক বিভাগ তখন তাদের খাতা পত্রে ব্যবসায়ীদের নাম ধাম লিখে রাখবেন। ব্যবসায়ীরা শতকরা পঁচিশ ভাগ দেয় শুল্কের পরিবর্তে সাত আট ভাগ দিতে সম্মত হন এবং বিভাগীয় কর্মচারী বা কাজীর কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র নিয়ে যান যাতে ফেরার পথে পুনরায় তাদের টাকা দিতে আর কেউ বলতে না পারেন। যদি এমন হয় যে তারা শুল্ক বিভাগের উত্তম সুযোগ সুবিধা পেলেন না, তাহলে ব্যবসায়ীরা অন্য রাস্তা ধরে যাবার ব্যবস্থা করেন। তবে সে রাস্তা যেমন সুদীর্ঘ, তেমনি দুর্গম। কারণ, পর্বতশ্রেণী প্রায় সর্বদাই তুষারাচ্ছন্ন থাকে। আর সমতল খণ্ডে বিরাট মরুময় অঞ্চল পার হয়ে এগোতে হয়।

যাত্রীদের ৬০° ডিগ্রী অক্ষাংশ পর্যন্ত উচ্চে আরোহণ করা প্রয়োজন হয়। তারপর তারা পশ্চিমদিকে কাবুলের পথে অগ্রসর হবেন। সে জায়গাটি ৪০° ডিগ্রীতে অবস্থিত। কাবুল সহরে গিয়েই দলবদ্ধ যাত্রীরা দু-ভাগে বিভক্ত হন। একটি দল যান বল্‌খ্‌-এ, আর দ্বিতীয়টি বৃহৎ তার্তারী অভিমুখে যাত্রা করেন। শেষোক্ত স্থানটিতে ভুটানগত বণিকগণ তাদের জিনিসপত্রের সংগে বিনিময় মাধ্যমে গ্রহণ করেন ঘোড়া, খচ্চর ও উটের বহর। কারণ ভুটানে বড় টাকার অভাব। তারপরে তার্তারীগণ তাদের সেই মালপত্র নিয়ে চলে যান পারস্য দেশে। সেখান থেকে যান অর্দবিল তাব্রিজে। এই কারণেই ইউরোপীয়দের ধারণা যে রেউচিনি ও বীজ আসে তার্তারি থেকে। বেড়াচিনি তার্তারি থেকে আমদানী হয় ঠিকই; কিন্তু তা ভুটানে উৎপন্ন জিনিসের মত উৎকৃষ্ট নয়। তার্তারীর রেউচিনি বিষাক্ত, তেমনি আবার ভেতরে ভেতরে নষ্ট হয়ে যায়।

তার্তারগণ নানারকম কাপড়ের ব্যবসা করেন। প্রথমতঃ তাব্রিজ ও অর্দবিলে উৎপন্ন সস্তাদামের রেশমী কাপড় তারা পারস্য থেকে নিয়ে যান। এছাড়া ইউরোপের আমদানী বিলিতী ও ওলন্দাজী বস্ত্র যা আর্মেনিয়রা কনস্টান্টিনোপল ও স্মার্ণা থেকে আনেন তা নিয়েও ব্যবসা চালান। ভুটান ও কাবুলের ব্যবসায়ী যারা কান্দাহার ও ইস্পাহানে যান তারা সাধারণতঃ সেখানকার প্রবাল দানা, হলদে অম্বর পাথর, ল্যাপিসের মালা নিয়ে আসেন। মুলতান, লাহোর ও আগ্রা ভ্রমণ করে প্রত্যাবর্তনের সময় তারা সূতী কাপড়, নীল ও প্রচুর কর্ণেলিয় এবং স্ফটিক দানা নিয়ে যান। শেষ পর্যায়ে যারা

গোরক্ষপুরের রাস্তা ধরে ফিরে যান, তাদের শুল্ক বিভাগের সংগে একটা বোঝা পড়া থাকে যে তারা পাটনা ও ঢাকা থেকে প্রবাল, হলদে অম্বর, কচ্ছপের খোলার বালা এবং আরও নানা সামুদ্রিক শঙ্খ ও জীবজন্তর খোলা সংগ্রহ করবেন। সেই সকল জিনিস নানা আকারের—গোলাল, চৌকো এবং বিভিন্ন মূল্যের।

আমি যখন পাটনায় ছিলাম তখন চারজন আর্মেনিয়ানের সংগে দেখা হয়েছিল। তারা তৎপূর্বে ভূটান রাজ্য ভ্রমণ করে এসেছেন। তাঁরা মূলতঃ এসেছিলেন ডানজিগ্‌ থেকে। সেখানে প্রচুর হলদে অম্বর পাথরের মূর্তি তৈরী হোত। মূর্তিগুলি নানা প্রকার জীবজন্তু ও দৈত্যদানবের। তাঁরা সেই জিনিস ভূটানের রাজার কাছে নিয়ে চলেছিলেন তাঁর দেশের মন্দিরে সংরক্ষণ করানোর উদ্দেশ্যে। ভূটানের রাজাও তাঁর দেশবাসীর ন্যায় অতি মাত্রায় পৌত্তলিক। আর্মেনিয়রা যেখানে টাকা আয় করার সুযোগ পান সেখানে পৌত্তলিক ধর্মানুষ্ঠানের জন্যেও উপাদান সরবরাহ করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন না।

এই প্রসংগে তাঁরা আমাকে বললেন যে রাজা তাঁদের একটি মূর্তির অর্ডার দিয়েছেন। সেটি তাঁরা নির্মাণ করিয়ে দিতে পারলে লাভের অংক বেশ মোটা হবে। মূর্তিটি হবে দানবাকৃতি। ছয়টি শিং, চারটি কান ও চারটি হাত থাকবে তার। প্রতি হাতে আংগুল থাকবে ছয়টি করে। সেটি তৈরী হবে হলদে অম্বর পাথরে। কিন্তু আর্মেনিয়রা তার জন্যে উপযুক্ত সাইজের বৃহৎ খণ্ড অম্বর সংগ্রহ করতে পারেননি। আমার মনে হয়েছিল যে তাঁদের হাতে টাকাও ছিল না। তাঁদের অবস্থা দেখেও মনে হয়নি যে তেমন কিছু অর্থ সম্বল ছিল। তবে এও ঠিক যে এঁদের মত সাধারণ লোকদের পক্ষে পৌত্তলিক ধর্মানুষ্ঠানের উপযুক্ত মূর্তি প্রতিমা সরবরাহ করাও সহজ কাজ নয়।

পাটনা থেকে ভূটান রাজ্যে যাবার সময় যে রাস্তা অবশ্য অতিক্রম করতে হয় সে সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক। যাত্রীদলকে সেই রাস্তায় তিন মাস কাটাতে হয়। তারা সাধারণতঃ ডিসেম্বরের শেষভাগে পাটনা ত্যাগ করেন এবং আটদিনের পরে গোরক্ষপুরে পৌছান। আমি ইতিপূর্বেও বলেছি যে এইটিই হোল সেদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানায় শেষ সহর। বণিকরা তাদের যাত্রাপথের কতকাংশে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি

ওখানেই সংগ্রহ করেন। গোরক্ষপুর ও সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব হোল আট নয় দিনের যাত্রাপথ। তখন যাত্রীদের বিশেষ কষ্টভোগ করতে হয়। কারণ সমগ্র অঞ্চলটি বনময়। প্রচুর বন্য হস্তী অধ্যুষিত স্থান। ব্যবসায়ীদের রাত্রিতে নিদ্রা যাবার উপায় নেই। সারারাত তাঁদের জেগে কাটাতে হয়। আর অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ছোট বন্দুকের গুলী নিক্ষেপ করতে হয় পশু প্রাণীদের ভীতি উৎপাদনের জন্যে। হাতীর চলা ফেরা করে নিঃশব্দে। ওরা যাত্রীদের অজ্ঞাতে নিঃসারে তাদের একেবারে কাছে এসে পড়ে। কিন্তু ওরা মানুষের ব্যক্তিগত ক্ষতি সাধনের জন্য আসে না। ওদের উদ্দেশ্য খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ, তা বস্তা ভর্ত্তি চাল, ময়দা, পাত্র পূর্ণ ঘৃত, যাই হোক তা নিয়ে চলে যাবে। এই জাতীয় জিনিস যাত্রীদের সংগে প্রচুর পরিমাণেই থাকে।

পাটনা থেকে এই সকল পার্বত্য প্রদেশে সাধারণ ভারতীয় শকট বা পালকী কিম্বা বলদ এবং উট ও ঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ যাতায়াত করেন। ঘোড়াগুলি এত ছোট যে একজন লোক পিঠে চাপলে তার পা দু'টি মাটি স্পর্শ করে। তবে ওরা খুব শক্ত ও সবল। কিন্তু চলে অতি ধীর পদক্ষেপে। এক নাগাড়ে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত রাস্তা চলতে পারে। খাদ্য ও পানীয় তখন বেশী দরকার হয় না। এই ঘোড়ার কিছু সংখ্যকের প্রতিটির মূল্য দুইশত একুশ মুদ্রা পর্যন্ত হয়। পার্বত্য প্রদেশে যেতে হলে এই ধরণের যানবাহন ছাড়া গত্যন্তর নেই। অন্য যা কিছু বহনকারী থাক না কেন, তা রেখে এগোতে হবে। কারণ, অনেক গিরিপথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। তখন ছোট ঘোড়া ব্যতীত আর কিছু কাজে আসে না। অথচ ছোট ঘোড়া শক্তি-মান হলেও ওদের নিয়ে সেখানে প্রবেশ করা অনেক সময় দুরূহ হয়ে ওঠে। এই কারণেই, আমি বলবো, সেই সুউচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করার জন্যে অন্য রকম সুবিধাজনক কোনও পন্থা অবলম্বন করা বিধেয়।

গোরক্ষপুরের পরে সাত আট ক্রোশ ব্যবধানে গিয়ে নেপালের রাজার রাজ্য পাওয়া যায়। এটি ভুটান রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। নেপাল মুঘল সম্রাটের অধিনস্থ সামন্ত রাজ্য। নেপালের রাজা প্রতি বছর মুঘল বাদশাকে একটি করে হাতী উপঢৌকন পাঠান। রাজা নেপাল সহরে বাস করেন। দেশটিতে ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থকড়ির আমদানী স্বল্প। কেননা, স্থানটি পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ। যাত্রীরা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে অধুনা

পরিচিত নগরকোটে পৌঁছলে নানা স্থান থেকে প্রচুর লোক ওখানে নেমে আসে। স্থানটি এত উঁচু ও সংকীর্ণ এবং তদুপরি খাড়া ধরণের যে তা অতিক্রম করতে যাত্রীদের নয় দশ দিন সময় কেটে যায়। আরও উঁচু থেকে যারা নেমে আসেন, তাদের মধ্যে বেশীরভাগ নারী ও বালিকা। যাত্রীদলের সংগে কিছু লাভজনক কারবার করাই তাদের উদ্দেশ্য। মানুষ, মালপত্র ও খাদ্য সম্ভারকে তারা পাহাড়ের ওধারে বহন করে নেবার জন্যে প্রস্তুত থাকেন।

বহন করে নেবার পদ্ধতি নিয়রূপ। পাহাড়ী মহিলাদের কাঁধের সংগে আবদ্ধ থাকে একটি ফিতার মত জিনিস। সেই দড়িটির সংগে তাদের পিঠে ঝোলানো থাকে গদীর মত বড় একটি আসন। যিনি উপরে উঠতে চান, তিনি সেই আসনে বসবেন। তিনজন মহিলা কুলি দফায় দফায় তাকে বয়ে নিয়ে যাবেন। তার মালপত্র ও খাদ্য দ্রব্য চাপানো হবে ছাগলের পিঠে। এক একটি ছাগল ১৫০ লিভর ওজনের মাল বহন করতে সক্ষম। যারা অতি সংকীর্ণ ও দুর্গম গিরি সংকটে তাদের অশ্ব সমূহকে নিয়ে যেতে চান তাদের জন্তুগুলিকে দড়ি বেঁধে টেনে তুলতে হবে। আমি পূর্বেও বলেছি যে এই কারণেই ও-দেশে ঘোড়ার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা কম। ঘোড়াকে সকাল সন্ধ্যায় দুবার খেতে দিতে হয়। প্রাতঃকালে আধসের ময়দা, এক পোয়া গুড় ও এক পোয়া মাখন একসংগে কিছু জলের সংগে মিশিয়ে ঘোড়াকে খেতে দিতে হবে। সন্ধ্যার দিকে কিছু মটর দানা বা ছোলা পিষে আধ ঘন্টা সময় জলে ভিজিয়ে রেখে খাওয়াবার প্রথা। সারাদিনে এই হোল ওদের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্য। কুলী রমণীরা প্রতিটি মানুষকে বহন করে নেবার জন্যে এক একজন পারিশ্রমিক পায় দুই টাকা। মালপত্র বহনের প্রতিটি ছাগল বা ভেড়ার জন্যেও তারা লাভ করে সেই একই হারে। অশ্ব নিয়ে যাবার ব্যয়ও তদনুরূপ।

পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে ভুটানে যাবার জন্য বিভিন্ন রকম যানবাহন পাওয়া যায়—যেমন, বলদ, উট, ঘোড়া, এমনকি পালকীও। যারা একটু বেশী আরামে যেতে চান তাদের জন্যেই পালকীর ব্যবস্থা। দেশটি উত্তম। ওখানে প্রচুর দানাশস্য, চাল, তরিতরকারী ও মদ্য উৎপন্ন হয়। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের গ্রীষ্মকালে সুতী বা শণের তৈরী কাপড়। নারী পুরুষ সকলের মাথাই আবৃত থাকে বিলিতী ধরণের টুপি দ্বারা। টুপিগুলির সারা কিনার

জুড়ে শূকর ছানার দাঁত বসানো থাকে। অলঙ্করণ হিসেবে। কচ্ছপের খোলার নানা আকারের খণ্ড বসিয়েও টুপিকে সাজানোর প্রথা আছে। ধনী ব্যক্তিরা টুপিতে প্রবাল, হলদে অম্বর পাথর বসান। এইসব রত্ন ও পাথর দিয়ে মেয়েরা গলার হারও তৈরী করেন। মেয়েদের মত পুরুষরাও বা-হাতে বালা পরেন কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত। মেয়েদের বালা অত্যন্ত সরু। আর পুরুষদের ব্যবহার যোগ্য যা তা প্রায় দুই আংগুল মত চওড়া। এরা গলায় রেশমের দড়ির ন্যায় একটি পরেন। তার সংগে ঝোলানো থাকে একটি প্রবাল দানা বা এক টুকরো হলদে অম্বর পাথর: না হয়তো শূকর ছানার দাঁত। তা ঝোলানো থাকবে কোমর পর্যন্ত। তাদের কোমরের বা-দিকে লহরে লহরে ঝুলবে প্রবাল দানার ও অম্বর পাথরের মালা অথবা শূকর ছানার দাঁত।

এরা নেপালী হিন্দু হলেও সবরকম খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। তবে গোমাংস খান না। গাভীকে এরা মানব জাতির মাতা ও ধাত্রীরূপে পূজা করেন। বিবিধ আত্মার প্রতি এরাও অনুরক্ত। এদের মধ্যে কিছু পরিমাণে চৈনিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। যেমন, আত্মীয় বন্ধুদের ভোজন করিয়ে ভোজপর্ব অন্তে এরাও হলদে অম্বর পোড়ান। তবে এরা চৈনিকদের মত অগ্নি উপাসনা করেন না। চীনদেশীয়রা ভোজ পর্বের পরে কেন অম্বর পোড়ান তার কারণ আমি অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি। এই কারণে এই জিনিসটি চীনদেশে খুব বিক্রী হয়। খণ্ড খণ্ড হলদে অপরিশ্রুত অম্বর পাথর যা আকারে একটি বাদামের মত এবং রঙ বেশ পরিষ্কার ও উত্তম তা ভুটানী ব্যবসায়ীরা পাটনাতে প্রতি সের পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দরে ক্রয় করেন। অম্বর, তিমির চর্বি, কস্তুরী, প্রবাল, রেউচিনি ও অন্যান্য সব ওষুধ জাতীয় জিনিসের এক সের ওজন আমাদের দেশীয় নয় আউন্সের সমান। বাংলা দেশে শোরা, দানাশস্য, চাল, চিনি ও অন্যবিধ খাদ্য দ্রব্য সের দরেই বিক্রি হয়। আমি যখন ঐদেশ ত্যাগ করি তখন একমন চাল দুই টাকায় বিক্রী হোত। চল্লিশ সেরে এক মণ হয়।

পুনরায় হলদে অম্বর প্রসংগে যাওয়া যাক। এক সের ওজনের এক খণ্ড উক্ত পদার্থের রঙ্ ও সৌন্দর্যানুসারে দাম হয় দু'শত পঁচিশ থেকে তিনশত টাকা পর্যন্ত। অন্যান্য আকারেরগুলি তাদের সাইজ ও সৌন্দর্য অনুযায়ী মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রবাল, তা অমার্জিত হোক, বা দানায় রূপান্তরিত

হোক, তা বিক্রীর যোগ্য এবং যথেষ্ট লাভজনক। তবে কাটাছাটা হয়নি এমন জিনিসই লোকে পছন্দ করে। তার কারণ, তা নিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মত ও পছন্দ অনুসারে কেটে নিতে পারেন। কাটাছাটার কাজ বেশীর-ভাগই মেয়েরা করেন। তারা স্ফটিক ও অ্যাগট পাথরের দানাও তৈরী করেন। পুরুষরা করেন কচ্ছপের খোলা ও সামুদ্রিক শঙ্খ দ্বারা বালা তৈরী। ছোট ছোট শামুক ও শঙ্খ তা গোলাল, চৌকো, সব দিয়েই বালা তৈরী হয়। এই বিষয়েও আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। উত্তর অঞ্চলের নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই তাদের চুল ও কানের সংগে তা ঝুলিয়ে ব্যবহার করেন। পাটনা ও ঢাকাতে দু'হাজারেরও বেশী সংখ্যক লোক এই শঙ্খ শিল্পে নিযুক্ত আছেন। তাদের তৈরী জিনিস রপ্তানী হয়ে যায় ভুটান, আসাম, শ্যামদেশ, এবং মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর ও পূর্বদিকে অবস্থিত অন্যান্য সব দেশে।

'সিমেন সাইন্' সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য এই যে তা অন্যান্য শস্যের মত চাষ করা যায় না। এটা এক প্রকার গুল্ম। মাঠে ঘাটে জন্মায়। এগুলোকে শুকিয়ে যেতেও দেখা যায়। মুস্কিল হোল এই যে তা যখন পরিপক্ক হয়ে ওঠে তখন বেশীরভাগ বাতাসে উড়ে আশে পাশে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যেই জিনিসটি এত দুর্মূল্য। আরও একটি ব্যাপার হয়। এগুলোকে হাতে ধরলেও অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। নমুনা হিসেবে তুলতে হলেও একটি কানা উঁচু পাত্রে তোলার প্রথা। মঞ্জুরীর মধ্যে যা আছে তা যদি সংগ্রহ করতে হয় তাহলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ঝুড়ির একটি ডাইনে বায়ে, অপরটিকে বায়ে ডাইনে দুলিয়ে দুলিয়ে চালাতে হয়। মনে হবে ঝুড়ি দিয়ে যেন গাছ কাটা চলছে। অথচ তা কেবল গাছের মাথাটুকুই অর্থাৎ মঞ্জরীগুলিকে স্পর্শ করে। এইভাবে সমস্ত দানাগুলি ঝুড়িতে পড়ে জমা হয়।

কুমায়ুন প্রদেশেও তা জন্মায়। সেই অঞ্চলে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী আর ওখানে জন্মায় না। আর ভুটানে উৎপন্ন জিনিসের মত তা উৎকৃষ্টও নয়। শিশুদের শরীরের কৃমি পোকা নষ্ট করার জন্যেই যে কেবল এর উপযোগিতা তা নয়। পারস্যবাসীরা এবং উত্তরদিকে বাস করেন যে জন সমাজ, এমনকি ইংরেজ ও ওলন্দাজগণও মিষ্টি মিঠাই ও মিশ্রীতে তা মৌরী মশলার মত ব্যবহার করেন।

রেউচিনি. এক প্রকার মূল জাতীয় জিনিস। তাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে তার দশবারটিকে এক সংগে বেঁধে শুকিয়ে নেয়া হয়।

ভূটান বাসীদের যদি মস্কোভিয়ার লোকেদের মত মাটির পাখী শিকার করার ক্ষমতা থাকতো তাহলে ওদেশ থেকে প্রচুর উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যেত। কারণ ভূটানে এই পাখী আছে প্রচুর। প্রাণীগুলি তাদের বাসা থেকে বাইরে মুখ বের করলেই মস্কোভিয়ানরা অব্যর্থভাবে গুলীবিদ্ধ করে। সে গুলী বিদ্ধ হয় ওদের নাকে বা চোখের উপর। শিকারীরা বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে কখন ওরা মুখ বের করবে। গুলী যদি ওদের দেহ বিদ্ধ করে তাহলে চামড়া কোন কাজে লাগে না। কারণ গুলী বিদ্ধ স্থানে রক্ত ক্ষরণের ফলে পশম রক্তাক্ত হয়ে ভিজে নষ্ট হয়ে পড়ে যায়।

ভূটানের রাজার রক্ষীরূপে সর্বদা সাত আট হাজার লোক নিযুক্ত থাকে। তাদের হাতে থাকে তীর-ধনুক। অনেকে আবার কুঠার ও ঢাল ব্যবহার করেন। কুঠারের একদিক সূক্ষ্মাগ্র। ঠিক যুদ্ধের আশা সোঁটার মত। সুদীর্ঘকাল পূর্বে ভূটানীরা ছোট বন্দুক, লোহার কামান ও বারুদের ব্যবহার শিখেছিলেন। বারুদ বড় দানাওয়ালা এবং অত্যন্ত তেজস্ক্রিয়। আমি দেখেছি যে তাদের বন্দুকের গায়ে পাঁচশত বছরেরও অধিক পুরাতন অক্ষর ও নকসা খোদিত। গভর্ণরের অনুমতি ব্যতীত এই অস্ত্রাদিকে কেউ রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন না। অতএব, কারোরই সাহস হবে না একটি ছোট বন্দুকও বাইরে নিয়ে যান। তা সম্ভব হয় যদি নিকটতম কোনও আত্মীয় জামিন হন যে তা বিশেষ সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার সংগে ফিরিয়ে আনা হবে। এই অসুবিধা না থাকলে আমি তার একটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসতাম। আমি যেটি দেখেছিলাম তার গায়ে ক্ষোদিত অক্ষর যাঁরা পড়তে পারতেন তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে তার নির্মাণ কাল একশত আশী বছর আগে। জিনিসটি অত্যন্ত ভারি; মুখটি 'টিউলিপের' মত গড়নের। অভ্যন্তর ভাগ আর্শীর মত উজ্জ্বল ও চকচকে। বন্দুকটির দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে স্বর্ণোজ্জ্বল কারুকার্য যুক্ত একটি পাটি। তার কিছু অংশ গিল্টী করা, বাকী অংশে রূপালী ফুলের নকসা। তার মধ্যেকার বলটির ওজন প্রায় এক আউন্স। ভূটানের ব্যবসায়ীরা বন্দুক ফিরিয়ে নেবার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। আমি কিন্তু প্রথমে যা মূল্যদানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তারপরে আর তাকে কোন অনুরোধ উপরোধ করিনি ওটি আমাকে বিক্রী করার

জন্যে। এমনকি তিনি তার বারুদের কিছু নমুনাও আমাকে দিতে রাজী হননি। কিন্তু আমি প্রায় ঐ রকমেরই দু'টি বন্দুক ফ্রান্সে নিয়ে এসেছি। তার একটি তৈরী হয়েছে সিংহল দ্বীপে, আর দ্বিতীয়টি বাংলাদেশে।

ভুটানের রাজার আবাসে সর্বদা প্রহরারত থাকে প্রায় পঞ্চাশটি হাতী ও বিশ পঁচিশটি উট। এদের জীনে ছোট ধরণের একটি কামান থাকে। তার গোলার ওজন প্রায় আধ পাউণ্ড। উটের পুচ্ছদেশে একজন লোক বসেন। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও বলেছি। তিনিই কামানটিকে উঁচু নিচু, ডানে বামে যেভাবে হোক বসিয়ে রাখেন। জীনের সংগে একটি কাঁটার মত জিনিসের সংগে কামানটি আবদ্ধ থাকে।

পৃথিবীতে আর এমন কোনও রাজা নেই যিনি ভুটানের শাসকের (লামা) মত প্রজাপুঞ্জের কাছে এত সম্মান পান বা প্রজারা রাজাকে এত ভয় করে। ভুটানীরা রাজাকে দস্তুর মত পূজা করেন। রাজা যখন বিচারসনে থাকেন বা কারোর সংগে আলোচনারত, তখন সমবেত ব্যক্তিরা তাঁর সামনে করজোড়ে হাত দু'টি কপালে ঠেকিয়ে থাকেন। প্রণতি জ্ঞাপনের সময় সকলেই সিংহাসন থেকে কিছু দূরে ভূমিতে শায়িত হয়ে করেন। তখন মাথা তোলার সাহস কারো হয় না। এই ধরণের বিনীত ভঙ্গীতেই তারা রাজার কাছে আবেদন ও প্রার্থনা নিবেদন করেন। ভূমি ছেড়ে উঠে তারা রাজার চোখের বাইরে যতক্ষণ না যাবেন ততক্ষণ পিছু হেঁটে চলবেন। ব্রাহ্মণরাই সাধারণ দীনহীন লোকেদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছেন যে ভূমণ্ডলে রাজাই (লামা) হলেন ঈশ্বর।

ভুটানের অধিবাসীরা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। চেহারা অতি উত্তম। তবে নাক ও মুখ চ্যাপ্টা ধরণের। আমি শুনেছি যে নারী সমাজ পুরুষের তুলনায় দীর্ঘতর ও বেশী শক্তিশালিনী। ভুটানীরা যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মুঘল বাদশাহ ছাড়া অন্য কাউকে এরা ভয়ও করেন না। ভুটান রাজ্যের দক্ষিণদিক হোল মুঘল সাম্রাজ্যের দিকে। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে সেখানে সংকীর্ণ গিরিসংকট ও সুউচ্চ পর্বতময় একটি রাজ্য আছে। উত্তরদিকে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বনভূমি ও আসামী তুষার ক্ষেত্র। পূর্ব পশ্চিমে বিরাট মরুময় অঞ্চল। সেখানে তিক্ত স্বাদের জল ব্যতীত আর কিছু নেই। স্থানটি যেমন হোক্, তা জনৈক রাজার অধিনস্থ। তবে তাঁরও বিশেষ কোনও ক্ষমতা নেই।

স্পষ্টতঃই জানা গিয়েছে যে ভুটানে কয়েকটি রৌপ্য খনির অবস্থান আছে। রাজা এখন রৌপ্য মুদ্রা তৈরী করান যা টাকার মতই মূল্যমানের। তবে ও-দেশের মুদ্রা গোলাকার নয়, অষ্টকোণ বিশিষ্ট। তদুপরি যে বর্ণাক্ষর ক্ষোদিত তা ভারতীয় বা চৈনিক—কোনটিই নয়। ভুটানের যে ব্যবসায়ীরা পাটনাতে আমাকে এই সকল তথ্য জানিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু রৌপ্য খনির অবস্থান সম্বন্ধে কিছু বলেননি। সোনা অতি সামান্য আছে ওদেশে। পূর্বাঞ্চল থেকে আগত ব্যবসায়ীরা তাদের সোনা সরবরাহ করেন।

ভুটান সম্বন্ধে আমার জানা বিবরণ এই। এই রাজ্যটি পার হয়ে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন কতিপয় রাষ্ট্রদূত। তাঁদের চীনদেশে পাঠিয়েছিলেন মাস্কাভিয়ার ডিউক। সে ঘটনা ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের। তাঁরা গিয়েছিলেন বৃহৎ তাতার দেশের মধ্যে দিয়ে ভুটানের উত্তর দিক ধরে। তারপরে তাঁরা পোঁছে যান চীন সম্রাটের দরবারে। সংগে নিয়েছিলেন তাঁরা অনেক উপঢৌকন। দূতগণ ছিলেন মস্কোভির বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক।

এঁরা সাধারণতঃ সম্মানসূচক অভ্যর্থনাদি লাভের যোগ্য। কিন্তু চীন সম্রাটকে অভিবাদন জানানোর সময় ব্যাপারটা হোল বিপরীত। সে দেশের প্রথা ছিল ভূপাতিত হয়ে তিনবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে হবে। কিন্তু দূতগণ বললেন তাঁরা স্বদেশের প্রথানুযায়ী প্রণতিজ্ঞাপণ করবেন। তাঁরা নিজেদের রাজাকে যেভাবে অভিবাদন করেন তদনুরূপ ছাড়া অন্য প্রথায় করতে নারাজ হলেন। কারণ, তাঁদের সম্রাট চীন সম্রাটের মতই মহান ও শক্তিমান। নিজেদের সংকল্পে তাঁরা এত দৃঢ় ছিলেন যে আর কোন কথা বলতে বা শুনতে রাজী হননি। অধিকন্তু তৎক্ষণাৎ রাজার সংগে সাক্ষাৎ না করেই উপঢৌকন সহ তাঁরা ফিরে চলে এলেন। ব্যাপারটা এই রকম হোতনা যদি মহান ডিউক রাষ্ট্রদূতের পদে এই জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন না করে সাধারণ পর্যায়ের লোককে নিয়োগ করতেন।

সাধারণ ব্যক্তিরা হয়ত নিজেদের রীতিনীতি সম্বন্ধে এতখানি সচেতন হতেন না। এই জাতীয় আত্মসচেতনতাই মানুষকে অনেক সময় কর্তব্য থেকে বিরত করে। মস্কোভির রাষ্ট্রদূতগণ যদি চৈনিক রীতি পালন করতে সম্মত হতেন (রাজার সম্মান মর্যাদার প্রশ্ন না তুলে যা তাঁদের করা উচিত ছিল), তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঐ সময়ে তাতার দেশের উত্তর দিক ধরে মস্কোভি থেকে চীন পর্যন্ত একটি স্থল পথ উন্মুক্ত হয়ে যেত। আর

ভুটান দেশ সম্বন্ধে ব্যাপকতর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হোত। কারণ ভুটান রাজ্য তার কাছাকাছি। এই সূত্রে আরও এমন সব রাজ্যের কথা জানা যেত যাদের নামও আমরা জানিনা বলা যায়। সমগ্র ইউরোপবাসীদের পক্ষে তা অপূর্ব কোনও এক সুযোগ এনে দিত।

এখানে মস্কোভির অধিবাসীদের কথা আলোচনা প্রসংগে আর একটি বিষয় স্মৃতি পথে উদিত হোল। তাহচ্ছে যে আমার ভ্রমণ পথে বিশেষতঃ তাব্রিজ ও ইস্পাহানের অন্তবর্তী রাস্তায় অনেক মস্কোভিয় বণিকের সংগে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে বলেছিলেন যে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে মস্কোভির একটি সহরে বিরাশী বছরের এক মহিলার গর্ভে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাকে (পুত্র) মহান ডিউক দেখতে চান। তিনি ওকে দেখে নিজের কাছে রাখেন ও দরবারী রীতিতে তাকে প্রতিপালন করেন।

অধ্যায় ষোল

তিপ্‌রা রাজ্য।

অনেকের এখনও বিশ্বাস যে পেগুরাজ্য চীনদেশের সীমানা নির্দেশ কচ্ছে। আমারও এই ধারণাই ছিল। কিন্তু তিপ্‌রা রাজ্যের ব্যবসায়ীরা আমাকে সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করেছেন। তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দান করেন। কারণ, তাহলে তাঁরা বিশেষ রকমের সম্মান মর্যাদা লাভ করবেন। বস্তুতঃ তাঁরা বণিক সম্প্রদায়ের লোক। তাঁরা এসেছিলেন পাটনা ও ঢাকায়। আমি তাদের সেখানেই দেখেছিলাম। তাঁরা এসেছিলেন প্রবাল, হলদে অম্বর, কচ্ছপের খোলা, সামুদ্রিক শঙ্খ, শামুকের বালা ও অন্যান্য সব খেলনা পুতুল কেনার জন্যে। আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা দিয়েছি যে বাংলা দেশের এই দু'টি স্থানে সেই ব্যবসা চলে।

আমি তাঁদের একজনকে দেখেছি ঢাকায়; আর বাকি দুজনার সংগে দেখা হয়েছিল পাটনাতে। আমি তাঁদের সান্ধ্য ভোজনে আপ্যায়িত করেছিলাম। তাঁরা খুব কম কথা বলেন। হয়ত বা এই কয়েকটি লোকের তা ব্যক্তিগত স্বভাব বৈশিষ্ট্য, না হয়তো তাঁদের দেশের সাধারণ রীতিও ঐ প্রকার হতে পারে। কোনও জিনিস ক্রয় করার সময় তাঁরা ছোট ছোট পাথর কুচোর সাহায্যে দাম পত্রের হিসেব রাখেন। পাথরগুলি হাতের আঙুলের নখের মত সাইজের। তার উপরে সাংকেতিক চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। তাদের প্রত্যেকের একটি করে তুলাদণ্ডের মত পরিমাপ যন্ত্র আছে। তার বাহুদণ্ড দু'টী লোহার নয়। এক প্রকার কাঠের এবং বিশেষ শক্ত পোক্ত যে আংটা দুটোতে ওজন ধরে রাখে, তা উক্ত বাহুদণ্ডের সংগে শক্ত রেশমী সূতার ফাঁসে আটকানো থাকে। এ দিয়ে তারা এক 'ড্রাম' থেকে শুরু করে বৃহত্তর কিছু মাপের ওজন গ্রহণ করতে পারেন।

তিপ্‌রার সমস্ত অধিবাসীরা যদি, আমি যে দু'জন ব্যবসায়ীকে পাটনায় দেখেছি, তাদের মতই হন, তাহলে বলা যেতে পারে যে ও-দেশের মানুষ খুব সুরা প্রেমী। আমি তাদের কখনও সুরাসার, কখনও স্পেনীয় মদ্য ও আরও নানা রকম সুরা, যেমন, সিরাজ; রিম্‌ ও মাস্তয়া পান করতে দিয়ে আনন্দ লাভ করেছি। এইসব জিনিস আমার সমস্ত ভ্রমণ যাত্রায়ই আমার

সংগে থাকতো। তবে আরবের মরুময় অঞ্চলে শেষ বার ভ্রমণ যাত্রায় আমার সংগে কিছুই ছিল না। সেই অঞ্চল অতিক্রম করতে আমার প্রায় পঁয়ষট্টি দিন সময় লেগেছিল। তার কারণ আমি ভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা করেছি।

যাই হোক্, তিপ্‌রার ব্যবসায়ীদের আমি স্বাস্থ্য কামনা করতে তারা আমার প্রদত্ত উত্তম সুরার যে রকম গুণ ব্যাখ্যা করেছেন, সেই রকম যদি তাদের দেশের আয়তন ও আবহাওয়া পরিবেশ সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারতেন তাহলে আমি আরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারতাম। আমার দোভাষী আমার পক্ষ থেকে তাদের অভিনন্দন জানাতেই এবং তখনও তাদের মদ্য পান হয়নি, তারা পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ঠোঁট কামড়াতে শুরু করলেন। আর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে দু তিনবার নিজেদের পেটের উপর হাত দিয়ে আঘাত করলেন। ব্যবসায়ীরা সকলেই এসেছিলেন আরাকান রাজ্যের মধ্যে দিয়ে। আরাকান রাজ্যের অবস্থান হোল তিপ্‌রার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। তার কতকাংশ পেগুর সীমান্তবর্তী। তারা আমাকে বললেন প্রায় পনের দিন সময় প্রয়োজন হয়েছিল তাদের দেশটি অতিক্রম করতে। তাদ্বারাও দেশটির আয়তন বিশেষ স্পষ্টরূপে অনুমান করা যায় না। কারণ স্থানটি অসমতল। সেই অসমান জায়গা কোথাও সুবৃহৎ, কোথাও আয়তনে ক্ষুদ্র। জায়গার ধরণ অনুসারেই জলের উৎস ও সরবরাহ।

তাদের মাল বহন করার পদ্ধতি ভারতবর্ষেরই অনুরূপ। বলদ ও ঘোড়ার ব্যবহার হয় এই কাজে। আমি পূর্বে যেমন বলেছি, তদনুরূপ ওখানকার অশ্বগুলিও আকারে ছোট; তাছাড়া উত্তম ধরণের। রাজা ও বড় বড় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা পালকীতে চড়ে যাতায়াত করেন। তাদের হাতীও আছে। কিন্তু তাদের যুদ্ধ করার শিক্ষা দেয়া হয় না। তিপ্‌রার অধিবাসীরা ভুটানের জনসমাজের অপেক্ষা গলগণ্ড ও দেহের স্ফীতি রোগে কিছু কম আক্রান্ত হন না। আমি শুনেছি যে কিছু সংখ্যক মহিলার বক্ষদেশ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তিপ্‌রাবাসী যে তিনটি লোককে আমি বাংলাদেশে দেখেছিলাম, যাদের একজন ঢাকাতে ছিলেন, তার দেহের দু'টি জায়গায় স্ফীতি ছিল। স্ফীতির আকার এক একটি হাতের মুঠোর মত। এই রোগের আক্রমণ হোত দূষিত জলের জন্যে। এশিয়া ও ইউরোপের নানাস্থানে এই রকম হয়ে থাকে।

বিদেশীদের প্রয়োজনীয় কোনও জিনিস তিপ্‌রাতে উৎপন্ন হয় না। তবে ওখানে একটি স্বর্ণ খনি আছে। তার সোনা অতি নিম্নস্তরের। রেশমী কাপড় যা তৈরী হয় তাও অত্যন্ত মোটা। এই দু'টি জিনিস থেকে রাজা রাজস্ব পান। রাজা তাঁর প্রজাপুঞ্জের কাছ থেকে কোনও কর আদায় করেন না। তবে ইউরোপের সামন্ত প্রথানুযায়ী সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি বছর স্বর্ণ খনিতে বা রেশমের কারখানায় রাজার জন্যে ছয় দিন কাজ করতে হয়। তিনি সোনা ও রেশম, দুই-ই চীনদেশে বিক্রয়ের জন্যে পাঠান। তৎপরিবর্তে তিনি গ্রহণ করেন রূপা। রূপাদ্বারা তিনি মুদ্রা তৈরী করান। তিনি ক্ষুদ্রাকার স্বর্ণ মুদ্রা তৈরী করান তুর্কী মুদ্রার অনুকরণে। স্বর্ণ মুদ্রা হয় দুই প্রকার। এর বেশী আমি সেই দেশটি সম্বন্ধে জানতে পারিনি। দেশটি অদ্যাপি আমাদের কাছে অজানা হয়েই আছে। তবে ভবিষ্যতে হয়ত আরও বেশী জানা যাবে। এই রকম আরও অনেক দেশের কথা জানা যাবে ভ্রমণকারীদের বিবরণ মাধ্যমে। একদিনে সমস্ত কিছু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়না।

অধ্যায় সতের

আসাম রাজ্য।

শ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীর জুমলার কথা আমি মুঘল বংশের ইতিহাস আলোচনা প্রসংগে বহুবার উল্লেখ করেছি। ঔরংজেব যখন ভ্রাতাদের হত্যা করলেন ও পুত্রকে বন্দী অবস্থায় রাখলেন তখন মীর জুমলা তাঁকে মুঘল সিংহাসন অধিকার করতে সহায়তা করবেন এমন আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তদবধি আসাম রাজ্য সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কোনও বিবরণ কারোর জানা ছিল না। মীর জুমলার মনে হয়েছিল যে ভ্রাতৃবিরোধের অবসান হয়েছে। সুতরাং ঔরংজেবের দরবারে তিনি এতদিন প্রধান সেনাপতিরূপে যে সম্মান মর্যাদা পেয়েছেন তা আর থাকবে না। তৎপূর্বে তিনি ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যে সর্বশক্তিমান পুরুষ এবং সেখানে তাঁর অসংখ্য অনুচর ছিল। সুতরাং সৈন্য বাহিনীর উপর নিজ প্রভুত্ব অটুট রাখার উদ্দেশ্যে তিনি আসাম রাজ্য জয় করার সংকল্প করলেন। তিনি জানতেন যে সেখানে তাঁকে বিশেষ কোনও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে না। কারণ সেই সময়ের পূর্বে প্রায় পাঁচ ছয়শত বছরের মধ্যে ও-দেশে কোনও যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। জনসমাজের অস্ত্র চালনা ও যুদ্ধ স· ।র্কে কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ ধারণা আছে যে ঐ দেশেই সুপ্রাচীনকালে সর্ব প্রথম বন্দুক ও বারুদের আবিষ্কার হয়। অতঃপর তা পেগু হয়ে চীনদেশে যায়। এই কারণেই সাধারণতঃ উক্ত জিনিসের আবিষ্কারকরূপে চীনের নাম উল্লিখিত হয়। মীর জুমলা সেই যুদ্ধ শেষে ও-দেশে তৈরী প্রচুর লোহার বন্দুক ও বারুদ সংগ্রহ করে আনেন। ভুটানের মত সেখানকার বারুদের দানা তত বড় ও লম্বা নয়। তা আমাদের দেশের ন্যায় ছোট ও গোলাকার। ও-দেশের বারুদ অন্যান্য দেশের তুলনায় ঢের বেশী জোরদার।

মীর জুমলা ঢাকা থেকে আসাম রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্যে একদল শক্তিশালী সৈন্য নিয়ে যান। ঢাকার প্রায় আট মাইল দূরে একটি নদী প্রবহমানা। ভারতীয় অন্যান্য নদীর মত এরও অনেক নাম। তা হয়ে থাকে যে সব অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হয় তার নামানুসারে। এর একটি শাখা গঙ্গা নদীতে গিয়ে মিশেছে। সেই সংগমস্থলের দুই তীরেই কেল্লা

আছে। তাতে ব্রোঞ্জের উৎকৃষ্ঠ কামান স্থাপিত। জলের ঠিক উপরিভাগ দিয়েই কামান দাগা চলে। সেখানেই মীর জুমলা নৌকায় আরোহণ করেন। যেখানে আসামের শেষ সীমানা চিহ্নিত তাঁর সৈন্যদলও নদীপথে তদবধি এগিয়ে যান। তারপর তারা এমন একটি অঞ্চল ধরে অগ্রসর হন যেখানে জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়। অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের আত্মরক্ষার তেমন কিছু ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া সেই আক্রমণও হয়েছিল খুব আকস্মিক ভাবে। স্থানীয় অধিবাসীরা ছিলেন হিন্দু। আর অভিযানকারীরা সকলেই মুসলমান। কাজেই হিন্দুদের একটি মন্দিরও রক্ষা পায়নি। মন্দির দেখলেই সৈন্যরা তাকে ধূলিসাৎ করেছে। তা করেছিল ভেঙ্গে চুড়ে বা আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

মন্দিরাদি ধ্বংসের পরে মীর জুমলা জানতে পারলেন যে আসামের রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন আশাতীত সুবৃহৎ সৈন্যবাহিনী সহ। রাজার সঙ্গে ছিল বহু সংখ্যক বন্দুক, প্রচুর আতসবাজী বা আমাদের ছোট বোমার মত সব জিনিস। বোমাগুলি ছোট ছোট লাঠির মাথায় আটকানো ছিল। মীরজুমলা এই সংবাদ পেয়ে আর এগিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তবে তাঁর প্রত্যাবর্তনের মুখ্য কারণ তখন শীতকাল আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সমগ্র দেশটি অধিকার করতে হলে ৪৫° ডিগ্রী অক্ষাংশ পর্যন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হোত। তা করলে তাঁর অনেক সৈন্যের প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। ভারতীয়রা এত শীতকাতর যে তাদের পক্ষে ৩০° কি বেশী ৩৫° ডিগ্রী পর্যন্ত যাওয়াও অসম্ভব হয়ে ওঠে। তা জোর করে করতে গেলে প্রাণহানিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। আমি ভারতবর্ষ থেকে যে সকল ভৃত্যকে পারস্য দেশে নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের পক্ষে ক্যাসবিন পর্যন্ত যাওয়াই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাদের একজনাকেও তাব্রিজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি। তারা মিডিয়ার পর্বত মালাকে তুষারাচ্ছন্ন দেখেই ঘাবড়ে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ তাদের স্বদেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

মীরজুমলাও আর উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে কোচহাজো নামে একটি সহর অবরোধ করেন। অতি অল্প সময়ে তিনি সহরটি অবরোধ করতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি প্রচুর ধন সম্পদ পেয়েছিলেন। অনেকের ধারণা যে তাঁর মৌল পরিকল্পনাই ছিল

সেই সহরটি অধিকার করা ও বিধ্বস্ত করা। তার বেশী আর কিছু নয়। অতঃপর প্রত্যাগমন করার সংকল্প ছিল। বাস্তবেও তিনি তাই করেছিলেন। কোচহাজোতেই আসামের রাজন্যবর্গ ও রাজপরিবারের সকলের সমাধি সৌধ অবস্থিত। অসমীয়ারা হিন্দু হলেও মৃতদেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করেন না। ভূগর্ভে সমাধিস্থ করেন। তাদের বিশ্বাস মানুষ মৃত্যুর পরে অন্য আর একটি জগতে চলে যান। যারা ইহজীবনে সৎভাবে দিন যাপন করেন, তারা পরলোকে গিয়ে সর্ববিধ সুখ সম্পদের অধিকার লাভ করেন। আর তারা এই জাগতিক জীবনে অন্যায় পথে চলেন, পরস্ব অপহরণ করেন, তারা মৃত্যুর পরে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন, বিশেষতঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণায়। অতএব, তাদের সমাধি শয়নে শায়িত করে তৎসংগে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেবার প্রথা আছে। মনে করা হয় তা দিয়ে তারা পরজীবনে প্রয়োজন মেটাতে পারবেন।

এই কারণেও মীর জুমলা কোচহাজোতে অনেক ধনরত্ন পেয়েছিলেন। বহুশতাব্দী ব্যাপী প্রতিটি রাজা নিজের জন্য সুবৃহৎ সমাধি সৌধ অর্থাৎ মন্দিরের মত একটি আগার নির্মাণ করাতেন। সেখানেই তাঁদের মৃত দেহ সমাহিত করা হোত। তাঁরা সকলেই জীবদ্দশায় সেখানে জমা রাখার জন্যে কিছু পরিমাণে সোনা-রূপা, গালিচা ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতেন। কোনও রাজার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সময় তাঁর সমস্ত মূল্যবান মনিরত্ন ও তিনি পূজা করতেন যে স্বর্ণ বা রৌপ্যময় দেব বিগ্রহ তাও সমাধি গর্ভে স্থাপিত হোত। ধারণা যে পরলোকে সেই সকল জিনিস তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে।

এই প্রসংগে সবচেয়ে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার হোল, যাকে বর্বরোচিত বললেও অত্যুক্তি হয় না, যে কোনও রাজার মৃত্যু হলে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীরা এবং দরবারের মুখ্য কর্মচারীরা সকলে আত্মহত্যা করেন কিছু বিষাক্ত রস বা ক্বাথ খেয়ে। এর কারণ, তাঁরা মনে করেন যে পরলোকে গিয়ে তাঁরা রাজাকে সেবা করতে পারবেন। ধনসম্পদ ব্যতীত একটি হাতী, বারোটি উট, ছয়টি ঘোড়া ও প্রচুর ক্রীড়াকুশল কুকুরও রাজার দেহের সংগে সমাধিস্থ হয়। এই ব্যাপারেও তাদের বিশ্বাস এই যে পশু প্রাণীগুলি পরলোকে গিয়ে পুর্নজীবিত হবে এবং সেখানে থেকে রাজাকে সেবা করবে।

এশিয়া খণ্ডে আসাম একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য। মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস সেখানে পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী কোন স্থান থেকে কিছু

সংগ্রহ করতে হয় না। যেমন ধরুন, সোনা, রূপা, ইস্পাত, সীসা ও লোহার খনি আছে ওখানে। প্রচুর রেশম উৎপন্ন হয়। তবে তা মিহি বা সূক্ষ্ম নয়। ওখানে এক প্রকার রেশম হয়, যার উৎপত্তিস্থল গাছ। সাধারণ রেশম পোকার মত এক প্রকার পোকা গাছে জন্মায়। গুটি পোকার চেয়ে তা গোলাকার। সারা বছর সেগুলি গাছেই থাকে। সেই রেশম দেখতে খুব উজ্জ্বল ও চমৎকার। কিন্তু টেকসই নয়। অল্পদিন পরেই ফেটে যায়। রাজ্যের দক্ষিণ অংশে এই রেশম উৎপন্ন হয়। সোনা রূপার খনিও দক্ষিণ খণ্ডে। এই রাজ্যে গালা জন্মায় প্রচুর। গালা ওখানে দুই প্রকার। গাছে যা জন্মায় তা লাল রঙ-এর। তাদ্বারা সূতী বস্ত্র ও অন্যান্য কাপড় চোপর রঞ্জিত করা হয়। লাল রঙ্ নিষ্কাশনের পরে মূল গালা দিয়ে টেবিল, বাক্স ও আরও অনেক জিনিস এবং স্পেনীয় মোম তৈরী হয়। এই গালা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়ে যায় চীন ও জাপানে। সেখানেও তা দিয়ে বাক্স. টেবিল ইত্যাদি তৈরী হয়। এই জাতীয় জিনিস তৈরীর ব্যাপারে আমাদের লাল গালা হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

সোনা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তা কেউ রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না এবং তাদ্বারা মুদ্রা তৈরী করাও চলবে না। ছোট বড়, দুই রকমে সোনাকে টুকরো করে রাখা হয়। তাদ্বারাই জনসমাজ স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্য চালান। তাও অন্যত্র নিয়ে যাবার অনুমতি নেই। তবে রাজা রূপা দিয়ে টাকার ওজনে মুদ্রা তৈরী করান। তার আকার অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং তা রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলে।

রাজ্যটিতে জীবনযাত্রার উপযোগী সমস্ত জিনিস যে পাওয়া যায় তা আমি পূর্বেও বলেছি। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর মধ্যে কুকুরের মাংস বিশেষ সমাদরের জিনিস এবং ভোজপর্বে এর স্থান অতি উচ্চে। রাজ্যের প্রতি সহরে কেবলমাত্র কুকুর বিক্রীর জন্যেই বাজার বসে। সেখানে রাজ্যের নানা অংশ থেকে কুকুর আমদানী হয়। আসামে দ্রাক্ষা ও সাধারণ আংগুরও জন্মায় যথেষ্ট। তবে তা দিয়ে সুরা তৈরী হয় না। আংগুর শুকিয়ে কেবল আসব নিষ্কাশন করেন। লবণ জিনিসটি এ-রাজ্যে নেই। সামান্য কিছু তৈরী করার চেষ্টা হয়। আর তা দুই প্রকারে। আবদ্ধ জলে যে উদ্ভিদ জন্মায় তা সংগ্রহ করে এই কাজ করা হয়। সেই উদ্ভিদ ও গুল্ম পাঁতিহাস ও ব্যাঙের খাদ্য। দ্বিতীয় প্রকারে নূন তৈরী করার পন্থা অতি সাধারণ। আমরা যাকে

আদমের ডুমুর গাছ বলি সেই ধরণের ডুমুর পাতাকে শুকিয়ে তারপরে পোড়ানো হয়। উহার ছাই-এর মধ্যে এক প্রকার লবণ পাওয়া যায়। তবে তা এত উগ্র যে তাকে আরও সিদ্ধ করতে না পারলে খাওয়া যায় না। স্নিগ্ধ করার নিয়ম এই :

ছাইগুলিকে জলে ভিজিয়ে দশবার ঘণ্টা নাড়াচাড়া করতে হয়। তারপর সেই ভস্মমিশ্রিত জলকে তিনবার কাপড় দিয়ে ছেঁকে নেবার নিয়ম। ছাঁকা হয়ে গেলে সেই জলকে আবার ফোটানোর প্রথা। ফোটাতে ফোটাতে তলানি ক্রমশঃ ঘন হয়ে ওঠে। জল সব শুকিয়ে গেলে পাত্রটির মধ্যে সাদা নুন জমাট বাঁধে। আর তা বেশ সাদা।

ডুমুর পাতার ছাই থেকে ও-দেশে এক প্রকার ক্কাথ তৈরী হয়। তাকে জলে মিশিয়ে তাতে রেশমী কাপড় সিদ্ধ করলে তা একেবারে তুষার শুভ্র হয়ে ওঠে। আসামে আরও ডুমুর গাছ থাকলে দেশবাসীরা সমস্ত রেশমী কাপড়কে শ্বেত শুভ্র করে তুলতে পারতেন। সাদা রেশম অন্যান্য সিল্কের তুলনায় ঢের বেশী মূল্যবান। কিন্তু ওখানে ডুমুর গাছ যা জন্মায় তাতে রাজ্যে রাজ্যে উৎপন্ন রেশমের অর্ধেক আন্দাজ সাদা করা যায়।

আসামের রাজা যেখানে বাস করেন সেই স্থানটির নাম কামরূপ। এই নামের পূর্বতন রাজধানী থেকে বর্তমান রাজধানীর দূরত্ব প্রায় বিশ পঁচিশ দিনের যাত্রা পথ। রাজা তাঁর প্রজাদের কাছে কোনও কর দাবী করেন না। কিন্তু দেশে সোনা, রূপা, সীসা ও লোহার যত খনি আছে তার মালিক রাজা। প্রজাদের উপর যাতে পীড়ন না হয় সেইজন্যে তিনি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে ক্রীতদাস এনে খনিতে কাজে লাগান। অতএব, আসামের সমস্ত কৃষকেরই জীবন সুখসাচ্ছন্দ্যময়। এমন কৃষক খুব কমই দেখা যায় যার জমি জায়গার মাঝখানে নিজস্ব একটি বাড়ী নেই। সেখানে গাছপালার মধ্যে একটি জলাশয়ও থাকে। অধিকাংশ চাষী গেরস্থ তাদের পরিবারের জন্যে হাতী পোষেন।

ভারতীয় হিন্দুদের মত নয়, এ-রাজ্যের হিন্দুরা চারটি পর্যন্ত বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ করে স্ত্রীকে বলেন,—"আমার গৃহে এসে তুমি আমাকে সেবা করবে, এইজন্যই তোমাকে নিয়ে এলাম"। দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তিনি আবার বলবেন,—"আমি তোমাকে অন্যান্য কাজে নিয়োগ করলাম"—ইত্যাদি।

সুতরাং প্রতিটি স্ত্রীর জানা থাকে যে সংসারে তার করণীয় কি। নারী-পুরুষ উভয়েরই চেহারা উত্তম, দেহের রঙ্ ভাল। তবে দক্ষিণ প্রান্তের অধিবাসীদের গাত্রবর্ণ খানিকটা কালচে (জলপাই রঙ্-এর)। উত্তর অঞ্চলীয়দের মত এদের গলগণ্ড বা দেহের কোথাও স্ফীতি রোগ হয় না। দক্ষিণ অংশের জনসমাজের দৈহিক গঠনও তত ভাল নয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের নাক চ্যাপ্টা। দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ নগ্ন দেহে ঘুরে বেড়ান। কেবল এক খণ্ড ছোট সূতী কাপড় দিয়ে কোনও রকমে লজ্জা নিবারণ করেন। মাথায় কিন্তু বিলিতী টুপির মত একটি টুপি পরা চাই। তার কিনারা ধরে ঝোলানো থাকে শূকরের দাঁত। তারা এমনভাবে কর্ণবেধ করেন যে সেই ফাঁকার মধ্যে দিয়ে আংগুল গলিয়ে দেয়া যায়। অনেকে কানে সোনা বা রূপার গহনা পরেন। পুরুষের চুল কাঁধের নীচে পর্যন্ত নেমে আসে। রমণীদের কেশপাশ যত বড় ও দীর্ঘ হয় ততই স্বাভাবিক ও সুন্দর বিবেচিত হয়।

আসাম ও ভূটান—দুই রাজ্যেই কচ্ছপের খোলার বালা ও সামুদ্রিক শঙ্খের ব্যবসায় চলে বিশেষ জোরালো ভাবে। গোলাকার সব জিনিস তৈরী হয়। তবে ধনী সমাজ বালা ব্যবহার করেন প্রবাল ও হলদে অম্বর পাথরের। কারো মৃত্যু হলে তার সমস্ত আত্মীয় বন্ধুরা সমাধিদানের সময় সমবেত হন। মৃতদেহ সমাহিত করার সময় সমবেত ব্যক্তিরা নিজেদের দেহের সমস্ত অলঙ্কার অর্থাৎ বালা, মল ইত্যাদি খুলে মৃতের সংগে ভূগর্ভে জমা করে রাখেন।

অধ্যায় আঠার

শ্যাম দেশের কথা।

শ্যাম দেশের অধিকাংশস্থলের অবস্থান শ্যাম উপসাগর ও বঙ্গোপ-সাগরের মধ্যস্থানে। দেশটির উত্তরে পেগু, আর দক্ষিণে মালাক্কা উপদ্বীপ। ইউরোপীয়দের পক্ষে ও-দেশে যাবার সর্বোত্তম ও সংক্ষিপ্ততম রাস্তা হোল, প্রথমে ইস্পাহান থেকে অর্মাসে গিয়ে সুরাট যেতে হবে। তারপর সুরাট থেকে গোলকুণ্ডা। গোলকুণ্ডা থেকে যেতে হবে মসলিপট্টমে। সেখানে টেনাসেরিমে যাবার জাহাজ পাওয়া যায়। টেনাসেরিম শ্যাম দেশের একটি বন্দর। ওখান থেকে রাজ্যের নামানুগ রাজধানী প্রায় পঁয়ত্রিশ দিনের যাত্রাপথ। এই রাস্তার একটি অংশ নদী পথ, বাকিটা গাড়ীতে বা হাতীর পিঠে চেপে যেতে হয়। জল ও স্থল দুই পথই বিঘ্ন সংকুল। স্থলপথে সর্বদাই বাঘ-সিংহের উপদ্রব। আর নদীর জল এত খরস্রোতা যে যন্ত্রের সাহায্যে নৌকা চালানোও অত্যন্ত দুরূহ।

একবার আমার ভারত ভ্রমণের পরে প্রত্যাবর্তনকালে আমি এই পথের নির্দেশ দিয়েছিলাম তিনজন বিশপকে। তাঁদের সংগে আমার দেখা হয় ইস্পাহানে। দ্বিতীয় জন হলেন মেটে লোপলিসের বিশপ। তাঁর সংগে আমার পরিচয় হয়েছিল ইউফ্রেটিস পার হবার সময়। তৃতীয় বিশপটি হেলিওপোলিসের। আমি যখন ইউরোপের জন্যে আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করবো ঠিক তখন তিনি গিয়ে সেখানে পৌঁছোন।

সমগ্র শ্যাম দেশেই ধান ও ফল জন্মায়। আম এবং আরও অন্যান্য সব ফলের উৎপাদন হয়। বনভূমিসমূহ হরিণ, হাতী, বাঘ, গণ্ডার ও বানরে পরিপূর্ণ। সর্বত্র দেখা যাবে বাঁশের ঝাড়। বাঁশগুলি লোহার মত শক্ত এবং অতিকায়। শাখা প্রশাখা অত্যন্ত দীর্ঘ বাঁশের ভেতর সব ফাঁপা।

বাঁশের ডালপালার ডগায় মানুষের মাথার মত সাইজের বাসা ঝোলানো থাকে। পিঁপড়েরা মাটি তুলে নিয়ে গিয়ে সেই বাসা তৈরী করে। বাসাগুলির নীচের দিকে ছোট একটি গর্ত থাকে। তার মধ্যে দিয়ে পিপঁড়েগুলি ভেতরে প্রবেশ করে। মৌমাছির মত ওদেরও প্রত্যেকের আলাদা কুঠরী আছে সেই বাসার মধ্যে। বাঁশের ডগায় বাসা তৈরী করার

কারণ হোল বর্ষাকালে মাটিতে বাসাগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ওখানে বর্ষাকালের স্থায়িত্ব চার পাঁচ মাস। সমগ্র দেশ তখন জল মগ্ন হয়ে থাকে। রাত্রিতে সাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। এমন সাপ আছে যা বাইশ ফুট লম্বা ও দুমুখো। লেজের মাথায় যে মুখটি তা কখনও খোলেনা। তার কোন গতিশক্তি নেই। শ্যামদেশে অত্যন্ত বিষধর আর একটি প্রাণী আছে। তা এক ফুটের বেশী লম্বা নয়। উহার লেজ কণ্টকময় ও তাতে দুটি সূক্ষ্মাগ্র আছে।

শ্যামদেশের নদীগুলি অতি সুন্দর। একটি নদী দেশ জুড়ে সর্বত্র প্রায় একই আকারের। তার জল খুব স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ওর মধ্যে বিরাট সব কুমীরের বাস। অসতর্ক মানুষকে ওরা প্রায়ই গিলে ফেলে। সূর্য উত্তরায়ণে গেলে নদীগুলিতে বান আসে। তাতে মাটি খুব উর্বরা হয়ে ওঠে। জল স্বাভাবিক ভাবেই সব জমিতে ওঠে, আবার নেমে আসে। প্রকৃতির তা এক অদ্ভুত অবদান। বন্যার ফলে যখন ক্ষেত খামার ভরে যায় তখন ধানের শীষ জলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

রাজ্যের রাজধানীর নামও শ্যাম। রাজার সাধারণ আবাস প্রাচীর বেষ্টিত। রাজধানীর আয়তন প্রায় পাঁচ মাইল। তা একটি দ্বীপে অবস্থিত। চারদিকে নদী প্রবাহমানা। রাজার দেব মন্দিরে যে অপরিমেয় সোনা মজুত আছে তার সামান্য অংশ ব্যয় করলে অতি অনায়াসে সমস্ত রাস্তার পাশ ধরে খাল খনন করা যেতে পারে।

শ্যামবাসীদের ভাষায় বর্ণমালা আছে তেত্রিশটি। তাঁরা আমাদের মতই বা-দিক ধরে লিখতে শুরু করেন, এবং উপর থেকে নীচে এগিয়ে যান। জাপান, চীন, কোচিন চীন ও টন্‌কিনের লোকেদের মত তাঁরা ডান দিক ধরে লেখা আরম্ভ করেন না।

দেশের সাধারণ মানুষ রাজার কাছে বা সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তিদের অধীনে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। মহিলারাও পুরুষের মত চুল কেটে ফেলেন। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধে। শ্যামবাসীদের ভদ্রতাবোধ ও সৌজন্যমূলক যে সকল আচরণবিধি প্রচলিত আছে তন্মধ্যে একটি হাল যে শ্রদ্ধেয় কারোর সামনে দিয়ে কেউ কখনও এগিয়ে চলে যাবেন না। যদি যাবার একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহলে করজোড়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে তবে যাবেন। ধনী ব্যক্তিরা বহু বিবাহ করেন। এই প্রথাটি আসাম রাজ্যের অনুরূপ

দেশের মুদ্রা রৌপ্য নির্মিত এবং আমাদের ছোট বন্দুকের বুলেটের মত। ক্ষুদ্রতম মুদ্রার কাজ চালানো হয় ছোট ছোট কড়ির মাধ্যমে। তা আমদানী হয় ম্যানিলা থেকে। শ্যামদেশে উৎকৃষ্ট টীনের খনি আছে।

প্রাচ্য দেশীয় রাজাদের মধ্যে শ্যামের শাসক সর্বাপেক্ষা ধনী। তাঁর রাজকীয় অনুশাসনে তিনি নিজেকে স্বর্গমর্ত্যের রাজারূপে উল্লেখ করেন। অথচ তিনি কিন্তু চীন সম্রাটের অধীনস্থ। খুব কচ্চিৎ কখনও তিনি প্রজাদের দর্শন দান করেন। দরবারের মুখ্য ব্যক্তিদের সংগেই মাত্র তিনি দেখা শোনা করেন ও কথাবার্তা বলেন। তাঁর প্রাসাদে কোনও বিদেশী আগন্তুকের প্রবেশ নিষেধ। মন্ত্রীদের হাতেই তিনি শাসনভার ন্যস্ত করে আছেন। তার ফলে মন্ত্রীরা তাঁদের দায়িত্ব ও অধিকার অনেক সময় অসদ্ব্যবহার করেন। রাজা জনসমক্ষে বছরে দু'বার আত্মপ্রকাশ করেন। আর তা করেন বিশেষ জাঁকজমক সহকারে। প্রথমবার তিনি বের হন সহরের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরে যাবার জন্যে। সেই যাত্রাটি নিষ্পন্ন হয় প্রকৃত রাজোচিত পদ্ধতিতে। মন্দিরের শিখর অন্দরে ও বাইরে গিল্টী করা। সেখানে তিনটি দেবমূর্তি আছে। প্রতিটি মূর্তি ছয় সাত ফুট লম্বা। ভাল ভাল সোনা দিয়ে তা তৈরী।

গরীব দুঃখীদের ভিক্ষাদান করে ও পুরোহিত, পূজারীদের উপহারাদি দিয়ে তিনি মনে করেন যে তাঁদের কাছে তিনি প্রিয় হয়ে ওঠেন। রাজা যখন মন্দিরে যান, তখন সমস্ত দরবারী কর্মচারীরা তাঁর সংগে যান। সেই সময় রাজা তাঁর যাবতীয় ধন ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন। রাজৈশ্বর্যের নানাবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে একটি হচ্ছে হাতী পোষা। শ্যাম দেশে দু'শত হাতী আছে। তাদের মধ্যে একটি শ্বেতকায়। সেই হাতীটির প্রতি রাজার এত অনুরাগ ও আকর্ষণ যে তিনি নিজেকে "শ্বেত হস্তীর রাজা" রূপে আখ্যাত করেন। তাতে তিনি অত্যন্ত গৌরবান্বিত বোধ করেন। আমি অন্যস্থানেও বলেছি যে হাতী বহু শতাব্দী জীবিত থাকে।

রাজার দ্বিতীয়বার বহির্গমন হয় আর একটি মন্দির দর্শনের সময়। সেই মন্দিরটি সহর থেকে প্রায় নয় দশ মাইল দূরে নদীর তীরে অবস্থিত। স্বয়ং রাজা ও তাঁর খাস পুরোহিতগণ ব্যতীত আর কোনও লোক সেখানে প্রবেশ করতে পারেন না। সাধারণ লোক মন্দিরের দ্বারদেশে গিয়ে প্রণতি জ্ঞাপন করেই তৃপ্ত হন। মন্দির দর্শনকালে রাজা দুশত অপূর্ব গিল্টী করা ও কারু-

কার্য মণ্ডিত সুদীর্ঘ নৌবহর নিয়ে নদীবক্ষে আবির্ভূত হন। দাড়ি-মাঝি থাকে চারশত। রাজার এই দ্বিতীয় ভ্রমণ পর্ব নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তখন নদীর জল হ্রাস পেয়ে যায়। পুরোহিতরা সাধারণের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে রাজাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই মন্দিরে পূজা অর্ঘ্যদান করলে নদীর জল স্রোতের গতি রুদ্ধ হতে পারে। সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা আরও মনে করেন যে রাজা তাঁর তলোয়ার দিয়ে জলকে দ্বিখণ্ডিত করেন এবং হুকুম প্রদান করেন সমুদ্রে চলে যেতে।

সেই যাত্রায়ই রাজা আর একটি মন্দিরে যান। কিন্তু তখন কোনও রাজোচিত ঐশ্বর্য ও মহিমার প্রকাশ করেন না। মন্দিরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। সেখানে ওলন্দাজদের ফ্যাক্টরী আছে। মন্দিরের দ্বার দেশে একটি মূর্তি আছে আমাদের দেশের দর্জীর ভঙ্গীতে। অর্থাৎ একটি হাত হাটুতে ন্যস্ত, অপরটি পাশে ঝোলানো (সম্ভবতঃ বুদ্ধ মূর্তি)। মূর্তিটি ষাট ফুটেরও বেশী উঁচু। সেই বিশাল মূর্তির চারদিকে আছে নানা ভঙ্গীর স্ত্রী ও পুরুষের তিনশতাধিক মূর্তি। সমস্ত মূর্তি গিল্টী করা। সমগ্র দেশব্যাপী এই জাতীয় মন্দির আছে যার সংখ্যা দেখলে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। এর কারণ, শ্যামদেশে এমন কোনও ধনী ব্যক্তি নেই যিনি নিজের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি মন্দির নির্মাণ না করান। সেই সকল মন্দির শিখর সমন্বিত ও ঘণ্টা যুক্ত। দেয়ালের ভিতরাংশ গিল্টী করা ও সুচিত্রিত। কিন্তু গবাক্ষরাজি এত ছোট ও সরু যে আলো প্রবেশ করে না। বেদীতে আছে অত্যন্ত মূল্যবান বিগ্রহ মূর্তি। তাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটি ভিন্ন সাইজের মূর্তি দেখা যায় পাশাপাশি।

আমার আলোচিত যে দু'টি মন্দিরে রাজা রাজসমারোহে পূজা অর্ঘ্য দিতে যান তাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে আরও সব রমনীয় মন্দির। এদের প্রতিটি অতি চমৎকার ভাবে গিল্টী করা। দ্বীপে অবস্থিত মন্দিরের কাছেই ওলন্দাজদের কুঠী। তার চতুর্দিক দেয়াল ঘেরা। তোরণটি অতি সুন্দর। বেষ্টিত স্থানের কেন্দ্রস্থলে বিরাট মন্দির। তার অভ্যন্তরভাগ পুরো গিল্টী করা। মূল দেব পীঠের সামনে একটি প্রদীপ ও তিনটি মোমবাতি জ্বলে। বেদীর উপরে দেবমূর্তি স্থাপিত। তাদের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্বর্ণ মণ্ডিত। বাকিগুলি তামার উপরে গিল্টী করা। সহরের কেন্দ্রে যে মন্দিরটি অবস্থিত এবং রাজা যেখানে বছরে একবার যান, তাতে প্রায় চার হাজার মূর্তি আছে।

শ্যাম সহর থেকে মন্দিরের দূরত্ব নয় মাইল। তারও চারদিকে প্রচুর ছোট মন্দির। এই সকল মন্দিরের গঠনসৌকর্য দেখে এবং দেশীয় মানুষের অদ্ভুত শ্রমসাধনার প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হতে হয়।

রাজা বাইরে বেরোলে সমস্ত বাড়ী ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করতে হবে। প্রতিটি নাগরিককে ভূপাতিত হয়ে তাঁকে প্রণতি জানাতে হয়। রাজার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস কারো হয় না। রাজা যখন রাস্তা ধরে এগিয়ে যান তখন কোনও লোক উচ্চাসনে বসে থাকতে পারবেন না। কাজেই বাড়ী ঘরের সকলে রাস্তার পাশে বা উন্মুক্তস্থানে নেমে আসবেন। রাজার চুলকাটার কাজ করেন তাঁর পত্নীদের মধ্যে একজন। কারণ কোন ক্ষৌর-কারের রাজার দেহ স্পর্শ করার অনুমতি নেই।

বর্তমান রাজা অতি মাত্রায় হস্তী প্রেমী। তিনি এত আগ্রহ ও নিষ্ঠা-সহকারে হাতী পোষেন যে দেখে মনে হয় যেন ওরা তাঁর রাজ্যের এক একটি বিভূষণ। হাতীগুলি অসুস্থ হলে দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ওদের অপরিসীম যত্ন ও তত্ত্বাবধান করেন রাজার প্রীতি উৎপাদনের জন্যে। একটি হাতীর মৃত্যু হলে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এমন সমারোহে সম্পন্ন হয় যেন রাজ্যের কোনও অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরলোক গমন করেছেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের শেষ কৃত্য সম্পাদিত হয় নিম্নানুগ পদ্ধতিতে।

নলখাগড়া দিয়ে একটি সমাধি সৌধের মত তৈরী হয়। তার দুইপাশ নানা রঙ্-এর কাগজে আবৃত থাকে। সব রকম সুগন্ধ কাঠ ওজনদরে বিক্রী হয়। মৃতদেহের ওজনের সমতুল্য কাঠ কিনে সৌধটির মধ্যস্থলে স্তূপীকৃত করার প্রথা। অতঃপর পুরোহিত কিছু মন্ত্রস্তুতি আবৃত্তি করলে সমস্ত কিছু পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেন। ধনী লোকের মৃতদেহ ভস্মীভূত হলে খানিকটা ভস্ম সোনা বা রূপার পাত্রে রক্ষণের প্রথা আছে। আর দরিদ্র জনসমাজের দেহ-ভস্ম বাতাসে উড়িয়ে বিলীন করা হয়। যে সকল অপরাধী ব্যক্তিরা নিজেদের জীবন নানা হীন উপায়ে অবসানের দিকে নিয়ে যান, তাদের দেহ অগ্নিতে দাহ করা হয় না। তা ভূগর্ভে হয় সমাহিত।

পতিতা নারীরা রাজার অনুমোদন লাভ করলেও তাদের বাসস্থানের জন্যে ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে। তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার জন্যে রাজার পক্ষে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকেন। উক্ত নারী সমাজের কারোর মৃত্যু হলে সম্ভ্রান্ত নারীদের মত তাঁর দেহ দাহ করা হয় না। তা কোনও

উন্মুক্তস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে তা কাক ও কুকুরের খাদ্যে হয় পরিণত।

শ্যাম রাজ্যে সম্ভবতঃ দুই লক্ষেরও অধিক পুরোহিত (বোঞ্জি) আছেন। রাজদরবার ও জনসমাজ—দুই এর কাছেই তাঁদের স্থান অত্যন্ত উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার। স্বয়ং রাজাও কিছু সংখ্যক পুরোহিতকে এত ভয় ও সম্মান করেন যে তাঁদের সামনে নিজেকে অতি দীন হীন ও বিনীত প্রমাণ করে থাকেন। এই ধরণের অসীম শ্রদ্ধা লাভ করার ফলে তাঁদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাও হয়ে ওঠে সীমাহীন। কোন কোনও সময় তাঁদের উচ্চাভিলাষ এমন পর্যায়ে ওঠে যে সিংহাসন লাভের দিকেও তাঁরা ঝুঁকে পড়েন। তবে সে বিষয় রাজার গোচরীভূত হলে তাঁদের প্রাণ রক্ষা করা দুরূহ হয়ে ওঠে। কিছুকাল পূর্বে একটি বিদ্রোহাত্মক ঘটনার পুরোভাগে ছিলেন জনৈক পুরোহিত। রাজা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পুরোহিতগণ (বৌদ্ধভিক্ষু) হলদে কাপড় ব্যবহার করেন। কোমরে পরেন লালকাপড়ের কোমর বন্ধ। বাহ্যতঃ তাঁরা অত্যন্ত নম্র ও বিনীত। কখনও তাঁদের মধ্যে সামান্যতম ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও লালসার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। ভোর চারটের ঘণ্টা ধ্বনিতে তাঁরা জেগে ওঠেন প্রার্থনা-বন্দনার জন্যে। সন্ধ্যা সমাগমেও তদনুরূপ মন্ত্র-স্তোত্র আবৃত্তি করেন। বছরে কয়েকটি দিন ধার্য আছে যখন সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সংগে কোনও আলাপ-আলোচনা চলে না। ভিক্ষু পুরোহিতদের অনেকে অপরের দান গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অনেকে আবার বৃত্তিস্বরূপ গৃহ-আবাস পেয়ে থাকেন। একবার ভিক্ষুর পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করলে তাঁরা আর বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারেন না। বিবাহ করার ইচ্ছা হলে সেই হলদে পোষাক ত্যাগ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় নিজেদের ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ।

এঁরা নিজেদের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানেন না। একটি বিষয় স্পষ্ট মনে হচ্ছে যে ভারতীয় হিন্দুদের ন্যায় এঁরাও আত্মার বহু দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করেন। প্রাণীহত্যা তাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে পশুর মাংস খেতে কোনও আপত্তি বা দ্বিধা নেই। তা অন্য লোকে হনন করলে বা তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সে মাংস তাঁরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। যে দেবতার পূজা-উপাসনা তাঁরা করেন তা যেন অস্পষ্ট একটি অপচ্ছায়ানুরূপ।

তাঁর সম্বন্ধে এঁরা যা বলেন, তা যেন অন্ধ বিশ্বাসপ্রসূত। নিজেদের অতি স্থূল রূপের ভুল ত্রুটীগুলি সম্পর্কেও এরা এত অনমনীয় ও অন্ধ যে তা সংশোধন করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা বলবেন; খৃষ্টধর্মের দেবতা ও তাঁদের দেবতা ভাইভাই। তবে তাঁদের দেবতা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে তাঁদের দেবতা কোথায় আছেন, তাহলে তাঁরা উত্তর দেবেন, তিনি অদৃশ্য। কোথায় আছেন তা কেউ জানেন না।

রাজ্যের স্থায়ী সৈন্যবাহিনীতে পদাতিকের সংখ্যা অধিক। আর তা বেশ উৎকৃষ্ট ধরণের। সৈন্যদের ক্লান্তি বলে কিছু নেই। তাঁদের যাবতীয় পোষাকের মধ্যে থাকে দেহের মধ্য অংশ আবৃত করার মত একখণ্ড সূতী বস্ত্র। বাকী দেহাংশ সব, অর্থাৎ বুক, পিঠ. বাহুদ্বয়, উরুদেশ অনাবৃত থাকে। দেহের চামড়া সূচীবিদ্ধ করে চিত্রায়িত। সেখানে রক্ত নিষ্কাশিত হলে পরে নানারকম নক্সা ফুটে ওঠে। দেহের চামড়া সূচীবিদ্ধ করে ফুল ও নানা প্রাণীর চিত্র খোদিত করার পরে তার যে রঙ পছন্দ সেই রঙ-এর প্রলেপ দেবার প্রথা। দূরে থেকে সেই সৈন্যদের দেখলে মনে হবে যে তারা হয়ত ফুলকারী রেশমী কাপড় বা ছাপানো সূতী বস্ত্রে দেহাবৃত করে আছেন। তাদের অস্ত্র হোল তীর ধনুক, ছোট বন্দুক, বর্শা এবং আরও একটি জিনিস। সেটি হোল পাঁচ ছয় ফুট লম্বা একটি দণ্ডের মাথায় লোহার ফলক। তা শত্রুর দিকে ছুড়ে মারার নিয়ম।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্যামসহরে জনৈক নেপল্‌সবাসী জেসুইট ছিলেন। নাম তাঁর ফাদার টমাস। তিনি রাজধানী ও প্রসাদকে সুরক্ষিত করে দিয়েছিলেন। প্রসাদটির অবস্থান নদীতীরে। তিনি পূর্বেই নদীর দুই তীরে দুর্গশীর্ষের বহিরাংশ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই সকল কাজের জন্যে তিনি সহরে বাসকরার অনুমতি লাভ করেন। তিনি সেখানে বাসগৃহের সংগে ছোট একটি গীর্জা নির্মাণ করান। বেইরুটের বিশপ এম্‌. ল্যাম্বার্ট শ্যাম দেশে থাকার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুজনার মধ্যে সদ্ভাব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তার ফলে বিশপ আলাদা আর একটি ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করাই সমীচীন মনে করলেন।

কোচিন চীন ও অন্যান্য স্থানের জাহাজ এসে যে বন্দরে নোঙ্গর করে তা সহর থেকে মাত্র পৌনে এক মাইল দূরে। সেখানে সর্বদাই কিছু না কিছু খৃষ্টধর্মী নাবিক উপস্থিত থাকেন। সেই কারণেই বিশপ ওখানে একটি বাড়ী ও গীর্জা নির্মাণ করালেন সমবেত প্রার্থনা ও উৎসব অনুষ্ঠানের জন্যে।

অধ্যায় উনিশ

মাক্কাসার রাজ্য ও চীনদেশে ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত।

মাক্কাসার রাজ্যের অপর নাম সেলিবিস দ্বীপ। দক্ষিণ অক্ষাংশের পাঁচ ডিগ্রী থেকে তার সীমানা আরম্ভ হয়েছে। দিনমানে অত্যধিক উত্তাপ। তবে রাত্রিকালের আবহাওয়া চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ। স্থানটি ভারি মনোরম ও অতি উর্বর। দ্বীপবাসীরা কূপ খনন করতে জানেন না। রাজ্য ও রাজধানীর একই নাম। রাজধানী সমুদ্রের সন্নিকটে। বন্দর অবাধ মুক্ত। কাজেই পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে পণ্যদ্রব্য বহন করে যে জাহাজগুলি ওখানে আসে তাদের কোনও রপ্তানী শুল্ক দিতে হয় না।

দেশবাসীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রকে বিষাক্ত করে রাখেন। আর তা অত্যন্ত তীব্র ও মারাত্মক বিষ। তা বোর্ণিও দ্বীপে জাত এক গাছের রস থেকে তৈরী হয়। যখন যেরকম তীব্র প্রয়োজন তদনুরূপ তাকে তৈরী করিয়ে নেবার প্রথা। রাজাই কেবল সে রহস্য জানেন। রাজা গর্ব করেন যে সেই বিষের দ্রুততম ক্রিয়ার এমন উপায় তিনি জানেন যে পৃথিবীর কোথাও তার উপশমের কোন পন্থা কারোর জানা নেই। আমার একটি ভাইকে (দানিয়েল) ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। তিনি একদিন উক্ত বিষের দ্রুত ক্রিয়ার প্রমাণ দেখেছিলেন। জনৈক ইংরেজ ক্রোধবশতঃ মাক্কাসারের রাজার এক প্রজাকে হত্যা করেন। কিন্তু রাজা হত্যাকারীকে ক্ষমা করেছিলেন। তাহলেও সেখানে যত ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ ছিলেন তাঁরা ভাবলেন যে অপরাধীর শাস্তি না হলে দ্বীপবাসীরা হয়ত তাঁদের মধ্যে কিছু লোককে আক্রমণ করে সেই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

অতএব তাঁরা রাজাকে অনুরোধ জানালেন সেই অপরাধী ইংরাজকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক। সেই অনুরোধ-আবেদন এত জোরালো ছিল যে শেষ পর্যন্ত রাজা তা অনুমোদন করেছিলেন। আমার ভ্রাতা ছিলেন রাজার অতি প্রিয়পাত্র। তিনি ওকে সমস্ত আনন্দ উৎসবে বিশেষতঃ পানভোজনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতেন। ইংরেজটিকে প্রাণদণ্ড দান স্থির করে রাজা আমার ভ্রাতাকে বললেন যে তিনি সেই মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আর

বেশীদিন দুশ্চিন্তা ও হতাশায় দিন কাটাতে দিতে চান না। বিষের ক্রিয়া কত স্বাভাবিক ও তীব্রতা প্রমাণের জন্যে তিনি স্বহস্তে অপরাধীকে নিজের তীর দ্বারা বিদ্ধ করেন। বিষাক্ত তীরগুলি আকারে ছোট। রাজা তাঁর তীর নিক্ষেপের নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্যে আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির দেহের কোন অংশে তীর বিদ্ধ করা উচিত। আমার ভ্রাতার কৌতূহল হয়েছিল দেখবার যে রাজার বিষদিগ্ধ তীরের প্রভাব কতখানি এবং তা বস্তুতঃই বিস্ময়করভাবে দ্রুত ক্রিয়াশীল কিনা।

আমার ভাই রাজাকে বলেছিলেন অপরাধীর ডান পায়ের বুড়ো আংগুলকে তীর বিদ্ধ করা হোক। রাজা অত্যন্ত সুকৌশলে কাজটি সম্পন্ন করলেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ দু'জন শল্য চিকিৎসক প্রস্তুত ছিলেন আংগুলের ক্ষত স্থানকে কেটে বিষমুক্ত করার জন্যে। কিন্তু তাঁরা তা ঠিকভাবে করতে সমর্থ হননি। পরন্তু বিষ অতি দ্রুত লোকটির হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে তার তন্মুহূর্তে মৃত্যু ঘটে। প্রাচ্যদেশের সমস্ত রাজা মহারাজাই অনুরূপ সুতীব্র বিষ মজুত রাখেন। একদা অচিনের রাজা এই জাতীয় বিষাক্ত পনের বিশটি তীর উপহার দিয়েছিলেন বাটাভিয়ার প্রধান দূত এম্. ক্রোককে। ইনি পরে সুরাট ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ পদ লাভ করেছিলেন। তিনি তীরগুলিকে বহুবছর কোনও কাজে ব্যবহার করেন নি। অতঃপর আমি যখন একসময় তাঁর সংগে কিছুদিন ছিলাম তখন অনেকগুলি কাঠবিড়ালকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করেন। ওরা তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারায়।

মাক্কাসারের শাসক মুসলমান। তিনি তাঁর কোনও প্রজাকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার অনুমতি দেন না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে জেসুইট ফাদারগণ কোনও উপায়ে মাক্কাসারে একটি গীর্জা নির্মাণের সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু পরের বছরেই সুলতান হুকুম দিলেন যে গীর্জাটিকে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে। কেবলমাত্র সেই গীর্জাটিই নয়, দোমিনিকান ফাদারদের গীর্জারও সেই একই পরিণতি হয়েছিল। তাঁরা ওখানে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের জন্যে প্রার্থনা-উপাসনা পরিচালনা করতেন। যাজক পল্লীর যে গীর্জাটি ধর্মনিরপেক্ষ পুরোহিতরা চালাতেন তা রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছিল যতক্ষণ ওলন্দাজরা শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে মাক্কাসার আক্রমণ করেননি। তারা অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে রাজাকে বাধ্য করেছিলেন তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত পর্তুগীজদের বিতাড়িত করতে। সুলতানের অসদাচরণও এই যুদ্ধের আংশিক কারণ।

উক্ত যুদ্ধে ওলন্দাজদের যোগদানের কারণ হোল পর্তুগীজ জেসুইটরা চীনদেশে ডাচ দৌত্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। এছাড়া অন্য কারণও ছিল। তাহচ্ছে যে মাক্কাসারে পর্তুগীজগণ ওলন্দাজদের উপরে গুরুতর সব অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি জনৈক ওলন্দাজ দূত যখন ওদেশের রাজার সংগে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে এসেছিলেন তখন পর্তুগীজরা তাঁর মাথা থেকে টুপি নামিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওলন্দাজরা সেই সময় অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারেননি। কিন্তু পরে তাঁরা তাঁদের সৈন্যদলকে 'উগি' নামক এক জনসম্প্রদায়ের সংগে সংঘবদ্ধ করে সেই তীব্র অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। উক্ত জনসমাজ তখন রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ব্যাপৃত ছিলেন। পক্ষান্তরে, আমি পূর্বেও বলেছি যে ওলন্দাজগণ পর্তুগীজ জেসুইটদের হাতে বিশেষভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন। পর্তুগীজ জেসুইটরা নানা কৌশল করে চীনদেশে প্রেরিত ওলন্দাজ দূতের উদ্দেশ্য সাধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। ঘটনাটি এইরূপ—

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বাটাভিয়ার জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল ওলন্দাজ কোম্পানীর জনৈক মুখ্য ব্যক্তিকে চীনদেশের রাজার কাছে পাঠান। চমৎকার সব উপঢৌকনসহ তিনি রাজদরবারে পৌঁছে মন্দারিনদের সংগে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ অন্বেষণ করেন। এরা হলেন চীনদেশের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত লোক। ওলন্দাজ দূতের আশা ছিল যে তিনি উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় চীনদেশে বাণিজ্যাধিকার লাভ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু জেসুইটরা দীর্ঘদিন ওদেশে বসবাস করার ফলে চীনভাষা শিখেছিলেন। দরবারের সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে ছিল তাঁদের সুপরিচয়। অতএব তাঁরা পর্তুগীজদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং ওলন্দাজগণ যাতে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্যের কোনও সুযোগ সুবিধা না পান তার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে চীনসম্রাটের মন্ত্রণা সভার কাছে ওলন্দাজ কোম্পানী সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করলেন। তাঁরা (জেসুইট) আরও বললেন যে ওলন্দাজরা সিংহলের শাসকের সংগে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। অর্থাৎ পর্তুগীজদের হাত থেকে সিংহলীরা ও ওলন্দাজগণ মিলিতভাবে যেসকল স্থান অধিকার করেছিলেন তা তাঁদের ফিরিয়ে দেননি। সুতরাং তাঁরা বিশ্বাসভাজন নন। তাছাড়া ওরা মালাক্কা দখল করে অচিনের রাজাকে এবং উক্ত দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য শাসকদের প্রতারণা করেছেন।

সেখানকার কয়েকটি দেশ ও তাঁদের বাসিন্দাদের এই সর্তে আবদ্ধ করেছিলেন যে তাঁদের সকলকে চিরজীবন সম্মানও মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের হাতের মুঠোতে পেয়ে আর কোনও বিচার বিবেচনার বালাই রাখেননি। পরন্তু তাদের দাস হিসেবে মরিশাস দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আবলুস কাঠ কাটার জন্যে। এই সমস্ত ঘটনা এবং আরও নানা বিষয় রাজার মন্ত্রণা সভার গোচরে যেতে ওলন্দাজ প্রতিনিধি তন্মুহূর্তে চীন ত্যাগ করার নির্দেশ পান। ফলে তিনি সেখানে কোনও কাজ শেষ করতে পারেননি। তিনি চীন দেশ ত্যাগ করার পর জনৈক গুপ্তচরের চিঠিতে পর্তুগীজ জেসুইটদের কুব্যবহারের কথা জানতে পারেন। অবশেষে তিনি বাটাভিয়াতে ফিরে গিয়ে জেনারেল ও তার পরামর্শ সভাকে ব্যাপারটি জানালেন। তারা সে খবর শুনে অত্যন্ত বিরক্ত ও চিন্তিত হলেন এবং তীব্র রকমের প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলেন। তাদের প্রতিনিধির চীনদেশে যাতায়াতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়েছিল। তিনি তার হিসেবপত্র দাখিল করার পরে স্থির হোল যে পর্তুগীজদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ উহার দ্বিগুণ আদায় করা হবে।

এঁরা বিশেষ ভাবেই জানতেন যে জেসুইট বিশপগণ প্রতিবছর মাকাও দ্বীপ ও মাক্কাসার রাজ্যে কিরকম ব্যবসা বাণিজ্য চালান। তাছাড়া নিজেদের জন্যে তারা স্বতন্ত্রভাবে প্রায় ছয়টি জাহাজ পূর্ণ করে ভারতীয় এবং চৈনিক জিনিসপত্র আমদানী করতেন। ওলন্দাজগণ সময় ঠিক করে নিলেন যে কখন সেই জাহাজগুলি মাক্কাসারে পৌঁছবে। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন মাক্কাসার বন্দরে কোম্পানীর দু'খানি জাহাজ এসে ভিড়লো। এরা এসেছিল তীর ভূমিতে অবস্থানরত ওলন্দাজদের স্থানত্যাগ করার কাজকে সুগম করার জন্যে। ওলন্দাজ নৌবহর বনতঙ্গ থেকে দশ মাইল দূরে তানাকেকি দ্বীপে নোঙর করেছিল।

স্থানীয় রাজা শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি সেই শত্রুদের ভয়ে ভীতিগ্রস্থ ছিলেন। মাকাওতে অবস্থানরত জাহাজ দ্বারা তিনি ওলন্দাজ আক্রমণকে কিছু সময় অন্ততঃ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। দু'পক্ষে যুদ্ধ দুর্দম হতে ওলন্দাজগণ তাঁদের নৌবহরকে দু'টিভাগে বিভক্ত করে ফেলেন। তেরখানি জাহাজ পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করেছিলেন। বাকী জাহাজ অনবরত দুর্গের উপর আক্রমণ চালাতে

লাগলো। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ তত জোরালো হয়নি। শোনা যায় যে সে-দিন ওলন্দাজরা সাত হাজারেরও অধিক কামান দাগিয়েছিলেন। তখন রাজা অত্যন্ত ভীত হয়ে পর্তুগীজদের গোলাগুলি বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন যাতে শত্রুরা আরও ক্রুদ্ধ না হন।

এই যুদ্ধে রাজকুমার পতিনসলোয়া পরলোক গমন করেন। মাক্কাসারের রাজার পক্ষে তা চূড়ান্ত ক্ষতির কারণ হয়েছিল। পরলোকগত রাজকুমারের কূটনীতির ফলে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ রাজাকে ভয় পেতেন। রাজাও তাঁর উপরে ছিলেন নির্ভরশীল। মাকাওতে অবস্থিত জাহাজগুলি আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। অতএব, ওলন্দাজ নৌবহরের পক্ষে পর্তুগীজদের ধ্বংস করা কিছু কঠিন হয়নি। তাঁরা শত্রুদের তিনটি জাহাজ পুড়িয়ে দিলেন। দু'খানিকে দিলেন জলমগ্ন করে। আর তাঁদের প্রচুর মূল্যবান জিনিসপত্র করলেন হস্তগত। এইভাবে ওলন্দাজগণ চীন দেশে তাঁদের দৌত্য বিফল হওয়ার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন বিশেষ লাভজনক উপায়ে।

১৩ই জুন মাক্কাসারের শাসক সুম্বাকো দেখলেন যে তিনি চরম সংকটের সম্মুখীন। তখন তিনি আর একটি কেল্লাতে শ্বেত পতাকা উত্তোলনের নির্দেশ দিয়ে বেগমদেরও সেখানে নিয়ে গেলেন এবং যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। শান্তি স্থাপনার উদ্দেশ্যে তিনি দরবারের উর্ধ্বতন এক কর্মচারীকে পাঠালেন ওলন্দাজ নৌবহরের জেনারেলের কাছে। সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বিশেষ একটি সর্তে যে তিনি বাটাভিয়াতে রাষ্ট্রদূত পাঠাবেন এবং তাঁর প্রজারা আর পর্তুগীজদের সংগে কোনও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারবেন না।

সন্ধিপত্রের ধারা যখন বাটাভিয়াতে জেনারেল ও তাঁর পরামর্শ সমিতির অনুমোদন লাভ করার মুখে তখন মাক্কাসারের রাজা তাঁর জাহাজ সজ্জিত করে দরবারের শ্রেষ্ঠতম এগারজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সেখানে পাঠান। সংগে সাতশত লোক ছিল। সেই দৌত্য কর্মের অধিনায়ক ছিলেন পরলোকগত সুলতান পতিনসালোয়ার ভ্রাতা। বাটাভিয়ার জেনারেলকে তাঁরা উপঢৌকন দিয়েছিলেন দুশত বড় বড় আকারের সোনার তাল। তা দিয়েছিলেন রাজকীয় কেল্লা উদ্ধারের জন্যে। সেই সংগে ওলন্দাজদের প্রস্তাবিত যাবতীয় সর্ত পালনেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর একটি সর্ত ছিল যে ইসলাম ধর্মীয় কোনও রীতিনীতি লঙ্ঘিত হবে না। জেনারেল সেই দৌত্য কর্মীদের

অভ্যর্থনা জানিয়ে সেই অপূর্ব সুযোগ নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তাতে তিনিও লাভবান হয়েছিলেন। ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে সম্মানজনকও হয়েছিল। তবে সেই সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছিল তাঁদের অস্ত্রবলের প্রভাবেই।

তিনি স্বহস্তে ক্ষতিপূরণের সর্ত রচনা করেছিলেন। মাক্কাসায়ের রাজ-প্রতিনিধি তাতে স্বাক্ষর করলেন এবং তা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ সমস্ত পর্তুগীজগণ মাক্কাসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিছু সংখ্যক গেলেন শ্যাম ও কাম্বোডিয়া রাজ্যে। বাকী সকলে গিয়েছিলেন মাকাও এবং গোয়াতে। কয়েক বছর পূর্বে মাকাও ছিল প্রাচ্য খণ্ডের প্রসিদ্ধতম ও সর্বাপেক্ষা ধনী সহর। ওলন্দাজদের চীনদেশে দূত প্রেরণের প্রধান লক্ষ্য ছিল এই স্থানটি। কারণ ওটি শ্রেষ্ঠতম একটি বন্দর। পর্তুগীজরা তখন সেই অঞ্চলের মুখ্য নায়ক। ওলন্দাজদের উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগীজদের সেই প্রাধান্যকে বিনষ্ট করা। বর্তমানে বাইশ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত এই সহরটি ক্যান্টন প্রদেশে একটি উপদ্বীপ জাতীয় স্থান। এখন তা চীন দেশের অংশ। ওর পূর্ব গৌরব আর নেই।

মাক্কাসারে যা ঘটেছিল তাতেই জেসুইট বিশপও পর্তুগীজ বণিকদের প্রতি শাস্তি বিধানের শেষ হয়নি। গোয়ার সন্নিকটে আরও একবার অপমান ও ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গোয়ায় প্রায় বারো মাইল দূরে ভেন্‌গারলার ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ চীনদেশে ওলন্দাজদের ব্যর্থতার কথা শুনলেন। কাজেই তিনিও সেখানে কিছু প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করলেন। তাঁর জানা ছিল যে গোয়া ও ভারতের নানাস্থানে জেসুইট বিশপরা অপরিশোধিত হীরকের ব্যবসা করেন জোরালো ভাবেই। তাঁরা ইউরোপে হীরক প্রেরণ করেন। পর্তুগালে প্রত্যাবর্তনের সময়ই তাঁরা উহা নিয়ে যান। উক্ত ব্যবসা গোপনে চালাবার জন্যে তাঁরা একটি অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। নিজেদের মধ্যে থেকে দু একজনকে ভারতীয় সন্ন্যাসী বা ফকিরের বেশে পাঠান। একাজ তাঁদের পক্ষে কিছু অসুবিধাজনক নয়। কারণ বিশপ গোষ্ঠীতে এমন লোকও আছেন যাঁদের জন্ম ভারতবর্ষে এবং তাঁরা ভারতীয় ভাষা জানেন নিখুঁতভাবে। এঁদের পোষাক একটি ব্যাঘ্রচর্ম। তা পিঠে জড়িয়ে রাখেন। আর একটি ছাগলের চামড়া কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেন। টুপি তৈরী হয় মেষ বা ছাগল ছানার চামড়া দিয়ে।

ছাগলের চারটি পা ঝোলানো থাকে তাঁদের ললাট, কণ্ঠদেশ ও কানের সংগে। কর্ণবেধ করা থাকে। তাতে স্ফটিকের আংটি ঝোলানো হয়। পা-দুটি উন্মুক্ত থাকে। পায়ে পরেন কাঠের খড়ম। তাতে এক গোছা ময়ূরের পালক রাখেন মাছি তাড়ানোর জন্যে।

গোলকুণ্ডার সুলতানের দরবারে ছিলেন এমন কয়েকজন অগাস্টাইন বিশপের সংগে আমি একদিন সান্ধ্যভোজনে ব্যাপৃত ছিলাম। আমার সংগে ছিলেন এম. এম. লেসকট ও রেইসিন। সমবেত জেসুইট বিশপদের একজন এসেছিলেন গোয়া থেকে। তিনি পূর্বে আলোচিত পোষাক পরিচ্ছদে মণ্ডিত হয়ে ভোজনকক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি আমাদের বললেন যে তিনি সেন্ট-থোম্-এ যাচ্ছেন গোয়ার ভাইসরয়ের কাজে। আমি তাঁর পোষাক দেখে মন্তব্য করলাম যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে এই প্রকার ছদ্মবেশে ভ্রমণ করার কোনও প্রয়োজন হয় না। কোন ধর্মের মানুষই এই প্রকারে আত্মগোপন করে চলেন না।

ভেন্‌গারলা ফ্যাক্টরীর অধিকর্তা জেসুইট বিশপদের উপর প্রতিহিংসা সাধনের সুযোগ নিলেন এইভাবে। তিনি জানতে পারলেন যে তাঁদের দু'জন চলেছেন হীরকখনি অঞ্চলে। তাঁরা হীরক কিনবেন প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের। তিনি সেই বিশপদ্বয়কে তাঁর জন্যেও কিছু হীরা কিনে আনার জন্য অনুরোধ করলেন। হীরা কেনার কাজ শেষ হতে বিশপদের বিচোলির শুল্ক বিভাগীয় অধিকর্তাকে রিপোর্ট দেবার নিয়ম। বিচোলি হচ্ছে বিজাপুর রাজ্য ও পর্তুগীজ অধিকৃত স্থানের সীমান্তবর্তী বড় একটি সহর। সেই সহরটি বাদ দিয়ে উক্ত অঞ্চলে দ্বিতীয় আর কোনও রাস্তা নেই। কারণ নদী বেষ্টিত সলসেটি দ্বীপেই গোয়ার অবস্থান। জেসুইট বিশপদের ধারণা ছিল যে তাঁদের হীরক কেনা সম্বন্ধে অন্য কেউ কিছু জানেন না। তাঁরা নদী পার হবার জন্য নৌকোতে চাপলেন। নৌকোতে উঠতেই তাঁদের দেহ তল্লাসী শুরু হয়ে যায়। তাঁদের কাছে প্রাপ্ত সমুদয় হীরা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

এখন আবার মাক্কাসায়ের রাজার প্রসংগে যাওয়া যাক। তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে জেসুট ফাদারগণ অদম্য চেষ্টা চালান। একটি সর্ত তাঁদের উপর আরোপিত না হলে হয়ত তাঁরা সেকাজে সফল হতেন। কিন্তু তাঁরা সেই সর্ত পালনে রাজী হন নি। একদিকে জেসুইটরা তাঁকে খৃষ্টধর্ম

গ্রহণের জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, অন্যদিকে মুসলমানরা সমভাবে তাঁকে প্ররোচিত করেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্যে। রাজা তাঁর হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারেননি যে দ্বিতীয় কোন ধর্মটি গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তিনি মুসলমানদের বললেন মক্কা থেকে শ্রেষ্ঠতম দু-তিনজন মোল্লাকে আহ্বান করে আনা হোক। আবার জেসুইটদেরও বললেন যে তাঁরাও যেন তাঁদের সম্প্রদায়ভুক্ত সুযোগ্য দু-তিনজন বিশপকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁদের কাছে দুই ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব ও আদর্শ সম্বন্ধে গভীরভাবে উপদেশ গ্রহণ করবেন। দুই পক্ষই রাজার অনুরোধ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে খৃষ্টধর্মীদের চেয়ে মুসলমানরা দ্রুততর কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। আট মাস পরে তাঁরা মক্কার দু-জন যোগ্যতর মোল্লাকে এনে হাজির করলেন। পক্ষান্তরে জেসুইটগণের পক্ষ থেকে কেউ এলেন না। তার ফলে রাজা ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করলেন। তিনবছর পরে দু'জন পর্তুগীজ জেসুইট মিশনারী মাক্কাসারে গিয়ে পৌঁছেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তখন রাজা আর খৃষ্টধর্মে আগ্রহ প্রকাশ করে ধর্মান্তরিত হন নি।

মাক্কাসারের রাজা মুসলমান হতে তাঁর ভ্রাতা রাজকুমার এত বিরক্ত হল যে তিনি তা চেপে রাখতে অসমর্থ হয়ে এমন একটি কাজ করে ফেললেন যা রাজার পক্ষে বিশেষ অসম্মানজনক হয়েছিল। তাঁর জানা ছিল মুসলমানরা শূকরের মাংসকে খাদ্যরূপে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। কিন্তু মাক্কাসারের হিন্দু বাসিন্দাদের কাছে তা একটি সাধারণ খাদ্য। রাজা ধর্মান্তরিত হয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করান। মসজিদের নির্মাণকার্য শেষ হতেই রাজ ভ্রাতা একদা রাত্রিতে সেখানে প্রবেশ করলেন। আর নিজে দাঁড়িয়ে সেখানে দশ বারোটি শূকর ছানাকে হত্যা করালেন। অতঃপর তাদের রক্তধারা চারদিকে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। মসজিদের সমস্ত দেয়াল, কুলুঙ্গী ধরনের যে স্থানটিতে বসে মোল্লা প্রার্থনা করেন যাবতীয় জায়গা রক্ত ছিটিয়ে কলুষিত করা হয়। রাজা তারপর নবনির্মিত মসজিদকে ধূলিসাৎ করে আর একটি নতুন ভজনালয় নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তখন রাজকুমার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত হিন্দু উচ্চ রাজকর্মচারীরা রাজদরবার ত্যাগ করেন। আর কোনও দিন তাঁরা সেখানে ফিরে যাননি।

এই হোল আমার সংগৃহীত প্রাচ্য দেশের রাজ্যসমূহ ও তৎসহ মহান মুঘল সাম্রাজ্য ও চীন সম্রাটের রাজ্য সম্পর্কিত তথ্যরাজি। এটা বিশেষ

তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই বিষয়সমূহ আমার স্মৃতিপটে নিখুঁতভাবেই ছিল মুদ্রিত। আমি অবশ্য জানি যে অন্যান্যরাও এ-বিষয়ে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাহলেও আমার ধারণা যে পাঠকরা আমার এই বিবৃতিকেও পছন্দ করবেন। কেননা, আমি এখানে আমার ভ্রমণ যাত্রা-প্রসূত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছি। আর এমন সব বিষয় বিবৃত করেছি তাঁদের আনন্দ দানের জন্যে যা বস্তুতঃই আমার স্বচক্ষে দেখা।

অধ্যায় বিশ

গ্রন্থকারের প্রাচ্যাঞ্চল ভ্রমণ, ভেন্‌গারলাতে বাটাভিয়ার জন্য জাহাজে আরোহণ; সমুদ্রে বিপদজনক অবস্থার সম্মুখীন এবং সিংহল দ্বীপে গমন।

আমি ভেন্‌গারলা ত্যাগ করি ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল। ভেন্‌গারলা গোয়ার বারো মাইল আন্দাজ দূরে বিজাপুর রাজ্যস্থিত একটি বড় সহর। আমি ওখানে একটি ওলন্দাজ জাহাজে আরোহণ করি। জাহাজটি পারস্য দেশে জাত রেশমী কাপড় বোঝাই করে এসেছিল। আর ফিরে চলেছিল বাটাভিয়াতে। জাহাজখানিকে নির্দেশ দেয়া ছিল পথিমধ্যে বারকুরে যাত্রা বিরতি করে চাল নেবার জন্য। আমরা সেখানে পৌঁছই উক্ত মাসের ১৮ই তারিখে। আমি জাহাজের কাপ্তেনের সংগে নেমে পড়ি। তিনি স্থানীয় রাজার সংগে দেখা করতে যান চাল সংগ্রহের জন্য অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে। রাজা আগ্রহ সহকারেই অনুমতি প্রদান করেন। নদীর তীর প্রায় ছয় মাইল পথ অতিক্রম করে আমরা দেখলাম যে রাজার আবাসও নদীর কিনারায়। সেখানে কেবলমাত্র দশ বারোটি তাল পাতার কুটির ছিল।

রাজা একটি পারসীক গালিচার উপর বসে ছিলেন। তাঁর আশে পাশে ছয়জন মহিলা। তাদের কয়েকজন ময়ূরের পালকে তৈরী পাখা দ্বারা রাজাকে ব্যজন কচ্ছেন। বাকি সকলে তাঁকে পান খেতে দিচ্ছেন এবং হুকা সাজানোতে ব্যস্ত। দেশের অন্যান্য মুখ্য ব্যক্তিরা থাকেন বাকি সব চালা ঘরে। আমরা হিসেব করে দেখলাম যে তাদের সংখ্যা প্রায় দুইশত। অধিকাংশই তীর ধনুকে সজ্জিত। তাদের দুটি হাতী ছিল। মনে হোল ওদের আরও কিছু বাসস্থান অন্যস্থানে আছে। ওখানে এসেছেন সাময়িকভাবে গাছপালা ও স্রোতস্বিনীর ঠাণ্ডা হাওয়া বাতাস উপভোগের জন্য। রাজার সংগে দেখা করে আমরা আমাদের জলযানে গিয়ে উঠলাম। তখন তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠালেন এক ডজন মুরগী ও পাঁচ ছয়টি পূর্ণ পাত্র তাল গাছের রস-সুরা (তাড়ি)। ঐদিন সন্ধ্যার পরে আমরা দেড় মাইল রাস্তা চলার পরে একটি ছোট গ্রামে রাত্রি যাপন করে নিদ্রার ব্যবস্থা করেছিলাম; সেখানে মাত্র পাঁচ ছয়টি ঘর-বাড়ী ছিল। আমরা জাহাজ থেকে সংগে যথেষ্ট খাদ্য নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রাতঃকালে আমরা সেখান

ছেড়ে যাত্রা করবো এমন সময়ে দেখি আমাদের জাহাজের জনৈক চালক ও তিন চারজন যুবা পুরুষ এসে হাজির। তরুণরা আমাদের প্রাতঃভোজনের উপযোগী খাদ্যাদি নিয়ে এসেছেন। তারা ওখানে উপস্থিত থাকতেই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। তখন তারা আমাদের কাছে কিছু তাড়ি চাইলেন।

আমরা যে গৃহ স্বামীর গৃহে রাত্রি যাপন করেছিলাম তিনি আমাদের কিছু তাড়ি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তা অতি উৎকৃষ্ট জিনিস ছিল। তিনি বলেছিলেন যে উহা অত্যন্ত কড়া। খেলে হয়ত মাথা ঝিম্ ঝিম্ করবে। আমাদের নাবিকরা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। কারণ ওরা সর্বদা উহা পান করেন। অনেকে অতি মাত্রায় পান করতেও অভ্যস্ত। আর তাতে কখনও কোনও অসুবিধা হয়নি। গাছ থেকে রস নিষ্কাশনের পরক্ষণেই তা খেলে অর্থাৎ গেঁজে ওঠার সময় না দিলে বিশেষ অসুবিধার কারণ থাকে না। তবে অত্যধিক পরিমাণে খেলে মনে হবে পাকস্থলীতে গিয়ে তা যেন ফেঁপে ফুলে উঠছে।

জনৈক চাষী একপাত্র তাড়ি নিয়ে এলে প্রত্যেকেই ইচ্ছে মত অর্থাৎ কেউ নিলেন তিন গ্লাস, অন্য আর একজন খেলেন চার কি পাঁচ গ্লাস। আমি খেলাম মাত্র এক গ্লাস। এক গ্লাসের ওজন প্রায় আধ পিন্ট। কিন্তু সত্য বলতে কি, আমরা সকলেই নিদারুণ মাথা ধরা রোগে কষ্ট পেয়েছিলাম। আর দুদিনেও সুস্থ হতে পারিনি। স্থানীয় লোকেদের কাছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে কি কারণে উহা খেয়ে আমরা অত কষ্ট পেলাম। তারা বললেন যে তাল গাছের আশে পাশে লঙ্কার গাছ পোঁতা হয়। তার ফলে তালের রস ঝাঁজালো হয়ে ওঠে। আমরা জাহাজে ফিরে এসেও মাথা ঘোরা বন্ধ হয়নি। ঠিক সেই সময়ই স্থানীয় গভর্ণর এলেন আমাদের কি পরিমাণ চাল দরকার তা জানতে এবং তার দরদাম ঠিক করার জন্য। চাল কিছু দূরস্থান থেকে আনতে হোত। সুতরাং তাতে আমাদের কিছু অসুবিধা হয়েছিল। কেননা বাতাসের গতি তখন পরিবর্ত্তিত হতে চলেছিল। অথচ জাহাজের কাপ্তেনও স্থান ত্যাগ করতে আগ্রহী ছিলেন না। কারণ, তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তখনও সংগৃহীত হয়নি।

২৮শে ও ২৯শের মধ্যে রাত্রিকালে বাতাসের গতি ভিন্নমুখে চলতে আরম্ভ করে। জাহাজ চালকরা কাপ্তেনকে বললেন যে তিনি (কাপ্তেন) তৎপূর্বে কখনও ভারতীয় উপকূলভাগ ধরে জাহাজ চালিয়ে যাননি। অতএব, তাঁর উচিত নোঙর তুলে জাহাজ ছেড়ে দেয়া। কিন্তু তখনও আমাদের সমস্ত

খাদ্যদ্রব্য ও মালপত্র জাহাজে মজুত হয় নি। কাপ্তেনও অনড় ও অনিচ্ছুক। তিনি বললেন পানীয় জল আবশ্যক। সারারাত ধরে বাতাস আরও প্রবল হয়ে উঠলো। পরদিন হাওয়ার চাপ সামান্য হ্রাস পেল এবং জাহাজে চাল তোলার কাজ চলতে লাগলো। আর একদিন কেটে গেল আমরা খুব জোর দিয়ে কাপ্তেনকে জেঠি ত্যাগ করতে বললাম।

তিনি যখন দেখলেন যে সকলে মিলে বিরক্তি সূচক কোলাহল সৃষ্টি করে চলেছেন তখন তিনি দুখানি নৌকা পাঠালেন জল সংগ্রহের জন্য। কিন্তু তারা নদীর মোহনায় পৌঁছানো মাত্র বাতাস এত প্রবল হয়ে উঠলো যে নৌকার মাঝিরা জল না নিয়েই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তাও এসেছিলেন এমন বিপদজনক অবস্থায় ও কষ্ট করে যে নৌকাশুদ্ধ তারা ধ্বংসের কবলে পড়তে পারতেন। তারা জাহাজে ফিরে এলে সাধারণ নিয়মানুসারে দুখানি নৌকা জাহাজের পেছনে বেঁধে দেয়া হোল। বড় নৌকায় চৌদ্দ জন লোক ছিল। তাদের কাজ ছিল জাহাজের গায়ে যাতে প্রবল ঢেউ এসে ধাক্কা দিতে না পারে তা দেখা। আমরা নোঙর তোলায় আগ্রহী হলেও বাতাসের গতি যেমন জোরালো, তেমনি বিপরীত মুখী হয়ে উঠলো। জাহাজ, মানুষ, মালপত্র সব এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। পরদিন যখন বাতাসের চাপ কমে গেল তখন দেখি আমরা সমুদ্র মধ্যে পাঁচ ছয় মাইল দূরে চলে গিয়েছি। নোঙর সব উঠে এসেছে।

তখন আমরা সকলে মিলে পরামর্শ করলাম যে কোন পথে আমাদের যাওয়া উচিত। কেউ কেউ বললেন, আমাদের গোয়াতে ফিরে গিয়ে সেখানে শীতকাল কাটানো উচিত। অন্যরা বললেন যে আমাদের পয়েন্ট দ্য গ্যালিতে যাওয়া সমীচীন। সিংহলের এই সহরটিই ওলন্দাজরা সর্বাগ্রে পর্তুগীজদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আমরা উক্ত দুটি স্থান থেকেই সমান দূরে ছিলাম। বাতাসের গতিও দুদিকে যেতেই সমান অনুকূল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পয়েন্ট দ্য গ্যালির বন্দরে পৌঁছে যাই ১২ই মে তারিখ। আমি তৎক্ষণাৎ মদসুয়েরীর গভর্ণরের সংগে দেখা করতে যাই। তিনি এখন বাটাভিয়ার গভর্ণর জেনারেল। তিনি আমাকে ওখানে অবস্থানকালে প্রতিদিন তাঁর সংগে ভোজন পর্ব সমাধা করতে অনুরোধ জানালেন।

সহরটিতে আমি তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য দেখতে পাইনি। দেখলাম কেবল ধ্বংসস্তূপের চিহ্ন, কিছু খনি ও পর্তুগীজদের বিতারণকালে ওলন্দাজরা

যে কামান ব্যবহার করেছিলেন তার চিহ্ন। কোম্পানী ওখানে বাস করতে চান এমন লোকেদের জমি জায়গা মঞ্জুর করেছেন বাড়ী ঘর তৈরী করার জন্যে। কোম্পানী দুটি সু-উচ্চ দুর্গ প্রাকার তুলেছেন পোতাশ্রয় রক্ষণের উদ্দেশ্যে। যদি সে দুটি দুর্গ প্রাকার নক্সা পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠিত হয় তাহলে সহরটি বেশ সুন্দর হয়ে উঠবে।

সিংহল দ্বীপের যে সকল স্থান পর্তুগীজ অধিকারে ছিল সেখান থেকে তাঁদের বিতাড়িত করার পূর্বে ওলন্দাজরা ভেবেছিলেন যে সমগ্র দেশটি তাঁরা অধিকার করতে পারলে ওখানে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে প্রচুর লাভ করা যাবে। বস্তুতঃ হয়ত তাই হোত যদি তাঁরা ক্যাণ্ডির রাজার সংগে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারতেন। তাঁরা (ওলন্দাজ) যে সময় পর্তুগীজ বিতারণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন যিনি রাজা ছিলেন তাঁর সংগে ওঁরা বিশ্বাসভঙ্গ করেন। তাতে ওঁরা নিজেদের অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

ওলন্দাজরা ক্যাণ্ডির রাজার সংগে একটি চুক্তি করেন যে তিনি সর্বদা বিশহাজার লোক লস্কর প্রস্তুত রাখবেন কলম্বো, নেগম্বো, মান্নার ও অন্যান্য পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত উপকূলভাগে সমাবিষ্ট সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্যে। ওলন্দাজরা স্থল ও জলপথে পয়েন্ট দ্য গ্যালি অবরোধের জন্যে যত সংখ্যক সৈন্য প্রয়োজন তা বিরাট জাহাজ করে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ওলন্দাজরা অচিনের রাজার সংগেও চুক্তি বদ্ধ হলেন যে তিনিও ছোট ছোট সশস্ত্র রণতরী দ্বারা উপকূলভাগ রক্ষা করে চলবেন। তাঁর প্রচুর রণতরীর বহর ছিল।

আরও ব্যবস্থা হয়েছিল যে ওলন্দাজগণ পয়েন্ট দ্য গ্যালি হস্তগত করে তা ক্যাণ্ডির রাজাকে দেবেন। কিন্তু তাঁরা সেই সর্ত পালন করেন নি। তখন রাজা জানতে চাইলেন যে কেন তাঁরা স্থানটির কর্তৃত্ব তাঁকে আরোপ করেন নি। তদুত্তরে ওলন্দাজরা বললেন যে তাঁরা চুক্তি ভঙ্গ করবেন না। তবে তাঁকে যুদ্ধের ব্যয় কিছু বহন করতে হবে। ওদিকে ওলন্দাজরা বিলক্ষণ জানতেন যে রাজার নিজ রাজ্যের অনুরূপ আরও তিনটি রাজ্য থাকলেও তিনি যুদ্ধের ব্যয়াংশ বহন করতে সক্ষম ছিলেন না। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে দেশটি অত্যন্ত দরিদ্র। আকার মনে হয়েছে যে রাজা হয়ত জীবনে কখনও পঞ্চাশ হাজার ক্রাউন মুদ্রা একত্রে দেখার সুযোগ পাননি। তাঁর দেশের একমাত্র ব্যবসার পণ্য হোল দারুচিনি ও হাতী।

পর্তুগীজরা ইস্টইণ্ডিজে যাবার পরে তাঁর দারু চিনির ব্যবসাতে কোনও লাভ হয় না। হাতী বছরে পাঁচ ছয়টির বেশী কেউ ক্রয় করেন না। কিন্তু অন্যান্যস্থানের তুলনায় ওখানকার হাতীর খুব কদর। কেননা, ওরা যুদ্ধকালে অত্যন্ত শক্তিমান। আমি এখানে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করবো যা সহজে বিশ্বাস করার মত নয়। তাহলেও ঘটনাটি সত্য। ব্যাপারটি হচ্ছে যে কোনও রাজা যদি সিংহলের হাতী সংগ্রহ করে তাকে ভিন্ন দেশীয় হাতীর মধ্যে রাখেন তাহলে তাকে দেখে অন্য হাতীরা সম্মান প্রদর্শন করে। সহজাত ভাবে তারা নিজেদের শুঁড়কে মাটিতে নামায়, আবার উপরে তুলতে থাকে।

অচিনের রাজার সংগেও ওলন্দাজরা কথার খেলাপ করেছিলেন। তবে ক্যাণ্ডির রাজার তুলনায় তাঁর সেই অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণের অবকাশ ছিল ঢের বেশী।

তিনি ওলন্দাজদের তাঁর দেশ থেকে লঙ্কা (লাল মরিচ) রপ্তানীর অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। লঙ্কা রপ্তানী ব্যবসার কোনও গুরুত্ব ছিলনা। তাঁর দেশে জাত লঙ্কার প্রাচ্যদেশে খুব কদর। অতএব, ওলন্দাজরা তাঁর সংগে গোলমাল মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন। অচিনের মুসলমান রাষ্ট্রদূত বাটাভিয়াতে গেলেন। সেখানে গিয়ে ভোজনের টেবিলে মহিলাদের দেখেতো তিনি অবাক। আরও বিস্মিত হয়েছিলেন অচিনের রাণীর স্বাস্থ্য কামনা করে পান ক্রিয়া শুরু করতে দেখে এবং বাটাভিয়ার জেনারেল যখন তাঁর স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন রাষ্ট্রদূতকে চুম্বন করে সম্বর্দ্ধনা জানাতে।

অচিনের রাজা ও রাণী বাটাভিয়ার দূতকেও কিছু কম যত্ন আপ্যায়ন করেননি। তাঁর নাম এম্. ক্রোক্। তিনি পনের বছর ধরে অবসাদ জাতীয় রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। মনে হয়েছিল কেউ সূক্ষ্মভাবে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছেন। তিনি যখন তৃতীয়বার রাজার সংগে দেখা করেন, তখন রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে তিনি ও-দেশের কোন মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন কিনা; আর কিভাবে তার সংগ ত্যাগ করেছেন। পরস্পর চুক্তি বদ্ধ হয়ে ত্যাগ করেছেন, না মহিলাকে তিনি জোর করে বিতাড়িত করেছেন ইত্যাদি।

রাজার জানা ছিল যে রাষ্ট্রদূত বহুদিন ধরে অবসন্ন বোধ কচ্ছেন এবং তাঁর ক্ষুধামান্দ্য চলছে। দূতটি স্বীকার করলেন যে তিনি মহিলাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন স্বদেশে গিয়ে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। সেই থেকেই তিনি রোগ

ভোগ কচ্ছেন। তা শুনে রাজা তিনজন চিকিৎসককে তাঁর কথা জানালেন। চিকিৎসকরা রাজার কাছেই ছিলেন। দূতের রোগ নির্ণীত হলে রাজা চিকিৎসকদের পনের দিন সময় দিলেন তাঁকে রোগমুক্ত করার জন্যে। আর বলে দিলেন যে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে দূত আরোগ্য লাভ না করলে তিনি তাঁদের সকলকে প্রাণদণ্ড দেবেন। চিকিৎসকরা বললেন যে তাঁরা দূতের আরোগ্য সম্পর্কে মতামত দেবেন একটি সর্ত্তে যে তাঁরা রোগীকে যে সকল নির্দেশ উপদেশ দেবেন তা তিনি মেনে নেবেন।

প্রথম তাঁরা রোগীকে প্রাতঃকালে দিলেন এক গ্লাস ক্বাথ, সন্ধ্যায় খাওয়ালেন একটি বড়ি। অবশেষে নয়দিন পরে রোগীর দেহে প্রবল বমনের উদ্রেক হয়। তখন মনে হয়েছিল যে তিনি হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বমনের সংগে বেরিয়ে এল বাদামের আকারে জড়ানো এক গোছা চুল। উহা বহির্গত হতে তিনি সুস্থ বোধ করলেন। অতঃপর রাজা তাঁকে গণ্ডার শিকারে নিয়ে যান পশু শিকারের সুযোগ দেবার জন্যে। একটি গণ্ডার হত্যার পরে উহার শিং কেটে রাজা দূতকে তা উপহার দিলেন। শিকার পর্ব অন্তে রাজা একটি বিরাট ভোজ সভার আয়োজন করেন। ভোজনের পালা শেষ হলে রাজা বাটাভিয়ার জেনারেল ও তদীয় পত্নীর স্বাস্থ্য কামনা করে পান শুরু করেন। এবং তাঁর এক বেগমকে নির্দেশ দিলেন দূতকে চুম্বন করার। এম্. ক্রোকের বিদায়কাল আসন্ন হতে রাজা তাঁকে রাজহংসীর ডিমের আকারের একটি নুরি উপহার দিলেন। মানুষের হাতের মধ্যে যেমন শিরা উপশিরা দেখা যায় ঠিক তদনুরূপ সেই উপলখণ্ডের মধ্যেও দেখা যেত সোনার সব বড় বড় শিরানুরূপ টানা চিহ্ন। ও-দেশে ঐ ভাবেই সোনা উৎপন্ন হয়।

অধ্যায় একুশ

গ্রন্থকারের সিংহল ত্যাগ ও বাটাভিয়াতে গমন।

আমরা পয়েন্ট দ্য গ্যালি ছেড়ে যাত্রা শুরু করি ২৫শে মে। ২রা জুন আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করে এগিয়ে চলি। ৬ই তারিখে একটি দ্বীপ দেখা যায়। নাম নাদাকোস। ১৭ই সুমাত্রা উপকূল আবিষ্কার করি। তারপর ১৮ই আমাদের দৃষ্টিপথে এল ইল্‌গাসিনা। ১৯শে দেখতে পেলাম সৌভাগ্য দ্বীপ। কতকগুলি ছোট দ্বীপের কিনারা চোখে পড়লো ২০শে তারিখ। যাভার উপকূলও এগিয়ে এল। এই সকল দ্বীপের তিনটিকে বলা হয় রাজ দ্বীপ। ২১শে আমরা খুঁজে পেলাম বন্‌তম্‌। ২২শে জাটাভিয়ার মুখে জাহাজের নোঙর পড়লো।

বাটাভিয়াতে দুটি কাউন্সিল আছে। একটি কেল্লা সংরক্ষণের জন্য সেই ব্যবস্থা। জেনারেল হলেন তার সভাপতি। এই সমিতিই কোম্পানীর যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। দ্বিতীয়টির কাজ চলে সহরের একটি আবাসে। শাসন বিভাগের তা যুক্ত। নাগরিকদের মধ্যে ক্ষুদ্র বাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলার দায়িত্ব ওঁদের হাতে।

ওখানে আমার সংগে যে ব্যবহার তাঁরা করেছেন তা এই। সহরের কাউন্সিলের সন্দেহ হয়েছিল যে আমার সংগে এক বাণ্ডিল হীরা আছে যা আমার প্রিয় বন্ধু মঁসিয়ে কন্‌ষ্টান্টের জন্য আনা হয়েছিল। ইনি ছিলেন গোমরুণের ওলন্দাজ ফ্যাক্টরীর সভাপতি। তাঁদের সেই সন্দেহের নিরসন হতে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা প্রত্যাহার করে নেন। আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তাঁরা লজ্জিত হন।

অধ্যায় বাইশ

গ্রন্থকারের বন্‌তমের রাজার সংগে সাক্ষাৎকার ও নানা দুঃসাহসিক কার্য্যের বিবরণী।

বাটাভিয়াতে অত্যধিক দুর্ব্যবহার পেয়ে আমি স্থির করেছিলাম বন্‌তমের রাজার সংগে দেখা করবো। আমার সহোদর ভ্রাতাকেও সংগে নিলাম। কারণ, তিনি স্থানীয় মালয়ী ভাষা জানতেন। প্রাচ্য অঞ্চলে এই ভাষাটি আমাদের ইউরোপে প্রচলিত লাটিন ভাষার মত সর্বত্র বিদিত। বন্‌তমে পৌঁছে ছোট একটি নৌকা ভাড়া করে আমরা সর্বাগ্রে ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষের সংগে দেখা করতে যাই। তিনি সৌজন্য প্রদর্শন করে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন।

পরদিন আমি ভাইকে পাঠিয়ে দিলাম রাজ প্রাসাদ থেকে খবর আনার জন্য যে কখন আমি রাজাকে সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ পাব। রাজা তাঁকে দেখেই (পরিচিত ছিলেন) আর ফিরে আসতে দিলেন না। পরন্তু আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা এসে আমাকে বললেন যে আমার সংগে যদি কোনও দুষ্প্রাপ্য মণিরত্ন থাকে তবে তা নিয়ে গেলে রাজার প্রতি যোগ্য সৌজন্য প্রদর্শন করা হবে।

ভাই ফিরে এলেন না। অতএব আমি রাজার সংগে দেখা করতে যাওয়া স্থগিত রাখলাম। কারণ তখন আমার মনে পড়েছিল যে অচিনের রাজা সিয়ররেনডের সংগে কি প্রকার ব্যবহার করেছেন। ফরাসীরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে তিনখানি বিরাট ও আর একটি আট বন্দুক সমন্বিত জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন ও-দেশে কাজে লাগানোর জন্য। জাহাজগুলি অতি দ্রুত গিয়েছিল। সে রকম দ্রুততার কথা বড় শোনা যায় না। চার মাসেরও অনধিক সময়ে ওরা বন্‌তমে পৌঁছয়। রাজা সৌজন্য সহকারে ওদের অভ্যর্থনা জানান আর যত ইচ্ছে লঙ্কা জাহাজে বোঝাই করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। ওলন্দাজদের কাছে যে দামে তিনি লঙ্কা বিক্রী করেছিলেন তার চেয়ে শতকরা বিশভাগ সস্তাদরে এদের দিলেন। কিন্তু ফরাসীরা কেবলমাত্র লঙ্কার জন্যই ওখানে যাননি। তাঁরা ছোট জাহাজ ও টাকাকড়ির অধিকাংশ পাঠিয়ে দিলেন মাক্কাসারে লবঙ্গ, জায়ফল ও জৈত্রীর বাজার পরখ করার জন্য।

ফরাসীরা বনৃতমের কাজ এত দ্রুত সমাধা করলেন যে মাক্কাসাবে প্রেরিত ছোট জাহাজটির প্রত্যাবর্তন অবধি অপেক্ষা করার মত ধৈর্য তাঁদের ছিলনা। পরন্তু আনন্দ লাভের জন্য বাটাভিয়াতে যাবার মনস্থ করলেন। বনৃতম ও বাটাভিয়ার মধ্যে দূরত্ব বিশ কি বাইশ মাইল আন্দাজ। হাওয়া অনুকূল হলে এক জোয়ারেই পৌঁছোনো যায়। তাঁরা সেখানে পৌঁছতেই ফরাসী নৌবহরের অধ্যক্ষ বাটাভিয়াস্থ জেনারেলকে অভিনন্দন পাঠালেন। বিনিময়ে ত্রুটী করেন নি। নৌবহরের অধ্যক্ষকে তিনি তীরভূমিতে আমন্ত্রণ জানালেন। অধিকন্তু তিনি জাহাজের লোকদের অত্যধিক উৎসাহ-বাণী ও যথেষ্ট স্পেনীয় সুরা পাঠিয়েছিলেন। যারা তা নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের বলে দিলেন ফরাসীদের অতিমাত্রায় পানোন্মত্ত করে তুলতে। আরও একটি নির্দেশ ছিল যা বাইরে কাউকে জানানো হয় নি।

তাঁর হুকুম-নির্দেশ এত সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়েছিল যে তারা সহজেই গোপন সংকেত অনুযায়ী জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। জেনারেলের কক্ষের জানালা দিয়ে অগ্নিশিখা দেখে ওলন্দাজরা অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের ভান করলো। কিন্তু ফরাসী নৌধ্যক্ষ সেই বিশ্বাস ঘাতকতার প্রকৃত কারণ কি এবং কে তার নায়ক তা অনুমান করে কোম্পানীর লোকদের ডেকে বললেন এবং বেশ সাহ্‌ সের সংগে বললেন—"এস সকলে পান করি। যারা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের শাস্তি পেতে হবে।" ওদিকে সমস্ত ফরাসী জাহাজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। জাহাজের লোকদের উদ্ধারের জন্যে প্রেরিত নৌকাতে চড়ে তারা প্রাণে বাঁচলেন। সেই ঘটনার পরে বাটাভিয়ার জেনারেল তাদের অনেক সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছেন। অতঃপর তারা বাটাভিয়াতে ফিরে চলে গেলেন সেই ছোট জাহাজটির আশাতে। জাহাজটি ফিরে আসতে মালপত্রশুদ্ধ সেটিকে বিক্রী করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। আর তা বিক্রী করতে হয় ইংরেজদের কাছে। স্বতন্ত্র চুক্তি অনুসারে তারা সকলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ কড়ি বাঁটোয়ারা করে নেন।

কিন্তু তাঁরা (ওলন্দাজ) ইংরেজদের সংগে যে চাতুরী খেলেছিলেন তা আরও জঘন্য রকমের। ইংরেজরাই সর্বাগ্রে সুরাট, মসলীপত্তন ও অন্যান্য দূরবর্তী স্থানসমূহ থেকে জাপান পর্যন্ত জাহাজ চালিয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। বাতাসের গতি প্রতিকূল হলেও তাঁরা কোথাও যাত্রা বিরতি

করেননি। পরন্তু তাঁরা ফরমোসা দ্বীপে একটি কেল্লা তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তার ফলে অনেক জাহাজই কেবল বিপন্মুক্ত হয়নি, বরং প্রচুর লাভবান হয়েছিল তখন ওলন্দাজদের মনে হোল যে ইংরাজরা চমৎকার একটি সুযোগ ও সুবিধামত স্থান পেয়েছেন। ফরমোসা হোল এমন একটি জায়গা যেখানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারবে। তারা আরও উপলব্ধি করলেন যে ইংরেজদের হাত থেকে জায়গাটি বলপূর্বক হস্তগত করা যাবে না। তখন তাঁরা একটি ফন্দী আঁটলেন। আর দুখানি জাহাজ পাঠালেন উৎকৃষ্টতম সৈন্যবহরকে তাতে স্থান দিয়ে। তারা এমন ভাব দেখাবেন যে ঝড়ের মুখে পড়েই ফরমোজা পোতাশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। জাহাজগুলির মাস্তুল ভেঙ্গে জাহাজের পাটাতনে যেন পড়ে আছে। পালগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। মাঝিমাল্লারাও আপাতঃ দৃষ্টিতে অসুস্থ।

ইংরেজরা ওদের দুঃখ দুর্দশায় বাহ্যতঃ সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে উক্ত জাহাজের অধিকর্তাকে তীরে আহ্বান করলেন। খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তারাও এজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। অসুস্থতার ভান করে যত সংখ্যক সম্ভব লোক লস্কর সহ তাঁরা উঠে গেলেন। তাঁদের অধ্যক্ষ যেসময় ইংরেজ অধিকর্তার সংগে সান্ধ্যভোজনে রত ছিলেন তখন যথেষ্ট সুরাপানের ব্যবস্থা ছিল। ওলন্দাজরা যখন দেখলেন যে ইংরেজরা অতিমাত্রায় সুরা পানে মগ্ন তখন তাঁর কেল্লার অধিনায়কের সংগে একটা ঝগড়া বিরোধের সূত্রপাত করলেন। গায়ের কোটের অন্তরাল থেকে তলোয়ার বের করে তাঁরা কেল্লার সমস্ত সৈন্যদের বিস্মিত করে সকলের শিরচ্ছেদ করলেন। এই করে তাঁরা কেল্লা অধিকার করলেন। যতদিন না চৈনিকরা এসে তাঁদের স্থানচ্যুত করেছিলেন ততদিন উহা তাঁরা আয়ত্বে রেখেছিলেন।

এখন অচিনের রাজা কিভাবে সিয়ররেনডের সংগে চতুরতা ও চালাকি করেছিলেন তা বিবৃত করি। সিয়ররেনডের কাছে ছিল উৎকৃষ্ট সব মণি রত্নের বহর। তিনি অচিনে পৌঁছোলেন। নিয়ম ছিল বণিকদের সংগে যেমনি রত্ন থাকবে তা ওখানে পৌঁছেই রাজাকে দেখাবে। সিয়রের প্রদর্শিত জিনিসের মধ্যে চারটি আংটির দিকে তাঁর নজর পড়তেই তিনি পনের হাজার ক্রাউন মুদ্রা মূল্য দিয়ে তা সংগ্রহ করতে চাইলেন। কিন্তু রেনডের দাবী ছিল আঠার হাজার ক্রাউন। মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত না হওয়াতে রেনড তা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যান। তাতে রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হন। 'পরদিন

তিনি আবার রেনডকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ফিরে এলে তাকে আঠার হাজার মুদ্রাই দিলেন। কিন্তু তারপরে রেনডকে আর দেখা যায়নি। সকলের ধারণা যে তাকে গুপ্তভাবে প্রাসাদের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়েছিল।

আমার জন্য প্রেরিত লোকদের সংগে যখন আমার ভাই ফিরে এলেন না তখন আমার মনে সেই ঘটনার স্মৃতি জেগে উঠলো। যাইহোক, আমি বারো-তের হাজার টাকা মূল্যের মণিরত্ন সংগে নিয়ে যাবার সংকল্প করলাম। জিনিসগুলির অধিকাংশ ছিল গোলাপ হীরার আংটি। কয়েকটি আংটিতে সাত, নয় ও এগারটি করে পাথর ছিল বসানো। আরও ছিল হীরা ও চুনীর ছোট কয়েকটি বালা।

আমি গিয়ে দেখি রাজার পাশে তার তিনজন সেনাপতি ও আমার ভ্রাতা বসে আছেন প্রাচ্যরীতির আসনভঙ্গীতে। আর তাদের সামনে দেখা গেল বড়বড় পাঁচটি থালাতে নানা রঙের ভাত। পানীয় হিসেবে ছিল স্পেনীয় মদ্য, তীব্র স্বাদের জল ও নানারকম সরবত। রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে আমি তার সামনে উপস্থিত করলাম একটি হীরার ও একটি নীল স্যাফায়ারের আংটি এবং হীরা, চুনী ও নীল স্যাফায়ার বসানো ছোট একটি বালা। তিনি আমাকে বসতে বললেন। তারপর আমাকে এক গ্লাস কড়া পানীয় গ্রহণ করতে বললেন ক্ষুধা উদ্রেকের জন্যে। গ্লাসটির এক চতুর্থাংশ পিন্ট জাতীয় জিনিস ছিল। আমি তা পান করতে অসম্মত হলাম। রাজা তাতে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। আমার ভ্রাতা তাকে বললেন যে আমি কোন তীব্র পানীয় গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নই। তখন তিনি আমাকে 'স্যাক্' ধরণের এক গ্লাস পানীয় দিতে নির্দেশ দিলেন।

অবশেষে তিনি উঠে গিয়ে একটি চেয়ারে বসলেন। যেখানে কনুই ন্যস্ত করলেন তা গিলটি করা। তার হাত-পা ছিল উন্মুক্ত। সোনালী জরি ও রেশমে তৈরী একটি পারসীক কার্পেটে পা রেখে তিনি বসেছিলেন। তার পরনে ছিল একখণ্ড সূতিবস্ত্র। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছিল আবৃত। কাপড়ের বাকি অংশ কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে ঝোলানো ছিল উত্তরীয় আকারে। জুতার বদলে পায়ে ছিল চপ্পল বা খড়ম। ওর ফিতা সোনা ও ছোট ছোট মুক্তার নক্সামণ্ডিত। তার মাথায় একটি পটি বা ফিতার মত করে বাঁধা ছিল ত্রিকোণাকারে রুমাল ধরণের একটি জিনিস। চুল লম্বা, তা জড়িয়ে-পাকিয়ে মাথার উপরে বাঁধা ছিল। ময়ূর পালকের লম্বা পাখা নিয়ে দুজন

লোক তার পেছনে দাঁড়ান। পাখাগুলির হাতল পাঁচ ছয় ফুট লম্বা তার ডান পাশে একজন কৃষ্ণকায় বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিলেন। তার (বৃদ্ধার) হাতে ক্ষুদ্র একটি হামাল দিস্তা। তার মধ্যে পানসুপারী ইত্যাদি চূর্ণ করে তিনি রাজার কাঁধের পাশ ধরে এগিয়ে দেন। রাজা মুখ খুলে হাঁ করে তা গ্রহণ করেন। মহিলারা যেমন করে শিশুদের খাওয়ান ঠিক তেমনি করে বৃদ্ধা রাজাকে তাম্বুল সেবা করালেন। অতিরিক্ত পান তামাক খাওয়ার ফলে তার সমস্ত দাঁত পড়ে গিয়েছে।

বনতমের রাজপ্রাসাদ কখনও কোনও নৈপুণ্যময় স্থাপত্যরীতিতে তৈরী হয়নি। চতুষ্কোণ স্থান, নানা রঙ্-এ রঞ্জিত স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত। রাজা তাতে হেলান দিয়ে বসেন। চার কোণে চারটি সুবৃহৎ স্তম্ভ মাটিতে বিশেষ-ভাবে প্রোথিত। একটি থেকে আর একটি চল্লিশ ফুট ব্যবধানে। বিশেষ একটি গাছের বাকল দিয়ে স্তম্ভগুলির দেহ আবৃত। তা এত মিহি যে মনে হয় সূক্ষ্ম কাপড়। ঘরের চালা নারকেল পাতার তৈরী। অনতিদূরে আর একটি চালা আছে। তা বড় বড় চারটি স্তম্ভে ন্যস্ত। রাজার ব্যক্তিগত হাতি ষোলটি। শ্রেষ্ঠতমটি রাজার কাজে ব্যবহৃত হয়। আরও অনেক হাতী আছে যুদ্ধের জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত। ওরা ভয়ংকর অগ্নিশিখা দেখেও ভয় পায় না। রাজার রক্ষীদলে প্রায় দুই হাজার লোক নিযুক্ত আছেন। এরা জলে স্থলে উভয়তঃ উত্তম সৈনিক। তারা উচ্চ পর্যায়ের মুসলমান। মৃত্যুকে তারা একেবারেই ভয় করে না।

রাজার অন্তঃপুর বা হারেম অতি ক্ষুদ্রাকার। আমার মণিরত্নাদি দেখে রাজা দু'জন বৃদ্ধা মহিলাকে ডেকে কিছু রত্ন তাদের হাতে দিয়ে বেগমদের দেখাতে বললেন। তারা ছোট একটি সামান্য দরজা পেরিয়ে চলে গেলেন। বাড়ীর দেয়াল মাটি ও গোময় দিয়ে তৈরী সামান্য আবরণ ছাড়া আর কিছু নয়। বেগমদের কাছে যা পাঠানো হয়েছিল তার কিছুই ফেরত আসেনি। আমি ভেবেছিলাম জিনিসগুলির জন্য উত্তম মূল্য পাওয়া যাবে। বস্তুতঃই তা হয়েছিল। আমি রাজার কাছে যা, যা বিক্রী করেছি তাতেই আমার যথেষ্ট লাভ হয়েছে। তিনি আমার পাওনা গণ্ডা ভালভাবেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কাজ শেষ হয়ে যেতে আমরা বিদায় নিলাম।

কিন্তু রাজা পরদিন সন্ধ্যায় আবার আমাদের যেতে অনুরোধ জানালেন। কারণ, তিনি আমাদের একটি তুর্কী ছুরিকা দেখাতে আগ্রহী ছিলেন। সেটির

বাটে তেমন বেশী কিছু হীরা বসানো ছিল না। তিনি উহাতে আরও পাথর বসিয়ে সুন্দর করতে চেয়েছিলেন। কাজ সেরে ইংরেজদের কুবীতে ফিরে এলাম। তাঁরা তো শুনে অবাক যে রাজা এই বাবদে প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। তাঁদের ধারণা হোল যে রাজার ধনসম্পদের মধ্যে উহাই হবে শ্রেষ্ঠ অংশ।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে আমি ভাইকে সংগে নিয়ে রাজার সংগে আবার দেখা করতে যাই। গিয়ে দেখি তিনি পূর্বেকার মতই যথাস্থানে বসে আছেন। জনৈক মোল্লা তাঁর সামনে বসে কিছু পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন। মনে হোল কোরাণের কোনও অংশ পাঠ কচ্ছিলেন। পাঠান্তে রাজা ও মোল্লা উভয়ে চলে গেলেন নমাজে। নমাজ শেষ করে এসে তিনি খাপসহ ছুরিকাটি আনার জন্য লোক পাঠালেন। খাপটি সোনার। বাটের মাথা হীরক মণ্ডিত। ক্রুশের মত উপরাংশ পল কাটা। বাটের মূল্য পনের যোল হাজার ক্রাউনের কম হবে না। রাজা বললেন, বোর্নিয়োর রাণী ওটি তাঁকে উপহার দিয়ে-ছিলেন। জিনিসটি তৈরী হয়েছে গোয়াতে। আমার অনুমানের চের উর্দ্ধে তিনি উহার মূল্যমান স্থাপন করলেন। ছুরিকা ও খাপ দুটিতেই প্রচুর খাঁজ কাটা ছিল।

কিন্তু রাজার কাছে হীরা ও অন্য মণিরত্ন এমন কিছু ছিল না যা দ্বারা সেই ফাঁকা জায়গাগুলি পূর্ণ করা যেতে পারে। সুতরাং তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যাতে স্বল্প মূল্যে পাথর সংগ্রহ করে জিনিসটিকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করি। আমি বললাম, পূর্বে কাটা খাঁজের উপযুক্ত রত্নাদি পাওয়া অসম্ভব। তবে তাঁর কাছে যে সকল মণিরত্ন আছে তার মধ্যে যা ওখানে বসবে ও মানাবে তা বসিয়ে নিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সমুদয় পাথরকে মোমের মধ্যে সাজিয়ে নিতে হবে। আমি তাঁকে সেই কাজের প্রণালী দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু ও করার মত নৈপুণ্য ও শক্তি কারোর ছিল না। কাজেই আমি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললাম যে তাঁর উচিত হচ্ছে ছুরিকাটি আমাকে বাটাভিয়াতে নিয়ে যাবার অনুমতি দান করা। এই কথা বলে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

অধ্যায় তেইশ

গ্রন্থকারের বাটাভিয়াতে প্রত্যাবর্তন। বনতমের রাজার সংগে পুনরায় সাক্ষাৎ। মক্কা প্রত্যাগত কিছু সংখ্যক ফকিরের অসদাচরণের বিবরণ।

রাত্রি এগারটায় আমরা বাটাভিয়ার জন্য জাহাজে আরোহণ করি। রাত্রিতে প্রবাহিত স্থল বায়ুই একমাত্র আমাদের যাত্রার অনুকূল। তার ফলে আমরা পরদিন বেলা দশ-এগারটার সময় বাটাভিয়াতে পৌঁছে যাই। বনতমের রাজার জন্যই আমাকে বিশদিন ওখানে কাটাতে হয়। আর তাঁকে উপলব্ধি করাতে হয় যে আমি তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসের সন্ধান করেছি। আমি এও জানতাম যে তা পাওয়া অসম্ভব। ওখানে অবস্থানকালে আমার কিছু করার ছিলনা। কারণ, বাটাভিয়াতে জুয়া খেলা ও সুরাপান ব্যতীত আর কোনও বিনোদন ব্যবস্থা নেই। আমার পক্ষে উহার কোনটিই উপযুক্ত ছিলনা। সেই সময় সিয়র কান্ট পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন ভারতে অবস্থিত কোম্পানীর একজন পরামর্শ দাতা। তিনি কোম্পানীর কাজ অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং বিশেষ সমারোহ ও মর্য্যাদা সহকারে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু লোক মুখে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ শোনা গেল। তিনি সৈন্যবাহিনী ও জাহাজীদের সংগে ন্যায় সংগত ব্যবহার করেননি।

বিশদিন বাটাভিয়াতে কাটিয়ে আমি আবার বনতমে ফিরে গিয়ে রাজাকে ছুরিকাটি ফেরত দেবার মনস্থ করেছিলাম। কেননা, তাঁর ছুরিকাতে খোদিত খাঁজের উপযোগী মণিরত্ন পাওয়া যায় নি। আমি অবশ্য অন্য ধরণের কিছু পাথর সংগে নিয়েছিলাম যে রকমটি তিনি দেখার সুযোগ পাননি। বন্তমে ফিরে যেতে রাজা আমাদের তাঁর নিজস্ব একটি বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাড়ীটি বাঁশের তৈরী। ওখানে পৌঁছবার আধঘন্টা পরেই রাজা আমাদের কয়েকটি সুমিষ্ট তরমুজ পাঠিয়ে দিলেন। ফলগুলির ভিতরাংশে টুকটুকে লাল। আমাদের সংগে ছিল আম এবং আরও একপ্রকার লম্বা গড়নের ফল, নাম পমপোন্। তারও ভেতরটা লাল। এ-জিনিসও খুব নরম এবং রসাল। স্বাদ অতি চমৎকার। ক্ষুধা নিবৃত্তি করে আমরা রাজার সংগে দেখা করতে চাই। এবারেও সেই পুরোনো জায়গাতে তাঁকে উপবিষ্ট দেখলাম।

তাঁর পাশে রয়েছেন পান তৈরীর সরঞ্জামসহ সেই প্রবীণা নারী। তিনি মাঝে মাঝে নিজ হাতে রাজাকে পান খাওয়াচ্ছেন। কক্ষটির ওধারে পাঁচ-ছয়জন সেনাপতি বসে কয়েকটি বাজীর বাণ্ডিল পরখ করছেন। তার মধ্যে জলে চালানোব উপযুক্ত নানাপ্রকার বাজী ছিল। চীনদেশ থেকে তা আনা হয়েছিল। সমগ্র পৃথিবীতে এই জাতীয় বাজী তৈরীতে চীন অগ্রণী। রাজার অবকাশ বুঝে আমি ছুরিকাটি তাঁকে ফেরত দিলাম। আর জানিয়ে দিলাম যে বাটাভিয়াতে উহার যোগ্য কোনও পাথর পাওয়া যায় নি। আর যদি বা কিছু পাওয়া যায় তা ন্যায্য মূল্যের দ্বিগুণ দরে কিনতে হবে। সুতরাং এরজন্য গোলকুণ্ডা ও গোয়া বা হীরকখনি অঞ্চল হোল প্রকৃত যোগ্যস্থান। তখন প্রধানা মহিলা ছুরিকাটি নিয়ে হারেমে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা সে সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। তারপর আমি তাঁর জন্য যে সকল মণিরত্ন নিয়ে গিয়েছিলাম তা দেখালাম এবং তিনি আমার পক্ষে লাভজনক মূল্য দিয়ে তা কিনলেন। পরদিন গিয়ে টাকা কড়ি নিয়ে আসতে বললেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ছয়টার সময় আমি, আমার ভাই ও জনৈক ওলন্দাজ (সার্জন) একত্রে একটি সংকীর্ণ গলি পথ ধরে এগিয়ে চলেছিলাম। রাস্তাটির একধারে নদী, অন্যদিকে বিরাট একটি উদ্যানের বেড়া ও খুঁটি। সেই বেড়ার আড়ালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধরণের বন্যতমবাসী লুকিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে একজন সম্প্রতি মক্কা থেকে ওখানে এসেছিল। তারা এমন একটি অভিনব পন্থায় শিক্ষিত হয়ে এসেছিল যা দ্বারা অ-মুসলমানদের সহজে হত্যা করা যায়। মক্কা থেকে এমন একপ্রকার ছুরিকা নিয়ে এসেছিল যার ফলাটির অর্ধেক অংশ বিষাক্ত। উক্ত ছুরিকা নিয়ে তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, আর অ-মুসলমানদের দেখলেই হত্যা করে। সেই ঘৃণ্য কাজকে তারা মনে করে ঈশ্বর ও মহম্মদ দু'জনকেই উত্তমরূপের সেবা স্বরূপ। সেই দুষ্ট প্রকৃতির লোকেদের মধ্যে একটির প্রাণ বিয়োগ হলে মুসলমানরা তাকে সাধু-সন্তের মত মর্যাদা সহকারে সমাহিত করেন। তার একটি সমাধি স্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রত্যেকেই কিছু না কিছু অর্থ দান করেন।

কখনও দেখা যাবে এই জাতীয় দুর্বৃত্তদের কেউ হয়ত দরবেশের মত জীবন যাপন কচ্ছে। সমাধিক্ষেত্রের পাশে তার জন্য কুটিরও নির্মিত হয়। সেখান থেকে সে মৃত ব্যক্তিদের সমাধিতে পুষ্প বর্ষণ করে। ক্রমে ক্রমে তার প্রাপ্য দান খয়রাত বৃদ্ধি পেলে সে আবার সেই সমাধিক্ষেত্রে নতুন কিছু অলঙ্কার

যোজনা করেন। এর কারণ, সমাধি সৌধ যত সুন্দর ও আড়ম্বরপূর্ণ হবে তার প্রাপ্য দান উপহারের মাত্রাও তত বাড়বে।

আমার স্মরণ আছে যে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে সুরাট বন্দরের সউয়ালিতে মুঘল বাদশার একটি জাহাজ মক্কা থেকে ফিরে এল প্রচুর ফকির বা দরবেশ নিয়ে। প্রতি বছরই বাদশাহ দু'খানি জাহাজের ব্যবস্থা করতেন তীর্থ যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য। যাত্রীদের তার জন্য কোনও অর্থ ব্যয় করতে হোতনা। যাত্রার দিন আসন্ন হলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ফকির সম্প্রদায় এসে জড় হতেন জাহাজে আরোহণের জন্য। জাহাজে নানা উৎকৃষ্ট জিনিসপত্রও বোঝাই করা হোত। তা মক্কায় বিক্রী করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তাতে যা লাভ হোত তা যাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেবার নিয়ম ছিল। তবে মূলধনের অঙ্ক ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা ছিল পরবর্তী বছরের কাজে খাটানোর জন্য। মূলধনের পরিমাণ প্রায় ছয় সাত হাজার টাকা। পণ্য বিক্রী করে শতকরা ত্রিশ চল্লিশ ভাগ লাভ না হলে বাজার খারাপ বলতে হবে। তবে এমন জিনিসও আবার থাকে যাতে শতকরা একশত ভাগই লাভ হয়। এছাড়া আরও সব মূল্যবান জিনিসপত্র উক্ত জাহাজে থাকে। মুঘল প্রাসাদের বিশিষ্ট ও মুখ্য ব্যক্তিরা এবং আরও সব সম্ভ্রান্ত লোকেরা অনেক উৎকৃষ্ট ও বহুসংখ্যক উপহার দ্রব্যও মক্কাতে পাঠিয়ে থাকেন।

এই ধরণের জনৈক ফকির ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে মক্কা প্রত্যাগত হয়ে সউয়ালিতে নেমেই নমাজ করলেন। আর তা শেষ করেই তিনি একটি ছোরা নিয়ে জাহাজের মাল খালাসরত কতিপয় ওলন্দাজের দিকে ছুটে যান। তারা এ বিষয়ে সজাগ হওয়ার আগেই তিনি তাদের সতের জনকে আঘাত করে ফেলেন। তন্মধ্যে তের জন মৃত্যুমুখে পতিত হন। আততায়ীর হাতে যে খঞ্জরটি ছিল সেটি এক ধরণের ছুরিকাই বটে। কিন্তু তার ফলা বাটের দিকে তিন আঙুল চওড়া এবং অত্যন্ত ভয়ংকর রকমের অস্ত্র। গভর্ণর ও ব্যবসায়ীদের নিকটবর্তী তাঁবুতে প্রহরারত সান্ত্রী আততায়ীকে গুলী বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। তৎক্ষণাৎ ফকির গোষ্ঠীর অন্যান্যরা ও সাধারণ মুসলমানগণ এসে মৃত দেহকে সমাহিত করলেন। পনের দিন পরে সেখানে নির্মিত হয়েছিল মনোরম একটি স্মৃতি সৌধ। প্রতি বছরই ইংরেজ ও ওলন্দাজরা সেটিকে উৎপাটিত করেন। কিন্তু তাঁরা স্থান ত্যাগ করলে আবার তা তৈরী

হয়। তার উপরে পতাকাও উড্ডীন হয়। কেবল তাই নয়, মুসলমানরা সেখানে নমাজও সম্পন্ন করেন।

বন্তমের ফকির প্রসংগে পুনরায় ফিরে যাওয়া যাক্। পূর্বে আলোচিত সেই বেড়ার আড়ালে লুক্কায়িত আছে দুর্বৃত্ত। আর আমি, আমার ভাই ও ওলন্দাজ সার্জন, তিনজন একত্রে একেবারে গায়ে গায়ে মিশে এগিয়ে চললাম। তখুনি সে বেড়ার মধ্যে হাতের বর্শাটি বিঁধে দিল এমনভাবে যে তা আমাদের একজনার বুকে বিদ্ধ হতে পারতো। ওলন্দাজটি নদীর দিকে এবং আমাদের সামনে থাকায় বর্শার ফলাটি তাঁর পাজামায় বিদ্ধ হোল। আমরা দুজনে বর্শাটি ধরে ফেললাম। আমার ভাই বেড়ার পাশে ছিলেন। তিনি তখুনি লাফিয়ে গিয়ে ফকিরকে বর্শা বিদ্ধ করলেন। তার মৃত্যু ঘটলো। তখন অনেক সৈনিক ও হিন্দুরা এসে আমার ভ্রাতাকে সেই হনন কার্যের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। সেই শোচনীয় ঘটনার পরে আমরা রাজার সংগে দেখা করে ভ্রাতা যা করেছেন তা অকপটে জানালাম। তিনি সব শুনে অসন্তুষ্ট হলেন না একেবারেই। পরন্তু আমার ভ্রাতাকে একটি কোমর বন্ধ উপহার দিলেন। দেখা গেল, রাজা ও তাঁর সহায়ক গভর্ণরগণ সেই দুর্বৃত্তদের মৃত্যু সংবাদ শুনলে খুসীই হন। যেহেতু তারা অতি মাত্রায় ভয় ভীতি শূন্য, নির্মম প্রকৃতির এবং জগতে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়।

পরদিন ইংরেজ অধিকর্তার কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি তখন আমাকে দুটি হীরার মালা ও দুখানি রূপার বাসন দেখালেন। জিনিসগুলি ইংলণ্ডজাত। তিনি সবকয়টি জিনিসই বিক্রী করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আমি একটি মাত্র হীরকহার খরিদ করলাম। দ্বিতীয়টি ঝুঁটা ছিল। বাটাভিয়াতে যদি রৌপ্য মুদ্রা তৈরী করার ব্যবস্থা থাকতো, তাহলে আমি রূপার থালাও কিনতাম। কিন্তু সেখানে তা করার কোনও ব্যবস্থা ছিলনা। পূর্বে ওলন্দাজরা ছোট, বড়, সিকি, ··রকম 'রিয়েল' মুদ্রা তৈরী করাতেন। তার একদিকে ছাপ পড়তো জাহাজের নক্সা, অপর পিঠে মুদ্রিত হোত ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মূলক তিনটি অক্ষর। মুদ্রা তৈরী হোত চীনাদের জন্যে। চীনারা সোনা অপেক্ষা রূপার কদর বেশী করেন। কাজেই তাঁরা বাটাভিয়াতে তৈরী সমস্ত রৌপ্য মুদ্রা উত্তম মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করে নিয়ে যান। পরে অবশ্য তাঁরা সে কাজ (মুদ্রা তৈরী) ত্যাগ করেন। কেননা, অতি অল্প সংখ্যক লোকই রূপা ব্যবহার করতেন।

অধ্যায় চব্বিশ

যাভার সম্রাটের সংগে ওলন্দাজদের যুদ্ধ-সংগ্রাম।

ইংরেজ অধ্যক্ষের কাছে বিদায় নিয়ে আমি বাটাভিয়াতে ফিরে গেলাম। ওখানে আমার তেমন কিছু কাজ না থাকাতে আমি যাভার সম্রাটের সংগে দেখা করবো মনস্থ করলাম। পূর্বে তিনি ছিলেন সমগ্র দ্বীপের অধিশ্বর। কিন্তু পরে তাঁর অধিনস্থ প্রদেশ বনৃতমের গভর্ণর বিদ্রোহ করেন। সেই বিদ্রোহে ওলন্দাজরাও জড়িয়ে পড়েছিলেন। যাভার রাজা যখন বাটাভিয়া আক্রমণ করেন তখন বনৃতমের রাজা ওলন্দাজদের সাহায্য করেন। সুতরাং বনৃতামের শাসক ওদের আক্রমণ করলে যাভার রাজা এগিয়ে যান সহায়তা দানের জন্যে। অবশেষে দুই রাজার সংঘর্ষ বাঁধলে ওলন্দাজরা দুর্বল পক্ষকেই সাহায্য দান করেন।

বাটাভিয়ার প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে যাভা নামক স্থানে (সহর) রাজার রাজধানী উপকূল ধরে সমুদ্রপথে সেখানে যাওয়া যায়। তবে রাজধানী সমুদ্র থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে। সমুদ্র ও রাজধানীর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে চমৎকার একটি রাস্তা। সমুদ্রের কিনারায় উত্তম একটি বন্দর আছে। সেখানে সহরের তুলনায় সুন্দর ও রমণীয় সব বাড়ী ঘর রয়েছে। রাজা ওখানে বাস করা নিরাপদ মনে হলে তবে থাকেন।

আমার যাত্রার পূর্বদিনে আমি জনৈক ভারতীয় পরামর্শদাতার কাছে বিদায় গ্রহণ করতে গিয়ে জানালাম যে আমি যাভার রাজার সংগে দেখা করতে চলেছি। তিনি তা শুনে তো অবাক। তার কারণ, যাভার রাজার সংগে ওলন্দাজদের ছিল মারাত্মক রকমের শত্রুতা। তিনি তার বর্ণনা দিলেন। ওলন্দাজগণ বাটাভিয়াতে কেল্লা নির্মাণ করার পরে বর্তমান রাজার পিতা ওদের সংগে আর কোনও শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক রাখেন নি। যুদ্ধের সময় যাভার পক্ষ থেকে একজন ডাচকে বন্দী করা হয়। তার বদলে ওরা দশজন যাভাবাসীকে ধরে নিয়ে যান। তারপরে অবশ্য তারা একজনকে উদ্ধারের জন্যে সেই দশজনকে মুক্তি দিতে রাজী হন। কিন্তু রাজা কোন সর্তে সেই বন্দীকে মুক্তি দিতে সম্মত হননি। পরন্তু তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সেই বন্দীকে যেন মুক্তি দান করা না হয়। প্রথা হোল,

যখন কোনও মুসলমান রাজা লোকান্তরিত হন তখন তাঁর উত্তরাধিকারী দরবারের কতিপর বিশিষ্ট উচ্চ রাজকর্মচারীকে মক্কায় পাঠান নানা উপহার দ্রব্যসহ।

তাঁরা সেখানে গিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করবেন, আর নতুন রাজা নির্বিঘ্নে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে তার জন্যে আল্লা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। তাছাড়া তিনি যাতে শত্রুদের পরাভূত করে বিজয় গৌরব অর্জন করতে পারেন তার জন্যও প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু নতুন রাজা ও মন্ত্রীসভা সমস্যায় পড়ে গেলেন যে কি প্রকারে সেই মক্কা যাত্রা সফল করবেন। প্রথমতঃ রাজার কোনও বড় জাহাজ ছিল না। ছোট জাহাজ যা ছিল তা কেবল তীর ধরেই চলতে অভ্যস্ত। এর কারণ, নৌ-চালকদের অনভিজ্ঞতা। দ্বিতীয়তঃ ওলন্দাজরা নদীর মোহনায় অনবরত এদিক, ওদিক ঘুরে বেড়ায় রাজার প্রজাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য।

তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাজা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সংগে চুক্তিবদ্ধ হলেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি বন্তমস্থিত ইংরেজ অধ্যক্ষ ও তাঁর মন্ত্রণা সভার কাছে দূত প্রেরণ করেন। তাঁরা রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভারতে কোম্পানীর যে সুসজ্জিত ও বৃহত্তম জাহাজ আছে তা তাঁকে প্রদান করবেন। এর বিনিময়ে রাজার দেশ থেকে ইংরেজ কোম্পানী যা কিছু মালপত্র আমদানী ও রপ্তানী করবেন তার জন্য শুল্ক দেবেন অর্ধেক পরিমাণ, পুরো নয়। সেই সর্ত অনুমোদিত হলে ইংরেজরা রাজাকে অসাধারণ রকমের বন্দুক গোলা ও সৈন্য সমন্বিত তিনখানি শক্তিশালী জাহাজ প্রদান করেন। অবশেষে দরবারে নয়জন প্রধান আমির-ওমরাহ, রাজবংশের অনেক লোক এবং আরও প্রায় একশত লোক মিলে সুবৃহৎ জাহাজে আরোহণ করলেন। কিন্তু তা গোপন রইল না। গুপ্তচর মাধ্যমে ওলন্দাজরা সে খবর পেয়ে গেলেন। আর তৎক্ষণাৎ ডাচ জেনারেল তিনটি জাহাজ প্রস্তুত করলেন। এবং সেগুলিকে বন্তম প্রণালীর মুখে নোঙর করালেন। তারপর ইংরেজরা ওখানে এসে পড়লে (তাঁদের আর কোন রাস্তা ছিল না) তন্মুহূর্তে ওঁরা তাঁদের ঘিরে ফেললেন। ইংরেজদের ভয় হোল হয়ত তাঁদের জাহাজগুলি ডুবে যাবে। অতএব তাঁরা যাত্রা বন্ধ করলেন।

যাভার মন্ত্রীরা তা দেখে ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতক মনে করলেন। আর নিজেদের বিষাক্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করে ইংরেজদের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়লেন। বহু সংখ্যক ইংরেজ নিহত হলেন। তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য সামান্যতম সময়ও পান নি। ওলন্দাজরা জাহাজে না এলে একটি ইংরেজও হয়ত রক্ষা পেত না। যাভার আমিরগণ ও তাঁদের প্রায় বিশজন অনুচর শত্রুর প্রতি কোনও সদয় ব্যবহার করেন নি। সুতরাং ওলন্দাজরা যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হন। তাঁরা নিজেদের সাত আটজন লোককে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত সুব্যবস্থা ও নিরাপদ অবস্থায় উপনীত হন। ইংরেজদের জাহাজ বাটাভিয়াতে পৌঁছলে সেখানকার অধ্যক্ষ অত্যন্ত শিষ্টাচার সহ বন্দীদের ও জাহাজটিকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন এবং রাজাকে জানান যে তিনি বন্দী বিনিময়ে সম্মত আছেন। রাজা কিন্তু সেই প্রস্তাবে কোন সাড়া দেন নি। ওলন্দাজদের তুলনায় রাজার প্রজা বন্দী হয়েছিল তিনগুণ বেশী। এর শেষ পরিণতি এই হয়েছিল যে সেই হতভাগ্য বন্দী ওলন্দাজদের যাভাতে দাসত্ব স্বীকার করে বাস করতে হয়েছিল। আর যাভাবাসীরা বাটাভিয়াতে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

যাভাবাসীরা সুদক্ষ সৈনিক। শোনা যায় যে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বন্তমের রাজা যখন বাটাভিয়া আক্রমণ করেন তখন একটি জলাভূমিতে অবস্থিত সৈন্য শিবিরে জনৈক যাভা সৈন্যের মনে হোল যে কোন আগন্তুক সেখানে এসেছে। তিনি তখন এগিয়ে গেলেন শত্রুকে খুঁজে বের করতে। আর তৎক্ষণাৎ একটি ওলন্দাজের বর্শায় তার দেহ বিদ্ধ হোল। যাভার সৈন্য নিজদেহ বিদ্ধ হতে সেই বর্শার ফলা টেনে বের করলেন না। পরন্তু সেইভাবে শত্রুর দিকে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে ছুরিকাঘাত করলেন।

অধ্যায় পঁচিশ

বাটাভিয়াতে গ্রন্থকারের ভ্রাতার মৃত্যু ও তাঁকে সমাধি দান। জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলে নতুন গোলযোগ।

আমার বাটাভিয়া বাসকালে আমার ভ্রাতা পরলোক গমন করেন। তাঁকে সমাহিত করার জন্য ওলন্দাজগণ আমাকে যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন তা আলোচনা করা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বিষয়। প্রথমতঃ এই ব্যাপারে ব্যয় করতে হয় যারা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করেন তাদের পারিশ্রমিক বাবদ। এই কাজে যত বেশী লোক নিয়োজিত হন সমাধিদানের ব্যাপারটা ততই গৌরবজনক ও মহনীয় বিবেচিত হয়। আমি নিয়োগ করেছিলাম ছয়জন লোককে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমাকে তাদের বাহাত্তর ক্রাউন মুদ্রা দিতে হয়েছিল। শবাচ্ছাদনের জন্য ব্যয় হয় দুই ক্রাউন। ওটি দরিদ্র লোকেদের প্রাপ্য।' সমাধিদানের সময় আমাকে খাদ্য ও সুরা সরবরাহ করতে হয়েছিল যথেষ্ট ব্যয় করে। শবাধার বহনকারীদের আমি দিয়েছিলাম বিশ ক্রাউন ; আর ষোল ক্রাউন দিতে হয়েছিল গীর্জার অঙ্গনে এক খণ্ড জমির জন্য। ওখানে সমাধিস্থ করার জন্য তারা এক শত মুদ্রা দাবী করেছিলেন। আলোচিত সমস্ত অর্থই ব্যয় হয়েছিল নানা বাবদে অর্থাৎ তাঁদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য জিনিসের মূল্য স্বরূপ। ভ্রাতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সর্বসাকুল্যে আমার ব্যয় হয়েছিল ফরাসী লিভর মুদ্রায় বারশত তেইশ।

দুটি যাত্রায় আমি যাভা ও সুমাত্রা যাবার সংকল্প করলাম। আমার টাকাকড়ি তখন ওলন্দাজ কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে ঋণপত্র বা তমসুকে খাটানোর জন্য অনেকে উপদেশ দিলেন। তাদের আর দেশে ফিরে যাবার ইচ্ছা ও কল্পনা ছিল না। তারা ইণ্ডিজ স্থায়ীভাবে বসবাস করারই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। ঋণপত্র আদান-প্রদানের কাজ তারা একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যমান ধরেই করতেন। দলিল সম্পাদনার সরকারী কর্মচারী (নোটারি পাবলিক) দ্বারা সেই ক্রয় বিক্রয় মঞ্জুরী ও তালিকাভুক্ত হয়। এই প্রথায় আমি যথেষ্ট টাকা খাটিয়ে তমসুক কিনেছিলাম। সরকারী খাজাঞ্চীখানার জনৈক এডভোকেটের সহায়তায়ও আমি কিছু টাকা খাটিয়েছিলাম। কিন্তু

কিছুদিন পরে তাঁর সংগে দেখা হতে তিনি আমাকে বললেন যে সেই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তিনি বিশেষ ঝামেলায় পড়েছেন।

এই বিষয়ে কোম্পানীর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল তাঁকে হুকুম করেছেন যে বিক্রীত সমস্ত তমসুক তাঁদের কাছে উপস্থিত করতে হবে। তার ফলে হয়ত সেই স্বল্প বেতনের কর্মচারী, যারা তমসুক পত্র দ্বারা টাকা গ্রহণ করেছেন তাদের বেতনের অনেকাংশ হারাবেন। তা শুনে আমি বললাম যে আমার প্রদত্ত অর্থ ফেরত পেলে আমি ঋণপত্রগুলি ফিরিয়ে দিতে রাজী। প্রায় ছয় সাত ঘণ্টা পরে জেনারেল ও তাঁর পরামর্শ সভা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সেখানে পৌঁছলে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করলেন যে আমি কেন ক্রয়-করা তমসুক পত্র অ্যাড্‌ভোকেটকে ফেরত দিইনি। এঁদের হুকুমেই তিনি আমার কাছে তা চেয়েছিলেন। তদুত্তরে আমি জানালাম যে আমি দেশে ফিরে চলেছি! সেই সূত্রে সমস্ত কাগজপত্র বন্‌তমে পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ ইংরেজ অধ্যক্ষ আমাকে তাঁর সংগে যাবার সুযোগ দেবেন বলে প্রস্তাব দিয়েছেন। পরামর্শ সভার সভ্যরা বললেন যে ওলন্দাজ জাহাজ বৃটিশ জাহাজের মতই উৎকৃষ্ট।

তাঁরা বিশেষ সৌজন্য সহকারে আরও বললেন যে আমার জন্য ভাইস্ অ্যাড্‌মিরালে একটি কেবিনের ব্যবস্থা হবে। তবে কথা হোল যে আমি স্থান ত্যাগ করার আগে সেই তমসুকপত্রগুলি অবশ্যই তাঁদের দিতে হবে। তাঁরা আশ্বাস দিলেন যে তখন তাঁরা আমাকে একটি বিল দেবেন যার বিনিময়ে হল্যাণ্ড কোম্পানী আমার প্রাপ্য টাকাকড়ি পরিশোধ করবেন। ব্যাপারটা কিন্তু আমার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কেননা, ওঁরা কতখানি বিশ্বাস-যোগ্য তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু দেখলাম, ব্যবসায়ী, কোম্পানীর কমাণ্ডার এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা সকলেই এক ফাঁদে পড়েছেন। যাঁরাই তমসুক কিনেছেন তাঁদের কাছ থেকেই জোর করে তা ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। তা দেখে আমার মনে হোল যে কাগজগুলি ফিরিয়ে দিয়ে ওঁদের সৌজন্য সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। আমি পুনঃ পুনঃ জেনারেল ও কাউন্সিলকে অনুরোধ করলাম আমাকে বিল প্রদানের জন্য। কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করে জেনারেল বললেন যে আমি হল্যাণ্ডে পৌঁছলে তা আমাকে দেয়া হবে। তখন নিরুপায় হয়ে ভাইস্ অ্যাড্‌মিরাল এবং আরও কয়েক ব্যক্তিকে জেনারেলের প্রতিশ্রুতির সাক্ষী রেখে আমি তাঁদের কাছে বিদায় নিলাম। বাটাভিয়াতে যাবার জন্য-অতি মাত্রায় অনুশোচনা ও মর্মপীড়া অনুভব করতে হোল।

অধ্যায় ছাব্বিশ

ইউরোপে প্রত্যাবর্তনের জন্য গ্রন্থকারের ওলন্দাজ জাহাজে আরোহণ।

পরদিন আমি ভাইস্ অ্যাড্‌মিরালে আরোহণ করলাম। তিনদিন পরে জাহাজ ছাড়লো। প্রণালীটি পার হতেই আমরা রাজাদের দ্বীপপুঞ্জ দেখতে পেলাম। সেখান থেকে কোকো দ্বীপপুঞ্জের দিকে এগিয়ে প্রায় দুদিন চেষ্টা করা হোল উহাকে খুঁজে বের করার জন্য। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। তখন জাহাজ সরাসরি উত্তমাশা অন্তরীপ অভিমুখে যাত্রা করলো।

বাটাভিয়া ত্যাগ করার পরে পঁয়তাল্লিশ দিন কেটে গেলেও জাহাজের বাতি নেবানো হয়নি। কারণ মনে হয়েছিল যে সমস্ত নৌবহরই অন্তরীপের দিকে চলেছে। একটি জাহাজ আবার পেছনে কোনও বাতির ব্যবস্থা রাখেনি। রাত্রি ছিল ঘোর অন্ধকার। সেই জাহাজটি আমাদের জাহাজের ক্ষতি সাধনে উদ্যত হোল। সকলে তখন প্রার্থনা শুরু করলেন। যাত্রীদের মনে হোল জাহাজ নিমজ্জনের পথে। বস্তুতঃ আমাদের জাহাজটি যদি অতি শক্তিশালী ও সুগঠিত না হোত, তাহলে সেই ভয়ংকর ধাক্কা সামলাতে পারতো না। অবশেষে আমরা দড়িদড়ায় আবদ্ধ পাল ইত্যাদি সব কেটে জাহাজকে পরিষ্কার করলাম।

পঞ্চান্নদিন যাত্রার পর উত্তমাশা অন্তরীপ দেখা গেল। কিন্তু আমরা সমুদ্রবক্ষে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কেননা, সমুদ্রে এত উত্তাল তরঙ্গ ছিল যে আমরা কোন প্রকারেই নোঙর করতে পারিনি। বাতাস যে খুব প্রবল ছিল তা নয়। দক্ষিণে হাওয়া এত দীর্ঘ সময় ধরে বয়ে চলেছিল যে জলস্রোত বিপরীত মুখে প্রবাহিত হতে বাধ্য হয়। সমুদ্র শান্ত হলে আমরা তীরে নোঙর করার জন্য এগিয়ে গেলাম।

আমার সমগ্র ভ্রমণ যাত্রায় যত রকমের লোক দেখেছি তার মধ্যে কোমোউকদের মত বীভৎস ও বর্বরোচিত চেহারার মানুষ কখনও দেখিনি। এদের কথা আমি আমার পারস্য ভ্রমণ বৃত্তান্তে বর্ণনা করেছি। উত্তমাশা অন্তরীপের মানবগোষ্ঠীকে বলা হয় কাফ্রী। কথা বলার সময় তারা বাতাসের গতি ভিন্ন মুখে চলার মত জিহ্বার মাধ্যমে একটা গোলমাল সূচক শব্দ সৃষ্টি করে। তারা খুব কচ্চিৎ কখনও সুবিন্যস্তভাবে শব্দ উচ্চারণ করে। তথাপি

পরস্পর তা সহজেই বুঝতে পারে। বনে-জঙ্গলে জন্তু জানোয়ার হত্যা করে তাদের চামড়া দিয়ে তারা দেহ আচ্ছাদন করে। শীতকালে চামড়ার যে অংশ রোমাকীর্ণ তা দেহের সংগে চেপে জড়িয়ে রাখে। আর গ্রীষ্মকালে আলগাভাবে চামড়াটি গায়ে ছড়িয়ে দেয়। সমাজে যারা উচ্চ পর্যায়ের তারাই এই প্রকারে দেহ আবৃত করেন। বাকি সকলে বিশেষ কিছু পরিধান করেন না। কোনও রকমে একখণ্ড কিছু দ্বারা মোটামুটি লজ্জা নিবারণ করা হয়। নারী পুরুষ উভয়েই বেঁটে ও ক্ষীণ দেহ। একটি পুত্র সন্তান জন্মালেই শিশুর অণ্ডকোষের ডান অংশটি কেটে ফেলা হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগে শিশুকে জলপান করতে ও তামাক খেতে দেবার প্রথা। অণ্ড কোষাংশ কেটে ফেলার কারণ তারা বলেন যে তার ফলে ওরা খুব দ্রুত দৌড়তে পারবে। ওদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকে যারা দ্রুতগামী হরিণকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরতে পারে। সোনা-রূপা যে কি বস্তু তা এরা জানে না। ধর্ম বলতে ওদের কিছু নেই

জাহাজ নোঙর ফেলতেই চারজন মহিলা জাহাজে উঠে এলেন। তারা আমাদের জন্য এনেছিলেন চারটি শিশু অস্ট্রিচ। তার মাংস সিদ্ধ করা হয়েছিল জাহাজস্থিত কয়েকজন পীড়িত লোকের জন্য। তারা পরে আরও নিয়ে এসেছিলেন প্রচুর কচ্ছপের খোলা, অস্ট্রিচের ডিম ও অন্য প্রকার সব ডিম যা আকারে রাজহাঁসের ডিমের মত। সেগুলির মধ্যে পীতাংশ (কুসুম) ছিলনা বটে, কিন্তু স্বাদ উত্তম। যে পাখীর ডিম তা দেখতে অনেকটা রাজহাঁসেরই অনুরূপ। সে পাখীগুলি এত স্থূলকায় যে খাদ্য হিসেবে বিশেষ উপযুক্ত নয়। খেতে মাংসের চেয়ে মাছের মত লাগে। সেই মহিলারা দেখলেন যে আমাদের বাবুর্চি দু-তিনটি মুরগী কেটে রান্নার আগে ওদের নাড়ীভুঁড়ি সব বের করে দিচ্ছেন। তা দেখে তারা তা নিয়ে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি নিষ্কাশন করে স্বাভাবিক ভাবেই ওগুলিকে খেয়ে ফেললেন। তার সংগে জাহাজের কাপ্তেন প্রদত্ত সুরাসার পেয়ে আরও যে কি খুসী হলেন তারা তা বলার নয়। পুরুষ ও নারী কারোরই নগ্নতার জন্য কোনও লজ্জাবোধ নেই। বস্তুতঃ তারা যেন মনুষ্য দেহধারী কোনও পশু সত্তা।

জাহাজ পৌঁছতেই তারা অনেক ষাঁড় বা বলদ নিয়ে এসে তীর ভূমিতে হাজির হোল। সংগে আরও সব জিনিসপত্র ছিল। তা এনেছিল আর এক জাতীয় পানীয়, তামাক, স্ফটিক ও মূল্যবান পাথরের দানার সংগে বিনিময়ের

উদ্দেশ্যে। জাহাজীদের প্রস্তাবিত বিনিময় মূল্যে যদি তারা খুসী না হন, তাহলে দ্রুত চলে যাবেন। আর এমনভাবে শিস্ দিয়ে এগোবেন যে সমস্ত গরুগুলি ওদের পেছনে ছুটে চলে যাবে। তাদের আর দেখা যাবে না। যখন ওরা পলায়ণপর হয় তখন একবার কতক লোক ওদের কয়েকটি বলদকে গুলী করে মেরে ফেলেছিল। তারপর তারা আর কোনকালে ওখানে ষাঁড় বা গরু নিয়ে আসেনি।

জাহাজের পক্ষে ওখানে নোঙর করা বেশ সুবিধাজনক। কারণ ওখানে নতুন নতুন খাদ্য সংগ্রহ করা যায় সহজে। ওলন্দাজরা ওখানে একটি উত্তম কেল্লা তৈরী করিয়েছিলেন। জায়গাটি এখন সুদৃশ্য একটি সহরে হয়েছে পরিণত। এশিয়া ও ইউরোপ থেকে আনীত যে সকল শস্য বীজ ওখানে বপন করা হয় তার ফসল অন্যান্য স্থানের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হয়। দেশটি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। হয়ত কয়েক মিনিট উপরেও হতে পারে। সুতরাং বলা চলে না যে ওখানকার অবস্থান বা উত্তপ্ত আবহাওয়ার জন্যই স্থানীয় কাফ্রীদের গায়ের রঙ্ অত কালো। ওরা অত উগ্র ধরণের কালো কেন তা জানার তীব্র আগ্রহ হয়েছিল আমার।

একটি বালিকার মুখে শুনলাম যে তার জন্ম হয়েছিল একটি কেল্লার মধ্যে। তার জন্মের পরেই ত. ক তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। জন্মের সময় তার গায়ের রঙ ছিল আমাদের ইউরোপীয় মেয়েদের মতই সাদা। সে আমাকে বললো যে কাফ্রীদের রঙ্ অত কালো হয় কেন তার কারণ হচ্ছে ওরা নানারকম ওষুধ জাতীয় জিনিস দি়ে একটা মলম তৈরী করে গায়ে মাখেন। যদি জন্মের পরে অনবরত তা করা না হয় তাহলে তারা পরে একপ্রকার শোথ রোগে আক্রান্ত হন আফ্রিকা, আবিসিনিয়া ও সাবা অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গদের মত। তাদের কেউই চল্লিশ বছরের বেশী জীবিত থাকেন না। আর সর্বদাই দেখা যায় যে তাদের একটি পায়ের তুলনায় দ্বিতীয়টি দ্বিগুণ বড়। কাফ্রীরা যদিও বর্বর প্রকৃতির তাহলেও ওদের ওষুধ পত্র সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে। অনেক রোগ ব্যারামেই তা ওরা প্রয়োগ করেন। ওলন্দাজরা কয়েকবার তা পরীক্ষা করে দেখেছেন।

আমাদের জাহাজে উনিশ জন পীড়িত লোক ছিলেন। তাদের পনের জনকে কাফ্রীদের হাতে দেয়া হয়েছিল রোগ নিরাময়ের জন্যে। তাদের ব্যারামের মধ্যে প্রধান ছিল পায়ের ক্ষত এবং যুদ্ধে আহত হওয়ার ফলে পায়ে

পুরোনো ক্ষত। পনের দিনের মধ্যেই তারা আরোগ্য লাভ করেন। দু'জন করে কাফ্রী এক একটি রোগীকে দেখা শোনা করতেন। ক্ষতস্থানের অবস্থানুসারে তারা ভেষজ ওষুধ সংগ্রহ করতে যেত। তা সংগ্রহ করে এনে পাথরে বেটে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিত।

বাকি চারজন রোগী আক্রান্ত হয়েছিলেন বসন্ত রোগে। তারা ও ব্যাপারে কাফ্রীদের উপর আস্থা রাখেন নি। বাটাভিয়াতে তাদের আর আরোগ্য করা সম্ভব হয়নি। তারা শেষ পর্যন্ত অন্তরীপ ও সেন্ট হেলেনার মধ্যবর্ত্তী কোনও এক জায়গায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের জনৈক ভদ্রলোক বাটাভিয়াতে ছিলেন। এক রাত্রে তাঁকে ডাঁশ মশা এমনভাবে কামড়ায় যে তৎক্ষণাৎ তাঁর পা-দুটি অসম্ভব ফুলে যায়। সহরের সমস্ত সার্জনদের যাবতীয় চিকিৎসা নৈপুণ্য তা নিরাময় করতে হার মানে। অতঃপর তিনি অন্তরীপে এলেন। জাহাজের কাপ্তেন তাঁকে তীরে পাঠিয়ে দিলেন। কাফ্রীরা দল বেঁধে তাঁর কাছে এল। তাঁকে দেখে শুনে তারা বললেন যে তাদের হাতে চিকিৎসার ভার দিলে ওঁকে আরোগ্য করে দিতে পারবে। কাপ্তেন রোগীর দায়িত্ব তাঁদের হাতে অর্পণ করলেন। পনের দিনের মধ্যে তারা তাঁকে নিরাময় করে স্বাস্থ্যবান মানুষে পরিণত করে দিয়েছিলেন।

অন্তরীপে কোনও জাহাজ ভিড়লে নিয়ম হোল জাহাজে কর্মরত ব্যক্তিদের অধিকাংশকে তীরে নেমে বিশ্রাম করার জন্যে ছুটী দেয়া। প্রথমে পীড়িত ব্যক্তিরা পালাক্রমে ছুটী পান। তারা সহরে চলে যান। সেখানে প্রতিদিন তারা বিশেষ ন্যায্য মূল্যে বাসস্থান ও খাদ্যের সু-ব্যবস্থার সুযোগ পান। ব্যবহারও পান অতি সদয় ও উত্তম।

ওলন্দাজদের মধ্যে একটি প্রথা আছে। তাঁরা যে সময় অন্তরীপে থাকেন তখন সৈন্যদলকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠান নতুন জায়গা আবিষ্কারের জন্যে। যারা বেশী এগিয়ে ভিতরে যেতে পারেন, তাঁরা পুরস্কৃত হন। একবার এই উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য জনৈক সার্জেন্টের নেতৃত্বে দেশটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং অনেকখানি এগিয়ে চলে যান। ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার নেমে এল। তারা আত্মরক্ষার জন্য অর্থাৎ ঠাণ্ডা ও সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালালেন। তারপরে অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লে একটি সিংহ এসে জনৈক সৈন্যের বাহু আক্রমণ

করলো। সৈনিক তা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ বন্দুকের গুলী ছুঁড়ে সিংহকে হনন করলেন। কিন্তু সিংহের মুখগহ্বর থেকে সৈনিকের বাহুকে মুক্ত করতে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়। নিদারুণ নির্বুদ্ধিতা হয়েছিল। তারা মনে করেছিলেন যে সিংহ আগুনের কাছে এগিয়ে আসবে না। সেই আহত সৈনিককে কাফ্রীরা কিন্তু বারো দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছিলেন।

কেল্লাতে প্রচুর বাঘ সিংহের চামড়া সংগৃহীত আছে। সেখানে একটি অশ্ব চর্মও আছে। কাফ্রীদের হাতে ওটি নিহত হয়েছিল। অশ্বটি ছিল শ্বেতকায়, দেহে কালো দাগ কাটা। ঠিক চিতার গায়েতে যেমন থাকে, তেমনটি। পশুটি লাঙ্গুল হীন। ওলন্দাজদের কেল্লার অনতিদূরে একটি সিংহের মৃতদেহ দেখা গেল। চারটি শজারুর কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ ছিল। তাতে ধারণা হয়েছিল যে শজারুর আক্রমণে সিংহটি প্রাণ হারিয়েছিল। কাঁটাবিদ্ধ অবস্থায় পশুটির চামড়া কেল্লাতে সংরক্ষিত হয়েছে।

কেল্লার দেড় মাইল আন্দাজ দূরে চমৎকার একটি সহর। সেটি প্রতিদিন বড় হয়ে উঠছে। হল্যাণ্ড কোম্পানী জাহাজ নিয়ে ওখানে পৌঁছলে নাবিক ও সৈনিকরা সহরটি দেখে খুব খুসী হন। ওলন্দাজদের সেখানে অনেক জমি জায়গা আছে। আর তাতে যাবতীয় গাছপালা, সজী, ডাল, চাল ও আঙুর যত পরিমাণ প্রয়োজন ত.. ফলন হয়। আরও পাওয়া যায় শিশু অসৃট্রিচ, গোমাংস, সামুদ্রিক মৎস্য ও মিষ্টি পানীয় জল। অসৃট্রিচ ধরার নিয়ম এই যখন যেমন খুসী বাচ্চাগুলিকে বাসাশুদ্ধ নামিয়ে আনেন। মাটিতে খুঁটি পুঁতে বাসা শুদ্ধ পাখীগুলির এক একটি পা তার সংগে বেঁধে রাখা হয়। কিছুকাল পরে বাচ্চাগুলি বেশ বড় হয়ে উঠলে বাসা থেকে ওদের বের করে দেবার নিয়ম। তখন আর ওদের উড়ে চলে যাবার শক্তি থাকে না।

ওলন্দাজগণ অন্তরীপে বাস করতে আরম্ভ করার সংগে সংগে তাঁরা একটি সদ্যোজাত বালিকাকে তার মায়ের কোল থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। সে এখন শ্বেতকায়া ও সুন্দরী। তবে নাকটি কিছু চ্যাপ্টা। এখন সে ওলন্দাজদের দো-ভাষীর কাজ করে। জনৈক ফরাসী ভদ্রলোকের সংগে বাস করার ফলে তার একটি পুত্র সন্তান জন্মে। কিন্তু কোম্পানী তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অনুমতি দেয়নি। পরন্তু তার বেতনের একটি বৃহৎ অংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই শাস্তি অত্যন্ত কঠোর হয়েছিল বলা যায়।

ওখানে বাঘ-সিংহ আছে প্রচুর। ওলন্দাজরা সেই পশু শিকারের অভিনব একটি পন্থা আবিষ্কার করেছেন। মাটিতে একটি খুঁটি পুঁতে তার সংগে একটি বন্দুক বেঁধে রাখেন। খুঁটির আশে পাশে ছড়িয়ে রাখেন মাংস। একখণ্ড মাংস ঝুলিয়ে দেয়া হয় বন্দুকের ঘোড়ার সংগে। পশুরা সেই মাংস খণ্ড নিতে উদ্যত হলে দড়িতে টান পড়ে। তখন বন্দুক থেকে গুলী নিক্ষিপ্ত হয়ে সিংহের গলায় ও বুকে বিদ্ধ হয়।

কাফ্রীদের প্রধান খাদ্য মূলজাতীয় একটি জিনিস। তারা উহা পুড়িয়ে রুটী তৈরী করেন। কখনও তা পিষে ময়দা করা হয়। উহার স্বাদ আখরোটের মত। এই কন্দ তারা কাঁচাও খান। আর তা খান মাছ ও পশু প্রাণীর নাড়ীভুঁড়ির সংগে মিশিয়ে। পশু-প্রাণীর নাড়ীভুঁড়ি থেকে ময়লা আবর্জনা বের করে তবে খান। বন্য পশুদের নাড়ীভুঁড়ি শুকিয়ে কাফ্রী মেয়েরা পায়ে জড়িয়ে রাখেন। স্বামীদের হাতে নিহত পশুর নাড়ীভুঁড়িকেই ওরা অলঙ্কারের মত মনে করেন। ওরা কচ্ছপও খান। কচ্ছপগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেললে খোলা ছাড়ানো সহজ হয়। বর্শার মত সূক্ষ্মাগ্র লাঠি তারা অনেক দূর পর্যন্ত ছুঁড়তে পারে। উহা নিয়ে তারা গভীর সমুদ্রে চলে যান। জলের উপরে কোনও মাছের আভাস পেলেই তারা ওটি ছুঁড়ে মেরে তাকে ঘায়েল করেন।

ওলন্দাজরা একবার একটি কিশোর কাফ্রীকে বাটাভিয়ার জেনারেলের কাছে নিয়ে যান। তিনি ওকে খুব যত্ন সহকারে মানুষ করেন। ডাচ ও পর্তুগীজ ভাষা শিখিয়ে ছিলেন তাকে। অবশেষে সে স্বদেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলো। জেনারেল তখন তাকে অতি চমৎকার জামা পোষাক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এই আশাতে যে সে ওলন্দাজদের মধ্যে বাস করবে এবং দেশের অভ্যন্তরে আরও গভীর অংশ আবিষ্কার ব্যাপারে তাদের সহায়তা করবে। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াল বিপরীত হয়ে। সে দেশের মাটিতে পা দিয়েই সেই জামাজোড়া সব সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তার স্বজাতির মধ্যে ফিরে গেল সম্পূর্ণ বন্য ভাব নিয়ে। কাঁচা মাংস খেতে আরম্ভ করলো সেই বিগত শিশুকালের মত। সম্পূর্ণ বিস্মৃত হোল তার সেই সদাশয় প্রতিপালকের কথা।

কাফ্রীরা শিকারে বেরোয় দলবদ্ধ হয়ে। সেই সময় তারা এমন অস্বাভাবিক কোলাহল চীৎকার করেন যে বনের পশুরাও শুনে ভয় পেয়ে যায়। সেই ভীত সন্ত্রস্ত পশুদের তখন হনন করা তাদের পক্ষে বিশেষ সহজ হয়ে ওঠে। আমার নিশ্চিত ধারণা যে তাদের উৎকট চীৎকার শুনে সিংহরাও ভীতিগ্রস্ত হয়।

অধ্যায় সাতাশ

ওলন্দাজ নৌবহরের সেন্টহেলেনাতে আগমন : দ্বীপটির বিবরণ।

উত্তমাশা অন্তরীপে বাইশদিন অবস্থানের পরে দেখা গেল যে বাতাস অনুকূল হয়েছে। তখন আমরা সেন্টহেলেনার জন্য যাত্রা শুরু করতে উদ্যত হলাম। জাহাজ চলছিল। তখন একদিন নাবিকরা চীৎকার করে উঠলো। তারা সেন্টহেলেনার রাস্তায় পৌঁছনো পর্যন্ত নিদ্রা যাবেন, বাতাস একটানা চলছিল এবং তার ফলে ষোল কি আঠার দিনে দ্বীপের রাস্তায় পৌঁছনো যাবে। আমাদের নাবিকদের ভয়ংকর একটা অসুবিধা গিয়েছে। অন্তরীপ ছেড়ে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হবার পরে চৌদ্দদিন তারা মাস্তলের শীর্ষভাগে বসে কাটিয়েছেন দ্বীপটির অবস্থান আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। কেননা, দ্বীপটি দৃষ্টিপথে এলেই জাহাজ চালককে দ্বীপের উত্তরদিকে এগিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কারণ উত্তরদিক ব্যতীত আর কোথাও জাহাজ নোঙর করার উপযুক্ত স্থান ছিল না। সেখানে তীর সংলগ্ন স্থানেও জলের গভীরতা অত্যধিক। যেখানে নোঙর পড়বে সেখানেও উত্তমরূপে তা আবদ্ধ না হলে বাতাসের চাপে জাহাজ · টি থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কারণ বাতাসের গতি কখনও পরিবর্তিত হয় না।

জাহাজ ভিড়লেই.নাবিকদের কিছু সংখ্যককে তীরভূমিতে পাঠান হয় বন্য শূকর ধরে আনার জন্য। উহা সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। ঘাস পাতা সংগ্রহ করাও একটা উদ্দেশ্য থাকে। তাও ও-দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তা সংগ্রহের জন্য জাহাজীরাই কেবল যান না। সমস্ত শূকর, ভেড়া, হাঁস, পাতিহাঁস যা কিছু জাহাজে থাকে তাদের তীরে নামিয়ে দেখা হয় যাতে ওরা নিজেরাই খাদ্য সংগ্রহ করে খেয়ে আসতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যে জীব-জন্তুগুলি এমন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে যে হল্যাণ্ড পৌঁছবার মধ্যে তাদের আর বিশেষ কিছু খাদ্য দিতে হয় না। সেখানকার এক প্রকার শাক মানুষের পক্ষেও বিশেষ কার্যকর। তারা বন্য শূকরের মাংসের সংগে চাল ও সেই শাক সিদ্ধ করে এক প্রকার মণ্ড তৈরী করেন যা খেতে অতি চমৎকার। তা খেলে মানুষের দেহ অত্যন্ত কর্মক্ষম ও নির্মল থাকে।

সেন্টহেলেনা দ্বীপে জাহাজ নোঙর করার যোগ্য দুটি স্থান আছে। আমরা তন্মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেখানে জাহাজ ভিড়িয়েছিলাম। তার কারণ, ওখানকার জমি খুব উৎকৃষ্ট ছিল। আর পাহাড়ের ঝর্ণা ধারা থেকে যে জল নামে তা দ্বীপভূমির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। তবে দ্বীপের এই অংশটিতে কোনও সমতলভূমি নেই। পাহাড় পর্বতের ধারা নেমে এসেছে সমুদ্রতীর পর্যন্ত।

অন্য প্রান্তে জাহাজ নোঙর করা শ্রেয়ঃ নয়।

তবে সেখানে অতি উত্তম সমতল ক্ষেত্র আছে, যা ইচ্ছে ফসল ফলানো যায় এবং গাছপালা জন্মানোও চলে। জায়গাটিতে প্রচুর জম্বীর লেবু ও কমলালেবুর গাছ জন্মে। পর্তুগীজরা পূর্বে উহার চাষ করেছিলেন। তাঁদের ইহা স্বভাব ধর্ম। তাঁরা যেখানে যান, পরবর্তী জনসমাজের জন্য তাঁরা স্থানটির কিছু না কিছু উন্নতিসাধন করে রেখে আসেন। আর হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা যেখানে যাবেন, তাঁদের চেষ্টা থাকে তথাকার সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দেবার। তবে আমার মনে হয় যে কমাণ্ডারগণ সে রকম মনোভঙ্গীর মানুষ নন। কিন্তু ওলন্দাজ নাবিক ও সৈন্যরা বিপরীতভাবাপন্ন। তারা পরস্পর বলবেন যে আর কখনও ওখানে যাতায়াত করবেন না। আর লোভ ও ঈর্ষা প্রবল হয়ে সেখানে যত গাছপালা থাকবে তা কেটে শেষ করে দেবেন। ফল সংগ্রহ করার দিকে তাদের মন যায় না।

কয়েকদিন পরে গিনি থেকে ওখানে একটি পর্তুগীজ জাহাজ এসে পৌঁছোল। তা বোঝাই ছিল দাসজাতীয় লোক দ্বারা। ওদের নিয়ে যাচ্ছিল তারা পেরুর খনি অঞ্চলে। কিছু সংখ্যক ওলন্দাজ নিগ্রো ভাষা জানতেন। তাঁরা দাসজাতীয় লোকেদের বুঝিয়ে দিলেন যে কি শোচনীয় ও দুরন্ত কষ্টের জীবন ওদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছে। তা শুনে পরবর্তী রাত্রিতে তাদের দুশত পঞ্চাশজন সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বস্তুতঃই সেই দাস-জীবন অত্যন্ত দুঃখময়। কিছুদিন পরে তাদের মধ্যে কতকের এক নাগাড়ে খনিতে খননের কাজ করতে হয়। ভূপৃষ্ঠ ক্ষয় হতে হতে ভেঙ্গে পড়ে যায় এবং একসংগে ওদের চার পাঁচশত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিছুক্ষণ খনিতে কাজ করার পরেই তাদের মুখ, চোখ ও চামড়ার রঙ্-এর পরিবর্তন হয়ে যায়। তার কারণ খনিগর্ভে একটা গ্যাস উৎপন্ন হয়। সেখানে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তবে নারী পুরুষ উভয়কেই যথেষ্ট পরিমাণ তীব্র পানীয় দেয়া হয়। তাতে অনেকখানি আরাম বোধ হয়। কিছু সংখ্যক

দাস আছে যাদের মনিবরা তাদের মুক্ত জীবনের অধিকার দান করেন। তারা তখন নিজেদের জন্যে জীবিকা ও আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। কিন্তু শনিবার রাত্রি থেকে সোমবার প্রাতঃকাল পর্যন্ত সময় তারা ব্যয় করে তীব্র পানীয় সংগ্রহের জন্যে। সেই পানীয় অত্যন্ত মহার্ঘ্য। অতএব তাদের অতি শোচনীয় অবস্থায় দিন কাটাতে হয়।

সেন্টহেলেনা দ্বীপ ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ একটি পরামর্শ সভা ডাকলেন। উদ্দেশ্য ছিল জাহাজ নিয়ে কোন পথ ধরে যাওয়া সংগত তা আলোচনা। দক্ষিণদিকের পরিবর্তে পশ্চিমে জাহাজ চালানোই স্থির হোল। কারণ জাহাজ চালাবার উপযুক্ত সময় কেটে গিয়েছিল। কাজেই আমাদের জাহাজ যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দিকে এগিয়ে চলে তাহলে হল্যাণ্ড পৌঁছবার অনুকূল হাওয়া আমরা পেতে পারি। কিন্তু আমরা দ্বীপের সামান্য পার হতেই দেখা গেল যে নাবিকরা যেরকম আশা করেছিলেন হাওয়া-বাতাস একেবারে তার বিপরীত হয়ে উঠলো। সুতরাং দ্বীপভূমির চৌষট্টি ডিগ্রী দূরবর্তী স্থান ধরে এগিয়ে চললাম এবং উত্তরদিক ধরে হল্যাণ্ডে ফিরে গেলাম।

অধ্যায় আটাশ

ওলন্দাজ জাহাজের সেন্টহেলেনা পরিত্যাগ এবং সুখসমৃদ্ধি সহকারে হল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন।

অ্যাড্‌মিরালের আহূত পরামর্শ সভার নির্দেশে পরদিন আমরা রাত দশটায় যাত্রা শুরু করি। সেন্টহেলেনা ত্যাগ করার তিনদিন পরে নাবিকরা অত্যন্ত হতাশাভরে সকাল-সন্ধ্যা প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আমরা এর আগে জাহাজ চলার সময় এই ধরণের কাজ করতে তাঁদের কখনও দেখিনি। আমি আরও বিস্মিত হলাম এই দেখে যে তাঁরা বিপদগ্রস্ত অবস্থার চেয়ে বিপন্মুক্ত হয়ে অতিমাত্রায় ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করতেন।

কিছুদিন পথ চলার পরে আমরা একটি দ্বীপের উপকূলভাগ দেখতে পেলাম। তারপরে পৌঁছলাম ফেরেলা দ্বীপে। ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষমান ওলন্দাজ নৌবহরের সংগে আমরা মিলিত হলাম। ওখানেই মুখ্য নৌধ্যক্ষ সমস্ত নাবিকদের কাছে জানতে চাইলেন। সমগ্র যাত্রাপথে তাদের অসদাচরণের ঘটনা সম্পর্কে।

আমাদের জাহাজ জিল্যাণ্ডে যাবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জাহাজকে সাতদিন বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমরা কিছুতেই ফ্লাশিং-এ জাহাজ প্রবেশ করাতে পারিনি। কারণ বালির চড়া পড়ে জায়গাটির অবস্থান ঠিক ছিল না। তার কিছু আগে জাহাজ নোঙর করলো। তখন কোম্পানির দুটি লোক এলেন আমাদের অভ্যর্থনা করে গৃহে নিয়ে যাবার জন্য। তারা আমাদের বললেন প্রত্যেকের বাক্স-পেঁটরা তালা বন্ধ করে চিহ্ন দিয়ে রাখতে। কারণ সমস্ত পেটিকা ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে মালিকরা তা নিতে গেলে উহা খুলবার নির্দেশ দেয়া হয়। তখন অনুসন্ধান চালানো হয় যে কোনও নিষিদ্ধ জিনিস আছে কিনা। আমি আমার বাক্সগুলিকে চিহ্নিত করে তীরে চলে গেলাম। আর জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সমগ্র যাত্রাপথে তাঁর ভদ্র ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। অতঃপর স্থলভাগে অগ্রসর হয়ে মিডল্‌বার্গের দিকে যাত্রা করলাম।

চারদিন পরে মিডল্‌বার্গে পৌঁছে আমি আমার বাক্স পেঁটরা আনার জন্য যাই। সেখানে দু'জন ডিরেক্টরকে উপস্থিত দেখলাম। তাঁদের একজন জিল্যাণ্ডবাসী, দ্বিতীয় জন হোর্নের বাসিন্দা। এঁরাই আমাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে গিয়েছিলেন। আমি চাবিদিয়ে বাক্স খোলার প্রস্তাব দিলাম। হোর্নবাসীর তুলনায় জিল্যাণ্ডের লোকটি অনেক ভদ্র। আমার চাবি আমাকে ফেরত দিয়ে তিনি আমার কথার উপর নির্ভর করে বললেন যে আমি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারি। বস্তুতঃই আমি সর্বদা লক্ষ্য করেছি যে হল্যাণ্ডের উত্তর অঞ্চলীয় লোক দক্ষিণ অংশের লোক অপেক্ষা অতিরিক্ত রূঢ় প্রকৃতির ও ভদ্রতা জ্ঞানহীন।

বাটাভিয়ার জেনারেল প্রতিশ্রুত ১৭,৫০০ ফ্লোরিণ আমাকে হল্যাণ্ডে পৌঁছবার পরে দেবার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে আমাকে এত বিলম্ব করতে হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আমি মোকদ্দমা করতে বাধ্য হই। সেই মামলা দু'বছরের উপরে চলেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি আমষ্টারডাম্ বা হগ্ কোথাও একজন নোটারি পাবলিক পাইনি যিনি আমার পক্ষ সমর্থন করে সেই বিলম্বের প্রতিবাদ করেন। প্রত্যেকেরই ডিরেক্টরদের সম্পর্কে ভীতি ছিল। কেননা, তাঁরা হলেন বিচারক, আবার অভিযোগও তাঁদেরই বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত পাঁচদিন বাদবিতণ্ডা ও কলহ-বচসার পরে ডিরেক্টর বাটাভিয়াতে আমার ভাইকে লিখলেন (কারণ, আমি তখন আবার ভারতে ফিরে যাবার ব্যবস্থা কচ্ছিলাম) যে আমি যদি দশ হাজার লিভর্ মুদ্রা গ্রহণ করতে রাজী হই তাহলে তার হাতে তা প্রদান করা হবে। আমার ভ্রাতা তা গ্রহণ করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন এমন রসিদ দিতে হয়েছিল।

এই হোল ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ অন্তে আমার প্রত্যাবর্তন যাত্রা। এইবারেই কেবল আমি সমুদ্র পথে ফিরেছিলাম। অন্যান্য যাত্রায় প্রতিবারেই আমি স্থল পথে যাতায়াত করেছি। কোন সূত্রেই ভূমধ্যসাগর পথে যাত্রাকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করিনি। আমার প্রথম যাত্রায় আমি সমুদয় পথ অতিক্রম করেছিলাম স্থলভাগ দিয়ে, অর্থাৎ প্যারিস ছেড়ে জার্মানী ও হাঙ্গেরী হয়ে কন্‌স্টান্টিনোপল্ পর্যন্ত। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে আর একবার ফেরার পথেও কন্‌স্টান্টিনোপলে গিয়েছিলাম।

সেখান থেকে যাই স্মার্নাতে। ওখানে গিয়ে লেঘর্নের উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করি। লেঘর্ন থেকে স্থলপথে চলে যাই জেনোয়াতে। জেনোয়া

ছেড়ে যেতে হয়েছিল তুরিনে। সেখান হতে গিয়েছিলাম প্যারিসে। প্যারিসে পৌঁছে রাজাকে চমৎকার এক প্যাকেট হীরক উপহার দিয়েছিলাম। এই বিষয় আমি মূল্যবান মণিরত্ন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছি। মহিমান্বিত সম্রাট আমাকে অতি সহৃদয়তাপূর্ণ একটি সম্বর্দ্ধনা জানান। তা হয়েছিল যেন আমার সুদীর্ঘ ও বারম্বার ভ্রমণ যাত্রা সমূহের গৌরবময় পরিপূর্ত্তি। আমার প্রতিটি যাত্রায় সর্বদাই আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতো এশিয়ার শ্রেষ্ঠ রাজা-মহারাজাদের একটি বিষয়ে সুবিদিত ও অভিজ্ঞ করে তোলা যে ইউরোপে তাঁদের চেয়েও একজন মহত্ত্বর ও শ্রেষ্ঠতর রাজা আছেন। আর তিনি (আমাদের দেশের রাজা) এশীয় রাজাবাদশাদের তুলনায় শক্তি ও ঐশ্বর্য মহিমা, সবদিকেই চূড়ান্তরূপে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ।

আমার ষষ্ঠ যাত্রা অন্তে আমি প্যারিসে উপনীত হলে সর্বাগ্রে আমার মনে যে চিন্তাটির উদ্রেক হয়েছিল তা হোল আমার রক্ষাকর্তা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নানা দুর্যোগ-দুর্ঘটনার মধ্যে তিনি আমাকে বিপদসঙ্কুল জল ও স্থল পথে দূর দূরান্তে ও সুদূর দেশে-বিদেশে রক্ষা করেছেন, সাহায্য করেছেন এবং শক্তি সঞ্চার করে দিয়েছেন আমার দেহে ও মনে।